Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭২ ভাগ। ১ম সংখ্যা। } ১লা মাঘ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪৩ সাল, ১৮৫৮ শক, ১০৮ ব্রাহ্মাব্দ
14th. January, 1937 { অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩্

প্রার্থনা।

হে জগত্রাতা! তুমি জগতের পরিত্রাণের জন্য যুগে যুগেই যুগধর্ম্ম প্রেরণ করিয়াছ, যুগে যুগেই তোমাকে [illegible] করিবার বিশেষ আয়োজন স্বরূপ যুগধর্ম্মের [illegible] বিশেষ বিশেষ উপাসনা-প্রণালীরও ব্যবস্থা করিয়াছ। নব-যুগধর্ম্ম নববিধানেও জীব তোমাকে লাভ করুক, তাহার প্রধান উপায় স্বরূপ তুমি নব উপাসনা-প্রণালীর ব্যবস্থা করিয়াছ। জগতের সকল ধর্ম্মবিধান লইয়া যেমন নব যুগের মহাধর্ম নববিধান, তেমনই এই নববিধানের উপাসনা-প্রণালীও সকল যুগধর্ম্মবিধানের উপাসনা-প্রণালীর সমষ্টিগত গঠন বলিলেও হয়। এমন পূর্ণাঙ্গ উপাসনা-প্রণালীই বা আর কোথায়, তোমাকে সর্ব্বতোভাবে লাভ করিবার এরূপ আয়োজনই বা আর কোথায়? কিন্তু অতি আক্ষেপের বিষয় এই, এমন সরস সুন্দর বিজ্ঞানময় পূর্ণাবয়বসম্পন্ন স্বর্গের উপাসনা-প্রণালীও আমাদের মণ্ডলীর মধ্যে, আমাদের দেশ মধ্যে আদৃত হইতেছে না, ঘরে ঘরে, পরিবারে পরিবারে এ উপাসনা সাধন হইতেছে না। আমরা প্রত্যেকেই অল্পাধিক এ জন্য অপরাধী। উপাসনাবিহীনতা আমাদের জীবনকে, পরিবার ও মণ্ডলীকে শুষ্ক কঠিন এবং নানা মানসিক অপরাধে অপরাধী করিতেছে। উপাসনায় অরুচি অর্থ তোমার প্রতি অরুচি, উপাসনার প্রতি অনাদর অর্থ তোমার প্রতি অনাদর। তাই এই মহা মাঘোৎসবের আরম্ভে তব চরণে কাতর ভিক্ষা, তুমি আমাদের সকলের জীবনকে উপাসনাশীল কর; যাঁহারা উপাসনাশীল হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আরও অধিক উপাসনাশীল কর; যাঁহারা উপাসনায় শিথিল, তাঁহাদিগকে উপাসনা বিষয়ে নব চেতনা, নব জাগরণ দিয়া উপাসনার আলোকে উদ্দীপ্ত কর; আর যাঁহারা এ পর্য্যন্ত উপাসনা গ্রহণ [illegible], তাঁহাদের জীবনে স্বর্গের নব আলোক ঢালিয়া নব জাগরণ দিয়া, নববিধানের নব উপাসনায় [illegible] দীক্ষিত কর। তুমি এবার গুরু, তুমি এবার ধর্ম্মের প্রবর্ত্তয়িতা। এই উৎসব সময়ে আমাদের সকলকে তুমি উপাসনা-সাধনে প্রমত্ত করিয়া, প্রমত্ত উপাসনার ভিতর দিয়া তোমাকে তুমি আমাদের মধ্যে বিলাইয়া দেও। এবার দেখি, উৎসব-ক্ষেত্রে স্বয়ং তুমি মূর্ত্তিমান্ অবতীর্ণ হইয়া তোমাকেই তুমি বিলাইতেছ, আর আমরা তোমাকে প্রচুর ভাবে লাভ করিয়া তোমাধনে ধনী হইতেছি, তোমাধনে ধন্য হইতেছি।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

উপাসনাময় ভারত

আমাদের অতি প্রিয় পুণ্য মাঘোৎসব সমাগত; এ সময় আমাদের মণ্ডলীর, দেশের এবং বিদেশের সকল শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় ভাই ভগ্নীদিগকে এই মহা মহোৎসবে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি। মহোৎসব-সম্ভোগ অর্থ উপাসনা-যোগে পরব্রহ্মের সহিত মিলনসম্ভোগ ও ভাইভগ্নীদিগের সহিত স্বর্গীয় মিলনসম্ভোগ। উপাসনার ভিতর দিয়া প্রস্তুত না হইলে মাঘোৎসবের জন্য প্রস্তুত হইতে পারিনা, উপাসনার ভিতর দিয়া প্রস্তুত না হইলে পরব্রহ্মের সহিত মিলিত হইতে পারি না, ভাইভগ্নীদের সহিত মিলিত হইতে পারি না; ভারতের পূজা-উপাসনা-সম্পদ আমাদের বিশেষ সম্পদ। তাই এ সময়ে ভারতের উপাসনাকে প্রবন্ধের বিষয় করিয়া ভাই ভগ্নীদের নিকট উপস্থিত করিলাম।

আমাদের নববিধান জাতীয় বিধান। ভক্ত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ভারতের ধর্ম্মধারার উচ্চতা, গভীরতা, সরসতা, বিচিত্রতা, বৈশিষ্ট্য প্রাণে বিশেষ ভাবে গ্রহণ করিয়া, জাতীয় ভিত্তিতে, জাতীয় ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য সৌন্দর্য্যে নববিধানের মহা উপাসনাকে সজ্জিত করিয়াছেন। স্বয়ং পবিত্রাত্মা কেশবচন্দ্রকে যন্ত্রবৎ পরিচালনা করিয়া, নব যুগের এই নব উপাসনার গঠন দান করিয়াছেন। এ উপাসনার মধ্যে বিদেশীয় সম্পদ মিশ্রিত থাকিলেও, এ উপাসনা দেশের বিচিত্র শোভা সম্পদে পূর্ণ। ভারতের আদি যুগের ধর্ম্মধারা ক্রমে পরিপুষ্ট হইতে হইতে উচ্চতর, উচ্চতম পরিপুষ্টি লাভ করিয়া, কি বিশাল স্রোত-স্বতীরূপে ভক্তির তরঙ্গ, যোগের পর্ব্বততুল্য ঘনতা গম্ভীরতা ও উচ্চতা, জ্ঞানের তীক্ষ্ণোজ্জ্বল কিরণমালা ও কর্ম্মের অসংখ্য শাখা প্রশাখায় বিচিত্রতা বক্ষে ধারণ করিয়া, কত ভাবেই দীর্ঘ উন্নতিপথে অগ্রসর হইয়াছে। নববিধানের নব উপাসনাতে সে সকলই মঙ্গলময় বিধাতার অপূর্ব্ব কৌশলে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। নববিধানের উপাসনা বিদেশীয় খৃষ্ট সম্প্রদায়ের, মুসলমান সম্প্রদায়ের বিশেষ অঙ্গকে আপনার অঙ্গে সন্নিবিষ্ট করিয়া আপনার কলেবরকে বৃদ্ধি করিয়াছেন সত্য, কিন্তু নববিধানের উপাসনায় জাতীয় ভাব প্রধান, ভারতীয় ভাব প্রধান। আমরা নববিধানের উপাসনাযোগে পবিত্রাত্মার আলোকে দেখিতে পাই; ভারত যেমন উপাসনা-প্রধান, ভারত যেমন উপাসনাময়, পৃথিবীর অন্য কোন দেশ এরূপ উপাসনা-প্রধান ও উপাসনাময় নহে।

আর্য্যগণ যখন ভারতে আসিয়া পারিবারিক ও সামাজিক জীবন প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন ধর্ম্মকে, পারিবারিক উপাসনাকে গৃহপরিবারের ও বৃহৎ সমাজের ভিত্তি করিয়া, তাঁহারা পারিবারিক ও সামাজিক জীবন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। গৃহপরিবার ও সামাজিক জীবন-রচনার মূলে স্বামী ও স্ত্রীর ধর্ম্মবন্ধন ও মিলিত জীবন। স্বামী স্ত্রীর জীবনের বন্ধন ও মিলিত জীবন যদি ধর্ম্মময় হয়, ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হয়, তবেই গৃহপরিবার হয় ধর্ম্মময়, সমাজ হয় ধর্ম্মময়, এবং ক্রমে সমস্ত দেশ হয় ধর্ম্মময়। স্বামী স্ত্রীর মিলিত জীবন যদি উপাসনা-প্রধান হয়, তবে গৃহপরিবার ও সমাজ উপাসনা-প্রধান হয়, সমস্ত দেশ ক্রমে উপাসনা-প্রধান হয়। ভারতে আর্য্যজাতির পারিবারিক ও সামাজিক জীবনস্থাপনে স্বামী স্ত্রীর মিলিত জীবন, মিলিত কর্ম্ম ছিল উপাসনা-প্রধান, উপাসনাময়। তাই ক্রমে ভারতের জাতীয় জীবন হইয়াছে উপাসনাময়, ভারত হইয়াছে উপাসনাময়। ভারতের উপাসনায় যেমন ধ্যান ধারণা প্রধান, যোগ, ভক্তি প্রধান, ভারতের উপাসনায় যেমন জ্ঞান কর্ম্ম প্রধান, ভারতের উপাসনা যেমন সরস ও সুন্দর, ভারতের উপাসনা যেমন বিচিত্র ভাবে পূর্ণ, এমন আর কোন্ দেশের উপাসনা? ভারতের উপাসনা যেমন জাতীয় জীবনের ছোট বড় সকল অনুষ্ঠান আচরণ ও সকল কর্ম্মকে আপনার আয়ত্তাধীন করিয়া, গৃহপরিবারের সকল কর্ম্ম, সকল অনুষ্ঠান, সকল আচরণকে উপাসনাময় করিয়াছে, ধর্ম্মময় করিয়াছে, এমন আর কোন্ দেশের উপাসনা করিয়াছে? জগতে ধর্ম্মযুক্ত ভারত, সভ্যতাযুক্ত ভারত। ভারতের সভ্যতায় বাহিরের সাজ সজ্জা, বাহিরের ভোগ বিলাসিতার আয়োজন প্রধান নহে, বাহ্য ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্য প্রধান নহে; ভারতের সভ্যতায় ধর্ম্ম প্রধান, ধর্ম্মসম্পদে ভারতের সভ্যতা গৌরবান্বিত। ধর্ম্মই ভারতের সভ্যতার প্রাণ, উপাসনা হইতে ধর্ম্ম, তাই উপাসনাময় ভারত।

অন্যদেশেও ধর্ম্ম আছে, উপাসনা আছে; অন্য-দেশেও গভীর সাধন ভজন আছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু অন্য দেশের সঙ্গে ভারতের ধর্ম্ম ও সাধনার প্রকৃত ভেদ কোথায়? ভারতের স্বামী ও স্ত্রীর মিলিত জীবনের

ধর্ম্মতত্ত্বের ক্রোড়পত্র ; ১লা মাঘ, ১৩৪৩।

সপ্তাধিকশততম মাঘোৎসব উপলক্ষে, ১লা মাঘ, ১৩৪৩ (১৪ই জানুয়ারী, ১৯৩৭) হইতে আরম্ভ করিয়া, ৩০শে মাঘ (১২ই ফেব্রুয়ারী) পর্য্যন্ত, নিম্নলিখিত পুস্তক সকল স্বল্পমূল্যে, ৯৫নং কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীটে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে এবং ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটস্থ প্রচারকার্য্যালয়ে পাওয়া যাইবে। অর্ডার পাইলে মফঃস্বলে ভিঃ পিঃ যোগে বই পাঠান হইবে।

পুস্তকের তালিকা।

ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন (দ্বাদশ সংস্করণ)	২॥৹	২৲
চিরঞ্জীব-সঙ্গীতাবলী (গীত-রত্নাবলী ও পথের সম্বল)	১৸৹	১।৹
শ্লোকসংগ্রহ	১৲	৸৹
অনুষ্ঠান-সঙ্গীত ১ম (ভাই কালীনাথ ঘোষ)	॥৹	।৵৹
ঐ ২য় ঐ	।৹	৶৹
নামসুধা ঐ	।৹	৶৹
আত্মদান ঐ	।৹	৶৹
বিবিধ ধর্ম্মসঙ্গীত (স্বর্গীয় ভাই প্রসন্নকুমার সেন)	১৲	॥৹
হিন্দি শতগান (শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ)	॥৹	।৵৹
Songs of Tomorrow—L. M. Chatterji	0 4	
উপদেশাবলী (প্রেরিতগণের উপদেশ)	১।৹	৸৹
ধর্ম্মবিজ্ঞানবীজ, চারি খণ্ড (৺কালীশঙ্কর দাস)	১৲	॥৹
কার্লাইল ও বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম (নগেন্দ্রনাথ মিত্র)	৵৹	৴১০
নিবেদন ঐ	।৹	।৵৹
উপাসনার স্বাভাবিকত্ব (ডাঃ ৺পরেশরঞ্জন রায়)	৴৹	৹১০
খ্রীষ্ট ও ব্রাহ্মসমাজ (স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ সেন)	৴৹	৹১০
শাক্যমুনিচরিত (সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত)	১।৹	১৲
গোস্বামী রঘুনাথ দাস ঐ	৶৹	৵৹
ধ্রুব ও প্রহ্লাদ ঐ	।৹	।৹
দেবর্ষি নারদের নবজীবনলাভ ঐ	৹১০	
নানকপ্রকাশ ১ম ও ২য় (ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু) প্রতিখণ্ড	৸৹	।৹
ব্রহ্মোপাসনা (ভাই উমানাথ গুপ্ত)	॥৹	।৵৹
বুদ্ধদেবের স্থান (ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী)	৵৹	৴১০
মহাপরিনির্ব্বাণসূত্র ঐ	॥৹	।৵৹
নিত্যভিক্ষা ঐ	।৹	৶৹
যুবকদের প্রতি উপদেশ ঐ	৶৹	৵৹
ব্রহ্মোপাসনা ঐ	॥৹	।৵৹
কেশব-পরিচয় (অরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়)	।৹	৵৹
শ্রী শ্রীহরিলীলারসামৃতসিন্ধু (স্বর্গীয় শশিভূষণ তালুকদার প্রণীত) ১ম ও ২য় (প্রতি খণ্ড)	১৲	৸৹
নবতত্ত্বামৃতম্ (সংস্কৃত) ঐ	১৲	৸৹
ঋগ্বেদ, ১ম ও ২য় (অধ্যাপক দ্বিজদাস দত্ত) প্রতিখণ্ড	২॥৹	২৲
শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ও শাঙ্কর দর্শন, ১ম ঐ	২৲	১॥৹
ঐ ২য় ঐ	৩৲	২৲
ইস্‌লাম ঐ	১॥৹	১৲
কোরাণের সূরা ও বেদের সূক্তসংগ্রহ ঐ	১৲	৸৹
সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় ঐ	১৲	৸৹
সার্ব্বভৌমিক ব্রাহ্মধর্ম্ম বা নববিধান ঐ	।৹	৶৹
Behold the Man Do	১॥৹	১৲
Rgveda Unveiled Do	5 0	4 0
Vedantism Do	1 0	0 12
Keshub Chunder Sen (G. P. Mazumder)	1 0	0 8
Life of Bhai Balodeb Narayan Do	0 4	0 3
Keshub Chunder Sen (Testimonies in Memorium) (G. C. Banerjee)	1 4	1 0
Keshub Chandra and Ramkrishna Do	2 0	1 8
Keshub as seen by his opponents Do	1 0	0 8
বিবরনির্ঘণ্ট সূচী ঐ	।৵৹	।৹
সত্য-কথা (ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন)	।৹	।৵৹
সাধু প্রমথলাল (শ্রীশরৎকুমার রায়)	৵৹	
ব্রহ্মতত্ত্ব (৺নিবারণচন্দ্র মুখার্জি)	।৹	।৵৹

[স্বর্গগত উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় প্রণীত]

বেদান্তসমন্বয় (বাঙ্গালা)	৫৲	৩৲
গীতাসমন্বয়ভাষ্যম্ (সংস্কৃত)	৩৲	২৲
বেদান্তসমন্বয়ঃ ঐ	৪॥৹	৩৲
গীতাপ্রপূর্ত্তিঃ ঐ	৩৲	২৲
নবসংহিতা ঐ	৸৹	।৹
ভাষ্যসঙ্গমনী (১ম খণ্ড) ঐ	১৲	৸৹
ধর্ম্মতত্ত্ব (বিবেক ও বুদ্ধির কথোপকথন) ১ম	।৵৹	।৹
ঐ ঐ ২য়	৸৹	।৵৹
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এবং তাঁহার স্বভাবনিষ্ঠ যোগ (প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ) প্রতি অংশ	।৹	।৵৹
শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্ম	১॥৹	১৲
কেশবচন্দ্র—উপাধ্যায়ের বক্তৃতা	১॥৹	১৲
নববিধান অপরিহার্য্য	৵৹	৴১০
প্রেরিত কালীশঙ্কর দাস	।৹	।৵৹
উপাসনাপ্রণালীর ব্যাখ্যা	৶৹	৵৹
শ্রৌতাচারের পুনরাবৃত্তি	৴৹	৹১০
ত্রিবিধ জন্ম	৴৹	৹১০
বৈদান্তিক পরলোকতত্ত্ব	৴৹	৹১০
আর্য্যবর্ণ ও তদ্ব্যাখ্যাতৃগণ	৶৹	৵৹
গায়ত্রীমূলক ষট্‌চক্রের ব্যাখ্যান ও সাধন	৴১০	৴৹

[স্বর্গগত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন প্রণীত]

কোর্‌-আন্ শরীফ (বাঙ্গলা) (নূতন সংস্করণ)	৬৲	৫।৹
হদিস (বাঙ্গালা) ১০ খণ্ড (প্রতিখণ্ড)	।৹	।৵৹
মহালিপি	।৵৹	।৹
ধর্ম্মসাধন-নীতি	।৵৹	।৹
চারিটী সাধ্বী মুসলমান নারী	।৵৹	।৹
ধর্ম্মবন্ধুর প্রতি কর্ত্তব্য	৶৹	৴১০
মহাপুরুষ মোহম্মদ ও তৎপ্রবর্ত্তিত এস্‌লাম ধর্ম্ম	৸৹	।৹
তত্ত্বসন্দর্ভমালা	।৵৹	।৹
এমাম হসন ও হোসয়নের জীবনী	১।৹	৸৹
চারিজন ধর্ম্মনেতা	৸৹	।৹
হাফেজ (বাঙ্গালা) (প্রথম ভাগ)	১৲	৸৹
হিতোপাখ্যানমালা—১ম ভাগ (গোলেস্তাঁ)	।৵৹	।৹
„ ২য় ভাগ (বোস্তাঁন)	৸৹	।৵৹
„ ১ম ও ২য় (মনোনীতাংশ) প্রতি খণ্ড	।৹	৶৹
নীতিমালা (কিমিয়ায় সাদত হইতে সঙ্কলিত)	।৵৹	।৹
তাপসমালা (৬ ভাগে সমাপ্ত)	৩৲	২॥৹
তত্ত্বরত্নমালা (মস্নেকোত্তয়র ও মওলানা রোম)	।৵৹	।৵৹
মহাপুরুষচরিত—প্রথমভাগ	।৵৹	।৵৹
দরবেশী	।৹	৶৹
তত্ত্বকুসুম	৴৹	৹১০
রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবন ও উক্তি	৶৹	৵৹
আত্মজীবন	১৲	।৹
Keshub Chunder Sen—Correct statement of some disputed facts in his life	0 8	0 6

[ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল-প্রণীত]

ব্রহ্মগীতা	১॥৹	১৲
ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা ঐ	১৲	॥৹
ঈশাচরিতামৃত—১ম ও ২য় ভাগ, প্রতি খণ্ড ঐ	৸৹	॥৹
চিরঞ্জীব-সঙ্গীতাবলী ঐ	১৸৹	১।৹
কেশবচরিত ঐ	১৲	৸৹

Minister K. C. Sen's works :—

Lectures in India (Cassell's Edition) Part I and II (each)	3	0	2	8
Lectures in England (Part I)	1	4	1	0
Yoga—Objective & Subjective	0	4	0	3
The New Samhita	0	4	0	3
Essays—Theological and Ethical	1	8	1	0
Discourses and Writings—Part I	0	8	0	6
The New Dispensation—The Religion of Harmony—Vol. I. & Vol. II. each	1	8	1	0
True Faith	0	2	0	1
Social Reformation in India	0	2	0	1

ভক্তিযোগ		৴০
দৈনিক প্রার্থনা (ভারতাশ্রম) ১ম ও ২য়, প্রতিখণ্ড	৸০	॥০
দৈনিক প্রার্থনা (কমলকুটীর) ৩য়—৮ম, পতিখণ্ড	৶০	
হিমালয়ের প্রার্থনা ১ম খণ্ড	।৶০	।০
হিমালয়ের প্রার্থনা ২য় ও ৩য় (প্রতি খণ্ড)	৶০	
প্রার্থনা—(ব্রহ্মমন্দির)	।৶০	।০
মাঘোৎসব	॥০	।৶০
ব্রহ্মগীতোপনিষৎ	৸০	॥০
সাধুসমাগম	॥০	।৶০
সেবকের নিবেদন ১ম ও ২য় খণ্ড	১৲	৸০
ঐ ঐ ৩য় খণ্ড	১৲	৸০
ঐ ঐ ৪র্থ খণ্ড	৸০	॥০
ঐ ঐ ৫ম খণ্ড	॥০	।৶০
আচার্য্যের উপদেশ ১ম খণ্ড	৸০	॥০
ঐ ২য় খণ্ড	১৲	৸০
ঐ ৩য় খণ্ড	৸০	॥০
ঐ ৪র্থ খণ্ড	১৲	৸০
ঐ ৫ম খণ্ড	১৲	৸০
ঐ ৬ষ্ঠ খণ্ড	১।০	১৲
ঐ ৭ম খণ্ড	১৲	৸০
ঐ ৮ম খণ্ড	১৲	৸০
ঐ ৯ম খণ্ড	১।০	১৲
ঐ ১০ম খণ্ড	১॥০	১৶০
দৈনিক উপাসনা	।০	৶০
সঙ্গত—(সঙ্গত-সভার আলোচনা) ১ম ভাগ	১৲	৸০
ঐ ঐ ২য় ভাগ	১৲	৸০
জীবনবেদ	॥০	।৶০
বিধানভগ্নীসঙ্ঘ (ব্রাহ্মিকাদিগের প্রতি উপদেশ)	১।০	১৲
অধিবেশন –(ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ)	॥০	।৶০
উপাসনা প্রণালী	৴০	৵১০
নবসংহিতা	৸০	॥০

Spiritual Progress (sayings and writings of Brahmananda collected by Sujata Debi)	0 4	
The Way to Prakriti Band Do	-/2/-	-/1/-
Why New Dispensation Do	-/2/-	-/1/-
পরলোকের সন্ধান ঐ	।০	৶০
নামমালা (ব্রহ্মানন্দের পুস্তকাবলী হইতে মণিকা দেবী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত)	।০	
যোগ(রায় সাহেব বিপিনমোহন সেহানবিশ-অনুবাদিত)	।০	৶০
Jeevan Veda, (Hindi translation by Rai Sahib Bechu Narayan)	0 8	0 6
The New Veda English translation (by J. K. Koar)	0 8	0 6

Rev. P. M. Choudhury's works :—

সত্য-রত্ন	১৲		।০	
সুনীতি-কুসুম	১৲		।০	
প্রতিমা	।০		৶০	
England & India	1	0	0	8
God's Treasury Part I	0	8	0	4
The Sex of Man	2	0	1	0
God and Man	1	0	0	8

Rev. P. C. Mozoomdar's works :—

আশীষ	১৲		৸০	
খ্রীচরিত্র	॥০		।৶০	
অখণ্ড জীবন	৴০		৵১০	
যুগধর্ম্ম ভাগবত	৴০		৵১০	
The Silent Pastor	0	8	0	6
The Spirit of God	2	0	1	8
The Oriental Christ	2	0	1	8
Heart-Beats	2	0	1	8
Faith and Progress of the Brahmo Somaj	2	0	1	8
To the Young men of India			0	1
উপদেশ ১ম খণ্ড	।০		৶০	
উপদেশ ২য় খণ্ড	।৶০		।০	
উপদেশ ৩য় খণ্ড	।০		৶০	
Life & Teachings of Keshub Chunder Sen	3	0		
Life of Protap Chunder Mozumdar	2	0	1	0
Life of Benoyendranath Sen (In English)	3	0	2	0
" " (In Bengali)	2	0	1	0
Intellectual Ideal (By Prof. B. N. Sen)	1	0		
Lectures & Essays Vol. I.(Literary) do.	1	8	1	0
Vol. II. (Theological) do.	1	0	0	12
Vol. III. (Sermons) do.	0	12	0	8
আবৃত্তি do.	৸০		।০	
গীতা-অধ্যয়ন do.	৶০		৴০	
In the Sanctuary of Silence (Nandalal Sen)	-/8/-		-/6/-	
The Lawgiver of Modern India (P. L. Sen)			0	1
নালুদার চিঠি—১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ভাগ, প্রতি খণ্ড	১৲		৸০	
কেশবচন্দ্র ও বঙ্গসাহিত্য (যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত)	৩৲		২৸০	
বিজ্ঞান ও বিশ্বাসের সমন্বয় (ভাই মহিমচন্দ্র সেন)	৴০		৵১০	
শ্রীমদ্গীতাপ্রপূর্ত্তি (সংস্কৃতের বঙ্গানুবাদ) ঐ	৩৸		২॥০	
ব্রহ্মস্বরূপের প্রকাশ ঐ	৸০		।০	
পারমহংস্যধর্ম্মঃ ঐ	।০		৶০	
শ্লোকসংগ্রহ (পদ্যানুবাদ) ঐ	১৲		৸০	
Sloka Sangraha (Translated in Hindi By Bhakta Hari Sunder Bose)	0	8	0	6
নববিধানের নূতনবেদ জীবনবেদ (ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ)	৶০		৴১০	
বৌদ্ধধর্ম্ম ও নববিধান— ঐ	।৶০		।০	
Fragments, Parts I—V, Do.	1	2		
The Apostles and Missionaries of Navavidhan, (Prof. N. Niyogi), Paper bound	3	12	3	0
ভক্ত-কেশব ঐ	৶০		৴০	
ঋষি প্রতাপচন্দ্র ঐ	॥০		।০	
কেশব-সমাগম (শ্রীমতিলাল দাস)	১৲		॥০	
কেশব-কাহিনী ঐ	১॥০		১৲	
The Evolution of Navavidhan—(Miss N. Ghosh)	1	0	0	12
Keshub Chunder Sen and Coochbehar Betrothal (Dr. P. K. Sen)	1	0	0	12
Brahmo Pocket Diary 1937			-/4/-	

শ্রীঅক্ষয়কুমার নাথ
কার্য্যাধ্যক্ষ।

নববিধান প্রেস—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ধর্ম্মানুষ্ঠান ও উপাসনাময় অনুষ্ঠানের ন্যায়, অন্য দেশের পারিবারিক জীবনে স্বামী স্ত্রীর মিলনে ধর্ম্মসাধন, স্বামী স্ত্রীর মিলনে উপাসনা দৃষ্টি-গোচর হয় না। ভারতে আর্য্য-জাতি যখন আপনাদের সমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন, তখন নিয়ম করিলেন, গৃহী ব্যক্তি আপনার গৃহিণীর সঙ্গে মিলিত হইয়া, গৃহিণীর সাহায্য লইয়া গৃহের পূজা বন্দনা ও যাবতীয় ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পন্ন করিবেন। যাঁহারা স্ত্রী গ্রহণ করিতেন, তাঁহারাই গৃহীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইতেন। গৃহিণীকে লইয়াই গৃহ, গৃহিণীর সাহচর্য্যে গৃহের গৃহোপাসনা, গৃহের ধর্ম্মানুষ্ঠান। ভারতের আদি যুগে যাঁহারা দার পরিগ্রহ করিয়া গৃহী হইতেন না, তাঁহারা সমাজের কেহ ছিলেন না; তাঁহাদের জ্ঞান বিদ্যা যতই থাকুক না কেন; তাঁহারা গৃহের কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক কার্য্য-সম্পাদনের অধিকার পাইতেন না। গৃহী ব্যক্তির গৃহিণীর সাহায্য ভিন্ন গৃহের ধর্ম্মানুষ্ঠানে কোন অধিকার ছিলনা। প্রাচীন ভারতে এই প্রথা দীর্ঘ দিন অক্ষুণ্ন ছিল, তাই ভারতে পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন যেমন ধর্ম্মের শাসনে শাসিত হইত, তেমনই নীতির কঠোর নিয়মে নিয়মিত হইত। পারিবারিক বন্ধন, পারিবারিক জীবন ছিল ধর্ম্মময়, মধুময় এবং ধর্ম্মাগ্নিতে অগ্নিময়। পারিবারিক ধর্ম্ম হইতে সামাজিক ধর্ম্ম, সামাজিক ধর্ম্ম হইতে জাতীয় ধর্ম্ম, দেশময় ধর্ম্ম। স্বামী স্ত্রীর জীবনের পবিত্র ধর্ম্মবন্ধন যেমন ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তেমন আর কোথায়? ভারতের পারিবারিক জীবন, জাতীয় জীবন, দেশের জীবন যেমন ধর্ম্মের অগ্নিতে অগ্নিময়, পুণ্যের গন্ধে সুবাসিত, এমন আর কোথায়? ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দান করে। তাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্রেও ধর্ম্মের উচ্চনীতি রক্ষা করিয়া কার্য্য করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প ছিলেন। প্রাচীন ভারতের যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনা পাঠের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম দেশের স্বাধীন ও সভ্য জাতির যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনা পাঠ কর, দেখিবে স্বর্গ আর নরক যেমন তফাৎ, তেমনই সে দুইয়ের পার্থক্য। পশ্চিম দেশের সভ্য জাতি আপনার দেশের নদ নদীকে ব্যবসায় বাণিজ্যের বড় বড় কেন্দ্রস্থলে পরিণত করিয়া, অর্থের ক্ষতি বৃদ্ধি গণনা ও কর্ম্ম-চাতুরীর আগার করিয়া তুলিয়াছেন; আর ভারত আপনার নদ নদীকে পরমার্থলাভের উপায়রূপে গ্রহণ করিয়া, নদ নদীর তীরে তীরে কত পূজা বন্দনার স্থান করিয়া, কত স্থায়ী তীর্থ রচনা করিয়া, ধর্ম্মধারায়, পুণ্যধারায় নদ নদীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, নদ নদীকে ধর্ম্মের সাজে, পূজা বন্দনার স্বর্গের সাজে সজ্জিত করিয়াছেন। ভারতের নদ নদীর তীরগুলি ব্রহ্ম-ধ্যান ধারণার স্থান, হরিগুণকীর্ত্তনে দেশের আকাশ বাতাস মুখরিত করিবার স্থান।

ভারতের দীর্ঘ ধর্ম্মজীবনে অনেক পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে বঙ্গ ভারতের ধর্ম্মজীবনে অনেক ভ্রম কুসংস্কার প্রবেশ করিয়াছে, সন্দেহ নাই। তথাপি বঙ্গ ভারতের পারিবারিক সামাজিক জীবন এখনও ধর্ম্মময়, উপাসনাময়। গৃহপরিবারে প্রাতঃকাল হইতে শয়নের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, পূজা অর্চ্চনা, হরিনাম, মা নাম, ব্রহ্মনাম-কীর্ত্তনে ভারতের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান সকলই পূজাময়, উপাসনাময়। ভারতের আকাশ বাতাস, সূর্য্য চন্দ্র, ভারতের নদ নদী, পাহাড় পর্ব্বত, বন উপবন এখনও পূজা ও উপাসনার গন্ধে পূর্ণ। আমরা নববিধানের লোক; আসুন প্রাচীন ও বর্ত্তমান ভারতের অফুরন্ত ধর্ম্মভাণ্ডার হইতে আমরা উপাসনার সার্ব্বভৌমিক বিচিত্র সত্য সামগ্রী গ্রহণ করিয়া পরিপুষ্ট হই।

—•—

ধর্ম্মতত্ত্ব

উৎসব কার বিধান?

আমরা ভাবি, আমরা উৎসব করি, উৎসবের আয়োজন করি, দশজনকে ডাকি, দশজনে মিলিয়া উৎসবানন্দ সম্ভোগ করি। এই আমিত্ব লইয়াই উৎসবের প্রয়াসী হই। পৃথিবীর দশজনে এই ভাবেই উৎসব করে বটে; কিন্তু বিধানের উৎসব অন্যরূপ। বিধাতা যিনি, বিধানজননী যিনি, তিনিই উৎসব করেন। স্বর্গে যে নিত্যোৎসব চলিয়াছে, পৃথিবীতে সময়ে সময়ে তাহারই প্রকাশ তিনি দেখান। স্বর্গের দেবতাগণকে নিয়ে তিনি ধরায় অবতরণ করেন; পৃথিবীর দুঃখী তাপী নরনারী যে যেখানে আছে, তাদের তিনিই ডাকেন। তিনিই সব ব্যবস্থাদি করেন। আমাদের দিক দিয়ে শুধু তাঁর ডাক শুনে আসা এবং সম্পূর্ণরূপে তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করা ও তাঁর ইচ্ছাপালন করা। এইরূপে তাঁর উৎসবে যোগদানে দুঃখ যায়, তাপ যায়, প্রাণে কত শান্তি ও আনন্দের সঞ্চার হয়; জীবনটা নূতন হয়, আশা ও বিশ্বাসে জীবনের গতি ঊর্দ্ধমুখীন হয়।

—

দশজনের মিলনেই উৎসব

আমরা যখন উৎসব করি, আমরা যখন দশজনকে ডাকি, তখন আমাদের কথা কয়জনে শোনেন? কেহ শোনে, কেহ শোনে

না; শুনেও কেহ আসে, কেহ আসে না। দশজনকে তেমন করে ডাকতেই বা পারি কৈ, যেমন করে ডাকা উচিত। আমাদের ডাকের ভিতর থাকে অহঙ্কার, আমাদের ডাকের ভিতর থাকে স্বার্থ, আমাদের ডাকের ভিতর থাকে বাধা বাধকতা। প্রেমের খাতিরে মানুষ যেমন ছুটে আসে, সে প্রেম আমাদের কোথায়? তাই আমাদের উৎসবে কেহ আসেনা, আমাদের উৎসব জমাট হয় না, দশজনের মিলনে যে আনন্দ, তা সম্ভোগ হয় না। অনন্ত প্রেমময়ী জননী যে উৎসব করেন, তাহাতেই স্বর্গমর্ত্তোর মিলন হয়। উৎসবে তাঁহার প্রেমের বাঁশী যখন বেজে উঠে, তখন কেহ কি আর ঘরে বদ্ধ হয়ে থাকতে পারে? সকল বন্ধন ছিন্ন করে সে ছুটে আসে। বিশ্বময় এক ছুটাছুটি ও হুড়োহুড়ি পড়ে যায়; ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকিতে বিশ্বের মধ্যে নূতন সাড়া দেখা দেয়। ঘর ছাড়া হয়ে, আত্মপর ভুলে, অনন্ত মুক্ত আকাশের তলে অনন্ত স্নেহময়ী জননীকে ঘিরে দাঁড়িয়ে, তখনই তাহারা এই উৎসবের মিলন-সংগীত গায়, "বিশ কোটী কণ্ঠে মা বলে ডাকিলে, রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে, বিশ কোটী ছেলে মায়েরে ঘেরিলে, দশদিক সুখে হাসিবে। আপনার মায়ে মা বলে ডাকিলে, আপনার ভায়ে হৃদয়ে রাখিলে, সব পাপ তাপ দূরে যায় চলে, পুণ্যপ্রেমের বাতাসে।" নববিধানের উৎসব অনন্ত জীবনে অনন্ত মিলনেই সম্ভব হয়।

—•—

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র

(রেঙ্গুন ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে, ৮ই জানুয়ারী, ১৯৩৬, পঠিত)

মহা মানবের স্মৃতিপূজার সার্থকতা কিসে? স্মৃতিপূজাতো পঞ্জিকার জিনিষ নয় যে—দিন, লগ্ন, গ্রহ নক্ষত্রকে বিচার করে জ্বালতে হবে সে পূজার দীপ। যুগে যুগে যাঁরা ভূমার প্রকাশ মানুষের মধ্যে পূর্ণতর করবার জন্য, সমাজের কুসংস্কার, কুপ্রথাকে ধ্বংস করবার জন্য এসেছিলেন, যে কাজের জন্য রাজার দুলালকে হতে হয়েছিল সন্ন্যাসী, যে কাজের জন্য কালে কালে এক একটি বিশ্বদরদী প্রাণ মৃত্যুর সাথে অবিরত করেছেন সংগ্রাম, তাঁদের স্মৃতি জাগাবার জন্য পঞ্জিকার নির্দ্দিষ্ট দিন লগ্নের তো প্রয়োজন নেই। কারণ তাঁদের নশ্বর দেহ আমাদের দৃষ্টির অগোচর হয়েছে মাত্র, তাঁরা তো তিরোহিত হন নি। তাঁরা যে বিশ্ব-মানবের চোখের সম্মুখ থেকে বিদায় নিয়ে, অন্তররাজ্যে নব নব রূপে লাভ করেছেন অমরত্ব। আমরা যদি তাঁদের জীবনের মহান্ আদর্শকে, সত্যকে আমাদের জীবনে একটুও স্থান দিতে পারি, তবেই হবে আজিকার মহামানবের স্মৃতিপূজা সার্থক।

আজ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের স্মৃতিবার্ষিকী। তাঁকে স্মরণ করতে আমরা সমবেত। তবে এই স্মরণ করাটা এ ক্ষণিকের সময় টুকুর মধ্যেই যেন আবদ্ধ না থাকে। দ'দিনের একদিন বিশেষরূপে স্মরণ করার উপকারিতা থাকতে পারে, তবে দ'দিনের অদিনকেই অন্যভাবে কাটিয়ে, মহামানবদের একটি কর্ম্মের সঙ্গেও আমাদের যোগ না রেখে, একদিন বিশেষরূপে স্মরণ করার মূল্য না থাকারই সামিল। কেশবচন্দ্র ছিলেন অসাধারণ পুরুষ। তাঁর হৃদয় ছিল নির্ভীক, আদর্শ ছিল স্বাধীনতা, তাই তি'ন দীক্ষা নিয়েছিলেন অগ্নিমন্ত্রে। অর্থাৎ মানুষ যে মন্ত্রে দীক্ষা নিলে পর, মৃত্যুভয় যায় ভুলে, দাসত্বকে করতে শেখে ঘৃণা, সত্যকে সমুজ্জ্বল করবার মত হৃদয়ে পায় বিপুল শক্তি। সেই অজর অগ্নিমন্ত্রেই দীক্ষিত ছিলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র। তাই তিনি যেখানেই সত্য পেয়েছেন, সেখান থেকেই তা কুড়িয়ে, ধর্ম্মকে, সমাজকে ও নিজের জীবনকে পবিত্রতার দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছেন। তাঁর জীবনে ঈশা, মুষা, বুদ্ধ, গৌরাঙ্গ প্রভৃতি বিশ্বের সকল মহা-মানবের ও বিশ্বের সকল ধর্ম্মেরই প্রভাব কিছু না কিছু ছিল। কারণ তিনি জানতেন, সত্যই প্রত্যেক মহামানবের ও প্রত্যেক ধর্ম্মের আদর্শ বা প্রাণ। তিনি কখনও সংকীর্ণতা দেখতে পারতেন না। তাই বাংলাকে তিনি যে আদর্শপতাকাতলে মিলাবার প্রচেষ্টা করেছিলেন, সেই আদর্শ বিশ্বজনীন বা সার্ব্বভৌমিক। কেননা তাঁর সেই প্রচেষ্টা কোন বিশেষ মতের বা সম্প্রদায়ের আহ্বান ছিল না, বিশ্বমানবের মধ্যে যে চিরন্তন সত্য রয়েছে, এ ছিল তারই আহ্বান। এ জন্যই তিনি বাংলার ঘন তমসাবৃত যুগেও সকল বাধা বিঘ্নকে উপেক্ষা করে, সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের বেদী প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আমরা যদি তাঁকে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের বা বিশেষ সমাজের প্রতিষ্ঠাতা বা সেবক বলেই ক্ষান্ত হই, তবে তাঁকে ক্ষুদ্র করেই দেখা হবে। তাহলে আমাদের কাছে তাঁর প্রিয় সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম হয়ে দাঁড়াবে হাসির বস্তু, আর তাঁর স্মৃতি-পূজা হবে পুতুল খেলা। যা সত্য, তা চিরদিন সর্ব্বজনের জন্যই সত্য, তা কোন বিশেষ সমাজের বা সম্প্রদায়ের আপনার ধন হইতেই পারে না। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র অনন্ত নীলাকাশের তলে দাঁড়িয়ে যে সত্য বাণী বাংলাকে শুনিয়েছিলেন, তাও সেই সার্ব্ব-জনীন সত্যেরই এক কথা। একথাটাই বিশেষরূপে উপলব্ধি করে আজ আমরা তাঁকে স্মরণ করব, ক্ষুদ্র সমাজের গণ্ডীতে বন্দী করে নয়।

পশ্চিমের সভ্যতার মোহে প্রথম বাংলার তরুণ প্রাণ যখন উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়েছিল, যখন মদ্যপান না করলে সভ্য হওয়া ছিল শক্ত, তখন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র মদ্যপাননিবারণী সভা প্রতিষ্ঠা করে বাংলার যে উপকার সাধন করেছিলেন, সে ঋণ বাঙ্গালীকে আজীবন স্বীকার করতে হবে। এ ছাড়াও তিনি সমাজের সব কুপ্রথাকে আঘাত দিয়েছেন। তাঁর কল্যাণেই অসবর্ণ বিবাহের রীতি প্রবর্ত্তন হয় ও জাতিভেদ ব্রাহ্মসমাজ থেকে উঠে যায়। অনেক সমাজই মুখে বলে, জাতিভেদ

থাকিবে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে পূরা মাত্রাই বজায় থাকে আভিজাত্যের গলদ। তাই কেশবচন্দ্র শুধু মুখের কথাতেই সে ভাবকে আবদ্ধ রাখলেন না, বাক্যে এবং কার্য্যে এক করে দিলেন। তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেছিলেন যে, ধর্ম্মকে উন্নত করতে হলে তার পূর্ব্বে সমাজকে করতে হবে পরিপূর্ণ নিষ্কলুষ। যে সমাজ নিষ্কলুষ নয়, সে সমাজের ধর্ম্ম পুঁথি পত্রে যতই উদারতা প্রকাশ করুক না কেন, কর্ম্মক্ষেত্রে সে উদারতার এক কণাও প্রকাশ করতে পারে না। তাঁর প্রচেষ্টাতে তরুণ দলের প্রাণে যাতে ধর্ম্মভাব জাগ্রত হয়, তার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ব্রহ্মবিদ্যালয়; এবং নারীজাতি যাতে পর্দ্দার অন্তরাল থেকে মুক্তি পেয়ে, আবার সেই অতীত ভারতের গার্গী মৈত্রেয়ীর মত আদর্শ রমণী হতে পারেন, তার জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আর্য্যনারীসমাজ। এমন কত যে সমাজের কল্যাণের জন্য করেছেন, তা বলতে গেলে এখন সময়ে কুলোবে না। তখনকার দিনে এসব করা যে কত কঠিন ছিল এবং কতটুকু শক্তি একজনের থাকলে পর এসব শুভ প্রতিষ্ঠান অন্ধ সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠা হতে পারে, তা আমাদের ভাবাও শক্ত। ইংরেজীতে যাকে বলে বর্ণ জিনিয়াস (Borngenius), এ কথাটি তাঁর সম্বন্ধেও খাটে। তাঁর বক্তৃতার এমন শক্তি ও ভাষার এমন মাধুর্য্য ছিল যে, একবার যিনি শুনেছেন, তিনি পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা না নিয়ে পারেন নাই। তাঁর জনহিতকর কার্য্যে ও প্রচারকার্য্যে যেন আগুনের স্ফুলিঙ্গ উঠতো। তিনি কখনও জড়তা, অলসতা বা শৈথিল্য দেখতে পারতেন না। তাঁর উৎসাহ ছিল নিত্য নতুন। তবে এসবের মূলে ছিল তাঁর আকুল প্রার্থনা। জীবনের উষাকালে কে যেন তাঁকে বলল—"প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর"। প্রার্থনার জোরেই যে তিনি সব কাজ করেছেন, এ কথা তিনি অনেক স্থানে স্বীকার করেছেন, এক কথায় প্রার্থনাময়ই ছিল তাঁর জীবন। তাঁর ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দরসপান দেখে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে "ব্রহ্মানন্দ" নামে অভিহিত করেন। ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে বাহিরে শ্রীবৃদ্ধি একমাত্র কেশবচন্দ্রের দ্বারাই পূর্ণ হয়েছে, এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না।

কেশবচন্দ্র জাতির কল্যাণের জন্য যা দান করেছেন, তাঁর জীবনের প্রত্যেক কর্ম্ম যে আদর্শকে সমুজ্জ্বল করেছে, তাঁর যোগ, ভক্তি, জ্ঞান, ধর্ম্মে ও কর্ম্মে যে সমন্বয় ভাব ছিল, তাকে উদার ভাবেই আমাদের গ্রহণ করতে হবে। তাঁর সার্ব্বভৌমিক ভাব কথাতেই যদি বদ্ধ থাকতো, যদি তাঁর জীবনে প্রকাশ না পেতো, তা হলে শেখা কথায় জীবন অতিবাহিত করতে পারতেম; কিন্তু এখন আর তা করবার উপায় নেই। কারণ তাঁর জীবনে যা সিদ্ধ হয়েছে, আমাদের জীবনে তা যদি না হয়, তবে যে সবই বৃথা হয়, আজ বিশেষ করে এ কথাই ভাববার দিন। আমরা আমাদের অনন্ত কর্ম্ম কোলাহলের ও কান্না-হাসির মাঝখানে দাঁড়িয়েও তাঁর জীবনের আদর্শ কর্ম্ম ও মহান ব্রত উদ্‌যাপনের তার একটুও কি গ্রহণ করতে পেরেছি? সংসারের সহস্র কাজের ভিড়েও তাঁর জীবনের আদর্শ কর্ম্মকে আমাদের জীবনের মধ্যে, সমাজের মধ্যে পূর্ণতর করবার জন্য একটু সময়ও কি ছাড়তে পেরেছি? তাঁর মত সত্যের জন্য দুঃখ ও আঘাতকে বরণ করবার মত শক্তি কি কিঞ্চিৎ পরিমাণেও আমাদের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে?

বর্ষায় বাংলার বুকে যখন বন্যা দেখা দেয়, তখন কোন্‌টা নদী আর কোন্‌টা খাল, তা যেমন বুঝা যায় না, সব স্থানেই থাকে এক তরঙ্গ এক কল্লোল, তেমনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের কল্যাণে বাংলার বুকে যখন ধর্ম্মের প্লাবন দেখা দিয়েছিল, তখন কে যে সারথি, আর কে যে যাত্রী তা বুঝা কঠিন ছিল। কিন্তু বর্ষার শেষে খাল যেমন হারায় নদীর যোগ, তেমনি আমরাও যেন সেই আদর্শ পুরুষদের প্রাণের সঙ্গে যোগ রাখতে আর পারছিনে। তাই তাঁরা যে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের বেদী দুঃখের সাথে, মৃত্যুর সাথে সংগ্রাম করে রচনা করে গেলেন, সেটা আমাদের নিকট হয়ে দাঁড়াল প্রায় সৌখীনের সামগ্রী। এই যে শৈথিল্য শুষ্কতা, তার কি প্রতীকার হবে না? স্মরণ রাখতে হবে, কেশবচন্দ্র একদিন যে বাংলাকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন, সেই বাংলার যুবকই আমরা। আমাদেরই করতে হবে সে কাজ, যে কাজে আমাদের জীবন, সমাজ ও বিশ্বজনীন ধর্ম্ম আবার পাবে প্রাণ। শৈথিল্য যদি আমাদের জীবনকে নিরাশায় ও নিরুৎসাহের কুহেলিকায় ঢেকে ফেলে, একবার যদি সেই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষার আগুন আমাদের জীবন থেকে নির্ব্বাপিত হয়, তবে যে আমাদের অস্তিত্ব রাখাই হবে শক্ত। কেশবচন্দ্রের মত আমাদেরও হতে হবে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত এক একটী আগুনের স্ফুলিঙ্গ। যেখানে অবিচার, যেখানে কুসংস্কার, সেখানেই ঝাঁপিয়ে পড়ে ভস্ম করতে হবে জাতির সমস্ত পাপ। একদিন বিশেষ সভা সমিতিতে শুধু তাঁর গুণগান গাইলেই চলবে না। তাঁর জীবনের সঙ্গে আমাদের জীবনের, তাঁর কর্ম্ম ও আদর্শের সঙ্গে আমাদের কর্ম্ম ও আদর্শের সাক্ষাৎ গভীর যোগ অনুভব করতে হবে।

কেশবচন্দ্র শুধু সহরের মুষ্টিমেয় লোকদের অন্ধতা ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত করবার জন্যই জীবন উৎসর্গ করে যাননি। যে ভারতবর্ষে এখনও কোটী কোটী লোক কুসংস্কারসমুদ্রে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে, তারা যতদিন আকুল প্রাণে বিশ্বদেবতার দেউল দ্বারে—

অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মা অমৃতংগময়, আবির আবির্ম এধি,
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।—

বলে প্রার্থনা না করবে, ততদিন আমরা অপূর্ণ। আমাদের এ স্মৃতিপূজার অঙ্গনও থাকবে অপূর্ণ। আমাদের কাছে থাকতে পারবেনা জাতিভেদ, থাকতে পারবে না সমাজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

গণ্ডী। আমাদের ধর্ম হবে বিশ্বজনীন, আর সমাজ হবে বিশ্ব-প্রেমে ভরপুর। এখানে বিশ্বের সবাই এসে সত্যকে করতে পারবে পরিবেশন। আমাদের ভারতবর্ষকে সত্যিকারের ভারতবর্ষ করতে হবে আমাদেরই।

যে ভারত একদিন বিশ্বকে 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' বলে মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করতে শিখেয়েছিল, যে ভারত একদিন আনন্দস্বরূপকে উপলব্ধি করে ধ্যানগম্ভীরস্বরে গেয়ে উঠেছিল—

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন॥

যে ভারত বিশ্বের কল্যাণের জন্য রাজার দুলাল বুদ্ধকে করেছিল সন্ন্যাসী, সেই নির্ভীক অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত ত্যাগী ভারতে পুনরায় ফিরতে হবে। কেশবচন্দ্রের মত যুগে যুগে যাঁরা অজ্ঞানশয্যায় শায়িত বিশ্বের দ্বারে দ্বারে "উত্থান কর, জাগ্রত হও" বলে সত্যলব্ধ বাণী প্রচার করে গেলেন, তাঁদের মত আমরা নিজে জাগ্রত হয়ে অন্যকেও জাগাতে হবে। বলতে হবে—

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গম্ পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।
বা 'উত্তিষ্ঠত নিদ্রাং কো অস্যা স্বপিতেন বো।'

একথাকে উচ্ছ্বাস বলে উড়িয়ে দিলে চলবেনা। আজিকার এই শুভ মুহূর্ত্তে প্রতিজ্ঞার সহিত গ্রহণ করতে হবে ব্রহ্মানন্দের ব্রত-উদ্‌যাপনের ভার। রাজর্ষি রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের তপস্যায় ভারতের অনন্ত নীলাকাশের তলে মিলনতীর্থের যে বেদী রচনা হয়েছে, সেখানে কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলায়ে আমাদেরও বিশ্বের সবাইকে আহ্বান করতে হবে—

"এসোহে আর্য্য, এসো অনার্য্য, হিন্দু মুসলমান,
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খ্রীষ্টান,
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার,
এসোহে পতিত, হোক অপনীত সব অপমানভার।
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা, মঙ্গল ঘট হয়নি যে ভরা,
সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে!
আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।"

তবেই হবে আজিকার মহামানবের স্মৃতিপূজা সার্থক। আর তা যদি না পারি, তবে পঞ্জিকার মান রাখবার জন্য স্মৃতি-পূজা নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীসমরেন্দ্র দত্ত রায়।

আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের স্মৃতিতর্পণ

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে যুগে যুগে কত মহাপুরুষ সাধু ভক্তগণের আবির্ভাব হইয়াছে। দেশের যখন নিতান্ত দীন দুরবস্থা হয়, তখনই তাঁহারা ভগবানের আদেশে ভগবৎপ্রেরিত হইয়া অবতীর্ণ হন, এবং তাঁহার মধুর আশার বাণী, সান্ত্বনার বাণী প্রচার করিয়া থাকেন এবং, নৈরাশ্যে পীড়িত মানবজাতিকে উদ্ধারের পথ প্রদর্শন করেন। তাঁহাদের প্রদর্শিত আলোকে ভ্রান্ত মানব নূতন পথ দেখিতে পায়, প্রাণে নূতন আশা উৎসাহের সঞ্চার হয়, প্রাণে গভীর শান্তি সান্ত্বনা লাভ করে।

এক শতাব্দী পূর্ব্বে আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনও এইরূপে ঈশ্বরাদিষ্ট হইয়া এদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মগ্রহণে প্রসিদ্ধ কলিকাতা নগরী ধন্য হইল। বঙ্গদেশ, ভারত-ভূমি, সমগ্র জগৎ বিস্ময়মুগ্ধনয়নে এই মহাপুরুষকে দর্শন করিল।

প্রায় ৫৩ বৎসর হইল, আচার্য্য কেশবচন্দ্র মরধাম ত্যাগ করিয়া অমরধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। আজ বঙ্গদেশ তাঁহার সুসন্তানকে প্রায় ভুলিতে বসিয়াছে। কিন্তু আজ তাঁহার তিরোধান-দিবসে তাঁহার প্রতি আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা অর্পণ করা বিশেষ কর্ত্তব্য।

শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্রের বিষয় অল্প কিছু বলিতে যাওয়া সহজ নহে। কিন্তু অল্প সময়ের জন্য যৎসামান্য বলিয়াও তাঁহার স্মৃতিতর্পণ করা আমাদের আজ কর্ত্তব্য।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৯শে নবেম্বর কলিকাতায় কলুটোলার প্রসিদ্ধ সেন-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সে সময় বঙ্গদেশে জ্ঞান বিজ্ঞানে নূতন উষার প্রথম বিকাশ হইতেছিল। তাঁহার পিতামহ রামকমল সেন ও পিতৃদেব প্যারীমোহন সেন উভয়েই অতি নিষ্ঠাবান্ ধার্ম্মিক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার জননী সারদা দেবী অতি ধার্ম্মিকা পুণ্যবতী রমণী ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই কেশবের চরিত্রে তেজস্বিতা, জ্ঞানানুরাগ ও ধর্ম্মভাব বিশেষরূপে দেখা যাইত।

যৌবনে তাঁহার এই গুণগুলি ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। তাঁহার দলের বন্ধুদিগের প্রতি তাঁহার একটী বিশেষ প্রভাব দৃষ্ট হইতে থাকে। তিনি নীতিশিক্ষা-প্রচারোদ্দেশ্যে কয়েকটী যুবক লইয়া একটী সান্ধ্য বিদ্যালয় স্থাপিত করেন। পরে Good will Fraternity সংঘও স্থাপিত করেন। তিনি অতি সুন্দর অভিনয় করিতে পারিতেন। তাঁহার এই দল লইয়া তিনি নীতিমূলক অভিনয় করেন। রাজা রামমোহন রায় প্রথম ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উহা নানারূপ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করেন। কেশবচন্দ্র মহর্ষির সংস্পর্শে আসিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। বাইবেল, ইংরাজী শাস্ত্র, দর্শন, বিজ্ঞান ও নানাবিধ উপদেশপূর্ণ গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া তাঁহার একেশ্বরবাদে দৃঢ়বিশ্বাস হয়; এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। কিছুদিন পর তাঁহার এইরূপ প্রগাঢ় বিশ্বাস ও ধর্ম্মভাব দেখিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহাকে "ব্রহ্মানন্দ" উপাধি ও "আচার্য্য" পদ দান করেন।

কেশবচন্দ্রের অসাধারণ বাগ্মিতা ছিল। তিনি এই সময়ে

ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার তেজঃপূর্ণ সুমধুর মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা মুগ্ধ জনতা ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনিত। তিনি এইরূপে ভারতের নানাদেশে নীতিমূলক উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। তাহার পর তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য ইংলণ্ডে গমন করিলেন।

সেখানে তাঁহাকে বহুলোক সাদরে গ্রহণ করিল। তাঁহার ইংরাজী ভাষায় সুন্দর প্রাঞ্জল বক্তৃতা শুনিয়া ইয়োরোপবাসী মুগ্ধ ও বিস্মিত হইল। তখনকার কালে বাঙ্গালীর মুখে এরূপ জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা ইংরাজী ভাষায় কেহ শোনে নাই। তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয়ে, তাঁহার বক্তৃতা-শ্রবণে, ভারতবাসীর বিষয়ে যে সকল ভ্রান্তধারণা ইয়োরোপবাসীর ছিল, তাহা অনেক পরিমাণে দূর হইল।

বিলাত হইতে ফিরিয়া তাঁহার স্বদেশানুরাগ আরও বৃদ্ধি পাইল। তিনি নানারূপ সংস্কারকার্য্যে অগ্রসর হইলেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে "সুলভ সমাচার" নামে এক পয়সা মূল্যে একটী সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বাহির করেন। ইহার পূর্ব্বে এত অল্প মূল্যে এরূপ সুন্দর সাপ্তাহিক পত্র বঙ্গভাষায় ছিল না। "ইণ্ডিয়ান মিরার" নামে একটী দৈনিক পত্রিকা তিনি সম্পাদন করেন।

"ধর্ম্মতত্ত্ব" নামে একটী ধর্ম্মবিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকাও তাঁহার উৎসাহে প্রকাশিত হয়। তিনি এইরূপে নানারূপ সংবাদপত্র ও পত্রিকা দ্বারা দেশের সংস্কারকার্য্যে প্রবৃত্ত হন। তিনি সুরাপান-নিবারণের জন্য "মাদকতা-নিবারণী সভা" ও "Band of Hope" নামে একটী দল গঠন করেন। তাহারা রাস্তায় রাস্তায় দল বাঁধিয়া গান গাহিয়া সুরাপানের কুফল প্রচার করিয়া বেড়াইত।

বয়স্কা মহিলাগণ যাহাতে শিক্ষা লাভ করেন, তজ্জন্য তিনি একটী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। "ভারতসংস্কারসভা" স্থাপন করেন। "ভারতাশ্রম" স্থাপন করিয়া তাহাতে কয়েক জন উৎসাহী ব্যক্তিকে সপরিবারে আশ্রয় দেন। যুবকগণের জন্য "ব্রাহ্ম-নিকেতন" স্থাপন করেন। এই সব স্থানে উপাসনা, কীর্ত্তন, সদ্‌গ্রন্থাদি পাঠ, সাধু প্রসঙ্গ, আলোচনা, বক্তৃতাদি হইত। সকল ধর্ম্মের সার এক, ইহাই তিনি প্রচার করিতে থাকেন। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সব জাতির ধর্ম্মের মূল একই, ইহাই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হয়; এবং নূতন সমন্বয়ধর্ম্মের নাম দিলেন "নববিধান"। এই সময়ে "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" ও তাঁহাদের উপাসনা-মন্দির স্থাপিত হয়। এই নববিধান ধর্ম্ম যাহাতে সকলের সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়, সে জন্য তিনি তাঁহার দলের এক এক ব্যক্তিকে এক এক ধর্ম্মগ্রন্থ বিশেষ রূপে অধ্যয়ন আলোচনা করিয়া তাহার সারমর্ম্মসমূহ লিপিবদ্ধ করিতে বলেন। তাঁহার ইচ্ছা ও আদেশে উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় বেদ, বেদান্ত, গীতা প্রভৃতি প্রায় সমগ্র হিন্দুশাস্ত্র ও পুরাণাদির আলোচনা করিয়া, তাহাদের মূলতত্ত্বগুলি সরল বাংলা ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার খৃষ্টধর্ম্ম অনুশীলন করিয়া, যিশুখৃষ্ট ও খৃষ্টধর্ম্মবিষয়ক বহু অমূল্য পুস্তক ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় রচনা করেন। সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত ধ্রুব, প্রহ্লাদ, শাক্যমুনি প্রভৃতি ভক্তজীবনী এবং যোগ, ভক্তি কর্ম্ম ও জ্ঞানবিষয়ক বহু সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধাদি রচনা করেন। মৌলবী গিরিশচন্দ্র সেন মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্র কোরাণ শরিফের প্রথম বঙ্গানুবাদ করেন। সঙ্গীতাচার্য্য ত্রৈলোক্যনাথ ... অতি সুমধুর কীর্ত্তন, ব্রহ্মসঙ্গীত ও শ্রীচৈতন্যবিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করেন। এইরূপে তাঁহার সম্প্রদায়ের ভক্ত সাধকগণ বঙ্গ সাহিত্যে প্রচুর মূল্যবান রত্ন দান করেন।

স্বয়ং কেশবচন্দ্রেরও বঙ্গ সাহিত্যে দান অল্প নহে। তাঁহার প্রার্থনা-পুস্তক, উপদেশাবলী ও নানা দেশে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলি বঙ্গসাহিত্যভাণ্ডারে অমূল্য রত্ন। তাঁহার ও তাঁহার সম্প্রদায়-ভুক্ত ব্যক্তিগণের লিখিত পুস্তকাদিও বঙ্গ সাহিত্যে চিরদিন অমর হইয়া রহিবে।

আচার্য্য কেশবচন্দ্র অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে যে একতার বাণী, সমন্বয়ের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, সেই সমন্বয়ের মিলনের ভাব আজ এত দিন পরে ভারতে কিয়ৎ পরিমাণে দেখা যাইতেছে। মহাপুরুষ ভক্ত সাধকগণ ভগবানের আদেশে আসিয়া ভবিষ্যৎ বাণী করিয়া যান। তাঁহাদের অক্লান্ত প্রয়াস কখনও বিফল হয় না। কখনও না কখন তাহা সফল হইবেই হয়। ধর্ম্মজগতে ও কর্ম্মজগতে কেশবচন্দ্রের দান অমূল্য, কেশবচন্দ্র চির অমর।—(রেডিওতে পঠিত)

শোভা সেন

আমার দেখা আর্য্যনারী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অনুষ্ঠানই সর্ব্বমানবের প্রাণ। নিয়মিত আচরিত দৈনন্দিন জীবনের ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানগুলি কি প্রকার জীবন্ত রাখে, তাহা এই মহীয়সী মহিলা অঘোরকামিনী দেবীর জীবনে অনেকবার দেখিতে পেয়েছিলাম। তাঁহার বদান্যতা, দয়াশীলতা, কর্ম্ম-কুশলতা, সেবাপরায়ণতার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরোপাসনা এক যোগে রক্ষিত হইত।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে আমি আমার বাল্যজীবনারম্ভে অঘোরকামিনী দেবীকে দেখি এবং সেই সময়ই লক্ষ্য করেছিলাম, তাঁর উপাসনা-শীলতা ও তৎসঙ্গে সংসারপরিচালন, পুত্রকন্যাগুলির পরিচর্য্যা, পতিভক্তি, পতিসেবা, পরোপকার ও কার্য্যতৎপরতা। প্রভাতসময় হতে সুশৃঙ্খলার সহিত পরিবারের সব ব্যবস্থা সম্পন্ন করে, সময়মত কমলকুটীরে উপাসনাতে উপস্থিত হতেন। যে বাড়ীতে আমরা

ছিলাম ও যেখানে ভিক্টোরিয়া কলেজ এবং কলেজিয়েট স্কুল হইত, তাহারই এক অংশে স্বর্গীয় প্রকাশচন্দ্র রায় সপরিবারে আসিয়া উঠিয়াছিলেন।

রাস্তার ওপারে প্রায় সম্মুখেই ছিল কমলকুটীর। মনে পড়ে, একদিন উপাসনায় যাবার সময় আমাকে ডেকে, তাঁর পাল্কীতে বসিয়ে কমলকুটীরে নিয়ে গিয়েছিলেন। অঘোরকামিনী দেবীর শেষ জীবন পর্য্যন্ত উল্লিখিত এই মহৎ গুণাবলী পর্য্যবেক্ষণ করেছিলাম।

আজকাল বিদ্যাচর্চ্চাটা মেয়েদের ভেতোর কিছুদিন পূর্ব্বের তুলনায় খুবই বেড়ে গেছে; তাই কুমারী পরোপকারী বিদ্যাবতী কন্যাগুলিকে দেখলে আমার গার্গী, লীলাবতী, খনাকে মনে পড়ে; আর সেই সঙ্গে আমার দেখা পরিচিতা রাধারাণী কুমারীকেও মনে হয়। শ্রীআচার্য্যদেব ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রথম প্রতিষ্ঠিত লেডিস্ নেটিভ নর্ম্যাল স্কুল নামে বালিকাবিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষিতা হয়েছিলেন; পরে কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী বেথুন বিদ্যালয়ে প্রায় যাবজ্জীবন মেয়েদের অত্যন্ত যত্নের সহিত পড়িয়ে তাঁর জীবনের কার্য্য সংসাধন ক'রে গেছেন।

দেখতে খুব সুন্দরী না হইলেও রাধারাণী মাসীমাকে আমি বড় ভালবাসতাম। তাঁর একটা প্রশান্ত গম্ভীর নৈতিক ভাব মাখা চেহারা খানি দেখলে অবাক হতাম। কুন্তলরাশি যেমন চওড়া, তেমনি লম্বা ছিল। এলোকেশে বেশী সময় থাকতেন; বাঁধলে যে রকম বড় খোঁপা হত, সাম্‌নে থেকে চমৎকার দেখাত।

আমাদের শ্রীআচার্য্যদেব-প্রতিষ্ঠিত সার্কুলার রোডে ভিক্টোরিয়া কলেজে যখন লেক্‌চার শুনতে আসতেন এবং বাগানে বন্ধুমণ্ডলী সঙ্গে বেড়াতেন, দেখে আমার বড় আহ্লাদ হত। এখন আরও কত স্বর্গের কুমারীগণের সঙ্গে মিলে ব্রহ্ম-সৌন্দর্য্যসাগরে মিশে গেছেন।

রাজলক্ষ্মী দেবী ইনিও আচার্য্যদেবেরই নিকট শিক্ষিতা দীক্ষিতা ভারতাশ্রমের মেয়ে ছিলেন। নূতন আলোকে উদ্ভাসিতা নারী হয়েও, বিশেষ সহিষ্ণু ও শান্তপ্রকৃতি ছিলেন। সুন্দরী ছিলেন। তাঁকে বড় ভাল লাগতো।

বাল্যকালে তাঁদের পরিবারে মিলিত হয়ে একই প্রকাণ্ড বাগান বাড়ীতে বাস করিতাম। ভাল ভাল গ্রন্থ সকল সর্ব্বদা তিনি পাঠ করতেন। আমাদের নিয়ে সন্ধ্যো বেলা কত ভাল ভাল জীবনী ও গল্প বলতেন। সেক্‌সপিয়রের ম্যাগবেথ্ তাঁরই কাছে ছোটবেলাতে প্রথম শুনেছিলাম।

রাজলক্ষ্মী দেবী ছেলে মেয়েদের বড় স্নেহ যত্নের সঙ্গে সেবা ও শিক্ষা দিতেন। সংসারের কাজ সেরে অনেক বেলায় যখন উপাসনা ঘরে বসতেন, সেই সাত্ত্বিক দেবী মূর্ত্তিখানি আমার মনে আজিও অঙ্কিত রহিয়াছে। আমাদের মাতৃদেবীর স্বর্গারোহণে বলেছিলেন, আমি কতদিন থাকব। জানিনা, আজ সেই নিত্য নিকেতনে তাঁরা কত আরাম, কত শান্তি উপভোগ করছেন।

কান্তমণি দেবী একটী সদাপ্রফুল্লচিত্তশালিনী কোমলপ্রকৃতি রমণী ছিলেন। তিনি অনেক কাজ করে গেছেন। নববিধানে তিনি প্রেরিত ভাই কান্তিচন্দ্র দত্তের সহধর্ম্মিণী ছিলেন। অনেক দিন তাঁরা ভিক্টোরিয়া স্কুলের সেক্রেটারী ও সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ছিলেন। মেয়েদের বড়ই ভালবাসতেন।

কান্তমণি দেবী পতিভক্তিপরায়ণা ছিলেন। মঙ্গলবাড়ীতে বাল্যকালে দেখতাম, পয়সার অভাব হেতু, স্বামীর রাত্রি-ভোজনের আয়োজনে যা কিছু সব রেখে দিয়ে, বেলা দুইটার সময় স্নান ও পূজান্তে লবণ ভাত খাইয়াই দিন কাটাইয়া দিতেন। সহাস্যমুখে গল্প করিতেন। তাঁর কাছে বসিতে অত্যন্ত আনন্দানুভব হইত।

এই মঙ্গলবাড়ীতে আমাদের পরম পূজনীয় উপাধ্যায় গৌর-গোবিন্দ রায়ের বাড়ীতে থাকাকালেই আমাকে বলেছিলেন, মাত্র পাঁচ আনা পয়সা সম্বল লয়ে আমরা অনাথাশ্রম খুললাম। পরে তাঁরা স্বামী স্ত্রী মিলিত হয়ে বড় অনাথ আশ্রম চালিয়েছিলেন। একটি শিশুকন্যাকে নিজ স্নেহে পালন করে, আরও অনেকগুলি ছেলে মেয়ের পরিচর্য্যা করতেন। আস্তাকুঁড়ের রাস্তা থেকে একটী বেবী বেট পাওয়া যায়, তাহাকেও অতি সতর্কতার সহিত বাঁচাইয়াছিলেন। পতি সঙ্গে কান্তমণি অপরিমিত যত্নে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে অনেকগুলি অনাথ শিশু ও বালক বালিকাকে প্রতিপালন করিয়া, বিবাহ পর্য্যন্ত দিয়া কার্য্যক্ষমও করিয়াছেন। সেই আশ্রম সমাজে সমর্পণ করে তাঁরা স্বর্গে বাস করছেন।

(ক্রমশঃ)

সেবিকা—হেমলতা চন্দ

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র

এলবার্ট হলে ৫০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে জনসভা

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের ৫০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁহার পুণ্যস্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণার্থ গত শুক্রবার এলবার্ট হলে এক জনসভা হয়। ডাঃ ডব্লিউ এস্ আরকুহার্ট সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত কেশবচন্দ্রের জীবনী আলোচনা কালে বলেন যে, অর্দ্ধ শতাব্দীরও পূর্ব্বে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যে ভাবে নানা বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। আজ দেশে অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন ও অসবর্ণ বিবাহ প্রভৃতি যে সমস্ত সমাজসংস্কারমূলক আন্দোলন চলিয়াছে, সকলের পূর্ব্বে কেশবচন্দ্রই উহাদের বাণী দেশে প্রচার করিয়া-ছিলেন। শ্রীযুক্ত গুপ্ত বলেন যে, দেশপ্রেমিক, সমাজসংস্কারক, বাগ্মী ও সংবাদপত্রসেবী হিসাবে কেশবচন্দ্র বাঙ্গলার এক অসাধারণ মনীষী ছিলেন।

শ্রীযুক্ত হিমাংশুকুমার? বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, যে সময়ে

বাঙ্গলার জাতীয় জীবন গড়িয়া উঠিতেছিল, সেই যুগে কেশবচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। জাতীয়জীবনগঠনকারীদের মধ্যে কেশবচন্দ্র অন্যতম। তিনি জাতির সমক্ষে যে নৈতিক আদর্শ উপস্থিত করিয়াছিলেন, বাঙ্গালী এখনও জীবনে তাহা গ্রহণ করিতে পারে নাই। কিন্তু জাতি যদি তাঁহার আদর্শ গ্রহণ করে, তবে উহা দ্বারা যে দেশবাসী সমূহ উপকৃত হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু বলেন যে, তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনকে একজন ভগবদ্ভক্ত ঋষি হিসাবেই দেখিয়া আসিয়াছেন, কেশবচন্দ্র ছিলেন ভগবৎ-প্রেরিত পুরুষ; ধর্ম্মের গ্লানি দেখা দিলে যুগে যুগে যেমন মহাপুরুষদের আবির্ভাব হইয়া থাকে, কেশবচন্দ্রও তেমনি ভাবে এই দেশে আসিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে আবার দেশে ধর্ম্মের গ্লানি দেখা দিয়াছে, তাই আবার কেশবচন্দ্রের মত মহাপুরুষের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী বলেন যে, বাঙ্গালী জাতিকে যদি জগৎসভায় কেহ প্রতিষ্ঠা দিয়া থাকে, তবে তিনি কেশবচন্দ্র। বাঙ্গালী যদি তাহার জাতীয় জীবনকে জয়যুক্ত করিতে চায়, যদি তাহার নৈতিক জীবনকে আরও অধিকতর উন্নত করিতে চায়, তবে তাহাকে কেশবচন্দ্রের প্রতিই দৃষ্টিপাত করিতে হইবে।

ডাঃ আরকুহার্ট বলেন যে, কেশবচন্দ্রের যুগে এমন এক সময় আসিয়াছিল, যখন ভারতবাসী ভাবিয়াছিল, তাহাদের জাতীয় জীবনের অতীতের কার্য্যাবলী হইতে গ্রহণযোগ্য কিছুই নাই। অতীতের যাহা কিছু সমস্তই পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু কেশবচন্দ্রই ভারতের অতীত মহত্ত্ব ভারতবাসীকে অঙ্গুলি-সঙ্কেতে নির্দ্দেশ করিয়া দেন। তিনি বলেন যে, অতীতকে একেবারে বাদ দিয়া ধর্ম্ম বা সমাজসংস্কার হইবে না। তাই ব্রহ্মানন্দ অতীতকে ভিত্তি করিয়া সমাজ ও ধর্ম্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র এই জন্যও শ্রদ্ধার পাত্র যে, তিনি ধর্ম্মের বাহ্যাড়ম্বরের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং তদানীন্তন কালে এইরূপ ভাবে প্রতিবাদ করা কিরূপ সাহসিকতা ও উদার মনোভাবের পরিচায়ক, তাহাও ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

সভাপতিকে ধন্যবাদ দেওয়ার পর সভা ভঙ্গ হয়।

("আনন্দবাজার পত্রিকা" হইতে উদ্ধৃত)

—•—

অভিভাষণ

(টাঙ্গাইলে পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসম্মিলনীর ষট্‌চত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি আচার্য্য সার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অভিভাষণের অংশবিশেষ)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আমার মনে হয়, ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ হিমালয় শিখরের ন্যায় উচ্চ এবং মহান্। স্মরণাতীত কাল হইতে কোটী কোটী ধর্ম্ম-পিপাসু নরনারী ঐ সুবর্ণ শিখরে পৌঁছিবার জন্য হিমালয়ের পাদমূল হইতে পর্ব্বতারোহণ আরম্ভ করিয়াছে,—কেহ লছমন, ঝোলা হইতেই ফিরিয়া আসিয়াছে, কেহ বা বদরিকাশ্রম দেখিয়া নামিয়া আসিয়াছে, আবার কেহ কেদারগৌরী পৌঁছিয়াই শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে—আবার কোনও ভাগ্যবান্ কাঞ্চনজঙ্ঘার ওই সুবর্ণ শীর্ষকে কিছুতেই লক্ষ্যহারা করে নাই—সে কেবল ঊর্দ্ধলোকেই চাহিয়া আছে, আর ধাপ হইতে ধাপে কেবল উঠিয়াই চলিয়াছে,—তাহার দৃষ্টি সেই জ্যোতির জ্যোতির দিকে অপলকনয়নে নিবদ্ধ হইয়া আছে—দক্ষিণে, বামে, পশ্চাতে কোথায়ও আর তাহার দৃষ্টি নাই,—সে কেবল উঠিয়াই চলিয়াছে, তাহার কাণে কেবল সেই দূরাগত সঙ্গীত বাজিতেছে—

মোরে ডাকি লয়ে যাও
মুক্ত দ্বারে,—তোমারি বিশ্বের সভাতে
মোরে ডাকি লয়ে যাও।
উদয় গিরি হ'তে উচ্চে কহ মোরে,
তিমির লয় হ'ল দীপ্তিসাগরে,
স্বার্থ হ'তে জাগ,
দৈন্য হ'তে জাগ,
সব জড়তা হ'তে
জাগ জাগরে,
সতেজ উন্নত শোভাতে।
মোরে ডাকি ল'য়ে যাও—

সে আপন মনে গাহিয়া চলিয়াছে,—
ভুবনেশ্বর হে! মোচন কর বন্ধন সব, মোচন কর হে!
প্রভু! মোচন কর ভয়, সব দৈন্য করহে লয়,
নিত্য চকিত চঞ্চল চিত কর নিঃসংশয়;
তিমির রাত্রি, অন্ধ যাত্রী, সমুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া
ধর হে!
ভুবনেশ্বর হে! মোচন কর স্বার্থ পাশ, মোচন কর হে!

ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ এত উচ্চ, এত মহান্, এবং এত বিশাল, যে ইহার সর্ব্বাঙ্গীন পালন এবং সাধন সকলের পক্ষে হয়ত সহজ এবং সম্ভব নাও হইতে পারে। কিন্তু আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া এই যে অবিরামগতিতে চলা এবং সাধনা, ইহার মধ্যেই মানব-জীবনের সার্থকতা। "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ"। সেই অমৃতসাগরের বিন্দুমাত্রও জল যদি আমরা পান করিতে পারি, তাহা হইলেও আমরা কৃতার্থ হই। আমাদের মধ্যে অনেকেই লছমন ঝোলা হইতে ফিরিয়াছে, কিংবা পর্ব্বতা-রোহণ করার কষ্টকে শ্রেয়ঃ জ্ঞান করে নাই বলিয়া হাসিতেছে?—আমি বলি, আমরা যাহা পারি নাই, তোমরা আসিয়া তাহা সফল কর।

আদর্শের মধ্যে যদি কোনও গলদ না থাকে, মিথ্যা ভাষণ, মিথ্যাচরণ যদি পাপ বলিয়া মনে কর,—পরস্ত্রীহরণ, পরদার-

গমন, এবং ব্যভিচার যদি দূষণীয় বলিয়া মনে হয়,—জাতিভেদ এবং বর্ণবৈষম্য যদি জাতীয় উন্নতির বিষম পরিপন্থী বলিয়া স্বীকার কর,—'ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং মধু' ধর্ম্মই মানবজীবনের একমাত্র মধু, ইহা যদি বিশ্বাস কর—তাহা ছাড়া আরও যে সকল মূল সত্যের উপর (eternal verities) মানবজাতি এবং মনুষ্য সমাজ যুগ-যুগান্ত ধরিয়া মহাকালের সকল আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সেই সকল মূল সত্যের উপর যদি সত্য সত্যই আস্থা থাকে, তবে আমি আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, দেশ কি এই সকল আদর্শ অনুসরণ করিতেছে? যদি তাহা না করে, তবে বলি যে, ব্রাহ্মসমাজ, তোমার সম্মুখে বিশাল দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। আর আপনারা যাঁহারা টিট্‌কারী দিতেছেন, তাঁহাদের বলি, আমরা যাহা পারি নাই, আপনারা আসিয়া তাহা আপনাদের জীবনে এবং জাতীয় জীবনে সফল করিয়া তুলুন,—

বাঙ্গালীর প্রাণ, বাঙ্গালীর মন
বাঙ্গালীর ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক, হে ভগবান!
বাঙ্গালীর আশা, বাঙ্গালীর ভাষা
বাঙ্গালীর প্রাণে যত ভালবাসা
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক, হে ভগবান্!!

(ক্রমশঃ)

—○—

সংবাদ।

জন্মদিন—গত ২৬শে ডিসেম্বর, কমলকুটীরস্থ নবদেবালয়ে, আচার্য্যপত্নী স্বর্গীয়া জগন্মোহিনী দেবীর জন্মদিন উপলক্ষে উপাসনা হয়। আচার্য্যকন্যা ময়ূরভঞ্জের মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী উপাসনা করেন।

গত ২১শে পৌষ, ২৪।৩ বাড়ির মির্জ্জাপুর রোডে, শ্রীমান্ সন্তোষচন্দ্র দত্তের তিন বৎসর বয়স্ক শিশুপুত্রের শুভ জন্মদিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে শিশুর মাতৃদেবী প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করেন।

২৯শে পৌষ, ৬৮।এ সার কৈলাস বোস ষ্ট্রীট, চট্টগ্রামের আশাকুটীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন দাস গুপ্তের ষষ্টিতম জন্মদিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। তৃতীয় ভ্রাতা শ্রীমান্ দীনেশরঞ্জন দাস গুপ্ত বিশেষ প্রার্থনা করেন। পুত্রকন্যাগণ এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

জাতকর্ম্ম—গত ১০ই জানুয়ারী, ৪নং রবিনসন ষ্ট্রীটে, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখার্জ্জির (অবসর-প্রাপ্ত আই.সি,এস,) পৌত্র, আচার্য্যদেবের মধ্যমপুত্র স্বর্গীয় নির্ম্মলচন্দ্র সেনের দৌহিত্র, শ্রীমান্ প্রশান্তকুমার মুখার্জ্জির নবজাত পুত্র এবং স্বর্গীয় নির্ম্মলচন্দ্র সেনের দৌহিত্র, পঞ্জাবের শ্রীমান্ হীরালাল সোনীর নবজাত পুত্র এই দুইটী শিশুর শুভজাতকর্ম্মানুষ্ঠানে, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন, এবং ডাঃ সত্যানন্দ রায় ইংরেজী ও সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে অনুষ্ঠানোপযোগী বিশেষ বিশেষ অংশ পাঠ করেন। শিশুদের জননীদের ইংরেজী নবসংহিতা হইতে জাতকর্ম্মের প্রার্থনাটী আবৃত্তি করেন। সর্ব্বশেষে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখার্জি আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া বিশেষ প্রার্থনা করেন। প্রথম শিশুটী গত ১৬ই নবেম্বর, দ্বিতীয় শিশুটী গত ১৪ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। এই শুভানুষ্ঠানে শিশুদের মাতামহী শ্রীমতী মৃণালিনী সেন (মিসেস এন্. সি, সেন) প্রচারভাণ্ডারে ১০৲ টাকা দান করেন। ভগবান্ শিশু দুইটীকে ও তাহাদের পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

নামকরণ—অদ্য ১লা মাঘ, হাওড়ায়, ২১নং ময়দেক কুণ্ডু লেনে, শ্রীযুক্ত দিননাথ সরকারের গৃহে, তাঁহার অনুজ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সরকারের দৌহিত্র, শ্রীমান্ অসিতরঞ্জন সেনের শিশুপুত্রের শুভনামকরণে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন এবং শিশুকে "প্রদীপরঞ্জন" নাম প্রদান করেন। অনুষ্ঠানান্তে শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দাস গৃহধর্ম্মপালন বিষয়ে পিতামাতাকে লক্ষ্য করিয়া কিছু বলেন। ভগবান্ শিশুকে ও তাহার পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

আদ্যশ্রাদ্ধ—গত ২রা জানুয়ারী, রূপসায়, বালেশ্বরের বর্ষীয়ান্ ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত ভগবানচন্দ্র দাসের কনিষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র দাসের আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই অক্ষয়কুমার লধ কলিকাতা হইতে তথায় গিয়া অনুষ্ঠানটীর কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। সংকীর্ত্তন সহকারে গৃহের নির্দ্দিষ্ট স্থলে পবিত্র ভস্ম রাখার পরে উপাসনা আরম্ভ হয়। অনুষ্ঠানটী গম্ভীরভাবে সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানান্তে সান্ত্বনাপ্রদায়ক কয়েকখানা চিঠি পঠিত হয়। এই উপলক্ষে সহধর্ম্মিণী ও ভ্রাতৃকন্যা কলিকাতা নববিধান প্রচারভাণ্ডারে ২৲, অনাথ আশ্রমে ২৲, বালেশ্বর ব্রাহ্মসমাজে ২৲, বারিপদা নববিধানসমাজে ১৲ দান করিয়াছেন।

গত ১০ই জানুয়ারী, কলিকাতার ৩নং রায় ষ্ট্রীটে, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র দাস গুপ্তের সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া পুণ্যপ্রভার আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়াছে। ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ উপাসনা করেন। স্বামী নবসংহিতা হইতে প্রধান শোককারীর প্রার্থনা আবৃত্তি করিয়া সহধর্ম্মিণীর সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন। অনুষ্ঠানমণ্ডপটী পরলোকগতা পুণ্যপ্রভার জীবনের পুণ্যশুভ্রপ্রভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল।

ভগবান্ পরলোকগত আত্মাদিগকে স্বর্গধামে নিত্যশান্তিতে রক্ষা করুন এবং শোকার্ত্তজনগণের প্রাণে শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

শোক-সংবাদ—আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, গত ৭ই জানুয়ারী, বাগনানে, শ্রদ্ধেয় ভাই নগেন্দ্রনাথ বানার্জ্জির কনিষ্ঠ জামাতা শ্রীমান্ জিতেন্দ্রকুমার

কালদারের পঞ্চদশবর্ষবয়স্কা কন্যা শ্রীমতী মানসী পুকুরে স্নান করিতে যাইয়া আকস্মিকভাবে জলে ডুবিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। জিতেনবাবু কটকে শিক্ষকতা করেন, বাগনানে বাড়ীঘর করবেন বলে সম্প্রতি পরিবার বাগনানে রাখিয়া যান। ইতিমধ্যে এই দুর্ঘটনা ঘটে। ভগবান্ শোকসন্তপ্ত পিতামাতার ও আত্মজনগণের প্রাণে শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

ব্রহ্মানন্দের স্বর্গারোহণোৎসব—গত ৮ই জানুয়ারী, নববিধানাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণের ত্রিপঞ্চাশত্তম সাম্বৎসরিক উপলক্ষে, প্রত্যূষে কমলকুটীরে ব্রহ্মানন্দের শয়নকক্ষে নামপাঠ হয়; তৎপর ৯টায় নবদেবালয়ে উপাসনা হয়, ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ, সেবিকা হেমলতা চন্দ বিশেষ প্রার্থনা করেন। আচার্য্য-পুত্র শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র সেন আচার্য্যের ৮ই জানুয়ারীর যোগের প্রার্থনা পাঠ করেন। সন্ধ্যা ৬টায় এলবার্ট হলে স্কটিশচার্চ্চ কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ ডবলিউ এস্ আরকুহার্টের সভাপতিত্বে স্মৃতিসভা হয়। স্মৃতিসভার বিবরণ স্থানান্তরে গত ৯ই জানুয়ারী আনন্দ-বাজার পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

সাম্বৎসরিক—গত ১লা জানুয়ারী, চালতাবাগান, ৫৩নং কালীপ্রসাদ বানার্জি লেনে, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাসের গৃহে, তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গীয় হরকালী দাসের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রকুমার দাস পিতামহের পুণ্যস্মৃতিতে প্রচারভাণ্ডারে ৪৲ টাকা দান করেন।

অদ্য গোবরডাঙ্গায়, খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দিরসংলগ্ন উদ্যানস্থিত স্বর্গগত ভাই কেদারনাথ দে ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী স্বর্গগতা স্বর্ণলতার সমাধিতীর্থে পুত্রকন্যাগণ মাতৃদেবীর স্বর্গারোহণপুণ্যাহে বিশেষ উপাসনাদি করেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা সেবিকা হেমলতা চন্দ উপাসনা করেন এবং স্বর্ণকমল-প্রীতিসাধনে নববিধান প্রচার-ভাণ্ডারে ১৲, সাধু প্রমথলাল শিক্ষাতীর্থে স্বর্ণকমলসাহিত্য প্রাইজের জন্য ২৲, পুণ্যাশ্রমে ১৲ এবং বাঁকিপুর অঘোরনারী সমিতিতে ১৲ ও মাঘোৎসবে ২৲ দান করিয়াছেন এবং মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী অশোকলতা দাসও মাতৃস্মৃতিতে মাঘোৎসবে ২৲ দান করেন।

পুস্তক-পরিচয়

কেশবচন্দ্র ও বঙ্গ-সাহিত্য:—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত; প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৩৩৭ পৃষ্ঠা, আইভরি ফিনিস কাগজে ছাপা, কাপড়ে সুদৃশ্য বাঁধাই। দাম তিন টাকা।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সাহিত্যসমাজে সুপরিচিত। 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' প্রণয়ন করিয়া তিনি যৌবনে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। পরিণত বয়সে নানা বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়া তাঁহার পূর্ব্ব যশঃ অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কেশবচন্দ্র ও বঙ্গ-সাহিত্য নামক গ্রন্থে তিনি জীবনচরিত ও সাহিত্য আলোচনার একটী নূতন পন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। কেশবচন্দ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। শতবর্ষ পূর্ব্বে কি ধর্ম্ম, কি সমাজ, কি শিক্ষা, কি অস্পৃশ্যতা-বিরোধী চেষ্টা, কি ধর্ম্মসমন্বয়, মাদকতা-নিবারণ, অসবর্ণ বিবাহ, স্ত্রী শিক্ষা, সাধারণের শিক্ষা, সব দিকেই তিনি ছিলেন একজন সাহসী সংস্কারক। কেশবচন্দ্রকে লোকে ধর্ম্মোপদেষ্টা বলিয়াই জানেন, কিন্তু রাজনীতির দিক দিয়া এবং সাহিত্যের দিক দিয়া যে তিনি কত বড় কৃতী পুরুষ ছিলেন, তাহা যোগেন্দ্রবাবুর লিখিত এই গ্রন্থ পাঠ করিলে সকলেই উপলব্ধি হইবে। তাঁহার বাঙ্গলা বক্তৃতা ও উপদেশসমূহ কথিত বাংলার একটি শ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে গণ্য হইবার যোগ্য। বিলাতে কেশবচন্দ্র তাঁহার বক্তৃতার দ্বারা ইংরাজদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, ভারতীয়েরা শিক্ষায় ও সভ্যতায় কোন অংশেই ন্যূন নহে। অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন এবং জাতিভেদ দূর করিবার চেষ্টা কেশবই প্রথম করিয়াছিলেন। সংবাদপত্র-সেবায় 'ইণ্ডিয়ান মিরর' ও 'সুলভ সমাচার' (এক পয়সা মূল্যের সংবাদপত্র) প্রচার করিয়া কেশব সর্ব্বসাধারণকে রাজনীতি চর্চ্চা এবং শিক্ষাদান বিষয়ে পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কাজেই বাগ্মী, স্বাধীন চিন্তার প্রবর্ত্তক এবং সমাজ-সংস্কারক কেশবচন্দ্রের পুণ্যস্মৃতিমূলক এই গ্রন্থখানা প্রচার করিয়া যোগেন্দ্রবাবু সাহিত্যের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। এই গ্রন্থ তিন খণ্ডে বিভক্ত:—প্রথম খণ্ডে অতি সুন্দরভাবে কেশবচন্দ্রের জীবনী আলোচিত হইয়াছে; দ্বিতীয় খণ্ডে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ও বাংলা সাহিত্যে কেশবচন্দ্রের দান সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে; আর তৃতীয় খণ্ডে—কেশবচন্দ্রের সংস্পর্শে আসিয়া যাঁহাদের জীবন ধন্য হইয়াছিল এবং যাঁহারা কেশবের আদর্শকে অনুসরণ করিয়া সাহিত্যসাধনায় যোগদান করিয়াছিলেন, সেই সকল মহাপুরুষদের জীবনী ও কার্য্যাবলীর কথা এবং তাঁহাদের সাহিত্যপরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে আমরা গৌরগোবিন্দ রায় (উপাধ্যায়), চিরঞ্জীব শর্ম্মা (ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল), প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত এবং গিরিশচন্দ্র সেন (যাঁহাকে মুসলমান সুধীবৃন্দ মৌলবী আখ্যায় অভিহিত করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন) প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত জীবনী ও রচনা-পরিচয় দেখিতে পাই।

কেশবচন্দ্রের বাংলা রচনা যে কিরূপ ভাবগম্ভীর ও সরল ভাষায় লিখিত হইত, যদি তাহার কেহ পরিচয় পাইতে চান, তাহা হইলে গ্রন্থস্থিত কেশবচন্দ্রের রচনা-সঞ্চয়ন হইতে কয়েকটী রচনা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

যোগেন্দ্রবাবুর ভাষার গাম্ভীর্য্য এবং বক্তব্য বিষয়ে সাহসিকতা সবিশেষ প্রশংসনীয়। বাংলা-সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ কেশবচন্দ্রকে উপেক্ষা করিয়া আসিতেছেন বলিয়া লেখক যে আক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতে প্রকৃত সত্য নিহিত রহিয়াছে। যোগেন্দ্রবাবু "কেশবচন্দ্র ও বাংলা-সাহিত্য" লিখিলেন, এইবার "কেশবচন্দ্র ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" নামে একখানা গ্রন্থ লিখিয়া সেকালের মনীষিগণের বিস্তৃত পরিচয় প্রদান করিলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের দিক দিয়া একখানি উপাদেয় গ্রন্থ হইবে। প্রত্যেক চিন্তাশীল পাঠকের এই বই পড়া উচিত। স্কুল ও কলেজের লাইব্রেরীতে এবং সাধারণ পাঠাগারে এই গ্রন্থের এক এক খণ্ড রাখা কর্ত্তব্য।

(আনন্দবাজার পত্রিকা—১২শে পৌষ, রবিবার, ১৩৪৩)

সপ্তাধিকশততম মাঘোৎসব।

কার্য্যপ্রণালী।

(আবশ্যক হইলে পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে)

১লা মাঘ, ১৩৪৩, ১৪ই জানুয়ারী, ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার—ব্রহ্মমন্দিরে সন্ধ্যা ৬৷৹টায় আরতি।

২রা মাঘ, ১৫ই জানুয়ারী, শুক্রবার—সন্ধ্যা ৬৷৹টায়, কমলকুটীরস্থ নবদেবালয়ে মহিলাগণ কর্ত্তৃক নিশানবরণ।

৩রা মাঘ, ১৬ই জানুয়ারী, শনিবার—সন্ধ্যা ৬৷৹টায় ব্রহ্মমন্দিরে হিন্দিতে উপাসনা।

৪ঠা মাঘ, ১৭ই জানুয়ারী, রবিবার—সন্ধ্যা ৬৷৹টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা।

৫ই মাঘ, ১৮ই জানুয়ারী, সোমবার—ব্রহ্মমন্দিরে সন্ধ্যা ৬৷৹টায় বক্তৃতা।

৬ই মাঘ, ১৯শে জানুয়ারী, মঙ্গলবার—শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বর্গারোহণ-সাম্বৎসরিক; ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৮টায় উপাসনা ও সন্ধ্যা ৬৷৹টায় স্মৃতিসভা।

৭ই মাঘ, ২০শে জানুয়ারী, বুধবার—সন্ধ্যা ৬৷৹টায় ব্রহ্মমন্দিরে পাঠ, আলোচনা, কীর্ত্তনাদি।

৮ই মাঘ, ২১শে জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার—শ্রীদরবারের উৎসব। ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৮টায় উপাসনা ও সন্ধ্যা ৬৷৹টায় শ্রীদরবারের বার্ষিক সভা।

৯ই মাঘ, ২২শে জানুয়ারী, শুক্রবার—সন্ধ্যা ৬৷৹টায় ব্রহ্মমন্দিরে বক্তৃতা।

১০ই মাঘ, ২৩শে জানুয়ারী, শনিবার—সন্ধ্যা ৬৷৹টায় ব্রহ্মমন্দিরে বিধানমুরলী শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে সঙ্কীর্ত্তনে উপাসনা।

১১ই মাঘ, ২৪শে জানুয়ারী, রবিবার—ব্রহ্মমন্দিরে সমস্তদিনব্যাপী উৎসব। প্রাতে ৭৷৹টায় কীর্ত্তন, ৮৷৹টায় উপাসনা; মধ্যাহ্ন ৩টায় উপাসনা, তৎপরে পাঠ, আলোচনা, ধ্যান ও ব্যক্তিগত প্রার্থনা; ৫৷৹টায় কীর্ত্তন ও সন্ধ্যা ৬৷৹টায় উপাসনা।

১২ই মাঘ, ২৫শে জানুয়ারী, সোমবার—নববিধান-ঘোষণার দিন; প্রাতে ৮টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা; অপরাহ্নে নগর-সঙ্কীর্ত্তন, ৫৷৹টায় ব্রহ্মমন্দির হইতে নগরকীর্ত্তন বাহির হইবে।

১৩ই মাঘ, ২৬শে জানুয়ারী, মঙ্গলবার—প্রাতে ৯টায় মঙ্গলবাড়ীর উৎসব। প্রাতে ৮টায় ১৪৮ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটে কেশব একাডেমী স্কুলে উৎসব।

১৪ই মাঘ, ২৭শে জানুয়ারী, বুধবার—ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৯টায় আর্য্যনারীসমাজের ও ব্রাহ্মিকাদিগের উৎসব।

১৫ই মাঘ, ২৮শে জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার—প্রাতে ৯টায় ১২।১, বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীটে অনাথ আশ্রমে উৎসব। সন্ধ্যা ৬৷৹টায় ব্রহ্মমন্দিরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভা।

১৬ই মাঘ, ২৯শে জানুয়ারী, শুক্রবার—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটে, অপরাহ্ণ ৫টায় প্রচারকার্য্যালয়ের উৎসব।

১৭ই মাঘ, ৩০শে জানুয়ারী, শনিবার—বালকবালিকাদিগের নীতিবিদ্যালয়ের উৎসব। প্রাতে ৮টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা; অপরাহ্ণ ৪৷৹টায় ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে, বালকবালিকাসম্মিলন ও পুরস্কার-বিতরণ। (প্রবেশের জন্য নিমন্ত্রণপত্র-প্রদর্শন আবশ্যক হইবে)

১৮ই মাঘ, ৩১শে জানুয়ারী, রবিবার—১৪৮ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটে অপরাহ্ণ ৪টায় সুনীতি-শিক্ষালয়ের পুরস্কার-বিতরণ। সন্ধ্যা ৬৷টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা, তৎপর কমলকুটীরস্থ নব-দেবালয়ে শান্তিবাচন।

১৯শে মাঘ, ১লা ফেব্রুয়ারী, সোমবার—সন্ধ্যা ৬৷৹টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসকমণ্ডলীর বার্ষিকসভা।

সকলের সপরিবারে ও সবান্ধবে যোগদান একান্ত প্রার্থনীয়।

ভক্তির অঞ্জলি।

সবিনয় নিবেদন,

ভক্তির অঞ্জলিরূপে এই মহোৎসবের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ, ১০৫সি, পার্ক ষ্ট্রীট ঠিকানায় সম্পাদকের নামে অথবা ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটে শ্রদ্ধেয় ভাই অক্ষয়কুমার লধের নামে যিনি যাহা পাঠাইবেন, কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে। ১লা, ১০ই ও ১১ই মাঘ ঝুলি ধরা হইবে।

নিবেদন।

মফঃস্বল হইতে যাঁহারা উৎসবে যোগদান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কে কখন আসিবেন, তাহা এক সপ্তাহ পূর্ব্বে শ্রদ্ধেয় ভাই অক্ষয়কুমার লধকে জানাইলে, যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইবে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির,
৯৫নং কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা;
৭ই জানুয়ারী, ১৯৩৭।

বিনীত—
শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ
সম্পাদক।

Edited on behalf of the Apostolic Durber New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priya-nath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭২ ভাগ।
২য় সংখ্যা।

১৬ই মাঘ, শুক্রবার, ১৩৪৩ সাল, ১৮৫৮ শক, ১০৮ ব্রাহ্মাব্দ
29th. January, 1937

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা

নববিধানের দেবতা, তোমার উৎসব অনন্ত ও অফুরন্ত। নিত্য নব নব ভাবে ও নব নব রূপে প্রকাশিত হইয়া, তোমার সন্তানদের প্রাণমন হরণ কর। তোমার অপার কৃপা অনন্ত উৎসবের স্রোত ধরাতলে প্রবাহিত করিয়া, আমাদিগকে সেই স্রোতে ভাসাইয়া নিয়া চলিয়াছে। সংসারের মলিনতার ভিতরে, পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, কি দৈন্যদশা ভোগ করিতেছিলাম; তুমি কৃপা করিয়া উৎসবক্ষেত্রে টানিয়া আনিলে, সকলের সঙ্গে মিলিত করিলে। মিলনেই যে উৎসব, তাহা বেশ বুঝিতে দিলে। যেখানে দুইটী প্রাণও তোমার চরণে মিলিত হয়, সেখানেই উৎসবের মলয়পবন প্রবাহিত হয়। আর উৎসবক্ষেত্রে প্রাণমন তোমার চরণে সমর্পণ করিলে, কি যে অপার আশীর্ব্বাদ লাভ হয়, তাহা অনুভব করিয়া ধন্য হইয়াছি। তুমি তো স্বর্গের কত ধন দৌলত নিয়ে, কত আশীর্ব্বাদ নিয়ে আমাদের হৃদয়-দ্বারে দাঁড়াইয়া আছ। তুমি আমাদের মনটা দেখ। যখনই মনপ্রাণ তোমার দিকে উন্মুখীন হয়, তোমারই জন্য কাঙ্গালের প্রাণে ব্যাকুলতার ঝড় বহিয়া যায়, তখনই তুমি প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন হইয়া, তোমার অপার আশীর্ব্বাদে আমাদের শূন্য জীবনকে ভরপূর করিয়া দাও। এমন করিয়া পলকের ভিতর শূন্যপ্রাণ আর কেহই পূর্ণ করিয়া দিতে পারে না। সংসারের আপদ বিপদে, শোকে দুঃখে কত অন্তরঙ্গ বন্ধুদের আশ্রয় নেই; কিন্তু জীবনের পরীক্ষায় প্রমাণ পেয়েছি, জগদ্বন্ধু, তুমি বিনা জীবনের বন্ধু আর কেহ নাই। জীবনের অভাব আর কেহই দূর করিয়া দিতে পারে না। একমাত্র তুমিই আমাদের ভরসা ও সম্বল। উৎসবের মধ্যে কত আপনার হইয়া এইরূপে দেখা দিলে, কত তোমার স্বর্গের প্রসাদ দান করিলে; সংসারে যারা নগণ্য, পাপী তাপী, তাদেরও যে তুমি এমন করিয়া ভালবাস, তাদের জীবনের দুঃখ দুর্গতি দূর করিয়া নূতন জীবন, স্বর্গের জীবন দাও, এ প্রমাণ হাতে হাতে দিলে। এইরূপে উৎসবের মধ্যে তোমার অরূপ রূপের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য স্পষ্ট অনুভূত হয়। তুমি যে আমাদের কেমন বড্ড ভাল মা, কেমন আদরিণী জননী, তাহা ভাল করিয়া বুঝা যায়। তোমাকে যাহাতে না ছাড়ি এবং না ভুলি, সর্ব্বদা প্রাণে প্রাণে রাখি, তেমনই করিয়া প্রাণমোহন ও মনোমোহন বেশে দেখা দিয়ে একেবারে মুগ্ধ করিয়া রাখিতে চাও। এবারকার উৎসবে তাহাই হউক। প্রাণমন সম্পূর্ণরূপে হরণ করিয়া, তোমার অনন্ত উৎসবে, নিত্যোৎসবে চিরদিন

মত্ত করিয়া রাখ। আর আমাদের সংসারে আমাদিগকে ফিরিয়া যাইতে দিও না; আনন্দময়ী মার সংসারে, আনন্দময়ী মার গৃহ পরিবারে নিত্যানন্দে বাস করি, তুমি সকলকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

—•—

মার প্রেমের বন্যা

আমাদের প্রিয় মাঘোৎসব এল, আমরাও উৎসব করিতে প্রস্তুত হলাম এবং উৎসবস্রোতে ভাসিয়া চলিলাম। বরাবর এইরূপ উৎসব আসে, এবং উৎসব চলিয়া যায়। কিন্তু উৎসবের প্রকৃত পরিচয় কি, প্রকৃত সফলতা কি, তা কি জীবনে আমরা ভাল করিয়া অনুভব করি, বা জীবনে তার প্রমাণ দিতে পারি? বাহিরে প্রকৃতির ভিতর দেখি, যখন সমুদ্রে জোয়ার হয়, তখন নদী, খাল, ডোবা, ডাঙ্গা ডহর সব ডুবিয়া একাকার হইয়া যায়। তখন কোনটা নদী, কোনটা ডাঙ্গা, কোন ভেদাভেদ বুঝা যায় না; সমস্তই এক সমুদ্রে পরিণত হয়। আবার যখন ভাটা হয়, তখন সকলই মাথা তুলিয়া আপন আপন ভেদগণ্ডী সৃজন করে। সমুদ্রের জোয়ার প্রকৃতিরাজ্যে একটা উৎসবের রূপ। এমনই প্রকৃতিরাজ্যে কত শত উৎসবের রূপ বা প্রতীক আমরা দেখিতে পাই। যেমন নীলাকাশে পূর্ণচন্দ্রের প্রকাশ, জ্যোৎস্নাধবলিত পূর্ণিমার রাত্রি, ফুটন্ত ফুলের অমলশোভা, নরনারীর যৌবনোদ্ভাসিত কমনীয় রূপলাবণ্য, বসন্তের মলয়জ শীতল স্নিগ্ধতা ও প্রকৃতির নবীনতা, শরতের অমলধবল সৌন্দর্য্য ইত্যাদি। কিন্তু বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে এ উৎসবের রূপ অনিত্য। এই আছে, এই নাই। আজ যাহা পূর্ণ, কাল তাহা শূন্য; আজ যাহা সুন্দর, কাল তাহা কুৎসিত; আজ যাহা নবীন, কাল তাহা পুরাতন। জড়প্রকৃতির মধ্যে বসবাস করিয়া আমাদের জীবনের রূপও কতকটা তদ্রূপ হইয়া গিয়াছে। পঞ্চভূত ও পঞ্চতন্মাত্রের অধীনতায় এবং বিষয়াসক্তির বন্ধনহেতু, আমরা কখন হাসি, কখন কাঁদি, কখন আনন্দ করি, কখন আবার দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া যাই; কখন উৎসাহে মত্ত হই, কখন অবসাদে হতবুদ্ধি হই। এইরূপ অনিত্যতার জগতে নিত্যস্বরূপের সন্ধান আমরা পাই না; একটা নিত্যসত্তার উপরে জীবনমন্দিরকে নিত্য নূতন রূপে গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হই না। এইরূপে পার্থিব জগতে বাহিরের ভাবে ধর্ম্ম বা কর্ম্ম লইয়া এক একটা উৎসব আসে, আবার চলিয়া যায়; জীবনে কোনরূপ স্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া যায় না।

যে উৎসবের বিষয় আমাদের আলোচ্য, এ উৎসব কি বাহিরের উৎসব, আমাদের উৎসব? তা যদি হয়, তবে এসম্বন্ধে আর কিছু বলিবার নাই। আসবে আর যাবেই; কোন স্থায়িত্বই থাকবে না। আমরা বিধানের লোক; সবই বিধাতার বিধান বলিয়া মানি; বিধাতার বিধাতৃত্বে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করি। তাই আমাদের উৎসব বিধাতার বিধান, অনন্ত প্রেমময়ী মার প্রেমের বন্যা। তাঁহারই নিত্য নব উদ্বেলিত প্রেমের বন্যায় আমাদিগকে চিরমগ্ন করিয়া, তাঁহাতে একাকার করিয়া লইতে তিনি চান। এবারকার উৎসবে তাই তাঁহারই প্রেরণায় আমরা গাইলাম, "একা একা আর রবনা এবার, প্রেমে একাকার হইয়া রব। এক হব প্রেমে তব। তোমার ভালবেসে, ভাইকে ভালবেসে, প্রাণে স্বর্গরাজ্য রচিব নব।" এবারকার উৎসবের মধ্যে মার এই প্রেমের রূপই বিশেষ স্পষ্ট অনুভব করিতে দিলেন।

যদি এবার মা প্রেমের পোষাক পরিধান করিয়া এলেন, তাঁহার প্রেমের বন্যা বহালেন এবং তাঁহার প্রেমে মগ্ন করে আমাদিগকে নূতন প্রেমের রূপ দিলেন, আর আমরাও তাঁহার নির্দেশে প্রেমভরে গাইলাম, "তোমায় ভালবেসে, ভাইকে ভালবেসে, প্রাণে স্বর্গরাজ্য রচিব নব," "তুমি এক পিতা মাতা সবাকার, নরনারী যত সন্তান তোমার", তবে এই প্রেমের বন্যা নিত্য আমাদের প্রাণে প্রবাহিত হইতে থাকুক। এ প্রেমের যেন আর কখনও ভাটা না হয়। এই মার প্রেম আমাদের তন্ত্র হউক, মন্ত্র হউক, ব্রত হউক, সাধন হউক ও সিদ্ধি হউক।

মার প্রেম শিশুসন্তানের কাছে নিত্য নূতন। মার প্রেম শিশুর কাছে কখনও পুরাতন হয় না। মা যদি এবার আমাদিগকে প্রেমভরে ডাকিলেন, আর আমরাও যদি পরস্পরকে ডাকিয়া বলিলাম, "ঐ শোন, ঐ শোন, মা ডাকিছে যে আবার," এবং মা আমাদিগকে তাঁহার প্রেমক্রোড়ে পাপী তাপী, দুঃখী ধনী, সাধু অসাধু নির্ব্বিশেষে টানিয়া নিয়া প্রেমসুধা প্রাণ ভরিয়া পান করিতে দিলেন, তবে চিরদিন যেন তাঁহার ক্রোড়ের শিশু হইয়া থাকি, তাঁর প্রেমসুধা পান করিতে না

তুমি এবং ভাই বোন সকলে মিলে এই প্রেমসুধাপানেই মত্ত হইয়া থাকি। আর সকলে মার মনোমত হইয়া মাকে বলি, মা, "তোমার হাতে খাব, তোমার সঙ্গে রব, সুখ দুঃখ যত তোমাকে জানাব; হাসিব কাঁদিব, তোমার কাছে শোব, চরণে মাথা রাখি।" শিশুই নিত্যোৎসবের অধিকারী। আমরাও মার কোলে শিশু হইয়া নিত্যোৎসবের অধিকারী হই।

সত্যই মা উৎসবে এবার তাঁহার প্রেমলীলা দেখাইয়া অবাক করিলেন। আমরা তো কত ভাবনা চিন্তা লইয়া উৎসবদ্বারে দাঁড়াইয়া ছিলাম; মা বলিলেন, "আমার হাতে সব ছাড়িয়া দাও, আমার উৎসব আমিই করিব, তোদের আর ভাবনা কি?" মা সত্যই তার প্রমাণ দিলেন। উৎসব আর কিছু নয়, মার "প্রেমের দরবারে আনন্দের মেলা।" প্রেমদাস যে গানটীতে উৎসবের প্রকৃত রূপ আঁকিয়াছিলেন, তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। গানের ভাবে আমাদের প্রাণ ভরপুর হইয়া এই উৎসব নিত্যোৎসবে পরিণত হউক এবং মার উৎসবের আশীর্ব্বাদ আমাদের জীবনে সার্থক হউক।

"ঐ দেখ প্রেমের দরবারে আনন্দের মেলা।
হরি ভক্তসঙ্গে রসরঙ্গে, করি'ছেন কত খেলা।

কেহ ল'য়ে প্রেমের পসরা, বলে আয় রে ভাই শুদ্ধ প্রেম কে নিবি তোরা; করে অপরূপ মহাভাবের বিচিত্র রসলীলা।

কেহ হরিভক্তিরসের সাজায়ে ডালি, দেখায় নানা ভাবকালি, ভাবে হাসে কাঁদে নাচে গায় দেয় করতালি; দুনয়নের জলে অঙ্গ ভাসে, প্রেমরসেতে মাতোয়ালা।

যোগী ঋষি তপোধন, তারা ধ্যানেতে মগন, পণ্ডিতেরা বেদমন্ত্র করে উচ্চারণ; আবার কর্ম্মী যত সেবায় রত, ভাবনায় হ'য়ে ভোলা।

শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর রস, তাতে দিয়ে নব রস, কেহ বা বিলায় প্রেম কলসে কলস; ডাকে কে নিবি আয় প্রেমের ছবি ত্বরা করে' এই বেলা।

প্রেমদাসের বড় সাধ মনে, হরি বলে' ভিক্ষা করে ভক্তির দোকানে; সাধু মহাজনের পাতের খেয়ে ঘুচাই জঠরজ্বালা॥"

—.—

ধর্ম্মতত্ত্ব

যথার্থ বড় মানুষ কে?

"তোমরা বল টাকাতে বড় মানুষ হওয়া যায়, ইহা মিথ্যা কথা। যদি যথার্থ বড় মানুষ হইতে চা, কেবল এই সাধুদিগকে গণনা কর। ইঁহারাই মনুষ্যজাতির রত্ন, অমূল্য নিধি। ইঁহারাই যথার্থ মণি মাণিক্য। পৃথিবীতে আসিয়া এই ধন ভিন্ন আর কোন সার ধন পাই নাই। ইঁহারা ব্রাহ্মের আদরের ধন, এইজন্য ব্রাহ্মের বাড়ীতেই টাঁকশাল। আমরা ব্রাহ্ম হইয়া সমস্ত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়কে ফাঁকি দিলাম। কারণ প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের শিরোমণি আমাদিগের বাড়ীতে।"

(কেশব)

—

রসনা সদয় হইলে পরিত্রাণ

"সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যদি দুই পাঁচটী লোকের রসনা শুভাশীর্ব্বাদ করে, এই দূষিত বায়ু ক্রমে ক্রমে চলিয়া যাইবে। রসনার আশীর্ব্বাদে দুর্ব্বল সবল, রোগী সুস্থ এবং নির্জ্জীব সজীব হইবে। একজনের আশীর্ব্বাদে শত শত বংশের লোক পরিত্রাণ পাইবে। কথার কত ক্ষমতা! অমৃত বাক্য উচ্চারণ কর, সাহসের কথা, শান্তির কথা বল। ক্ষুদ্র রসনা সিংহের ন্যায় প্রবল হউক। ছোট কল, ছোট রসনা যন্ত্র। কেমন যন্ত্র, তোমরা জান না। রসনার ভাল কথায় জীবের কল্যাণ হইবেই হইবে। ঈশ্বরের প্রেমমুখ দেখিতে পাইবে, যদি রসনা আস্তিক হয়। মুখ ভাল কথা বলে না, তাই আমাদের ভাল হয় না। অতএব শুভ উৎসবে রসনা-পক্ষীটীকে শুভ কথা বলিতে শিক্ষা দাও। সকল রসনা 'মঙ্গল হউক, মঙ্গল হউক, মঙ্গল হউক' এই কথা বলুক। রসনা যদি সহায় হয়, তোমরা পাঁচটী ব্রাহ্ম পাঁচ হাজার ব্রাহ্মের ন্যায় সবল এবং সতেজ হইবে। রসনা একটী প্রকাণ্ড যন্ত্র। পঞ্চাশটী ব্রাহ্ম প্রবল হইয়া যদি হুঙ্কার করেন, আশ্চর্য্য কর্ম্ম সকল সম্পন্ন হইবে: কেবল ব্রাহ্মেরা ভাল কথা বলিতে চাহেন না, এইজন্যই ব্রাহ্মসমাজের দুর্দ্দশা। রসনা তেজের কথা বলিলে, নিমেষের মধ্যে চীরজীবনের পাপ সকল ধ্বংস হইবে। রসনার কথা পাঁচ লক্ষ লোককে মঙ্গল-পথে লইয়া যাইবে। রসনা ঈশ্বরের সংস্পর্শে অলৌকিক বল এবং স্ফূর্ত্তি লাভ করে। এই রসনার আশীর্ব্বাদে আমাদের পরিত্রাণ হইবে।"

(কেশব)

—•—

নারীজাতি ও কেশবচন্দ্র

(৮ই জানুয়ারী, কটক টাউনহলে, আচার্য্য কেশবচন্দ্রের ৫৩তম স্বর্গারোহণ-সাম্বৎসরিক উপলক্ষে পঠিত)

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ধর্ম্ম, সমাজ, শিক্ষা এবং দেশের নানাবিষয়ে উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন; কিন্তু বিশেষ করিয়া ভারতের নারীজাতির উন্নতির জন্য তাঁহার কতখানি শক্তি তিনি নিয়োজিত করিয়াছিলেন, তাহা জানিলে তাঁহার উদার আদর্শের একটী বিশেষ দিক বুঝিতে পারা যায়। ৭৫ বৎসর পূর্ব্বে নারী-জাতির অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল, তাঁহাদের শিক্ষা, সাধনা, কার্য্যকারিত্ব-শক্তি কিছুই ছিল না; এ বিষয়ে কোন মহাপুরুষের দৃষ্টি তেমনভাবে আকৃষ্ট হয় নাই। নারী এতদিন পুরুষের সহায় না হইয়া বিঘ্ন বলিয়া গণ্য হইতেন। তাঁহারা যে ধর্ম্মসাধনে পুরুষের প্রকৃত সহধর্ম্মিণী হইয়া স্বামীর ধর্ম্মসাধনে সাহায্য করিতে পারেন, ইতিপূর্ব্বে একথা কেহই ভাবেন নাই। অন্তঃপুর হইতে স্ত্রীলোকদিগের বাহিরে আসা অসম্ভব এবং দুঃসাহসের কার্য্য ছিল; কিন্তু মহর্ষি যেদিন কেশবচন্দ্রকে আচার্য্যপদে বরণ করিলেন, সেদিন ঘটনাচক্রে ধর্ম্মসাধনে নারীর স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেল। আজ সেই শুভ মুহূর্ত্তের কথা স্মরণ করি, যেদিন ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে কলুটোলার বিখ্যাত সেন বংশের বধূ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী সতী জগন্মোহিনী দেবী স্বামীর ধর্ম্মসাধনের সহায় হইবার জন্য, সমস্ত পার্থিব সুখ সম্পদ তুচ্ছ করিয়া, দীনবেশে প্রকাশ্য দিবালোকে স্বামীর পদানুসরণ করিয়া, রাজপথে বাহির হইয়া মহর্ষির গৃহে উপস্থিত হইলেন; তাহা দেখিয়া বঙ্গদেশ বিস্ময়ে স্তব্ধ হইল, মহর্ষি চমৎকৃত হইলেন। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। স্বামী কহিলেন, "যদি আমার ধর্ম্মসাধনের সহায় হইতে চাও, আমার সঙ্গে চলিয়া আইস।" সে আহ্বানে পত্নী কি শুনিলেন, কি বুঝিলেন, তাহা তিনিই জানেন; কিন্তু এ আহ্বান উপেক্ষা করিবার শক্তি তাঁহার ছিল না। একদিকে প্রকাণ্ড গৃহ আত্মীয় স্বজনে পরিপূর্ণ, অন্যদিকে স্বামীর ধর্ম্ম। কেশবচন্দ্রের খুল্লতাত অনেক প্রকারে বাধা দিয়াছিলেন, দরজা বন্ধ করিয়া দ্বারবানদের বসাইয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু কেশবচন্দ্র যখন নিজহস্তে দ্বার খুলিয়া ফেলিলেন, তখন দ্বারবানেরা আর বাধা দিতে সাহসী হইল না। সাধক গৃহ হইতে বাহির হইলেন, সহধর্ম্মিণীও পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাহিরে আসিলেন। ততদিন পর্য্যন্ত কেহই পত্নীকে ধর্ম্মসাধনের সহায়রূপে গ্রহণ করিতে পারেন নাই, কিন্তু কেশবচন্দ্রের সাহস ও সদৃষ্টান্ত সকলের মনে বল আনিয়া দিল এবং নারীজাতির উন্নতির বিষয়ে ভারতে এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। সেই দিন হইতে ভারতের নারী সংকীর্ণ সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া, নিজ কল্যাণসাধনের জন্য জগৎ সভায় দণ্ডায়মান হইলেন।

সেই সময় নারীদিগের মনের প্রসারতা তেমন ছিল না এবং এই বিশাল পৃথিবী ও জগৎ সম্বন্ধে কোন জ্ঞানও ছিল না; তাঁহাদের এই অভাব দূর করিবার উদ্দেশ্যে কেশবচন্দ্র ১৮৭১খ্রীঃ "বামাহিতৈষিণী সভা" নামে অন্তঃপুরস্থ মহিলাদের একটী সমিতি স্থাপিত করিলেন। সেখানে নানা বিষয়ে প্রবন্ধাদি পাঠ ও আলোচনাদি হইত। যাঁহারা ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন, কেবল যে তাঁহাদের উপকার হইয়াছিল, তাহা নয়; ইহার ফলে পরবর্ত্তী সময়ে বঙ্গদেশের ও ভারতবর্ষের নারীজাতির প্রভূত উন্নতি সম্ভব হইয়াছিল।

ইহার পর তাঁহার মনে "ভারত-আশ্রমের" ভাব আসিল। স্বামী স্ত্রী পরস্পর পরস্পরকে সহায় করিয়া ধর্ম্মসাধন করিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র "ভারত-আশ্রম" নামে একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে কয়েকটী ব্রাহ্মপরিবার উচ্চ আদর্শ লইয়া, সকলে এক পরিবারভুক্ত হইয়া, পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে যোগ রক্ষা করিয়া একত্র ধর্ম্মসাধন করিতেন। ইহাতে সকলের ধর্ম্মপিপাসা বাড়ীতে লাগিল এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অনেকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পত্নীগণও স্বামীদিগকে পারিবারিকভাবে ধর্ম্মসাধনে সাহায্য করিতে লাগিলেন।

এইরূপে নারীগণ যখন ধর্ম্মসাধনের উপযোগী হইতে লাগিলেন, তখন ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের জন্য "আর্য্যনারীসমাজ" স্থাপিত হইল। এখানে কেবল মাত্র নারীগণ ধর্ম্মসাধনের উদ্দেশ্যে মিলিত হইতেন এবং নিজেরা পাঠ, আলোচনা, কীর্ত্তনাদি করিয়া পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিতেন। তাঁহাদের উপযোগী বিশেষ ব্রতগ্রহণ ইত্যাদি তাঁহাদের সাধনা ছিল এবং এইরূপে নারীগণ ধর্ম্মজগতে স্বীয় স্থান অধিকার করিলেন। এইভাবে ঘটনা পরম্পরা বিবেচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, কেশবচন্দ্র নারীদের ধর্ম্মসাধন বিষয়ে চিরকাল যত্নবান ছিলেন এবং তার একটী পথ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নিজ জীবনেও দেখা যায় যে, তাঁহার পত্নীকে তিনি চিরদিন সাধনার সঙ্গিনী করিয়া গিয়াছেন। আচার্য্য কেশবচন্দ্র যে শুধু নারীকে ধর্ম্মসাধনে স্থান দিয়াছিলেন, তাহা নয়; সামাজিক জীবনেও নারীকে একটী বিশেষ স্থান দিয়া তাঁহার সর্ব্বপ্রকার উৎকর্ষলাভের সহায়তা করিয়া গিয়াছেন। নারীজাতির উচ্চ শিক্ষার জন্য ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি Normal School for Ladies নামে একটী মহিলা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। উচ্চবংশসম্ভূত বহু মহিলা এই বিদ্যালয়ে যোগদান করিয়াছিলেন। কেহ শিক্ষাদান করিতেন, কেহ শিক্ষালাভ করিতেন; প্রতিদিন প্রায় ৫০টী অন্তঃপুরস্থ মহিলা নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসিতেন। ঐ বিদ্যালয়ে ইংরাজী বাঙ্গলা ইতিহাসাদি সকল বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইত। এই সময় হইতে নূতন ভাবে স্ত্রী-শিক্ষার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। প্রতি বৎসর পারিতোষিকবিতরণের সময় বড়লাট ও তাঁহার

পরিবারস্থ মহিলারা আসিয়া সকলকে উৎসাহিত করিতেন।

ক্রমে তিনি দেখিলেন যে, অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকাদের বিবাহ নারীদের শিক্ষার উন্নতির এবং জাতির কল্যাণের প্রধান অন্তরায়; ইহা দূর করিবার মানসে বালিকাদিগের বিবাহের বয়সের একটা নিম্নতম সীমা নির্দ্ধারণের জন্ম তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

আজকাল অনেক নারীশিল্পপ্রদর্শনীর কথা শুনিতে পাওয়া যায়। ইহার প্রথম প্রবর্ত্তন করেন আচার্য্য কেশবচন্দ্র। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে নর্ম্মাল স্কুলে প্রথম ভদ্রবংশীয়া মহিলাগণের হস্তনির্ম্মিত শিল্পকার্য্যাদির প্রদর্শনী হয়। উক্ত প্রদর্শনীতে সেই সময়ের বহু সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলাগণ আপন আপন শিল্পকলাদি প্রদর্শন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

তখন পর্য্যন্ত নারীগণ অন্তঃপুর হইতে বাহির হইতেন না। কিন্তু কেশবচন্দ্র এ নিয়ম ভাঙ্গিয়া দেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার কয়েকটী ইংরাজ বন্ধুদের সহিত পরিবারস্থ মহিলাদের পরিচয় করাইয়া দেন। বঙ্গমহিলাগণের পক্ষে অন্তঃপুরের বাহিরে ভদ্রসমাজে সামাজিক ভাবে আসা এই প্রথম।

কলিকাতায় এখন যে ভিক্টোরিয়া ইন্‌ষ্টিটিউসনে বালিকাগণ শিক্ষালাভ করিতেছেন, কেশবচন্দ্রই ইহার প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। ইহা স্থাপনের উদ্দেশ্য এই যে, তিনি মনে করিতেন, বালিকাদের শিক্ষা বালকগণ হইতে ভিন্ন প্রণালীতে হওয়া উচিত, যাহাতে তাহারা পরবর্ত্তী জীবনে সুগৃহিণী ও সুমাতা হইতে পারে।

অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাগণ যাহাতে মুক্তভাবে মেলামেশা ও সেই সঙ্গে নির্দ্দোষ আমোদ পাইতে পারেন, সেই উদ্দেশে কেশবচন্দ্র "আনন্দবাজার" আরম্ভ করেন। সেখানে ভদ্রবংশীয়া মহিলাগণই কেবলমাত্র যাইতেন। তাঁহারাই দোকানে বিক্রয় করিতেন, তাঁহারাই ক্রয় করিতেন। তখনকার দিনে ইহা এত উপযোগী হইয়াছিল যে, ইহা ক্রমে একটী বৃহৎ ব্যাপারে দাঁড়াইয়াছিল।

আচার্য্য কেশবচন্দ্র নারীকে ব্রহ্মকন্যারূপে সম্মান করিতেন ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। তিনি নারীজাতির উন্নতির জন্ম সকল দুয়ার খুলিয়া দিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তিনি চাহিতেন না যে, আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে নারী কঠোর প্রকৃতি বা পুরুষস্বভাব লাভ করে। সেইজন্ম তিনি নারী-প্রকৃতির অনুকূল শিক্ষা-প্রণালীর পক্ষপাতী ছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাকে নারীদের উপযোগী বলিয়া মনে করিতেন না। তিনি অবরোধপ্রথার বিরোধী ছিলেন, কিন্তু অবাধ মেলা-মেশা একেবারেই পছন্দ করিতেন না। তিনি স্বামীর সংসারে ও ধর্ম্মসাধনে সহায় এবং সঙ্গিনী হওয়াই হিন্দুনারীর প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন।

শ্রীমতী শান্তনা নিয়োগী।

—•—

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র

(৮ই জানুয়ারী, ঢাকায় নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে, আচার্য্য কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণ-সাম্বৎসরিক উপলক্ষে পঠিত)

আমার লেখবারও ক্ষমতা নাই, বলবারও ক্ষমতা নাই। তবু প্রাণের আবেগে মনের দু'চারটা কথা আপনাদের নিকটই উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করিতেছি। আমার বিশ্বাস, কেশব friends ও enemies উভয় দ্বারাই misrepresented। আমি নিজে তাঁহাকে যেরূপ ভাবে দেখি, তাহা এখানে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব।

মহর্ষি ঈশাকে তাঁহার শিষ্যগণ কোনও এক সময়ে "তুমি Good" এই বলিয়া সম্বোধন করেছিলেন। এরূপ ভাবে অভিহিত হইয়া মহর্ষি ঈশা বলেছিলেন, "Don't call me good, my father in heaven alone is good"

অদ্য এই পবিত্র স্মৃতিসভায় ঈশার সেই বাক্য আমার প্রাণে জাগিতেছে। অদ্য যদি কেশব এই সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার নানাগুণবর্ণনা ও তাঁহার দ্বারা কৃত অলৌকিক কার্য্য সকলের সুখ্যাতি শুনিতে পাইতেন, তাহা হইলে তিনি কি বলিতেন? তিনি নিজেকে যিশুদাস বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। তিনি যিশুর সঙ্গে এক আত্মা ও এক প্রাণ হয়ে বলিতেন, "বন্ধুগণ, এ সব গুণ আমাতে আরোপ করিও না। অলৌকিক কার্য্য সকলও আমার কার্য্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিও না। যিনি সর্ব্বগুণাধার, যিনি ভূমা ও মহান, যাঁহার কীর্ত্তি এই অনাদি, অনন্ত জগৎ অনাদি কাল হইতে প্রকাশ করিতেছে, তিনিই এসকলের মূল ও উৎস। তিনিই অপূর্ব্বকর্ত্তা, তিনিই সকল কার্য্যের প্রেরয়িতা হইয়া আমাকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়াছেন মাত্র। তাই তাঁহারই জয়ধ্বনিতে, বন্ধুগণ, অদ্য আকাশ মেদিনী কম্পিত করে জয়গান করুন, আজ ঢাকা নগরী হরিসংকীর্ত্তনের মহাধ্বনিতে নিনাদিত হউক।" "তিনি কেন আমাকে এই বিশেষ সময়ে নববিধানরূপ বিশেষ কার্য্যে বিশেষরূপে ব্যবহার করেছেন, তাহারও কারণ তাঁহাতেই বর্ত্তমান।" "আমি উপলক্ষ্য মাত্র, আমার কোনও গুণদ্বারা এই কার্য্য সুসম্পন্ন হয় নাই। আমি গুণহীন, তিনিই সর্ব্বগুণাধার, তিনিই যশস্বী ও কীর্ত্তিমান।"

"দেহ-যন্ত্রে তুমি যন্ত্রী, আত্মারথে তুমি রথী,
মানুষ কেবল পাপের ভাগী, নিজ স্বাধীনতার ফলে।"

বন্ধুগণ, মানুষের স্বাধীনতা কোথায়, তাহা এ বয়সেও ঠিক বুঝিতে সক্ষম হই নাই। মানুষ যে নিজেকে স্বাধীন বলে অনুভব করে কার্য্যে রত হবে, এটা বিধাতার বিধি সত্য বটে। এইজন্ম আমার ইচ্ছা হয়, "স্বাধীনতার ফলে" এই কথাটার জায়গায় বসাইয়া দেই—"তোমাতে বিমুখ থাকার ফলে বা জড়তার ফলে।"

অদ্য এই পবিত্র স্মৃতির দিনে আর একটী কথা মনে হচ্ছে। লীলাময় হরি কেশবকে ব্যবহার করিয়া কি কি লীলা প্রকাশ করিলেন? ব্রহ্মদর্শনের লীলা, ব্রহ্মবাণী-শ্রবণের লীলা ও ব্রহ্ম-স্পর্শলাভের লীলা তিনি কেশবজীবন গ্রহণ করিয়া প্রকাশ করিলেন। এবং কেশবের মধ্য দিয়া আমাদের সকলের জন্য, পাপী, পুণ্যবান্ সকলের জন্য আহ্বান পাঠালেন যে, তিনি আমাদের প্রত্যেকের জীবনে ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মবাণীশ্রবণ ও ব্রহ্মস্পর্শন তরূপ লীলা করিবেন। কেহ বাদ যাবেন না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে যেমন একজন মহাপুরুষকেই ব্রহ্মদর্শনলাভের, ব্রহ্মবাণীশ্রবণের ও ব্রহ্মস্পর্শলাভের অধিকারী করেছিলেন এবং অন্য সকলে সেই মহাপুরুষ হইতেই সমস্ত পরিত্রাণের পথ লাভ করিবেন, এরূপ বিধান করেছিলেন; এই নববিধানে লীলাময় শ্রীহরি অন্যরূপ, নূতন রূপ, নববিধান করিলেন। তিনি প্রত্যেক জীবনে নিজে সাক্ষাৎ ভাবে লীলা করিবেন, এই অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতেছেন। এ বিধানে কাহাকেও নিষ্পাপ করিলেন না। কাহাকেও একমাত্র prophet করিলেন না। তাই পূতচরিত্র কেশবকে দিয়াও বলাইলেন, "আমি পাপীর সর্দ্দার"। অর্থাৎ যতক্ষণ আমি একা আমার নিজের উপরই দাঁড়াইয়া আছি, ততক্ষণ আমি পাপী বা পাপীর সর্দ্দার। আর যখন লীলাময় হরি আমাকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করেন, তখন হরির সংস্পর্শে মূক কথা বলে, অন্ধ দৃষ্টি পায় ও বধির প্রেরণার বাণীতে পরিপূর্ণ হৃদয়ে প্রবক্তার ন্যায় কথা বলে। তিনিই সর্ব্বমূলাধার, তিনিই সকলের সর্ব্বস্ব। পরিশেষে এই পথে—লীলাময় হরির হস্তে আত্মসমর্পণের পথে—কেশবকে অগ্রসর করাইয়া তাঁহাকে দিয়া বলালেন, "Long since has this bird "I" flown from this cage, never to return again." ইহাই ব্রহ্মযোগ অবিচ্ছেদে গ্রহণ। মঙ্গলময় হরিরই পূর্ণ জয়।

কেশবকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া লীলাময় হরি, কেশবেরই প্রাণের মধ্যে ভগবল্লীলারূপ ঋক্ সকল, বেদমন্ত্র সকল উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে দিয়া জীবনবেদ লিপিবদ্ধ করাইয়াছেন। এবং আমাদের প্রত্যেকের নিকট কেশবকে দিয়া ও অন্তরে পবিত্রাত্মার মধ্য দিয়া আহ্বান পাঠায়েছেন যে, আমাদের মধ্যেও তিনি লীলারূপ ঋক্ বা বেদমন্ত্র প্রত্যেকের বিশেষত্বের মধ্য দিয়া উচ্চারণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। আমরা যেন সমাহিতচিত্তে, বিশ্বাসের ভূমিতে দাঁড়াইয়া, এই মন্ত্র সকল শ্রবণ করি ও গ্রহণ করি এবং জীবনরূপ উজ্জ্বল লালরক্ত দিয়া সে সকল লিপিবদ্ধ করি। প্রত্যেকের জীবনেই তিনি বিশেষ বিশেষ লীলা করিবেন, এই শুভসংবাদ তিনি নববিধানে কেশবকে দিয়া পাঠালেন। বন্ধুগণ, আমরা সমাহিতচিত্তে শ্রবণ করি, পাঠ করি ও লিপিবদ্ধ করিতে শিখি।

পাপী তাপী, সাধু পুণ্যবান্, দুঃখী দরিদ্র, ধনী মানী, আপদ্ বিপদাপন্ন এবং সুখী সচ্ছন্দতাপূর্ণ সকলের মধ্যে হরি লীলা করিতেছেন ও করিবেন। কেহই বাদ যাইবেন না। তবে প্রত্যেকটী লীলা ভিন্ন ভিন্ন ও অপরূপ। যাহার বিশ্বাস-চক্ষু আছে, সে দেখিবে। যাহার বিবেক-কর্ণ আছে, সে শুনিবে। কেশবের মধ্য দিয়া এই আহ্বান, এই হরিলীলা-দর্শনের আহ্বান সকলের নিকট ভগবান্ পাঠায়েছেন। এবং আমাদের সকলের জন্যই, পাপী সাধু সকলের জন্যই, বিশ্বাস-ভূমিতে দাঁড়াইয়া এ হরিলীলা-দর্শনের নিমন্ত্রণ পৌঁছিয়াছে। নববিধানের ইহা বিশেষ দান। হরি তো এই বিশ্বময় কথার মধ্য দিয়া ২৪ঘণ্টা কথা বলিতেছেন। তিনি বিশ্বপ্রাণ হয়ে, আমাদের আপন হইতেও আপন হয়ে, সর্ব্বদা নিজকে প্রকাশ করে রেখেছেন, নববিধান এই শুভ-সংবাদ এনেছেন। তিনি আমাদের সর্ব্বস্ব হয়ে, আমাদের শরীর, মন, আত্মার সমস্ত হয়ে, আমাদিগকে আবেষ্টন করে স্পর্শ করে রয়েছেন। নববিধান এই শুভসংবাদ এনেছেন। একবার বিশ্বাসভূমিতে দাঁড়াইয়া আমরা স্বীকার করিতে শিখি, অমনি নববিধানের নবলীলা হরিদর্শন, হরিবাণী-শ্রবণ ও হরিস্পর্শলাভ পাইয়া আমরা সকলে ধন্য হব। হরি পাপীর সঙ্গে থাকিয়া পাপীর পাপ তাঁহার অপূর্ব্ব উপায়ে মোচন করিতেছেন, দুঃখীর সঙ্গে থাকিয়া তাহার দুঃখ তাঁহার অনির্ব্বচনীয় উপায়ে মোচন করিতেছেন। পুণ্যবানের পুণ্য গ্রহণ করিতেছেন। কেহই তাঁহার সঙ্গলাভে বঞ্চিত হইতেছে না। পৃথিবীর মা যেমন দশটী ছেলের সকলের সঙ্গেই প্রেমে মিশে থাকেন, সেইরূপ জগজ্জননী পাপী পুণ্যবান নির্ব্বিশেষে সকলকেই আরও ঘনিষ্ঠরূপে প্রেম দান করিতেছেন ও সকলের জন্য প্রেমবক্ষ পেতে রেখেছেন। নববিধানে কেশবের মধ্য দিয়া তিনি আমাদিগকে এই শুভসংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন এবং পবিত্রাত্মারূপে হৃদয়ের মধ্যে এই আলোক প্রকাশ করিতেছেন।

আর একটা কথা। ব্রাহ্মসমাজ "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই মহাবাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন, যদিও এই বাক্য নূতন নহে। ইহুদী ধর্ম্ম ও ইসলাম ধর্ম্ম তাঁহাদের prophetদের মুখ দিয়া এ বাণী উচ্চারণ করায়েছেন। তবু এ মহাবাক্য পুনরুচ্চারণের দরকার হয়েছিল। তাই লীলাময় হরি রামমোহনকে ব্যবহার করিয়া আবার এই বাক্য ব্রাহ্মধর্ম্মে উচ্চারণ করাইলেন। এক্ষণ সকল জাতি ও সকল ধর্ম্মসমাজই এই বাক্য গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়, একথা সকল ধর্ম্মসমাজই গ্রহণ করিয়াছেন। যাঁহারা পুতুল, প্রতিমা ও অবতারের পূজা করেন, তাঁহারাও এসবটার নানা রকম ব্যাখ্যা দেন; এবং ব্রহ্ম যে এক ও অদ্বিতীয়, একথা স্বীকার করেন। কোনও ধর্ম্মসমাজই "একমেবাদ্বিতীয়ং" একথা উচ্চারণ করিতে কুণ্ঠিত নহেন। রামমোহনের জীবনে ভগবল্লীলারূপ বেদমন্ত্র "একমেবাদ্বিতীয়ং" জয়যুক্ত হইয়াছে। সকল ধর্ম্মসমাজই উহা গ্রহণ করিয়াছেন। তাই এই যুগকে রামমোহনের যুগ নাম দেওয়া যেতে পারে। শ্রীহরি রামমোহনকে ব্যবহার করিলেন। তাঁহাকে মহা পণ্ডিত করিলেন। তাঁহাকে

সকল ধর্ম্মশাস্ত্রে মহা পণ্ডিত করিয়া এবং তাঁহার মধ্যে শ্রীহরি নিজে শক্তিতা সঞ্চার করিয়া সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের গুহ্যতত্ত্ব সকল সাধারণের নিকট প্রকাশ করিলেন। সকলের মধ্যেই যে অন্তর্নিহিত ভাবে একেশ্বরবাদ রয়েছে, তাহা প্রকাশ করিয়া ধর্ম্মের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিলেন। যাহা সাময়িক ও দেশকাল-ভেদে বিভিন্ন, তাহার অন্তঃস্থলে ধর্ম্ম সকল যে এক পরব্রহ্মের নিশ্বাস হইতে উৎপন্ন হইয়া তাঁহারই পাদপদ্মে পৌঁছিবার জন্ত অনন্ত সামঞ্জস্যের পক্ষপুটে রক্ষিত হইয়া অনন্তের অভিমুখে চলিয়াছে, তাহা প্রমাণ করিবার জন্ত কেশবকে তিনি বিশেষ ভাবে ব্যবহার করেছেন। সামঞ্জস্য সকল ধর্ম্মেরই মূল ভিত্তি, এই ভিত্তি অবলম্বন করিয়াই সকল ধর্ম্মের উন্নতি হইয়াছে ও হইতেছে। ভগবান্ কেশবকে বিশেষ ভাবে ব্যবহার করিয়া, এই সামঞ্জস্যের নিয়ম যে ধর্ম্মের উন্নতির ভিত্তি, তাহা সাধারণে প্রকাশ করিলেন।

কেশব-যুগ কি আমরা দেখিতে পাইতেছি? সুদূর ভবিষ্যতে দেখিতে পাইব বলিয়া আশা করিতে পারি কি? এক্ষণ পর্য্যন্ত মনে হয় যে, উহা অনন্ত রহস্যের গর্ভে লুক্কায়িত। ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মবাণীশ্রবণ ও ব্রহ্মস্পর্শলাভ এই সকল বেদমন্ত্র পূর্ব্বকালে prophetদেরই একচেটিয়া ছিল; কিন্তু রামমোহনযুগের পর, এখানে একটী জীবনে, ওখানে একটী জীবনে, এখানে কোন ও ক্ষুদ্র সঙ্ঘে, ওখানে কোনও ক্ষুদ্র সঙ্ঘে উচ্চারিত হইতেছে ও হইবে। কিন্তু সমস্ত মানবজাতি ও সমস্ত ধর্ম্মসমাজ কোন্ সুদূর ভবিষ্যতে যে এই সকল মহামন্ত্র জীবনবেদে লিপিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাহা আমরা এক্ষণও ধারণা করিতে পারি না। এখনও পুণ্যাত্মা মহাপুরুষদের মধ্য দিয়া ব্রহ্মদর্শন প্রভৃতি লাভ করাই ধর্ম্মমণ্ডলী সকল গ্রহণ করিতেছেন। ব্রহ্ম মা যে পাপী তাপী অধম দুর্জ্জনেরও মা, তাহা ধর্ম্মমণ্ডলী গ্রহণ করিতেছেন না। তাই আমাদের এই কেশবকে শ্রদ্ধাঞ্জলিদানের সভা, যেরূপ প্রাণস্পর্শী ও জীবন্ত হওয়া উচিত ছিল, সেরূপ হইতেছে না। কেশবের যুগ এখনও সুদূর ভবিষ্যতে। যেদিন জনসাধারণ ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মবাণীশ্রবণ ও ব্রহ্ম-স্পর্শলাভের জন্ত ব্যাকুল হয়ে, মা মা বলে মায়ের কোলে উঠিতে যত্ন করিবে, মাকে বিশ্বাস করিতে শিখিবে, মা যে কেবল পুণ্যাত্মার মা হতে পারেন না, তিনি যে ছেলের পুণ্য পাপ বিচার না করে সকল সন্তানকে ক্রোড়ে নেবার জন্ত সর্ব্বদা প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন, একথা সকল ধর্ম্মমণ্ডলী যেদিন গ্রহণ করিবেন, সেদিন কেশবযুগ আরম্ভ হইবে। তবে আমরা অনেক সময় মহাপুরুষদিগকে বুঝিবার জন্ত, আমাদের যতদূর ধারণা যায়, সেখানে আনিয়া তাঁহাদের জয় গান করি। তাই কেশবযুগ, না আসিতে, কেশবের উপর শ্রদ্ধাঞ্জলিদান সম্পূর্ণ জীবন্ত হইতেছে না। তবু বলি, লীলাময় হরির লীলাদর্শনের চেষ্টাও ভাল। তাই আপনাদের সকলের হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয় মিলাইয়া "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং" এই মহা ঋক্ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ধন্ত হই।

কেশবজীবনের প্রধান দান আমার অনুভূতিতে, প্রথমতঃ হরি সকলের মা হইয়া, সকলের নিকট সমান ভাবে দেখা দিয়া, সকলকে সমানভাবে আবেষ্টন করিয়া, সকলের নিকট সমান ভাবে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করিয়া, সকলকে প্রেমকোল দিয়া, পাপী পুণ্যবান নির্ব্বিশেষে সকলের জন্ত অপেক্ষা করিতেছেন। এই বিশ্বাসভূমিতে ভাইগণ আমরা একবার দাঁড়াইতে শিখিলেই, আমাদের অনন্ত স্খলন সত্ত্বেও আমরা মায়ের কোল পাইবই পাইব। ইহার জন্ত কোনও মহাপুরুষকে মধ্যবর্ত্তী করিতে হইবে না। মাই মধ্যবর্ত্তী হইয়া সকল মহাপুরুষ ও সকল ভাইদের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিবেন। বিবেক, বৈরাগ্য, প্রেম, পুণ্য ও বিশ্বাস কোনও মহাজনের একচেটিয়া নহে। মহাজনগণ বিশেষ বিশেষ সময়ে মায়ের বিশেষ কার্য্যের জন্ত ব্যবহৃত হন বটে, কিন্তু প্রেম, পুণ্য, বিবেক, বৈরাগ্য ও বিশ্বাসের দ্বার তিনি সকল সন্তানের জন্ত সমানভাবে উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন এবং মায়ের প্রেমাদর সকলকে সমান বিতরণ করিতেছেন। তিনি পাপী বলিয়া কাহারও উপর বিমুখ নহেন।

দ্বিতীয়তঃ, ধর্ম্মসমন্বয়। সকল ধর্ম্মই সমন্বয়ের ভিত্তিতে গঠিত হইয়া উঠিয়াছে, একথা সত্য। কিন্তু কেশবের মধ্য দিয়া হরি একথা সকলের নিকট, সাধারণের নিকট ব্যক্ত করিলেন যে, এই সমন্বয় শুধু একটী এক ধর্ম্মের মধ্যে পৃথক ভাবে হইলে চলিবে না। ধর্ম্ম পরস্পরের সকলের সঙ্গে কোলাকুলি করে, পরস্পরের সঙ্গে সমন্বয় করিয়া, এক অনন্ত উন্নতিশীল মহা সমন্বয় ব্যাপার সংঘটিত হইবে।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা একটু ব্যাখ্যা করিয়া আমি শেষ করিব। আজকাল সভা সমিতিতে একটী কথার অবতারণা হয়। সেটী সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। সেই কথাটী এই, "যত মত, তত পথ"। আমরা নববিধানে বলি, অনেক মত, কিন্তু এক পথ। অর্থাৎ হরিলীলার পথ, প্রকৃত বিশ্বাসের পথ। সেই বিশ্বাসের পথ নবযুগে নববিধানে অনন্ত-গ্রহণ ও সামঞ্জস্যের পথ আবিষ্কার করেছে।

আদিকাল হইতে যত মত চলিয়া আসিতেছে এবং ভবিষ্যতে যত মত সৃষ্ট হইবে, নববিধানে প্রকৃত বিশ্বাসের নব ঋক্‌মন্ত্র—পাপী পুণ্যবান নির্ব্বিশেষে, ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মবাণীশ্রবণ ও ব্রহ্মস্পর্শ-লাভ দ্বারা সামঞ্জস্য করিয়া সকলকে আত্মস্থ করিবে ও অনন্ত অভিব্যক্তির পক্ষপুটে আরোহণ করিয়া এক সরল সোজা সামঞ্জস্যের পথ ধরিয়া অনন্তে স্থান পাইবে। আমাদের নব-বিধান এই নব আদর্শের পথ অবলম্বন করিয়া, আমাদিগকে এক অনন্তাভিমুখী গতিশীল আদর্শের সামঞ্জস্যের ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে অধিকারী করিবে।

শ্রী উমাপ্রসন্ন ঘোষ।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র—অগ্নিমন্ত্রের উপাসক

ত্রিপঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে মহাভাগ কেশবচন্দ্রের পুণ্যকর্ম্মরত জীবনের অবসান হয়। তাঁহার পূতজীবন বর্ত্তমান সময়ে আমাদের সম্মুখে পবিত্র তীর্থস্থানের মত অবস্থান করিতেছে। তিনি বাল্যকাল হইতে অমৃত-পিপাসা লইয়া অমৃতসন্ধানের পথে বিচরণ আরম্ভ করিয়াছিলেন ও ষড়্‌-বিংশতি বৎসর ধরিয়া দেশবাসীকে সত্যের পথ, আলোকের পথ, অমৃতের পথ ও সুনীতির পথ প্রদর্শনকল্পে অনন্যমনা হইয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন। যৌবনারম্ভকাল হইতে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি বৈরাগ্যব্রতধারী ভক্ত ছিলেন। ভক্তিতে তিনি সর্ব্বদা সন্তরণ করিতেন, উহা হইতে প্রেরণা লাভ করিতেন, ইহাতে তিনি কাঁদিতেন, হাঁসিতেন, নাচিতেন এবং উপদেশ দিতেন। লোকাচারপ্রচলিত আমাদের ধর্ম্ম তাঁহার ধর্ম্ম ছিল না; তিনি ঐশ্বর্য্যকে অস্বীকার করিয়া, লোকসমাজের সম্মানকে পরিহার করিয়া, পার্থিব সুখ ও সম্পদ ত্যাগ করিয়া, ক্ষুরধারনিশিত দুর্গম পথের যাত্রী হইয়া, যোগে মগ্ন থাকিয়া চিদানন্দসাগরে প্রেমানন্দের লীলা-লহরী দেখিতে দেখিতে ও ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করিতে করিতে প্রমত্তভাবে তিনি তাঁহার অধ্যাত্ম জীবনের "আশ্চর্য্যগণিত" বিদ্যা শিক্ষা দান করিয়া, দেশে মহৎ কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

ধর্ম্মাত্মা কেশবচন্দ্র "বিদ্যাসাগরযুগের" উজ্জ্বল তারকা-মণ্ডলীর মধ্যে বৃহস্পতির ন্যায় ছিলেন। এই যুগকে বঙ্গদেশের "স্বর্ণযুগ" বলা হয়। এই যুগের মাহেন্দ্রক্ষণে বিধবা-বিবাহের আন্দোলন, ইণ্ডিয়ান মিউটিনী, নীলের হাঙ্গামা, রাজনীতিচর্চ্চা ও ভারতসভা স্থাপন, দেশীয় নাট্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, বাংলা নাটক, উপন্যাস, গদ্য, কবিতা ও বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের প্রচার, তত্ত্ববোধিনী, সোমপ্রকাশ প্রভৃতি বিখ্যাত পত্রিকার অভ্যুদয়, হোমিওপ্যাথির প্রচলন, নানাস্থানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন, স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্ত্তন, ব্রাহ্মসমাজের শক্তিবৃদ্ধি, বাল্যবিবাহ-নিবারণী সভা, মদ্যপাননিবারণী সভা, সংস্কৃতশিক্ষার উপযোগী গ্রন্থাদি প্রণয়ন, "জাতীয় মেলা" নামক প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠা; স্বদেশানুরাগের উন্মেষ; এবং এই যুগের শেষভাগে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের সূচনা প্রভৃতি নানারকম দেশহিতকর ঘটনাবলী বঙ্গসমাজে নবশক্তির সঞ্চার করিয়াছিল। এই যুগসন্ধিক্ষণে সাধক ও প্রেমিক কেশবচন্দ্রের আবির্ভাবে ও প্রভাবে বঙ্গদেশের ও ভারতের অনেক স্থানে ভক্তিধর্ম্মের প্লাবন হইয়াছিল। শুভক্ষণে তিনি নবধর্ম্মের বার্ত্তা প্রচার করিলেন, তাঁহার দ্বারা সমস্ত প্রাচীন বিধান জাগ্রত হইল, সমস্ত নরনারী, সমস্ত জাতি ভেদাভেদ ভুলিয়া মহাসঙ্কীর্ত্তনে অবিরাম নাচিতে লাগিল। "নরনারী সকলের সমান অধিকার, যার আছে ভক্তি, সে পাবে মুক্তি, নাহি জাতবিচার" প্রভৃতি কথা তাঁহার মুখ হইতে প্রথম নিঃসৃত হইল। তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার অমূল্য অবদান যুগ-ধর্ম্ম সমন্বয়ের সুসংবাদ। ইহাই তাঁহার প্রবর্ত্তিত "নববিধান"। ইহার গূঢ় মন্ত্র এই যে, সাধুজীবনরূপ মহাতীর্থে গমনপূর্ব্বক তাঁহাদের চরিত্রের সহিত যোগযুক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে আত্মস্থ করা। তিনি নববিধানকে "ভারতে স্বর্গের জ্যোতি" বলিয়াছেন। সহজ সাধন দ্বারা নানা দেশের সাধু মহাজনদিগের সহিত আধ্যাত্মিক যোগ স্থাপন করা, চিন্ময় হরিকে পতিরূপে বরণ করা ও মাতৃভাবে পূজা করা, ইহলোক ও পরলোক, স্বদেশ ও বিদেশ সব একাকার ভাব, ঈশ্বরাদেশের বশবর্ত্তী হওয়া এবং মানবের সামাজিক জীবনকে ধর্ম্মসাধনের অঙ্গীভূত করা প্রভৃতি "নববিধানের" নিগূঢ় তাৎপর্য্য। কেশবচন্দ্র নববিধানের মধ্য দিয়া এই বাণী প্রচার করিয়াছেন যে, স্বদেশের ও বিদেশের সমস্ত ধর্ম্মই ঈশ্বর-প্রেরিত স্বর্গীয় বিধান; কোন ধর্ম্মমত ও বিশ্বাসের প্রতি কাহারও বিদ্বেষ ও বিরোধ থাকা উচিত নয়, সকল ধর্ম্মবিধানই সত্য ও সুন্দর, শাশ্বত ও অনন্ত। তাঁহার কথাতেই বলি, "যত সত্য পৃথিবীতে প্রচলিত আছে, পূর্ব্বে ছিল, এখনও আছে ও অনন্তকাল থাকিবে—তাহার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইলে সত্যস্বরূপ পরমাত্মার পূজা সম্পাদিত হইবে।" বর্ত্তমান যুগের ইহাই নূতন ঘোষণা।

কেশবচন্দ্র অগ্নিমন্ত্রের উপাসক ছিলেন। তাঁহার জীবন ও বাণী অগ্নিময় ছিল। তাঁহার উপাসনা ক্রমাগত উত্তাপ দান করিয়াছে। একটু ঠাণ্ডা ভাব আসিলেই তাঁহার মন অবসন্ন হইত, নিরুৎসাহ আসিয়া পড়িত। অমনি তিনি প্রার্থনা করিতেন ও পাপকে ঘুসি দেখাইতেন। ক্রমে জীবনকে সজীব করিলেন ও অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা লইয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সুরু করিলেন ও দেশবাসীকে "প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর" বলিয়া আহ্বান করিলেন। ভগবৎসমীপে চিত্ত সমাহিত করতঃ ব্যাকুলভাবে ও ভক্তিভরে প্রার্থনা করিয়া, বল, সাহস ও আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতে হইবে। আধ্যাত্মিক উত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া সত্যকে দেখা, ইহাই মানবজীবনের চিরন্তন কর্ত্তব্য। অসত্য ও অশুচি দূর করিতে হইবে। মানুষের মধ্যে যথার্থ ও পবিত্র প্রবাহ হউক, এই তাঁহার আশা ছিল। প্রার্থনার মধ্য দিয়া মানবসমাজে, ইতিহাসে, বাহ্যপ্রকৃতিতে ও নিজের হৃদয়ে ব্রহ্ম সম্ভোগ করিতে হইবে। প্রার্থনায় দুর্জ্জয় বলের সঞ্চার হইবে, ইহার দ্বারা ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতি হইবে, মানব-সমাজের শ্রীবৃদ্ধি হইবে ও পারিবারিক কল্যাণ হইবে, চরিত্র ভাল হইবে, অভাব পূরণ হইবে, সঙ্কটে ও বিপদে মানুষ সর্ব্বদা রক্ষা পাইবে। তিনি বলিলেন; "হে প্রভু; পাহি মাং নিত্যং, পাহি মাং নিত্যং" প্রার্থনায় দ্বারা আশা, উদ্যম, বুদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হইবে। মানুষকে জাগ্রত ও জীবন্ত করিবে, অগ্নিময় করিবে, সাহসী করিবে। ইহাকে হৃদয়ের ভূষণ করিতে হইবে।

পাপ, তাপ, দৈন্য থাকিবে না। মানুষ রূপান্তরিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। এই তেজস্বী পুরুষ স্বদেশে ও বিদেশে প্রচার করিয়াছেন যে, প্রার্থনা না করিলে আর রক্ষা নাই, সংসারের চিন্তাকে অন্ততঃ পাঁচমিনিট সরাইয়া দয়াময়কে ডাকিতে হইবে। তিনি করযোড়ে নতজানু হইয়া তাঁহার দেশবাসীকে নিবেদন করিয়াছেন যে, যাঁহার প্রসাদে মানুষ জীবনধারণ করিতেছে, সেই জীবনদাতাকে দৈনিক কিয়ৎক্ষণের জন্য স্মরণ করিতে হইবে। তিনি স্বয়ং ব্রহ্মদর্শন করিয়া শুদ্ধ হইয়া ভাগবতীতনু লাভ করিয়াছিলেন। তিনি এখনও অদৃশ্য লোক হইতে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "করেছ কি হেরি জন্ম সকল বিশ্বস্তর বিশেশ্বরে?" তিনি বলিয়াছেন যে, মানবজীবনের চরম লক্ষ্য যুগযুগান্তর হইতে চলিয়া আসিতেছে—"One continued growth of heavenward enterprise"—মানবজীবনের গতি ক্রমান্বয়ে ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধলোকে, যে লোকে জরা নাই, মৃত্যু নাই, চিরশান্তিদাতা সর্ব্বদা শান্তি বিধান করিতেছেন।

কেশবচন্দ্রের আর এক শিক্ষা এই, যে কোন জনহিতকর কার্য্য মানুষ করুক না কেন, তাহাকে আমিত্ব বিনাশপূর্ব্বক সরল বিশ্বাসে শ্রীচরিতে আত্মসমর্পণ করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। তবে কর্ম্মে উন্মাদনা আসিবে, কর্ম্ম করিবার শক্তি লাভ হইবে ও কর্ম্মী জয়যুক্ত হইবে। হৃদয়ের মধ্যে অগ্নি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিবে। সে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইবে না। সে অগ্নি ব্রহ্ম-অগ্নি, ব্রহ্মতেজ ও ব্রহ্মবল। এই ব্রহ্মবল আধ্যাত্মিক শক্তির উৎস। ইহা ভীষণ ব্রহ্মাস্ত্র। এই অস্ত্রে বিপদ, আপদ, প্রলোভন, দুর্নীতি, অসত্য, কপটতা, নিরুৎসাহ, শীতলতা, অজ্ঞানতা খণ্ড খণ্ড হইবে। আমিত্ব বিনাশ হইলে, যিনি সকলের চেয়ে সত্য, তাঁহাকেই সকলের চেয়ে সহজে দেখা চায়; এই সত্যকে চেনা ও দেখা মানুষের চরম সাধনা। ব্রহ্মানন্দ বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "অনেক দিন হইল, আমিরূপ পাখী এই দেহ হইতে উড়িয়া গিয়াছে, কোথায় গিয়াছে জানিনা; কিন্তু সে আর ফিরিয়া আসিবার নহে।" এই আমিত্ব উড়িয়া গিয়াছিল বলিয়াই, তিনি শিষ্যপ্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া, এই পৃথিবীকে ব্রহ্মবিদ্যালয়রূপে গ্রহণ করিয়া, নিত্য নূতন সত্য লাভ করিতে করিতে তাঁহার প্রাণকে সুশোভিত করিয়াছিলেন। তিনি জন্মশিষ্য। তাঁহার শিক্ষা আর ফুরাইল না, আকাশ, বাতাস, সমুদ্র, পর্ব্বত, নদী, পশু, পক্ষী তাঁহার গুরু হইয়াছিলেন। এইভাবে তিনি জীবনকে মনন দ্বারা পরিচালিত করিয়া, পরমার্থকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ও তাঁহাকে আশ্রয়পূর্ব্বক, অবলীলাক্রমে স্বীয় জীবনকে পরহিতে নিয়োগ করিয়া গিয়াছেন। "বিদ্যাসাগর যুগে" শ্রীকেশবের অপূর্ব্ব ভক্তিবাদ প্রচার, নীতি ও ধর্ম্মবিষয়ক পুস্তিকা প্রণয়ন, সরস বক্তৃতা, এবং বিভিন্নধর্ম্মবিধানগুলিকে বিচিত্র বর্ণের পুষ্পের ন্যায় মনে করিয়া "নববিধান" রূপ হার প্রস্তুতপূর্ব্বক, বাঙ্গলা যে সমন্বয়ের জন্য রাজা রামমোহনের সময় হইতে অপেক্ষা করিতেছিল, তাহার বিজয়নিশান উড়াইয়া জাতির নবজীবনলাভের উপায় নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন এবং তজ্জন্য বঙ্গীয় নরনারীকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। সেই যুগে তাঁহার প্রধান উপদেশ ছিল, "পরিশুদ্ধ জীবন যাপন কর, এবং জান যে, ধর্ম্মই ধর্ম্মের সার্থকতা।" "সত্যমেব জয়তে নানৃতম্"—সত্য ও সুন্দরকে জানা, দেখা ও উপলব্ধি করা ছাড়া মানবের আর অন্য উপায় নাই, অন্য পথ নাই এবং জয়ের সম্ভাবনাও নাই। সে যুগের মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ ব্যতীত আর কোন মনীষী দেশবাসীকে সকাতরে উদাত্তকণ্ঠে সত্য ও সুনীতির অনুসরণ করিতে আহ্বান করেন নাই। অদ্য ভক্ত কেশবের মধুর স্মৃতি স্মরণ করিয়া আমরা বিশ্বজননীর শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা করিতেছি যে, দেশের বর্ত্তমান সঙ্কটকালে তাঁহার ভক্তের প্রদর্শিত পথের পথিক হইয়া ও তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া, যেন তাঁহার জীবনের সমস্ত সত্য, সমস্ত মঙ্গল ও সমস্ত প্রেম আমাদের জীবনকে শুদ্ধ ও নির্ম্মল করে। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা লইবার উপযোগী যেন আমরা হই। তিনি দিব্যধাম হইতে আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

শ্রীহিমাংশুভূষণ মল্লিক।

স্বর্গীয় কৃষ্ণকুমার মিত্র

বিগত ১০ই জানুয়ারী, রবিবার, সায়াহ্নে, অযোধ্যা ব্রহ্মমন্দিরে (লক্ষ্ণৌ), স্বর্গীয় কৃষ্ণকুমার মিত্রের স্মরণার্থে বিশেষ উপাসনা হয়। স্থানীয় অনেকগুলি ব্রাহ্মমহিলা ও পুরুষ উপস্থিত ছিলেন। মিসেস সিদ্ধান্ত সুমধুর সঙ্গীতে সকলের প্রীতিভক্তি উদ্দীপ্ত করিয়াছিলেন। ডাঃ সুরেশচন্দ্র বসু উপাসনার কার্য্য করেন। নিম্নে সংক্ষেপে তাঁহার নিবেদন প্রদত্ত হইল :—

ব্রাহ্মমণ্ডলীর ভিতর আসিয়া আমরা এক বিস্তৃত পরিবারের অন্তর্গত হইয়াছি। আমরা কেবল আপন আপন ক্ষুদ্র পরিবারের অন্তর্ভূত নই। সমগ্র ব্রাহ্মমণ্ডলী আমাদের পরিবার। মণ্ডলীর প্রত্যেক নরনারীর কল্যাণকামনা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে মণ্ডলী মধ্যে যে সকল বিচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে এবং তজ্জন্য যে তীব্র বিদ্বেষ ভাব ছিল, তাহা ক্রমে মন্দীভূত হইতেছে। আমাদের মূল বিশ্বাস যে এক, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমাদের আদর্শ এবং গম্য পথও একই। একথা স্মরণ করিয়া আমাদের ভ্রাতৃভাব অবশ্য বর্দ্ধিত হইবে।

যে তেজস্বী পুরুষ এই মণ্ডলীর মধ্যে থাকিয়া এতদিন ইহার কল্যাণ সাধন করিলেন, এখন তিনি আপন কর্ম্ম শেষ করিয়া অন্তলোকে গিয়াছেন। তাঁহার নীতি, নিষ্ঠা, সত্য ও ধর্ম্মপরায়ণতা স্মরণ করিয়া আমাদের মনে বল হয়। যখনই সত্য ও ধর্ম্মের অপমান হইতেছে মনে করিতেন, তখনই সতেজে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি ধর্ম্মপথ সমর্থন করিতেন। আমি বাল্যকাল হইতে তাঁহাকে দেখিয়া আসিতেছি। যখন তিনি সিটি স্কুলে

পড়াইতেন, তখন কিছুদিন আমি তাঁহার ছাত্র ছিলাম। প্রত্যেক ছাত্রের প্রতি তিনি ভালবাসা পোষণ করিতেন এবং যাহাতে তাঁহাদের মঙ্গল হয়, সেই চেষ্টা করিতেন। ছাত্রদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চেষ্টা পাইতেন।

সেই সত্যনিষ্ঠ ধর্ম্মপরায়ণ তেজস্বী পুরুষ কৃষ্ণকুমারের পরলোকগমনে সমগ্র ব্রাহ্মমণ্ডলী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। আমাদের অগ্রজ ও নেতৃগণ যাঁহারা চলিয়া যাইতেছেন, তাঁহাদের স্থান পূর্ণ করে, এমন লোক আমাদের মধ্যে উঠিতেছেনা। এ অবস্থায় নিরাশ না হইয়া যাহাতে আমরা, ভাইবোন যাহারা এ পৃথিবীতে আছি, সকলে শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সহিত পরস্পর মিলিত হইতে পারি, এ বিষয়ে সচেষ্ট হইতে হইবে।

ঈশ্বর-কৃপায় আমরা তাঁহার বিধানমণ্ডলীতে আদৃত হইয়াছি। যাহাতে এই ধর্ম্মবিধানের আদর্শ আপন আপন জীবনে পূর্ণ হয়, সে বিষয়ে আমরা কখন শিথিলযত্ন হইতে পারি না। আমাদের মধ্যে যাঁহারা পরলোকে গিয়াছেন, নিশ্চয় তাঁহারা বিবাদ বিসম্বাদ ত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সহিত পরস্পর মিলিত হইতেছেন এবং বিধিনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছেন। অতএব আমরা ইহলোকেই থাকি, আর পরলোকেই থাকি, ঈশ্বরের নামে সকলে এক ভ্রাতৃমণ্ডলীর অন্তর্গত।

শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু।

ভক্তকণ্ঠের মধুর সুর

যুগে যুগে কত ভক্ত মধুর সুরে প্রাণারাম শ্রীহরির গুণ গান করিয়া ত্রিতাপে তাপিত নরনারীর প্রাণে শান্তি দিয়াছেন। যিনি নিত্য নব সুরে, মধুর মোহনভাবে প্রত্যেক নরনারীর নাম ধরে ডাকছেন, তাঁর সুরের ঝঙ্কার যে ভক্তের কণ্ঠবীণায় নিনাদিত হয়, তিনিই ধন্য; তাঁর কণ্ঠের সুরই প্রাণকে মোহিত করে। সেদিন একটী অতি বৃদ্ধ যষ্টিহস্তে গাহিতে গাহিতে পথ দিয়া যাইতেছেন, তাঁর সংগীতে এ অধমের চমক ভাঙ্গিল। তিনি সহাস্যবদনে গাহিতেছিলেন "নিকুঞ্জবিহারী হরি, নবঘনশ্যাম"। বৃদ্ধের সংগীতে মন প্রাণ উধাও হইল, সে সুর অন্তরাত্মাকে জাগাইল। মনে হইল, সত্যইতো, চিদানন্দময় শ্রীহরি ভক্তের হৃদয়নিকুঞ্জবনে নিত্যবিহার করিয়া, নব নবরূপে প্রাণকে পাগল করিতেছেন। এ নব যুগের নূতন হরি দেশ কালে বা কোন স্থানে আবদ্ধ নহেন, তাঁর ভক্ত প্রাণকে তিনিই আকুল করেন, তিনি কখনও হাসান, কখনও কাঁদান। তাইতো নবযুগের নবভক্ত প্রাণাধিক শ্রীব্রহ্মানন্দ বল্লেন, "আমার মাকে কি দেখেছিস তোরা বল সত্য করে; যাঁর নব নব রূপে নানারূপে মন হরে।" ভক্ত কেশবচন্দ্র মায়ের রূপ দেখে, মায়ের মধুর কথা শুনে, সত্যই পাগল হয়েছিলেন। আমরা যাই তাঁর ভিতরে প্রবেশ করি, ততই অবাক হই। মায়ের সুরে কেশব এমনই মজেছিলেন যে, মাকে বল্লেন, "মা! ঐ যে তোমার একটী সুর আছে, যাতে জীবের পরিত্রাণ হয়, ঐ সুর পৃথিবীতে ছড়াছড়ি, জীবের পরিত্রাণের সুর কাণকে জড়িত করে রেখেছে; আমার প্রাণটী একতারা, একসুর। পরিত্রাণের দুটী সুর নাই।" নবযুগের পরিত্রাণের জন্য, একদল প্রেরিত ভক্ত শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সহিত এসেছিলেন; তাঁরা ব্রহ্মানন্দের সুরেই সুর মিলাইয়া মধুর ব্রহ্মনাম, আনন্দময়ী মায়ের নাম গান করে চলে গেলেন। তাঁদের ভক্তির উচ্চতা, তাঁদের বিশ্বাস, বৈরাগ্য, ভ্রাতৃপ্রেম জগদ্বাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। এখনও সেই সুর শোনা যায়, সেই উদার ভ্রাতৃভাবের মধুরতা মাঝে মাঝে প্রাণকে উল্লসিত করে। তাই বলিতে ইচ্ছা হয়, ভাইভগ্নীগণ! আসুন, আমরা নিজেদের ভুলে গিয়ে, ঐ অগ্রগামী ভক্তদলের মধুর সুরে ভক্তবৎসলের গুণকীর্ত্তন করি। শ্রীনববিধানে কেহ বৃদ্ধ নয়, আমরা সকলেই বালক ও যুবক এবং উৎসাহী বীরের ন্যায়; পাপ অধর্ম্মের বিরুদ্ধে যেমন সংগ্রাম করিব, তেমনি আপনাদিগকে জগদ্বাসীর দাসানুদাসরূপে দাঁড় করাইয়া, সকল ভাই ভগ্নীদিগের পদানত হইয়া, ভক্তদিগের মধুর সুরে সুর মিলাইয়া, ভক্তবৎসল শ্রীহরির গুণকীর্ত্তনে নিজেরা কৃতার্থ হইব ও জগদ্বাসীকে কৃতার্থ করিব। পরিত্রাণের সুর যে একটী, তাহা শ্রীনববিধানেই পরিষ্কাররূপে ঘোষিত হইয়াছে। মা আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমরা তাঁর সুরেই গান করিয়া, তাঁর মোহন মূরতি দেখিতে দেখিতে বিমোহিত হই।

সেবক—শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়।

সপ্তাধিকশততম মাঘোৎসবের প্রস্তুতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১লা জানুয়ারী, ৬॥টায় নবদেবালয়ের সম্মুখে কীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তন করিতে করিতে দেবালয়গৃহে প্রবেশের পর, বেদীর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র সেন নবদেবালয়-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আচার্য্যদেবের প্রার্থনা পাঠ করেন। তৎপর পূর্ব্বাহ্ন ৯টায় নবদেবালয়ে উপাসনা হয়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। ধর্ম্মপিতামহ রাজর্ষি রামমোহন ও ধর্ম্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনস্মরণে আচার্য্যদেবের প্রার্থনা পঠিত হয়। নবদেবালয়ের মহিমা গৌরব-স্মরণে আচার্য্যপরিবার ও নববিধানমণ্ডলী যাহাতে উপাসনাদি-সাধনে, আচার্য্য ব্রহ্মানন্দের বড় সাধের এই নবদেবালয়ের সদ্ব্যবহার দ্বারা স্বর্গের এই বিশেষ দানের গৌরব রক্ষা করিতে পারেন, তজ্জন্য এবং সমাগত পুণ্য মাঘোৎসব উপলক্ষে প্রস্তুতি সাধন করিয়া যাহাতে মাঘোৎসব সম্ভোগ করিতে প্রস্তুত হইতে পারেন, তজ্জন্য প্রার্থনা হয়।

সন্ধ্যায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে কীর্ত্তন, পাঠ ও আলোচনা হয়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ এদিনের আচার্য্যদেবের প্রার্থনা পাঠ করেন। তৎপর ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ ধর্ম্মপিতামহ রামমোহন ও ধর্ম্মপিতা দেবেন্দ্রনাথের প্রতি মণ্ডলীর ঋণ সম্পর্কে প্রসঙ্গ করিয়া তাঁহাদের প্রতি ভক্তি কৃতজ্ঞতা দান করেন।

২রা জানুয়ারী, পূর্ব্বাহ্নে নবদেবালয়ে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে নববিধান-স্মরণে কীর্ত্তন হয় ও ঐদিনের আচার্য্যদেবকৃত প্রার্থনা পঠিত হয়। তৎপর অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ সেন নববিধানসাধনব্যাপারে জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া, দীর্ঘ সুমিষ্ট শিক্ষাপ্রদ বক্তৃতা করেন। তৎপর আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রতি ও তাঁহার সহ প্রেরিতদলের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিয়া ভাই গোপালচন্দ্র গুহ সংক্ষেপে প্রসঙ্গ করিলে, অদ্যকার কার্য্য শেষ হয়।

৩রা হইতে ১৩ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত প্রত্যেক প্রস্তুতির দিনে পূর্ব্বাহ্নে নবদেবালয়ে উপাসনা হয়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ, ভাই অখিলচন্দ্র রায় অধিকাংশ দিন উপাসনা করেন।

৬ই জানুয়ারী ভক্তিভাজন ভাই প্যারীমোহন চৌধুরীর স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক দিন পূর্ব্বাহ্নে নবদেবালয়ে ভাই অক্ষয়কুমার নন্দ উপাসনা করেন, এবং সুসমাচার-লেখা বিষয়ে আচার্য্যদেবের "সত্যলিপিবদ্ধ" প্রার্থনাটী পাঠ করেন। সেদিন ভৃত্য-সেবার দিন বলিয়া তদুপলক্ষে আচার্য্যদেবের প্রার্থনাও পাঠ করেন। রাত্রে ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটে, প্রচারকার্য্যালয়ে ভৃত্যসেবা হয়। দারোয়ান আদি প্রায় ৪০জনকে প্রীতিপূর্ব্বক আহার করান হয়।

৮ই জানুয়ারী আচার্য্যদেবের স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক দিনে পূর্ব্বাহ্নে ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন। শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র সেন "যোগ" বিষয়ে আচার্য্যদেবের প্রার্থনা পাঠ করেন। এ দিনকার এলবার্ট হলের স্মৃতিসভার বিবরণ ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে।

৪ঠা, ৫ই, ৬ই, ৭ই, ৯ই, ১১ই, ১২ই প্রতি সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে সঙ্গীত ও প্রসঙ্গাদি হইয়াছে। এবারে ব্রহ্মমন্দিরে সন্ধ্যার পর পাঠ ও আলোচনা অধিকাংশ দিনই খুব জমাট ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। এই সকল আলোচনায় ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ, অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ সেন, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ, ভাই অখিলচন্দ্র রায়, ভাই অক্ষয়কুমার নন্দ, শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র আইচ, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র দেব, শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্র দত্ত রায় প্রভৃতি যোগদান করিয়া আলোচনার কার্য্য সম্পন্ন করেন।

৩রা জানুয়ারী, মাতৃভূমির দিন সন্ধ্যায় ভাই গোপালচন্দ্র গুহ ও ১০ই জানুয়ারী, জনহিতৈষিগণের দিনে সন্ধ্যায় ভাই অখিলচন্দ্র রায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনার কার্য্য করেন।

১৩ই জানুয়ারী, সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে মহিলাদিগের প্রস্তুতির উপাসনা মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী সম্পন্ন করেন। গভীর রাত্রিকালে ব্রহ্মমন্দিরে জাগরণ উপলক্ষে প্রার্থনা ধ্যানাদি হয়।

সংবাদ।

উৎসব—নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে চট্টগ্রাম নববিধান ব্রাহ্মসমাজের ৮১তম সাম্বৎসরিক উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়।

৯ই পৌষ, ১৩৪৩, ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৩৬, বৃহস্পতিবার—"ব্রাহ্মসমাজপ্রতিষ্ঠার দিনে" প্রাতে ডাঃ শৈলেন্দ্রভূষণ দত্ত উপাসনা করেন, মধ্যাহ্নে মহিলাগণ কর্ত্তৃক পাঠ ও আলোচনা হয় এবং সন্ধ্যায় শ্রীযুক্তা প্রফুল্লকুমারী চৌধুরী উপাসনা করেন। ১০ই পৌষ, প্রত্যূষে উষাকীর্ত্তন হয়, প্রাতে শ্রীযুক্তা কুমুদিনী দাস উপাসনা করেন, মধ্যাহ্নে প্রীতিভোজন হয়; সন্ধ্যায় জানকীনাথ দাশগুপ্ত উপাসনা করেন। ১১ই পৌষ, সন্ধ্যায় শ্রীযুক্তা কুমুদিনী দাস উপাসনা করেন। ১২ই পৌষ, রবিবার, সন্ধ্যায় শান্তিবচন, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র দাস উপাসনা করেন। শ্রীযুক্তা কুমুদিনী দাস, শ্রীযুক্তা প্রফুল্লকুমারী চৌধুরী এবং শ্রীমান্ সুশান্তকুমার চৌধুরী সুমধুর সংগীত করেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কতিপয় বন্ধু উৎসাহের সহিত যোগদান করেন।

পারলৌকিক—গত ৪ঠা মাঘ, বাগনানে শ্রীমান জিতেন্দ্র কুমার হালদারের জ্যেষ্ঠা কন্যা স্বর্গীয়া মানদীর পারলৌকিক অনুষ্ঠান উৎসবের ভাবে সুগম্ভীররূপে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই অক্ষয়কুমার নন্দ উপাসনা করেন, কন্যার মাতামহ ভাই নগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি বিশেষ প্রার্থনা করেন, শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দে সংগীত করেন। পিতা কন্যার ফুটন্ত ফুলের মত সুন্দর জীবনের কথা বলিয়া প্রার্থনা করেন। কলিকাতা, বারিপদা ও বাগনানের বন্ধু-বান্ধবগণ যোগদান করেন। এই উপলক্ষে পিতা কলিকাতা নববিধান প্রচারভাণ্ডারে ২৲, এবং অন্যান্য কয়েকস্থলেও কিছু দান করিয়াছেন। স্নেহময়ী জননী তাঁহার কন্যার আত্মার কল্যাণ বিধান করুন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

শোক-সংবাদ—আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, আমাদের টাঙ্গাইলের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দে অধিকারীর জ্যেষ্ঠ সন্তান একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ মোহিতচন্দ্র ভাগলপুর জেলে, গত ৯ই জানুয়ারী, ক্ষয়রোগে ভবকারাগার হইতে মুক্ত হইয়া পরমজননীর চিরমুক্ত ক্রোড়ে চলিয়া গিয়াছেন। ভগবান্ শোকসন্তপ্ত পিতার প্রাণে ও ভগ্নীদের প্রাণে শান্তি ও সান্ত্বনা দান করুন পরলোকস্থ আত্মার কল্যাণ করুন।

সাম্বৎসরিক—১০নং নারিকেল বাগান লেনে, গত ৫ই জানুয়ারী, স্বর্গগত ভক্তিভাজন ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়ের সহধর্ম্মিণীর

স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে, জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের গৃহে উপাসনা হয়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ১লা মাঘ, কলিকাতায়, ২৫০নং নিউপার্ক ষ্ট্রীটে, ডিব্রুগড়ের সিভিল সার্জ্জন লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল জ্যোতিলাল সেনের (আই,এম,এস, এম,সি) মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই চন্দ্রমোহন দাস উপাসনা করেন।

গত ২০শে জানুয়ারী, কমলকুটীরস্থ নবদেবালয়ে, আচার্য্য ব্রহ্মানন্দদেবের মধ্যম পুত্র স্বর্গীয় নির্ম্মলচন্দ্র সেনের প্রথম সাম্বৎসরিক উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন, ডাঃ সত্যানন্দ রায় ইংরাজী, বাঙ্গলা ও সংস্কৃতে পাঠাদির কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী মৃণালিনী সেন নববিধান প্রচারভাণ্ডারে ৫৲ ও মুঙ্গের যাত্রীদের আশ্রম-নির্ম্মাণে ১০৲ টাকা দান করিয়াছেন। অনেকে যোগদান করিয়া পরলোকস্থ আত্মার প্রতি শ্রদ্ধার্পণ করিয়াছেন।

গত ২২শে জানুয়ারী, দেরাদুনে, স্বর্গীয়া সরলা মজুমদারের পুণ্যস্মৃতিতে, তাঁহার ভগ্নী শ্রীযুক্তা আমোদিনী ঘোষের গৃহে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে লক্ষ্ণৌ ব্রাহ্মসমাজে ২৲ টাকা নিবেদন করা হইয়াছে।

:—:—

STATEMENT OF ACCOUNT OF THE PROTAP CHUNDER MOZOOMDAR MEMORIAL TRUST

(From 8th March, 1928 to 31st December, 1934)

Receipts

By	Rs	Rs.	As.	P.
I. Donations ...		18,826	0	0
Contribution from Navavidhan Ashram fund through the congregation of the Bharatbarshya Brahma Mandir (Calcutta)	11426			
Mr. B. M. Das (Calcutta)	200			
Mr. B. K. Halder Bar-at-Law, (Pyinmana, Burmma)	5000			
Dr. P. K. Mazumdar late of Rangoon	1000			
Mr. P. K. Sen, Bar-at-Law, Patna	1000			
Major Joti Lal Sen, I.M.S.	100			
Mr. Benode Behari Mazumdar, Pleader (Purnea)	100			
II. Interest on Investment		1075	5	6
III. Miscellaneous		3	3	3
Total Receipts		19,904	8	9

Disbursement	Rs.	As.	P.
Payment under terms of Trust Deed to Mrs. P. C. Mozumdar	12,000	0	0
Repairs and construction	3,847	15	3
Law Charges	167	0	0
Taxes & Rent	314	6	0
Security Deposit with the Calcutta Elec. Supply Corpn. Ld. (Refundable)	25	0	0
Investment with the Bengal Prov. Co-Op. Bauk Ld. Cal. in fixed dedosit	3000	0	0
Memorial Service of late Mr. & Mrs. P. C. Mazumdar	108	11	6
Electric Charges	89	6	9
Servants' wages	100	0	0
Bank Charges	43	3	6
Miscellaneous	8	5	0
Advance not yet accounted for	25	0	0
Tatal disbursements ...	19,729	0	0
Balance at Bank with Messrs. Thomas Cook & son (Bankers) Ld. Calcutta	175	8	9
Total Rs.	19 904	8	9

Checked the above account and found correct

P. Sen Gupta
(A. S. A. A.)
Hon. Auditor

PATNA, 14-8-35
The 14th August, 1935

Passed by the Board of Trustees on 4-1-1936.

P. K. Sen
Secretary, Board of Trustees
Protap Chunder M. M. Trust
14-8-35.

Edited on behalf of the Apostolic Durber New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭২ ভাগ। ৩য় সংখ্যা। } ১লা ফাল্গুন, শনিবার, ১৩৪৩ সাল, ১৮৫৮ শক, ১০৮ ব্রাহ্মাব্দ
13th. February, 1937 } অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা

হে ধ্রুব সত্য, তুমি সত্য, তোমার বাণী সত্য, তোমা হইতে যে শিক্ষালাভ হয়, তাহাও অমোঘ সত্য। এই সৌভাগ্য আমাদের যে, আমাদের এই ক্ষুদ্র নগণ্য জীবনে তোমার যখন যে বাণী সমাগত হইয়াছে, তোমা হইতে যখন যে শিক্ষালাভ হইয়াছে, তাহার সত্যতার প্রমাণ আমাদের জীবন প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইয়াছে, এবং তোমার বাণীতে ও শিক্ষায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, এই পরীক্ষাময় জীবনপথে নিরাপদে অকুতোভয়ে অগ্রসর হইতে অভ্যস্ত হইতেছে; কিন্তু আমাদের জীবনপাঠে একথা মনে হয়, তোমার বাণীর ও তোমার শিক্ষার সাক্ষাৎ প্রমাণ আমাদের নিজ জীবনে লাভ করিয়াও, আমাদের অগ্রগামী সাধু ভক্তদিগের ন্যায়, আমরা এখনও তোমার বাণীর ও তোমা হইতে শিক্ষালাভের আদর করিতে শিখি নাই। যখন আমরা, পৃথিবীর মানুষগুরু যতই সাধু ও সত্যবাদী হউন না, তাঁহার বাণী ও তাঁহা হইতে প্রাপ্তশিক্ষা ততক্ষণ সত্য বলিয়া জীবনে গ্রহণ করিব না, যতক্ষণ তোমার আলোকে আমরা তাহা সত্য ও জীবনের প্রয়োজনীয় বলিয়া বুঝিতে না পারি, এই যখন আমাদের একমাত্র পন্থা, তখন তোমা হইতে শিক্ষালাভের জন্য অধিকতর ব্যস্ত না হইলে, তোমার বাণী-শ্রবণ জন্য অধিকতর ব্যাকুল না হইলে আমাদের আর উপায় নাই। এ পথ বাহ্যতঃ কঠিন বোধ হইলেও, ইহা আমাদের জীবনের পক্ষে পরম মঙ্গলপ্রদ; কেন না, আমরা ধর্ম্মশাস্ত্রে যত উচ্চতত্ত্বই পাঠ করি না কেন, সাধু ভক্তের মুখে যত উচ্চ কথাই শুনিনা কেন, আমাদের জীবনে তাহাদের প্রত্যেকটীর প্রয়োগ-প্রণালী তোমার আলোকে লাভ করা বাধ্যকর বলিয়া, হে দেবদুর্ল্লভ! তোমার সঙ্গে আমাদের এই ধর্ম্মজীবনপথে সদা সর্ব্বদা গতি বিধি করিতে হয়, হাবা শিশুর ন্যায় তোমার নিকট যখন তখন জিজ্ঞাসা করিতে হয়। এইরূপে, হে ত্রিভুবনেশ্বর মহান্ দেবতা! তুমি হও আমাদের এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবনের শিক্ষাগুরু দীক্ষাগুরু, জীবন-পথে পিতামাতা সহায় সম্বল সকলই। তোমার বাণী-শ্রবণ ও তোমা হইতে সাক্ষাৎ শিক্ষালাভের পথ যখন তোমাকেই সর্ব্বতোভাবে পাওয়ার পথ, তোমারই সর্ব্বতোভাবে হওয়ার পথ, তখন তোমা হইতে শিক্ষালাভের আদর করিব না? এবিষয়ে এখনও আমাদের জীবনের শিথিলতা লক্ষ করিয়া কাতরপ্রাণে ভিক্ষা করিতেছি, আমাদের জীবনে শরীরী অশরীরী সেই সকল সাধু ভক্তদের জীবনের সঙ্গ সহায়তা দান কর, যাঁহাদের দৃষ্টান্তে আমাদের

এ বিষয়ে নব নব জাগরণ উপস্থিত হয়; এবং স্বয়ং তুমি এরূপ অগ্নি আমাদের জীবনে প্রদান কর, যেন আমরা অগ্নিময় হইয়া তোমার বাণীশ্রবণপথে তোমা হইতে শিক্ষালাভের পথে নিরাপদে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে পারি।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

—•—

মাঘোৎসবের মহাশিক্ষা

পবিত্র নববিধানক্ষেত্রে বৎসরে ছোট বড় অনেকগুলি উৎসব আছে। তন্মধ্যে মাঘোৎসব সর্ব্বাপেক্ষা বড় উৎসব। সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানেই শিক্ষালাভ হয়। মাঘোৎসব সর্ব্বাপেক্ষা বড় উৎসব বলিয়া, মহা মহোৎসব বলিয়া, মাঘোৎসবের শিক্ষা বড় শিক্ষা, মহাশিক্ষা। এ শিক্ষা অন্তরের অন্তরে জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত প্রকাশের অনুভূতিতে ও তাঁহার জীবন্তবাণীর আলোকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর হইতেই লাভ হয়। জীবন্ত ঈশ্বর পিপাসু ও ব্যাকুলাত্মা ক্ষুধিতজনের অন্তরে তিনি গুরুরূপে, শিক্ষকরূপে অবতরণ করেন ও অধিকারভেদে যাহাকে যেরূপ শিক্ষা দিবার প্রয়োজন, সেই পরম গুরু সেইরূপ সত্য শিক্ষাই দান করেন। উৎসবক্ষেত্রকে, দেবমন্দিরকে তিনি বেদবিদ্যালয়ে পরিণত করিয়া, স্বর্গের অতুলনীয় শিক্ষাই দান করেন। মাঘোৎসবের প্রস্তুতির প্রথম দিন হইতে মাঘোৎসবের সর্ব্ব শেষ অনুষ্ঠানের দিন শান্তিবাচন পর্য্যন্ত, প্রত্যেক উপাসনা, প্রত্যেক পাঠ প্রসঙ্গ, সঙ্গীত কীর্ত্তন, যাহা কিছু সকলই এই সাধনক্ষেত্রে শিক্ষার আয়োজন। প্রস্তুতির প্রত্যেক দিনের ব্যবস্থা স্বর্গ হইতে আলোক আসিবার প্রমুক্ত দ্বার। সাধু ভক্ত, স্বদেশ, গৃহ পরিবার ও মানবসমাজের উচ্চস্তর হইতে নিম্নস্তরের সকলকে লইয়া কিরূপে ধর্ম্মজীবন সাধন ও যাপন করিতে হয়, প্রস্তুতির ব্যাপার বিশেষভাবে তাহা শিক্ষাদান করে।

ধর্ম্মপিতামহ রামমোহন, ধর্ম্মপিতা দেবেন্দ্রনাথের জীবন আলোচনা ও গ্রহণ উৎসবের প্রারম্ভিক প্রস্তুতির ব্যাপার। রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথের জীবন কি মহা সমন্বয়ের ধর্ম্ম নববিধানের পথে প্রস্তুতির প্রথম ও দ্বিতীয় সোপান নহে? পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্ম্মমণ্ডলীগুলি শাস্ত্রতান্ত্রিক, ধর্ম্মশাস্ত্র তাঁহাদের অভ্রান্ত অবলম্বন। তাঁহারা প্রত্যেকেই কিতাবী। ঈশ্বরের সাক্ষাৎ বাণী নহে, পরম গুরু হইতে সাক্ষাৎ দেবালোকলাভ, জীবন্ত ঈশ্বর হইতে জীবন্ত অভ্রান্ত শিক্ষালাভ তাঁহাদের ধর্ম্মজীবনপথে শিক্ষার বিষয় নহে; অভ্রান্ত শাস্ত্রানুসরণ তাঁহাদের শিক্ষার প্রণালী। রামমোহনের জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কার্য্য প্রত্যেক সম্প্রদায়ের অবলম্বিত ও মান্য শাস্ত্রকে একেশ্বরের পূজার প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া, একেশ্বরের ভূমিকে নির্ব্বিরোধ করা। তিনি হিন্দুর নিকট হিন্দুশাস্ত্র বেদোপনিষদ, খৃষ্ট সম্প্রদায়ের নিকট বাইবেল, মুসলমান সম্প্রদায়ের নিকট কোরাণকে একেশ্বরের উপাসনার অকাট্য প্রমাণরূপে অবলম্বন করিয়া, তাঁহাদের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট এবং জগতের নিকট অতীতকে সাক্ষী করিয়া, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের মহাধর্ম্ম নববিধানের ভিত্তিভূমিরূপে সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত একেশ্বরের পূজা জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলের জন্য প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এ সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত একেশ্বরবাদ কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাই নবযুগধর্ম্মে এই একেশ্বরের পূজা হইল সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ভবিষ্যতের মিলনভূমি। এই সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত একেশ্বরের পূজার অটল ভূমিতে সকলের মিলনাহ্বান ধর্ম্মপিতা রামমোহনের জীবনের অভূতপূর্ব্ব অতুলনীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি।

ধর্ম্মপিতা দেবেন্দ্রনাথ আসিলেন প্রাচীন ভারতের ঋষিযুগের বিশুদ্ধ ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দরসপানকে নবভাবে উদ্ধার করিতে; শুধু ভারতের জন্য নয়, সমস্ত পৃথিবীর জন্য। আমরা পবিত্রাত্মার শিক্ষায় বুঝিয়াছি, এই ঋষিজীবনসুলভ ব্রহ্মদর্শন যেমন বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বঙ্গ ভারতের জাতীয় ধর্ম্মজীবনের পক্ষে প্রয়োজন, তেমনই খ্রীষ্টসম্প্রদায়, মুসলমান সম্প্রদায়, বৌদ্ধ সম্প্রদায়, জানিত ও অজানিত পৃথিবীর সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় ও সমগ্র মানবমণ্ডলীর ধর্ম্মজীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন ও অপরিহার্য্য অবলম্বন। বিশুদ্ধ বিচিত্র সর্ব্বগ্রাসী ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মানুভূতি যেমন বর্ত্তমান বঙ্গভারতের ধর্ম্মজীবনের পরিপোষণ, পরিপুষ্টি ও ক্রমোন্নতির পথে অপরিহার্য্য প্রয়োজন, তেমনই বিদেশস্থ ও সমগ্র পৃথিবীস্থ সকলের ধর্ম্মজীবনের পক্ষেই প্রয়োজন। বিশুদ্ধ ঈশ্বরানুভূতি, পরমাত্মার সহিত মানবাত্মার স্বরূপাত্মক যোগই ধর্ম্মজীবনের অটুট অচল ভিত্তিভূমি। এই বিশুদ্ধ ব্রহ্মানুভূতি ও জীবাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপমূলক স্বভাবসিদ্ধ যোগ ভারতীয় ঋষিজীবনলব্ধ সর্ব্বোচ্চ গৌরবময় সম্পদ। ইহা যেমন

বর্ত্তমানে আমাদের, তেমনই পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের গ্রহণের একান্ত প্রয়োজন। তাই এই সমন্বয়ের ধর্ম্মসাধনে ধর্ম্মপিতা দেবেন্দ্রনাথের জীবনের স্থান বিশেষ স্থান এবং অপরিহার্য্য স্থান।

তৎপর প্রস্তুতির ব্যাপারে আমরা নববিধান এবং নববিধানবাহক ভক্ত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে ও তাঁহার সহযোগী প্রেরিতবর্গকে স্মরণ করিলাম এবং তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধাভক্তি দান করিলাম। দার্শনিকদিগের ঈশ্বরের অভিজ্ঞানসম্পর্কে উচ্চ সিদ্ধান্ত এই,"God is transcendent, God is immanent and God is aboslute." ঈশ্বর সর্ব্বাতীত, ঈশ্বর সর্ব্বগত ও ঈশ্বর একমাত্র নিত্য সত্তা, অপরিবর্ত্তনীয় অপরিহার্য্য ধ্রুব সত্তা। ভারতীয় ঋষি-জীবনের অভিজ্ঞান হইতে ঈশ্বর সর্ব্বাতীত ও ঈশ্বর সর্ব্বগত ইহা জানিয়াছি। ঈশ্বর নিত্য সত্য, তিনি নিজে কোন প্রকার পরিবর্ত্তনের অধীন নহেন, এবং তাঁহা হইতে যাহা কিছু আলোকলাভ হয়, তাঁহা হইতে যে কোন বাণী প্রকাশিত হয়, তাঁহার স্বরূপ ও বিভূতি যে কোন আকারে যে কোন ব্যক্তিতে, যে কোন সাধু ভক্ত মহাপুরুষে প্রকাশিত হয়, এমন কি তাঁহার স্বরূপ ও বিভূতি যে কোন ক্ষুদ্রজনে যে কোন সামান্য পরিমাণেও প্রকাশিত হয়, তাহাও ঐশ্বরিক ঐশ্বর্য্য বলিয়া স্বীকার ও গ্রহণ সকলের পক্ষে বাধাকর। এই সর্ব্বতোভাবে স্বীকার, এই সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ, ইহাই সমন্বয়ের সাধনা, ইহাই নবভক্ত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবনের বিশিষ্ট সাধনা; এই পথে সিদ্ধি ও প্রচার তাঁহার জীবনের বিশিষ্ট কীর্ত্তি। এই পথের সহকর্ম্মী, সহ প্রেরিতরূপে সহায়তা করাই ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সহ প্রেরিতদিগের কার্য্য।

পৃথিবীর অতীত এবং বর্ত্তমানের, স্বদেশের ও বিদেশের সকল সাধু ভক্ত মহাপুরুষ ও তাঁহাদের সহকর্ম্মীদিগের উপাসনার ভাবের মিলনসমষ্টিতে নববিধানের এই নব উপাসনা। পৃথিবীতে এক একটী মহাজনের প্রবর্ত্তিত ও তাঁহার অনুবর্ত্তীদের গৃহীত ও আচরিত এক একটী প্রণালীবদ্ধ উপাসনার ভাবের গভীরতা কত, সরসতা কত, সৌন্দর্য্য কত, ঐশ্বর্য্য ও উচ্চতা কত, ভাবিলে যেন কূল কিনারা পাওয়া যায় না। একবার অন্তরে আমাদের চিন্তা ও ধারণার বিষয় করিয়া দেখি, পৃথিবীস্থ স্বদেশের, বিদেশের, অতীতের, বর্ত্তমানের সকল সাধু ভক্ত মহাজন ও উপাসকদিগের জীবনের উপাসনার সমষ্টিগত ভাব লইয়া যদি আমাদের উপাসনা হয়, তাহা হইলে আমাদের উপাসনা কত বিরাট, কত বিচিত্র, কত সর্ব্বগ্রাসী, কত উচ্চ, কত গভীর, কত সরস ও সুন্দর! তাই কথা হইল, তাই গীত হইল, "নববিধানে হল রে ভাই প্রকাণ্ড ব্যাপার, এত নহে মানুষের কারবার। খুলে দিয়াছেন ব্রহ্মাণ্ডপতি অনন্ত ধনভাণ্ডার"। অনন্তের উপাসনায় অনন্ত আয়োজন। এই উপাসনা সজনেও সম্ভব হয়, নির্জ্জনেও সম্ভব হয়। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সজনে এই উপাসনা-সাধন ও উপাসনা-সম্ভোগ পরম দেবতার শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ আমাদের এই পৃথিবীর জীবনের পক্ষে। তাই ব্রহ্মমন্দিরে দিনব্যাপী উৎসবে যথাসম্ভব পরিপূর্ণ জনমণ্ডলী লইয়া যে নববিধানের এই বিরাট উপাসনা-সাধন, তাহা পৃথিবীর জীবনের পথে শ্রেষ্ঠ তপস্যা, শ্রেষ্ঠ সাধন ও শ্রেষ্ঠ সম্ভোগ।

যখন ধর্ম্মসাধনার এক একটি অঙ্গ লইয়া বৎসরের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সাধন করি এবং সাধনাদি করিয়া নববিধানের বিশেষত্ব অন্তরঙ্গ পরম গুরু পবিত্রাত্মার শিক্ষালোকে বুঝিতে পারি ও সে বিশেষত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া মাঘোৎসবের জন্য প্রস্তুত হই, তৎপর মাঘোৎসব ক্রমে সাধন ও সম্ভোগ করিতে থাকি, তখন বিরাট সমন্বয়ের ধর্ম্ম নববিধানের ঘোষণার দিনটি কত বড় দিন, কত বড় পুণ্য দিন, কত বড় আশা ও আনন্দের দিন, তাহা অন্তরে যতদূর অনুভূতির বিষয় হয়, তাহা কি আর বাক্যে তেমন প্রকাশ সম্ভবে? এবার মাঘোৎসব উপলক্ষে কিরূপ প্রস্তুতি লাভ হইল, কিরূপ উৎসব সাধন ও সম্ভোগ হইল, তাহা আমরা আমাদের এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে কতকিৎ বর্ণনা করিয়া উৎসবের শিক্ষার বিশেষ বিশেষ আভাস দান করিলাম। এই মহা মহোৎসবে কে কিভাবে অন্তরের অন্তরে স্বর্গের মহা শিক্ষা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, তাহার পুনরুন্মেষ যদি এই প্রবন্ধপাঠে কোন পাঠক পাঠিকার জীবনে সম্ভব হয়, তাহা হইলেই প্রবন্ধের সার্থকতা।

—:—

ধর্ম্মতত্ত্ব

"যে একবার মাকে দেখিয়াছে, সে পাগলের মত হইয়াছে। আমরা কাহার মুখ দেখিয়া সকল যন্ত্রণা সহ্য করিতেছি? আমরা কি প্রবঞ্চিত হইতেছি? আমরা যে পৃথিবীতে এত নির্য্যাতন সহ্য করিতেছি, কাহার বলে? এক এক দিন যখন আমাদের বুক দুঃখে বিদ্ধ হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন কাহার মুখ দেখিতে যাই? যিনি দুঃখীদের ক্রন্দন শুনেন, তাঁহারই চরণ আমাদের একমাত্র আরামস্থল। যদি দুঃখ দূর করিতে চাও, ইঁহাকে যত্ন করিয়া রাখিও, ভালবাসার আসনে ইঁহাকে রাখিও।"

(কেশব)

—

"অনেক দিন পাপের অবিশ্বাসের বিষ পান করিয়া দুঃখ পাইলে, এখন প্রেমময় ঈশ্বরের প্রেমমধু পান কর। এই মধু পান করিয়া এবার অমর এবং অজেয় হও। এমন পিতাও দেখি নাই, এমন বন্ধুও দেখি নাই। বাঁচিবার জন্যই এমন পিতার আশ্রয় পাইয়াছ, মরিবার জন্য নহে। অমর হইয়া, অজর হইয়া, দয়াল পিতার দিব্যধামে গিয়া, জননীর হাত ধরিয়া, এ জীবন থাকিতে থাকিতে স্বর্গের সুখ সম্ভোগ কর।"

(কেশব)

—•—

কেশবচন্দ্রের জীবনকথা ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ

(৮ই জানুয়ারী, শিলচর স্মৃতিসভায় পঠিত)

যে মহাপুরুষের জীবনকথা অদ্য আলোচিত হইতেছে, নারীসমাজের দিক হইতে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদনের একটী বিশেষ সার্থকতা রহিয়াছে। তাঁহার জীবনে নারীজাতির প্রতি কর্ত্তব্য-সম্পাদনের এবং নারীজাতির জীবনের চারিদিক হইতে তাহাদের প্রগতির বিঘ্ন বিদূরিত করার যে চেষ্টা দেখা যায়, তাহার সহিত অন্য কোথাও আমরা তুলনা খুঁজিয়া পাই না। এইজন্যই অদ্য বিশেষ ভাবে এই মহাপুরুষের বিশাল জীবন সম্বন্ধে আমার মত এহেন অক্ষমার ক্ষীণকণ্ঠে দু'একটা কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছি। এই দুঃসাহসের পশ্চাতে আমার পূজনীয় পিতৃদেবের আদেশ না থাকিলে, আমি অগ্রসর হইতাম না। আশা করি, আমার ত্রুটি বিচ্যুতি আপনারা ক্ষমা করিবেন।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের বহুমুখী প্রতিভার কথা প্রতি বৎসরই তাঁহার স্মৃতিসভায় কীর্ত্তিত হইয়া থাকে; কিন্তু তথাপি তাঁহার ভাবঘন জীবনের গভীরতাকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়া, পুনরায় বর্ত্তমান যুগের জনসমাজে তাহার জাগরণের যে সম্ভাবনা, তাহা যেন এখনও ভবিষ্যতের কামা বস্তু হইয়াই রহিয়াছে। কেশবচন্দ্রের মধ্যে আমাদের বাংলা দেশের সর্ব্বতোমুখী মুক্তির আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট হইয়াছিল এবং এইজন্যই ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, সাহিত্য ও সংবাদপত্রসেবা সর্ব্বত্রই কেশবের ব্যক্তিত্বের প্রভাব আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি। মুক্তিমন্ত্রী কেশবচন্দ্র মানবাত্মাকে সংস্কারের অষ্টপাশ হইতে মুক্ত করিয়া, প্রেমের বেদীতলে তাহার আপনার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

কেশবের বিভিন্নমুখী ক্রিয়াশীলতার কথা অল্প সময়ের আলোচ্য বিষয় নহে; তাঁহার জীবনের যে কোনো একটী দিক লইয়া বিশাল গ্রন্থ রচনা চলিতে পারে; তাঁহার প্রসিদ্ধ জীবনী-লেখকগণ যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষাও পরিতৃপ্তি লাভ করে নাই। আরও বলার ইচ্ছাকেও, গ্রন্থের কলেবরবৃদ্ধির ভয়ে, তাঁহাদিগকে সংযত করিতে হইয়াছে।

সম্প্রতি কেশবচন্দ্রের সাহিত্যিক প্রতিভা লইয়া বিক্রমপুরের ইতিহাস-লেখক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই বইখানির অনুকূল সমালোচনা আমরা "দৈনিক আনন্দবাজার" পত্রিকায় পাঠ করিয়াছি। অসাধারণ বাগ্মী কেশবচন্দ্র—ভক্ত ও প্রেমিক কেশবচন্দ্র তাঁহার বক্তৃতাবলী ও প্রার্থনাবলীর মধ্যে যে অনুভূতিকে স্বচ্ছন্দ স্বতঃ-স্ফূর্ত্ত, সাবলীল ভাষায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবে ও রসে বাঙ্গালার এক শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সম্পদ। কেশব সাহিত্যিক নহেন বা সাহিত্যিক দিকে তাঁহার প্রতিভা স্ফুরিত হয় নাই, একথা আমরা জানিতাম না। শুনিয়াছি, এক শ্রেণীর বাঙ্গালী পণ্ডিত নাকি এই সত্যটীকে উপেক্ষা করিয়া চলিতে চাহিতেছেন। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় এইজন্যই একখানা গ্রন্থ লিখিয়া কেশবচন্দ্রের সাহিত্যিক প্রতিভার কথা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

আচার ও সংস্কারের ঊর্দ্ধে বিশ্বের সমস্ত ধর্ম্মানুশীলনের ধারাকে স্থাপন করিয়া এক বিশ্বধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান কেশবের আকাঙ্ক্ষার বস্তু ছিল এবং এই জন্যই তাঁহার নববিধানধর্ম্মের পরিকল্পনা। এই সম্বন্ধে তাঁহার "জীবনবেদ" হইতে একটা অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলেই সকলেই লক্ষ্য করিবেন, কি ঐকান্তিক আগ্রহে, হৃদয়ের অপূর্ব্ব প্রসারতার ফলে কেশবচন্দ্র মানবের বিভেদহীন ভ্রাতৃত্বকে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। কর্ম্মে ও মর্ম্মে, আচারে ও বিচারে কেশব ছিলেন, এক পরিপূর্ণতার উপাসক। জীবন-বেদে আছে,—"পূর্ণব্রহ্ম, তোমার রাজ্যে উদার প্রেম। তোমার সন্তানেরা চান, তাঁরা পরস্পরের কাঁধে হাত দিয়া থাকেন। তোমার ন্যায়ের সঙ্গে তোমার প্রেম নৃত্য করে। তোমার যত গুণ মিলিয়া এক গুণ হয়। সমস্ত রং মিশিয়া যায়। আমি দেখিলাম, সাত রং মিলিয়া এক রং হইল। দেখিলাম, নববিধানের

কি আশ্চর্য্য শোভা! তুমি আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি পূর্ণব্রহ্মরূপ দেখি, ব্রহ্মের পূর্ণ পরিবার দেখি, পূর্ণ সৌন্দর্য্য দেখি। তাহা হইলেই সকল খেদ মিটিয়া যায়। চারিদিকে লোকের ব্যবহার দেখিয়া বড় দুঃখ হয়। কেহ কেবল পাপ করে; কেহ কেবল সুখ সুখ করিয়া বেড়ায়। কেহ ঈশাকে লইয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকেন, কেহ গৌরাঙ্গকে লইয়া উন্মত্ত হন। কেহ কর্ম্মশীল হইয়া আর সব পরিত্যাগ করিলেন কেহ বিবেক লইয়া আর সব লইলেন না। আর গুণের খণ্ড খণ্ড দেখা যায় না। দেখিতে গেলেই যেন এবার অখণ্ড দেখা যায়, এমনই কর। অখণ্ড ভাব দেখিয়াই যেন সকলের ভক্তিভাব, পুণ্যভাব উথলিয়া উঠে। সমুদয় সাধুমণ্ডলী দেখিয়া যেন প্রাণমন আনন্দিত করি। একটী, দুইটী, তিনটী দেখিয়া স্থির থাকিতে পারি না। নববিধান দিয়াছ, এখন ইচ্ছা করি, অমনি পূর্ণ হই; যাঁহারা নববিধানে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা পূর্ণ হইতে চান। আর অংশ দেখিতে চাই না; আর অংশ লইতে চাই না। ব্রহ্মের সন্তান হইয়া খণ্ড খণ্ড লইব? পূর্ণব্রহ্ম, এসো, এ হৃদয় তোমায় লইবে। আসিবে যদি, তবে পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণপ্রেম, পূর্ণ পুণ্য ও পূর্ণশান্তি লইয়া এসো। গরিবকে আর কষ্ট দিও না। দুই হাত প্রসারণ করি, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পূর্ণভাবে হৃদয়ে এসো। যে অংশ চায়, সে অংশ পায়; যে পূর্ণতা চায়, সেই যাকে পূর্ণভাবে দেখিতে পায়। সমস্ত মনুষ্যের জন্য এই প্রার্থনা করি, অংশ ধর্ম্ম যেন আর না থাকে; সমস্ত মিলিয়া এক হউক। কবে আমরা নববিধানকে বুক জুড়িয়া আলিঙ্গন করিব? সমস্ত গুণ কোটী কোটী সূর্য্যের ন্যায় হৃদয়ে প্রকাশিত হউক; দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া যাই। অনন্তে লীন হই; আর মাকে খণ্ড খণ্ড লইয়া গঙ্গাতীরে বসিয়া থাকিব না। পূর্ণব্রহ্ম, পূর্ণব্রহ্ম, পূর্ণব্রহ্ম, পূর্ণব্রহ্ম, এই শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে পূর্ণতা পাইব। পূর্ণতা না পাইলে নিস্তার দেখি না। রূপে যখন মুগ্ধ হই, তখন তুমি বল, বৎস, গুণে কেন মুগ্ধ হও না? গুণই যদি কেবল ভাবিতে থাকি, তুমি বল, ছেলে হয়ে বুঝি মায় গুণ ভাবে? রূপ দেখিতে পারিলে না? দয়াময়ি, চিরকাল এইরূপে লাঞ্ছনাই পাইলাম; বহুবার তোমার কাছে গেলাম, সুখ্যাতি আর পাইলাম না। যদি বলি, মা, তোমার গহনা বেশ, তুমি বল, কাপড় ভাল নয় কি? কাপড়ের সুখ্যাতি করিলে, তুমি বল, গহনাকে কেন অনাদর কর। মা, আমি বলিলাম, তোমার জ্ঞানগুণ কি চমৎকার! অমনি অসীম প্রেমস্বরূপ দেখাইয়া বল, প্রেম কি আমার খাট? বিবেককে আদর করিলে, তুমি বলিতে থাক, ভক্তি বুঝি কেন না? মা, আমি কি করব বল? আংশিক সাধনে আর প্রাণ তৃপ্ত হয় না। পূর্ণতা কিসে পাইব, বলিয়া দাও। অংশ লইয়া যাহারা সন্তুষ্ট, আমাদিগের ন্যায় তাহাদিগকে কাঁদাও। পূর্ণ বৈকুণ্ঠ কোথায়, আমাদিগের সকলকে বলিয়া দাও। দয়াসিন্ধু পরমেশ্বর, দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, পূর্ণধর্ম্ম লইয়া যা কিছু অভাব, যেন দূর করি; পূর্ণ পবিত্রতার আনন্দে যেন মগ্ন হই। মা দয়াময়ি, অনুগ্রহ করিয়া তুমি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।"

উদ্ধৃত অংশটী একটু দীর্ঘ হইয়া গেল; কিন্তু প্রলোভন আমি সংবরণ করিতে পারিলাম না। এই উচ্ছ্বসিত স্বচ্ছন্দ-প্রকাশিত বাক্যে কেশবের অন্তরের গভীর অনুভূতি রূপায়িত হইয়াছে। কেশবের ধর্ম্ম যে সংকীর্ণ জাতীয়তার ঊর্দ্ধে, তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হই। কেশব সকল ধর্ম্মে আচারের দিকের বিচ্ছিন্নতাকে সংযোজিত করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি মানুষের প্রাণের অতল গভীরতায় ডুবিয়া গিয়া, বিভেদ ও বিচ্ছেদহীন ধর্ম্মবোধ লইয়া জাগিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন কেশবের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী, কেশবের প্রতি ছিল তাঁহার স্নেহ অগাধ; তথাপি দু'য়ের মধ্যে অনুসৃত পন্থায় বিভিন্নতাও ছিল যথেষ্ট। কেশব শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় সমন্বয়বাদী ছিলেন সত্য, তবে সমন্বয়কে তিনি স্বীকার করিলেও, "যত মত তত পথ"কে ভিত্তি করিয়া কেশব "বহু ধর্ম্মসৃষ্টির" পক্ষপাতী ছিলেন না। এইজন্যই কেশবের নববিধানধর্ম্মের পরিকল্পনা ও প্রচার। কেশবের নববিধান সকল ধর্ম্মের বৃহত্তম ভাব, যাহাকে অঙ্কশাস্ত্রে বলে গ, স', গু,—গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক এবং রামকৃষ্ণের "যত মত তত পথ" কতকটা গণিতশাস্ত্রের লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতকের মত।

কেশব ধর্ম্মের সারকে মানিতেন এবং খোলসকে নির্ম্মমভাবে আঘাত ও অস্বীকার করিতেন। ইহাতে কেশব সামাজিক জীবনে হইয়া উঠেন—একজন আমূল সংস্কারক। মিথ্যার সঙ্গে আপোষ করিয়া চলার লোক কেশবচন্দ্র ছিলেন না। কেশব তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সকল প্রকার সামাজিক কুসংস্কার ও সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি যাহা একবার অন্যায় বলিয়া বুঝিয়াছেন, তাহা বিদূরিত বা অতিক্রম করিতে সহস্র বাধা ও শত্রুতাকে তুচ্ছ করিয়া চলিতেন। অবরোধ অগ্রাহ্য করিয়া সস্ত্রীক কি ভাবে তিনি মহর্ষির বাড়ীতে চলিয়া গিয়াছিলেন, সেই ঘটনাটী উল্লেখযোগ্য। ১৩১৬ সালে ভাদ্র সংখ্যা "ভারতমহিলা" পত্রে ৺অমৃতলাল গুপ্ত মহাশয় "স্ত্রী-জাতির উন্নতি ও কেশবচন্দ্র" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ লিখেন। এই প্রবন্ধে লিখিত আছে,—"১লা বৈশাখ তিনি কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য্যপদে বৃত হইবেন, তদুপলক্ষে মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথের বাড়ীতে ব্রহ্মোপাসনা হইবে। কেশবচন্দ্র সস্ত্রীক এই উপাসনায় যোগদান করিবার সংকল্প করিলেন। কিন্তু কেশব-চন্দ্রের অভিভাবক এই সংকল্পের কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি বলিলেন,—'কি এত বড় স্পর্দ্ধা! কলুটোলার সেন পরিবারের কুলবধূ লজ্জাহীনা নারীর ন্যায় ঘরের বাহির হইবে—স্বামীর সঙ্গে ঠাকুর বাড়ীতে যাইবে? তাহা তো কিছুতেই হইতে পারে না।' তাঁহার যে কথা, সেই কাজ। কেশবচন্দ্র

স্ত্রীকে লইয়া বাড়ীর বাহির যাইতে না পারেন, ঐ জন্য হিন্দুস্থানী দরোয়ান নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু কে কেশবচন্দ্রকে সংকল্প-চ্যুত করিবে? কেশবচন্দ্র তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া গৃহের বাহিরে আসিলেন; তাঁহার স্ত্রী লজ্জায় আকুল হইয়া স্বামীর সঙ্গে চলিতে লাগিলেন। এই অভিনব দৃশ্য দেখিয়া পুরমহিলাগণ বধূকে বলিতে লাগিলেন,—'ওগো, ভদ্রলোকের মেয়ে, তুমি কি রকম? তোমার লজ্জা সরম কিছু নাই কি? তুমি কোথায় যাচ্ছ?' এই কথা শুনিয়া তরুণবয়স্কা বধূ লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইলেন; তাঁহার আর পা চলিল না। কেশবচন্দ্র পত্নীর এইভাব লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—'তুমি যদি আমার সঙ্গিনী হইতে চাও, তবে এই সময় আমার অনুসরণ কর; নচেৎ আমি বিদায় গ্রহণ করিতেছি।' বধূ অল্পবয়স্কা হইলেও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ স্বামীর মহত্ত্ব বুঝিতে পারিতেন। তিনি পুরমহিলাদিগের কথায় কর্ণপাত না করিয়া স্বামীর সঙ্গে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের গৃহে গমন করিলেন।" নিজের পরিবার পরিজনের মতের বিরুদ্ধে—শুধু মতের বিরুদ্ধে নয়, প্রদত্ত বাধা অতিক্রম করিয়া অবরোধ-প্রথার বন্ধনপাশ হইতে মুক্তিলাভ করার এই চেষ্টার মধ্যে যে কতখানি নৈতিক বল রহিয়াছে, তাহা হয়তঃ আমরা এ'যুগে উপলব্ধি করিতে পারিব না। আমি অদ্য আপনাদের সাক্ষাৎ নিঃসংকোচে দাঁড়াইয়া আমার বক্তব্য বলিতে পারিতেছি, ইহাতে আমার আত্মীয় স্বজনের কোনো অমত তো নাই-ই, বরং সম্মতি রহিয়াছে। আপনাদের নিকটও ইহা বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নহে। কিন্তু কেশবের যুগে তাহা ছিল না। কুসুমাদপি কোমল এই মানুষী সত্যের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠার জন্য কিভাবে বজ্রাদপি কঠোর হইতে পারিতেন, তাহা আমরা এই স্থানে পাইতেছি।

সামাজিক জীবনে নারীজাতির দুর্গতি কেশব গভীর বেদনার সহিত অনুভব করিতেন এবং নারীর উন্নতির জন্য বিবিধ কর্ম্ম-প্রচেষ্টা কেশবের ঘটনা-বহুল জীবনের একটী বিশিষ্ট অংশ অধিকার করিয়া রহিয়াছে। "ব্রাহ্মিকাদিগের প্রতি উপদেশ" কেশবচন্দ্রের একখানা সুলিখিত গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত মতিলাল দাশের "কেশব-কাহিনী" হইতে উদ্ধৃত করিতেছি:—"শ্রীকেশব নারী-জাতির মুক্তির জন্য শুধু উপদেশ দান করিয়া, কিম্বা ঈশ্বরের চরণে প্রাণের প্রার্থনা জানাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই; তাহাদের চরিত্র যাহাতে নববিধানের নবজীবনপ্রদ নির্ম্মল বাতাস ও আলো পাইয়া অন্তর্মুখীন ও বহির্মুখীন ভাবে পূর্ণবিকশিত হয়, সেইজন্য নানাপ্রকারের ব্যবস্থাও করিয়াছেন। যথা, 'নারীবিদ্যালয়', 'মহিলাদের জন্য নর্ম্মালস্কুল', 'বামাহিতৈষিণী সভা', 'ব্রাহ্মিকা-সমাজ', 'আর্য্যনারীসমাজ', ভিক্টোরিয়া ইন্‌ষ্টিটিউট" প্রভৃতি স্থাপন এবং 'পরিচারিকা', 'মহিলা' ইত্যাদি পত্রিকা প্রকাশ।"

(ক্রমশঃ)

মালতীশ্যাম।

বারই মাঘ

সারা ভারতের, বিশেষ ক'রে বঙ্গদেশের বর্ত্তমান ও সর্ব্বাঙ্গীন সর্ব্বতোমুখী উন্নতির মূলে রয়েছে রাজা রামমোহনের জীবনের আধ্যাত্মিকতা। তাঁর জীবনের এই আধ্যাত্মিকতা ছিল বলেই, তিনি উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী, তথা ভারতবাসীর মনের হীন অবস্থা ও সামাজিক জীবনের দুর্দ্দশার মাঝেও, বৃহত্তর জীবনের একটি সন্ধান দিয়েছিলেন। আর সেই সন্ধানের পথে বৃহত্তম প্রচেষ্টা হোলো ভারতবর্ষীয় সাধনা এবং ব্রহ্মোপাসনাকে মণ্ডলী-গত ভাবে পুনঃ প্রতিষ্ঠা। তাই না ১১ই মাঘ সকলের আদরের দিন। আর সেই সাধনা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশব-চন্দ্রকে কেন্দ্র ক'রে কত সাধকমণ্ডলীর সার্থক সাধনায় পর্য্যবসিত হ'ল। বিশেষ করে মণ্ডলীগত সাধনায় ব্রহ্মানন্দদলের সাধনা অধ্যাত্ম-জগতের এক অপূর্ব্ব অবদান।

শ্রীকেশবের আধ্যাত্মিক জীবনের পরিণত অবস্থায়, সকল ধর্ম্ম, সকল শাস্ত্র ও সকল মহাপুরুষকে জীবনের রক্তমাংসের ন্যায় গ্রহণ করে, সার্ব্বজনীন ও মহাসমন্বয়ের যে মধুর আস্বাদ তিনি পেলেন, তা জগজ্জনকে আস্বাদন করাবার জন্যে কত আকিঞ্চন করলেন। তাই না আবার ১১ই মাঘের পর ১২ই মাঘ আমরা পেলাম। এই ১২ই মাঘে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র তাঁর অধ্যাত্ম-জীবনের চরম ফল জগজ্জনকে বিতরণ করলেন "নববিধান ঘোষণা" করে। পৃথিবীর সকল জাতির অধ্যাত্মসাধনার স্বাধীনতা যে মহাসমন্বয়ের ভিতর, তা ঘোষিত হ'ল এই ১২ই মাঘ; আর তা যতই আমরা উপলব্ধি ক'রব, ততই দেখব যে, সকল জাতির জাতীয় স্বাধীনতা এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে আছে, আর এর ভেতর দিয়েই সে পথ সহজ, সরল, মুক্ত হবে। বঙ্গদেশের কি সৌভাগ্য! এই ঘোষণা হ'ল কলিকাতায়, তাই না এই স্থান শুধু বিজ্ঞানজননীর লালিতপালিত সুখস্বাচ্ছন্দপূর্ণ মহানগরী নয়—"মহাতীর্থ"।

১১ই মাঘে ভারতবর্ষীয় অপৌত্তলিক সাধনাকে মণ্ডলীগত ভাবে ব্রাহ্মসমাজ-প্রতিষ্ঠার ভেতরে ফিরে পেলাম। ১২ই মাঘে পৃথিবীর পূর্ব্বাপর সকল আধ্যাত্মিকতা, সকল শাস্ত্র, সকল মহাপুরুষকে আমার নিজের বলে চিনলাম। শুধু চিনলাম তা নয়, জীবনে গ্রহণ করবার উত্তরাধিকারী হলাম। তাই মহোৎসব কি আমাদের কাছে শুধু একটা বাইরের পর্ব্ব হবে? যে আধ্যাত্মিকতার সন্ধান (spiritual quest) ১১ই মাঘে আরম্ভ হয়ে, কত অপূর্ব্ব সাধনা-পরম্পরার ভিতর দিয়ে ১২ই মাঘ আমাদের কাছে এল, তা যদি আমাদের প্রাণে জাগ্রত না হয় এই উৎসবের ভিতরে, তবে আমাদের আত্মিক দৈন্য তো ঘুচলো না একটুও। আর এই দৈন্য না ঘুচলে, বিধাতার এই অপরূপ সৃষ্টি মানবজীবন লাভ করেও কিছুই তো হ'ল না। আর জাগ্রত হ'লে এই আধ্যাত্মিক সন্ধান (spiritual quest),

এক প্রেমের (romantic) রাজ্য আমাদের কাছে খুলে দেবে।

এই যদি না হয়, তো মহোৎসব ঈদ, দুর্গোৎসব, বড়দিনের চেয়ে বড় হবে কিসে?

রমণা, ঢাকা।
১২ই মাঘ, ১৩৪৩।
শ্রীপুর্ণেন্দ্রনাথ মজুমদার

অভিভাষণ

(টাঙ্গাইলে পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসম্মিলনীর ষট্‌চত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি আচার্য্য সার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অভিভাষণের অংশবিশেষ)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যাঁহারা মনে করেন যে, ব্রাহ্মসমাজের কাজ হিন্দুসমাজ অনেক গ্রহণ করিয়াছে, এইবার তাঁহারা পাততাড়ী গুটাইতে পারেন, তাঁহাদিগকে বলি যে, তাঁহাদিগের একেবারে দৃষ্টিবিভ্রম এবং মতিবিভ্রম উপস্থিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মসমাজের বাহিরের আবরণ, খোসাভুষি, আঁঠি,—ইহার চাল চলন, পোষাক পরিচ্ছদ, হাব ভাব, এ সব একেবারেই বাহ্যিক, এ না নিলেও ক্ষতি নাই এবং নিলেও আসল জিনিষের এতটুকুও বাড়ে না। প্রকৃত মানুষ এবং প্রকৃত ব্রাহ্মের বিচার তাহার পোষাক পরিচ্ছদ এবং বাহিরের জলুসের জন্য নহে—তাহার অন্তরাত্মার এবং ভিতরকার মানুষটীর সত্য পরিচয়ের উপরেই তাহার যথার্থ আদর, অনাদর নির্ভর করে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শকে মনে এবং প্রাণে প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে, এবং তাহার সাধনায় অগ্রসর হইতে থাকিলে, বাহিরের এই সকল রূপ-সজ্জা এবং আবরণ আপনি আপনিই ফুটিয়া উঠে। তখন তাহা আর ধার করা জিনিষের মত অনুকরণ করিয়া পরিতে হয় না।

"বিজ্ঞানসারথির্যস্তু, মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি, তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং॥"

বিজ্ঞান যাঁহার সারথি, এবং মনোরূপ রজ্জু যাঁহার বশীভূত, তিনিই সংসার পার, সংসার অতীত, সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মের পরম স্থান প্রাপ্ত হন। জ্ঞান, প্রেম এবং ভক্তিকে বনিয়াদ করিয়া, বিশ্বাস, বৈরাগ্য এবং সেবার অনুশীলনের দ্বারা যিনি আপনার জীবনকে পুণ্য এবং পবিত্রতায় মণ্ডিত করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার আর বাহিরের পোষাকের দরকার হয় না। আর যাহাদের বাহিরের আবরণই একমাত্র সম্বল, ভিতরে কিছু নাই, তাহাদের পাওয়া ঠিক গেরুয়ার আলখেল্লা পরা বৈরাগীর ভিক্ষা মাগিয়া বেড়ানোর ন্যায়। বৈরাগ্যের প্রতীকস্বরূপ যে গেরুয়ার আলখেল্লা পরিয়াছে, তাহার আবার ভিক্ষার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘোরা কেন? এ ঠিক যেন—

মন না রঙ্গায়ে কি ভুল করিয়ে
কাপড় রঙ্গাল যোগী,
মন্দিরতলে আসন পাতিল
শিলাপুজনের লাগি।
দুর্গম বনে গিরিশিরে,
বহুক্লেশে মরিল সে ফিরে;
কৃচ্ছ্রে তাঁরে নাহি মিলে
বলে দেবে কোন্ অনুরাগি!

ধর্ম্মের আদর্শ দূরে থাকুক, ব্রাহ্মসমাজের উচ্চাদর্শগুলির মধ্যে যাহা জাতি গঠন এবং মানুষ গড়িবার প্রধান উপাদান, তাহাও হিন্দুসমাজ গ্রহণ করে নাই; যদি করিত, তবে আজ Communal awardএর প্রশ্নই উঠিত না এবং Depressed classএর স্বার্থ-রক্ষার অজুহাত সৃষ্টি করিয়া বিরাট হিন্দুসমাজের মধ্যে ভাঙ্গন ঢুকাইবার সুযোগও জুটিত না।

গান্ধীজির জন্মেরও বহুপূর্ব্বে, শতবৎসর আগে, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এবং ব্রাহ্মসমাজ এ দেশের অবজ্ঞাত, উপেক্ষিত এবং অবনত সম্প্রদায়ের লোকদিগকে টানিয়া তুলিয়া মানুষ করিবার জন্য, জাতিভেদ ও বর্ণভেদ-প্রথার বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছিলেন। আজ হিন্দুসমাজ হরিজন আন্দোলনে যেরূপে সাড়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন, এক শতাব্দী না হউক, অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও যদি ব্রাহ্মসমাজের এই আদর্শ তাঁহারা গ্রহণ করিতেন, তবে আজ Communal award-এর এই প্রশ্নই উঠিত না এবং দেশেরও আজ এই দুরবস্থা থাকিত না।

আজ হিন্দুসমাজ পৌর এবং রাষ্ট্র সভায় নারীকে সমান অধিকার দিতে ব্যস্ত হইয়াছেন এবং বিগত গান্ধী আন্দোলনে হাজার হাজার নারী পুরুষের পাশে দাঁড়াইয়া স্বেচ্ছায় কারাবরণ এবং নানাবিধ নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছেন। কিন্তু বিগত অর্দ্ধ-শতাব্দী ধরিয়া ব্রাহ্মসমাজ দেশের সর্ব্বত্র এই বাণী প্রচার করিয়াছেন,—

'নরনারী সকলের সমান অধিকার,
যার আছে ভক্তি, পাবে মুক্তি, নাই জাতবিচার।'

হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মসমাজের এই আদর্শের বিরুদ্ধেও প্রাণপণ সংগ্রাম করিয়াছিলেন। তাহা না হইলে এই একশত বৎসরে নারীজাতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশ নূতন রূপ গ্রহণ করিত।

জাতিভেদ, শ্রেণীভেদ এবং বর্ণভেদ রূপ মহাপাপ যতদিন হিন্দুসমাজকে জর্জ্জরিত করিবে, এবং মানুষে মানুষের মধ্যে নানা রূপ বিধি-নিষেধ ও গণ্ডী টানিয়া কেবল দ্বন্দ্ব কোলাহল ও ভেদ-বুদ্ধির বিষ ছড়াইতে থাকিবে, ততদিন এ জাতির মুক্তির আশা এবং স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখা বিড়ম্বনা মাত্র।

জাতিভেদের বিষময় ফল উপলব্ধি করিয়া কবি তাই আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন,—

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান॥

* * *

বিধাতার রুদ্ররোষে দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে
ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান॥

যারে তুমি নীচে ফেল, সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে,
পশ্চাতে রেখেছ যারে, সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।
অজ্ঞানের অন্ধকারে, আড়ালে ঢাকিছ যারে,
তোমার মঙ্গল ঢাকি, গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান॥

* * *

শতেক শতাব্দী ধরে নামে শিরে অসম্মান ভার,
মানুষের নারায়ণে তবুও করনা নমস্কার!
তবু নত করি আঁখি, দেখিবারে পাও নাকি,
নেমেছে ধূলার তলে হীন পতিতের ভগবান,
অপমানে হতে হবে সেথা, তোরে সবার সমান॥

ভগবানের সত্তা খুঁজিতে যাইয়া বিশ্বকবি তাঁহাকে এই সকল ধুলিধূসরিত অবনত জাতির মধ্যে ধূলা কাদা মাখা অবস্থায় দেখিয়া চম্‌কিয়া গিয়াছেন। দীন-দুঃখীর উপর অত্যাচারী রাজার প্রতি কষাঘাত যেমন ভক্তের ভগবানের পৃষ্ঠে রক্তরঞ্জিত চাবুকের রেখা অঙ্কিত করিয়াছিল, তেমনি উচ্চবর্ণের হিন্দুদিগের হস্তে অবনত জাতির এই লাঞ্ছনার সহিত ভগবান্ নিজেকে লাঞ্ছিত করিয়া তাহাদের চক্ষুদান করিবার চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া কবি গাহিয়াছেন,

অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে,
কাহারে তুই পূজিস সঙ্গোপনে?
নয়ন মেলে দেখ্ দেখি তুই চেয়ে
দেবতা নাই ঘরে॥
তিনি গেছেন যেথায় মাটী ভেঙ্গে
ক'রছে চাষা চাষ,
পাথর ভেঙ্গে কাটছে যেথায় পথ,
খাটছে বার মাস।
রৌদ্র জলে আছেন সবার সাথে,
ধূলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে,
তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি
আয়রে ধূলার পরে॥
নয়ন মেলে দেখ্ দেখি তুই চেয়ে
তোর দেবতা নাই ঘরে॥

এমনি করিয়া আমরা ভারতের কোটী কোটী নরনারীকে যুগযুগান্ত ধরিয়া দলিয়া পিষিয়া রাখিয়াছি। আজ তোমার স্বরাজ ও স্বাধীনতার সংগ্রামে সাড়া দিবে কে?—আগে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করিয়া তবে এই সকল সংস্কারে হাত দিবেন বলিয়া যাঁহারা কোমর বাঁধিতেছেন, তাঁহারা বহুবার আত্মপ্রতারিত হইয়াছেন এবং যতবার এইরূপ ছিন্নমূল গাছের গোড়া না বাঁধিয়া আগায় জল দিয়া তাহাকে চাঙ্গা করিয়া তুলিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিবেন, ততবারই সব পণ্ডশ্রম হইয়া যাইবে।

আগে মানুষ চাই, তবে ত ঈপ্সিত লাভের জন্য সংগ্রাম করিবার সৈন্য পাইবে। কবি তাই আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন,—

হে মোর জননি!
সাত কোটী বাঙ্গালীরে
রেখেছ কাঙ্গালী ক'রে
মানুষ কর নি!

এস, কে আছ হৃদয়বান! কে আছ প্রেমিক! কে আছ কর্ম্মী! কে আছ বীর! উহাদিগকে উঠাও, তোল, মানুষ কর। প্রেমামৃতধারায় সহস্র সহস্র বৎসরের জাতিগত বিদ্বেষবহ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া দাও। দরিদ্রের পর্ণকুটীরে, পাঠশালার বাণীমণ্ডপে, রাখালের গোচারণ মাঠে, হাটে, বাটে, ঘাটে, বাজারে, বন্দরে, পল্লীবাসীর গৃহে গৃহে ব্রাহ্মধর্ম্মের এই মৃত-সঞ্জীবনী বার্ত্তা লইয়া যাও, আর বল, তোমাদের মহানিশার অবসান হইয়াছে!

ব্রাহ্মসমাজের বাণী যদি যুগোপযোগী হয় এবং ইহা যদি মানবজাতির মুক্তির বাণী হয়, তবে আজ হউক, কাল হউক, ইহা মানুষের প্রাণে বিপ্লব উপস্থিত করিবেই—হিন্দুতে মুসলমানে, হিন্দুতে হিন্দুতে এবং জাতিতে জাতিতে, যদুবংশ-ধ্বংসের ন্যায় যেরূপ আত্মঘাতী মহা-মৃত্যুর বিষাণ বাজিয়া উঠিয়াছে এবং দিকে দিকে এই বিদ্বেষবহ্নির ধূমায়মান শিখা লোলজিহ্বা বিস্তার করতঃ যেভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, এবং ভারতের পশ্চিম ঘাটে আরব সমুদ্রের তীরে যে কালবৈশাখীর ঝড় উঠিয়াছে, তাহাতে নিঃসংশয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারি যে, ব্রাহ্মসমাজের এই আদর্শ,—

"এক জাতি, এক ভগবান,
এক দেশ, এক মন প্রাণ!"

সপ্তাধিকশততম মাঘোৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১লা মাঘ, ১৪ই জানুয়ারী, পূর্ব্বাহ্নে নবদেবালয়ে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য্য করেন। ভাই অখিলচন্দ্র রায় সঙ্গীত করেন ও প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে আরতি হয়। "মা আনন্দময়ীর শ্রীমন্দিরে" কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করা হয়। তৎপর আরতির সঙ্গীত গীত হয়। বিধানমুরলী শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কীর্ত্তন ও সঙ্গীতের নেতৃত্ব করেন। আরতির সঙ্গীতান্তে ভাই অক্ষয়কুমার লধ আরতির প্রার্থনাটী ভাবের সহিত উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করেন। তৎপর "তোমার আরতি করে নিখিলভুবন" এই সঙ্গীত গীত হইলে এ দিনের কার্য্য শেষ হয়।

২রা মাঘ, পূর্ব্বাহ্নে নবদেবালয়ে উপাসনা ভাই গোপালচন্দ্র গুহ নির্ব্বাহ করেন। সন্ধ্যায় কমলকুটীরস্থ নবদেবালয়ে মহিলাদিগের দ্বারা নিশান-বরণ হয়। মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী বরণে নেতৃত্ব করেন।

৩রা মাঘ, পূর্ব্বাহ্নে নবদেবালয়ে ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনার কার্য্য করেন। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে হিন্দিতে উপাসনা শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্রনাথ রায় নির্ব্বাহ করেন। তাঁহা হইতে এ বেলার উপাসনার বিবরণ পাইলে প্রকাশিত হইতে পারিবে।

৪ঠা মাঘ, পূর্ব্বাহ্নে নবদেবালয়ে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য্য করেন। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে ডাক্তার সত্যানন্দ রায় উপাসনার কার্য্য করেন। মাঘোৎসবের বিষয় ধরিয়া উপদেশ দেন।

৫ই মাঘ, পূর্ব্বাহ্নে, নবদেবালয়ে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে বক্তৃতা হয়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ প্রার্থনা করিয়া প্রথমে বলেন। তিনি উপস্থিত যুবকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন, ইউরোপ ও আমেরিকা এই দুইটী শিক্ষায় ও সভ্যতায় গৌরবান্বিত দেশ এবং আমাদের দেশের যুবকদিগের উচ্চশিক্ষালাভের স্থান। সেখানকার ধর্ম্মবিহীন শিক্ষা ও সভ্যতা সে দেশের পক্ষে মহা অনিষ্টের কারণ হইয়াছে। পশ্চিমে ধনজনের আধিপত্য ও বিদ্যার গৌরব। ধর্ম্মের সঙ্গে যোগ না থাকিলে বিদ্যা হয় বিবাদের কারণ, এবং ধন হয় অহঙ্কারের কারণ। আমাদের দেশের প্রাচীন কথা "বিদ্যা বিবাদায়, ধন মদায়," যদি বিদ্যা ও ধনের সঙ্গে ধর্ম্মের যোগ না থাকে। ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি জ্ঞানবিজ্ঞান-প্রধান ভূখণ্ডে দেখিতে পাই, সে সকল দেশে জ্ঞান বিজ্ঞানকে উপায়রূপে গ্রহণ করিয়া, একদেশ অন্যদেশের সঙ্গে সাম্রাজ্য ও আধিপত্য লইয়া ঝগড়া করিতেছেন। বিজ্ঞানকে সাংঘাতিক অস্ত্রে পরিণত করিয়া তাঁহারা ধ্বংসলীলার উচ্চ পরিণতি প্রদর্শন করিতেছেন। সে সকল মানবসমাজে বাহ্য সভ্যতার চাক্‌চিক্য আছে, কিন্তু তাঁহাদের অন্তর্জ্জগতে কেবল হিংসা, দ্বেষ, অশান্তি, উদ্বেগের তাণ্ডবলীলা। বাহ্য সভ্যতার আবিষ্কারের অন্তরালে বিরাট অসভ্যতারই চরম অভিব্যক্তি। কথা এই, এই সকল দেশ ধর্ম্মহীন শিক্ষা ও সভ্যতার জীবনে অনাত্ম, অনিত্য পৃথিবীর ধন ঐশ্বর্য্য, রাজ্য সম্পদ লইয়া ব্যস্ত। আর আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাস ও বর্ত্তমান ইতিহাস কি সাক্ষ্য দান করে? প্রাচীন ইতিহাস প্রমাণ করে, এদেশ ছিল ধর্ম্মপ্রাণ; এদেশের প্রাচীন কালের শিক্ষা সভ্যতায় অলঙ্কৃত যাঁহারা, তাঁহারা আমাদের ভারতের ঋষিকুল। তাঁহারা আপনাদের জীবনে, গৃহ পরিবারে ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছিলেন, ধর্ম্মের জন্য তাঁহাদের ত্যাগের অবধি ছিল না, তাঁহাদের দৃষ্টান্তে সমস্ত প্রাচীন আর্য্যসমাজ পরিচালিত হইত। বর্ত্তমানে স্বদেশ বিদেশের দার্শনিকগণ মানবের উচ্চ নিয়তি সম্পর্কে কোন্ মীমাংসায় উপস্থিত হইয়াছেন? তাঁহাদের মীমাংসা এই, মানবের উচ্চ নিয়তি পূর্ণতালাভ (Perfection)। শ্রীঈশাও বলিয়াছেন, "Be perfect as your Father is perfect." এই পূর্ণতা শারীরিক জীবনের উচ্চ পরিপুষ্টিতে কিম্বা বাহিরের বিদ্যাবুদ্ধিগত মানসিক উচ্চ পরিপুষ্টিতে হয় না। কেন না, শারীরিক জীবনে পরিপুষ্টি সীমাবদ্ধ, পার্থিব বাহ্য শিক্ষা সভ্যতা লইয়া মানসিক জীবনের গতিও সীমাবদ্ধ; মানবাত্মার মধ্যে পরমাত্মার বিকাশ প্রকাশে মানবাত্মার যে উচ্চ পরিপুষ্টি, তাহাতেই মানবের উচ্চ নিয়তির পূর্ণতা। ঈশ্বরই পরম পূর্ণ। তাঁহার সঙ্গে যোগে মানবাত্মার উচ্চ পূর্ণতা, পূর্ণতা হইতে পূর্ণতা, অসীম পূর্ণতা। মানবের পক্ষে সহজে এই পূর্ণতার প্রকৃষ্ট পথ নবযুগে প্রকাশিত হইয়াছে। মানবাত্মা নিরাকার, নিরাকারে নিরাকারের প্রকাশ। মানবজীবনে সহজে নিরাকারের প্রকাশ হয়, একটু প্রণিধান করিলেই আমরা বুঝিতে পারি। প্রাচীন কালের একটী শ্লোক এই, "অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরশুচিঃ॥" এই শ্লোক প্রতিপন্ন করে, ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলেই, তিনি মানবের অন্তরে সহজে প্রকাশিত হইয়া, মানবজীবনকে দেবভাবে পূর্ণ করেন। ইহাই মানবে জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত অবতরণের সাক্ষ্যদান। নবযুগে নববিধানের এই পবিত্রাত্মার অবতরণমূলক সাধনা। এই অবতরণের ভিতর ক্ষুদ্র মানবাত্মাতে অনন্ত ভূমা ঈশ্বরের প্রকাশ সম্ভব হইয়াছে। মানবাত্মায় ঈশ্বরের এই অবতরণমূলক পূজা উপাসনাতে আর বাহ্যমূর্ত্তির কোন অবলম্বনের প্রয়োজন হয় না। মানবজীবনে এই অনন্তের অবতরণে, অনন্তের সম্মিলনে মানবজীবনের ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চ পূর্ণতা; এই পথেই ইহকাল পরকালে মানবজীবনের উচ্চ নিয়তিমূলক পূর্ণতা লাভ হয়। এই পথে মানবাত্মার সঙ্গে ঈশ্বরের একদিকে উচ্চ হইতে উচ্চ যোগ, অপর দিকে এই পথেই সকল সাধু ভক্ত সঙ্গে এবং পৃথিবীর আপামর সকল মানব-

মণ্ডলীর সঙ্গে পূর্ণ যোগ। ধর্ম্মপ্রাণ ভারত। এই পথেই ভারতের গৃহ পরিবারে এবং সামাজিক ও জাতীয় জীবনে ধর্ম্মের প্রাধান্য, ধর্ম্মময় সংসার, ধর্ম্মময় সমাজ, ধর্ম্মময় কর্ম্ম। ধর্ম্মই লক্ষ্য, সংসারের অন্যপ্রকার সকল উন্নতিই উপলক্ষ্য।

দ্বিতীয় বক্তা শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্রনাথ রায় বৈরাগ্যের ব্যাখ্যা করিয়া বলেন, মহাত্মা শ্রীবুদ্ধের জীবনের বৈরাগ্য ও ভক্তাবতার শ্রীচৈতন্যের বৈরাগ্য উৎকট ত্যাগের বৈরাগ্য; ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবনে সে বৈরাগ্য কিরূপ স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হইয়া, তাঁহাকে সংসারী বৈরাগী করিয়াছে, তাহা প্রদর্শন করেন।

তৃতীয় বক্তা ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ—তিনি প্রথমে শরীর ও মনের প্রকৃতি বর্ণনা করিয়া শরীর সম্বন্ধে বলেন, শরীরকে যে কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মে পরিচালন কর, সেই স্থায়ী নিয়মে শরীরের কার্য্য করিলে, স্নান আহার পান ব্যায়ামাদির কার্য্য নির্দ্দিষ্ট নিয়মে করিলে, শরীর প্রকৃতিস্থ থাকিবে। আহার পানাদির নিয়মের ব্যতিক্রম হইলেই শরীর অপ্রকৃতিস্থ হয়, শরীরের বিকৃতি উপস্থিত হয়। মনেরও নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে। মনকে অগ্রগতি করিয়া পরিচালন না করিয়া, যদি পশ্চাৎ দিকে, অতীতের দিকে মনের ক্রিয়া পরিচালন কর, মনের বিকৃতি উপস্থিত হয়। রাঁচির বিকৃতমনাদিগের চিকিৎসালয়ে ইহার দৃষ্টান্ত আমরা পাইয়া থাকি। তাহাদের বিকৃতমন কাহারও রাজ্যের চিন্তায়, কাহারও যৌবনের চিন্তায় রয়, অথচ তাহাদের বয়স হয়ত অনেক হইয়াছে। মনের অগ্রগতিতে মানসিক ক্রমোন্নতির, মানুষের মনের ঊর্দ্ধগতির সীমা কোথায়? শ্রীবুদ্ধের জীবনের ও শ্রীঈশার জীবনের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া বক্তা বলেন, শ্রীবুদ্ধ ধ্যানের চতুর্থ অবস্থায় এতদূর অগ্রসর হইলেন যে, তিনি যেন অনন্তের সঙ্গে মিশিয়া অনন্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। সমস্ত বিশ্বে তাঁহার করুণা মৈত্রীর ভাব ছড়াইয়া পড়িল; তাই তাঁহার সম্পর্কে বলা হয়, "বুদ্ধং জ্ঞানময়ম্ আকাশবিপুলম্।" শ্রীঈশা উচ্চ যোগের অবস্থায় তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী অশরীরী আত্মা মুষা প্রভৃতি সাধু মহাজনদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া আত্মিকভাবে ভাবের বিনিময় করিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, আত্মার মৃত্যু নাই; তাই তিনি পরমপিতার আদেশে, নিজের আত্মাকে মৃত্যুর অতীত জানিয়া, শারীরিক মৃত্যুকে অনায়াসে আলিঙ্গন করিলেন। এইরূপ মানবের হৃদয় মন আত্মার অসীম প্রগতি ও অনন্ত উন্নতি প্রত্যক্ষের ব্যাপার।

৬ই মাঘ, শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক। ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৮টার উপাসনা হয়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। মেয়েরা সংগীত করেন। প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান ধারণা ইত্যাদি ব্যাপার ভারতবর্ষের অতি উচ্চ সম্পদ, অতুলনীয় সম্পদ। কালক্রমে এদেশে সে সাধনার ধারা বিলুপ্ত হইয়াছিল। নূতন ভারতে, নবধর্ম্ম নববিধানের যুগে সেই প্রাচীন ভারতের ঋষিজীবনের ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিবার জন্য শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আগমন। অদ্যকার আরাধনাদিতে ভারতীয় ঋষি-জীবনসুলভ ঈশ্বরের উজ্জ্বল গভীর সরস সুন্দর প্রকাশ ও তাঁহার সম্ভোগ বিশেষভাবে লাভ হয়। মহর্ষিদেবের ব্যাখ্যান হইতে অনুষ্ঠানের বিশেষ উপযোগী অংশ পাঠ হয়। নববিধানের সমন্বয়-সাধনায় ভিত্তিরূপে এই ভারতের ঋষিজীবনের উচ্চ ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান পবিত্রাত্মা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং ইহা শুধু ভারতের নয়, সমস্ত পৃথিবীর ধর্ম্মসাধনার ভিত্তি ও অপরিহার্য্য শ্রেষ্ঠ অঙ্গরূপে গৃহীত হইবে, তাহা আত্মনিবেদনাদিতে প্রকাশিত হয়। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে স্মৃতিসভায় ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও ভাই গোপালচন্দ্র গুহ মহর্ষিদেবের জীবনী অবলম্বনে প্রসঙ্গ করিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি কৃতজ্ঞতা অর্পণ করেন।

৭ই মাঘ, সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে প্রথম কীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তনের পর রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ জগন্মোহন দাস নববিধানের বিশেষ বিশেষ সাধনার বিষয় অবলম্বন করিয়া বাংলায় এবং শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্রনাথ রায় ইংরেজীতে বক্তৃতা করেন।

৮ই মাঘ, শ্রীদরবারের উৎসব হয়। পূর্ব্বাহ্ণে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হয়। ভাই নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বোধনের অংশ এবং ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনার অবশিষ্টাংশ সম্পন্ন করেন। সম্পাদক ভাই গোপালচন্দ্র গুহ বিশেষ প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীদরবারের বার্ষিক সভা হয়। সম্পাদক প্রার্থনা করিয়া "শ্রীদরবারের গৌরব" শীর্ষক আচার্য্যদেবের প্রার্থনা পাঠ করেন। তৎপর মণ্ডলীর উপস্থিত সভ্যগণ ও উপস্থিত প্রচারকগণ মধ্যে বিস্তৃত আলোচনার পর শেষ প্রার্থনা হইয়া অদ্যকার কার্য্য শেষ হয়।

৯ই মাঘ, সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে বক্তৃতা হয়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খড়্গসিংহ ঘোষ "যুগধর্ম্ম-সমস্যা" বিষয়ে সারগর্ভ সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করেন।

১০ই মাঘ, সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে সঙ্কীর্ত্তনে উপাসনা হয়। বিধানমুরলী শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সঙ্কীর্ত্তনে নেতৃত্ব করেন। অদ্যকার সংকীর্ত্তনে উপাসনা গভীর সম্ভোগের বিষয় হইয়াছিল। বৎসরে ঘন ঘন এরূপ সংকীর্ত্তনে উপাসনা বাঞ্ছনীয়।

(ক্রমশঃ)

ভাই নির্ম্মলচন্দ্র

দেখিতে দেখিতে ভাই নির্ম্মলচন্দ্রের পবিত্র স্মৃতি অতীতের গর্ভে প্রবেশ করিতেছে। তাঁহার স্মৃতি তবুও আমাদের সম্মুখে চিত্রার্পিতের ন্যায় চিরদিন পড়িয়া থাকিবে। বালক নির্ম্মলকে যখন কমলকুটীরে দেখিতাম, তখন তাঁহার বাল্যস্বভাব-সুলভ সরলতা আমার হৃদয়কে বড়ই আনন্দিত করিত। তাহার পর

আমাদিগের দীর্ঘকাল কুচবিহার অবস্থান কালে তাঁহার ধর্ম্ম-জীবনের প্রভাব দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। যদিও সেখানে সরকারী কার্য্যে ব্রতী ছিলেন, তত্রাচ সে দেশে নববিধানসংক্রান্ত কার্য্যে তাঁহার অদম্য উদ্যম ও উৎসাহ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সে দেশে কিরূপে নববিধান প্রচার হয়, সে জন্য তিনি মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ, মহারাণী সুনীতি দেবী, কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ এবং ভগিনী সাবিত্রী দেবীকে লইয়া কত সময় ব্যস্ত থাকিতেন। তাহার পর ভাই নির্ম্মলচন্দ্র যখন ইংলণ্ডে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন সেখানেও নববিধানপ্রচার সম্বন্ধে নানা ভাবে অনেক উদ্যম ও উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন। সে সময়ে তিনি আমাকে এ বিষয়ে উৎসাহপূর্ণ চিঠিও লিখিয়াছিলেন। ভাই নির্ম্মলচন্দ্রের ভিতরে এ সম্বন্ধে যে উৎসাহ ও উদ্যম বর্ত্তমান ছিল, তাহার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমি দার্জ্জিলিংয়ে দেখিয়াছি। ১৯০৮সনে যখন মহারাণী সুনীতি দেবী দার্জ্জিলিংয়ে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন সেখানে ভাদ্রোৎসবের ব্যবস্থা হইয়াছিল। উৎসবের উপাসনার জন্য আমি কুচবিহার হইতে আহূত হইয়াছিলাম। উপাসনার ব্যবস্থাদির সমস্ত আয়োজন উৎসাহের সহিত তিনি করিয়াছিলেন। তাহার পর ১৯৩১ সনে রাঁচী নগরে পীড়াশয্যায় শায়িতা মহারাণী সুনীতি দেবীর পার্শ্বে বসিয়া যে দৃষ্টান্ত দেখাইলেন, তাহা ইতিহাস-পত্রে বর্ণনীয়। একদিকে দিদির সময়োচিত সেবা এবং অপরদিকে সেই স্থানে উপাসনার ব্যবস্থা। রুগ্ন ভগ্ন শরীর লইয়াও দেবী সুনীতি সেই সুবর্ণরেখার বেলাভূমিতে উপাসনা করিতে এবং প্রতিদিন তাঁহার ভাবোপযোগী শ্রীমদাচার্য্যের প্রার্থনা পাঠ করিতে বিরত হন নাই। নভেম্বরের দশ তারিখে দেবী সুনীতি চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। সুবর্ণরেখার মৃদু স্রোতে ভাই নির্ম্মল সেই পবিত্র মীরা-ভস্ম ভাসাইয়া দিয়া, বিগলিত অশ্রুধারা নদীর স্রোতের সঙ্গে মিশাইলেন এবং সেই অশ্রুধারা লইয়া পবিত্র ভস্ম বাষ্পীয় শকটে সযত্নে বহন করিলেন, এবং কলিকাতায় নবদেবালয়ের প্রাঙ্গণে শ্রীমদাচার্য্যের মহা সমাধির পার্শ্বে তাহা গম্ভীরভাবে প্রোথিত করিলেন।

ভাই নির্ম্মল, তোমার এখানকার চক্ষু মুদ্রিত হইল, কিন্তু তোমার নববিধানের চক্ষু চির উন্মুক্ত। তুমি এখন ব্রহ্মানন্দদলে প্রবিষ্ট। তুমি নববিধানের সেই নবীনা মীরার ভস্ম স্পর্শ ও বহন করিয়াছ, এবং এখন সেই মীরার সঙ্গে উপাসনায় মিলিত হইয়াছ। আমরাও আজ এখান হইতে সেই উপাসনায় মিলিত হই। আজ তাই প্রাণের সুরে বলিতেছি,

নবীন বিধানে তুমি আরও নূতন,
পেয়েছ সেখানে তুমি নূতন সাধন;
আজ দেবী মৃণালিনী, আরতি, অঞ্জলি,
নির্ম্মাল্য, শ্রীলতা আজ সকলেই মিলি,
সুচারু, মণিকা, সুজাতা, সুব্রত, সরল—
দেখিছেন আজ সবে ব্রহ্মানন্দদল;
সুনীতি, সাবিত্রী, প্রফুল্ল, করুণা
সেই দলে সেই স্থানে সবে একমনা।
আজ তাই বলি তাই সকলেই মিলি,
ব্রহ্মের চরণে সবে দিই পুষ্পাঞ্জলি।

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

সংবাদ।

উৎসব—ভাই অখিলচন্দ্র রায় লিখিয়াছেন:—

মা বিধানজননীর কৃপায়, গত ৪ঠা পৌষ শনিবার হইতে ১১ই পৌষ পর্য্যন্ত আটদিন ব্যাপী মুঙ্গের ভক্তিতীর্থে সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় ভাই গোপালচন্দ্র গুহ সহ মুঙ্গের যাত্রা করিয়া, ঐকয়দিন উৎসব-সম্ভোগে কৃতার্থ হইয়াছি। শ্রদ্ধেয় ভাই গোপালচন্দ্র গুহ মহাশয় ও এ সেবককে উৎসবের প্রধান কাজগুলি সম্পন্ন করিতে হয়। ভাগলপুর হইতে শ্রদ্ধেয় নবীনচন্দ্র আইচ মহাশয়ও উৎসবে যোগদান করিয়া, উৎসব-সাধনায় আমাদের প্রধান সহায় হইয়াছিলেন। প্রথম দুইদিন সমবিশ্বাসী বন্ধু ডাঃ শশিভূষণ দাস গুপ্ত মহাশয় উৎসবে যোগদান করিয়া সপরিবারে হাওড়ায় চলিয়া আসেন। উৎসবযাত্রীদের থাকিবার সুব্যবস্থা তিনিই করিয়াছেন। উৎসবের মধ্যে ভক্ত-দীননাথ শিক্ষাতীর্থের ছাত্রছাত্রীদিগের উৎসব বেশ সুন্দর হইয়াছিল। শান্তিবাচনের দিনে দরিদ্রদিগের সেবা হয়। পূর্ব্ববারের ন্যায় এবারও মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা পুনঃ গঠিত হইয়াছে। মা বিধানজননীর কৃপায় ভক্তিতীর্থের যাত্রিনিবাসটীর নির্ম্মাণকার্য্য অনেক পরিমাণে সম্পন্ন হইয়াছে। আশা করা যায়, সমবিশ্বাসী ভাই ভগিনীদের কৃপা-দৃষ্টি হইলে, অচিরে যাত্রীদের আশ্রমটীর কার্য্য শেষ হইবে।

মাঘোৎসব উপলক্ষে, গত ১১ই মাঘ, এলাহাবাদে, "জ্ঞান-কুটীরে" উপাসনা ও প্রীতিভোজন হয়। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বানার্জি উপাসনা করেন। হিন্দুসমাজেরও কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন। "নববিধান" জিনিষটা কি, তাহা উপাসনা ও পাঠাদির দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছিল। সকলেই বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। প্রায় ৭০জন একত্রিত হইয়াছিলেন।

স্মৃতি-সভা—ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের স্মৃতি-উৎসব উপলক্ষে, শিলচর রাজকীয় বিদ্যালয়ে এক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র দে এম,এ, বি-এল সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্তা মালতীশ্যাম "কেশবচন্দ্রের জীবনকথা ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাঁহার প্রবন্ধের কতকাংশ স্থানান্তরে দ্রষ্টব্য। শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন সেন ইংরাজীতে ও শ্রীমান্ বিজয়েন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য বাংলাতে কেশবচন্দ্র সেনের জীবন ও বাণী

আলোচনা করেন। গভর্ণমেণ্ট স্কুলের দশমমানের ছাত্র শ্রীমান্ ফণীন্দ্রনাথ দত্ত একটী সুন্দর বক্তৃতা দেয় এবং কেশবচন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভা আলোচনা করে। এ, এস, জহিরউদ্দিনও ইংরাজীতে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। সর্ব্বশেষে সভাপতি মহাশয় কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিলে পর সভা ভঙ্গ হয়। কাছাড় ব্রাহ্মসমাজের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র দাস মহাশয় সভাপতিকে সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

গত ৮ই জানুয়ারী, শুক্রবার সন্ধ্যায়, চট্টগ্রামে স্থানীয় যাত্রামোহন হলে, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ৫৩তম স্মৃতিসভা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। চট্টগ্রাম কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পদ্মিনীভূষণ রুদ্র মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। একটী সময়োচিত সংগীতের পর শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র দাশ মর্ম্মস্পর্শী প্রার্থনা করিয়া সভার উদ্বোধন করেন। অতঃপর লব্ধপ্রতিষ্ঠ বক্তা শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র চৌধুরী, সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর স্থানীয় ম্যানেজার শ্রীযুক্ত মেহেটা, শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেন এবং সভাপতি মহাশয় প্রাঞ্জল ভাষায় কেশবচন্দ্রের জীবনী আলোচনা করিয়া, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করেন। সভায় বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্র মহিলা ও ভদ্রমহোদয় উপস্থিত ছিলেন।

পরলোকগমন—আমরা অতীব দুঃখের সহিত শোক-সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়ে নিম্নলিখিত পরলোকগমন-সংবাদ প্রকাশ করিতেছি :—

গত ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৮ই মাঘ, রাত্রি ২ঘটিকার সময়, রায় সাহেব ডাঃ প্রবোধচন্দ্র রায়ের অনুজ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায়, প্রায় এক বৎসর রোগ ভোগ করিয়া, ৫১ বৎসর বয়সে, পত্নী, দুই ভ্রাতা ও বন্ধুবান্ধবদিগকে শোকসাগরে ভাসাইয়া, অমৃতলোকে জনকজননীর সন্নিধানে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি সদা হাসিমুখে মণ্ডলীর সেবা করিতে যত্নবান্ ছিলেন।

১২ই ফেব্রুয়ারী (৩০শে মাঘ), শুক্রবার, অপরাহ্ণ ৩টার সময়, মণ্ডলীর বয়োজ্যেষ্ঠ, রায় [ব্রাদার্সের] শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্ত ঊননবতিতম বর্ষে, শান্তভাবে মা নাম করিতে করিতে, অমৃতধামে আনন্দময়ী জননীর স্নেহক্রোড়ে চির আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। ইনি সুদীর্ঘ জীবনে নববিধানের লীলাক্ষেত্রে প্রেমময়ী জননীর কত লীলা দেখিয়াছেন, এবং কতরূপে তাঁহা কর্ত্তৃক বিধানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইয়াছেন।

বিধানজননী তাঁহার প্রিয় সন্তানদিগকে প্রেমবক্ষে স্থান দান করুন এবং শোকার্ত্ত পরিবারে শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ১৯শে জানুয়ারী, গৌহাটীতে স্বাস্থ্যবিভাগের এসিষ্টাণ্ট ডিরেক্টর ডাঃ সচ্চিদানন্দ হোসেন পালের মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিকে, পিতৃদেব শ্রীযুক্ত দামোদর পাল উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে ডাঃ পাল প্রচারভাণ্ডারে ৫৲টাকা দান করিয়াছেন।

গত ২০শে জানুয়ারী, (৭ই মাঘ) ৫নং পঞ্চানন ঘোষ লেনে, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গীয় কালীনাথ বসুর সাম্বৎসরিক দিনে পারিবারিক ভাবে সকলকে লইয়া উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে তিনি ৪৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ৩১শে জানুয়ারী, ১১৫ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে, শ্রীমান্ জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিকে, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। শ্রীমান্ জ্ঞানাঞ্জন বিশেষ প্রার্থনা করেন।

গত ১লা ফেব্রুয়ারী, ৬৩নং ল্যান্সডাউন রোডে, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেনের পিতৃদেবের সাম্বৎসরিকে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে ৫৲ টাকা দান করা হয়।

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী, কমলকুটীরস্থ নবদেবালয়ে, স্বর্গগত সঙ্গীত প্রচারক ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যালের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ পাঠ ও প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে শ্রীমতী পুণ্যদায়িনী চক্রবর্ত্তী প্রচারভাণ্ডারে ১৲ টাকা দান করেন।

গত ২৪শে মাঘ, মঙ্গলপাড়ায়, ৬৩নং অপার সার্কুলার রোডে, শ্রীযুক্ত সদানন্দ দাসের গৃহে, তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গগত কবিরাজ ভাই কালীশঙ্কর দাসের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে তাঁহার সহধর্ম্মিণী উপাসনা করেন।

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী, ২৫০নং নিউপার্ক ষ্ট্রীটে, ডিব্রুগড়ের সিবিল সার্জ্জন লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল জ্যোতিলাল সেনের পিতৃদেব স্বর্গগত ভাই বিহারীলাল সেনের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। পুত্র এবং কন্যাতুল্যা শ্রীমতী কুমুদিনী দাস বিশেষ প্রার্থনা করেন। অদ্য এই উপলক্ষে নবদেবালয়ে ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ পাঠ ও প্রার্থনা করেন।

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী, কলিকাতায় ২২নং মিউরোডে, টাঙ্গুর (বর্ম্মা) য়্যাডভোকেট স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির সাম্বৎসরিক দিনে, ডাঃ সত্যানন্দ রায় উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী চারুবালা ব্যানার্জি প্রচারভাণ্ডারে ৫৲, ভগ্নীসমিতিতে ৫৲ গরিবদের জন্য ২৲ টাকা এবং কন্যা শ্রীমতী প্রতিমা ব্যানার্জি প্রচারভাণ্ডারে ৫৲, ব্রাহ্ম রিলিফ ফাণ্ডে ৫৲ ও গরিব ছেলেদের জন্য ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে", শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭২ ভাগ। ৪র্থ সংখ্যা। | ১৬ই ফাল্গুন, রবিবার, ১৩৪৩ সাল, ১৮৫৮ শক, ১০৮ ব্রাহ্মাব্দ | 28th. February, 1937 | অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা

মা, তোমার অমৃতপ্রসাদের তরে ব্যাকুলাত্মা ভক্ত নরনারী যুগযুগান্তর ধরিয়া তোমার দ্বারে দাঁড়াইয়াই আছেন; তুমি তো কত দিতেছ, তবু তাঁদের সাধ মিটিতেছে না; বলেন, আরও দাও, আরও দাও, আরও দাও। তোমার দ্বারে এলে তুমি কি মানুষকে এমনই কাঙ্গাল কর, যে তার ক্ষুধা মিটেও মিটেনা, তৃপ্তি মেনেও মানেনা? সে যত পায়, আরও তত চায়; তার ভিক্ষার থালি আর কিছুতেই ভরে না। সে অবিরাম তোমার দ্বারে দাঁড়াইয়া কেবলই ভিক্ষা করে, কেবলই প্রার্থনা করে। অনন্ত তুমি, তোমার ভাণ্ডারে কত কি রেখেছ, তা কেবল ভক্ত জানেন। ভক্ত তাই বলেন, "আমাদেরই জন্যে, স্বর্গনিকেতনে গো মা, কত সুখ শান্তি, অতুল সম্পত্তি, রেখেছ যতনে; নিজ হাতে সাজাইয়া বিবিধ বিধানে গো মা।" তাই তাঁরা নিত্য দীনাত্মা হয়ে, কাঙ্গালের কাঙ্গাল অতি কাঙ্গাল হয়ে, হে কাঙ্গালের ঠাকুর, তোমার চরণতলে চিরতরে পড়েই আছেন। তোমার দেবারও বিরাম নাই, তাঁদের প্রার্থনারও বিরাম নাই। এমন করে মানুষকে পাগল কর কেন, মা! যে একটু খানিক কিছু যায় তোমার দ্বারে, তার সমস্ত কেড়ে নিয়ে এমন কর যে, সে আত্মাভিমান ভুলে, তৃণসমান হয়ে, হে জীবনসর্ব্বস্বধন, তোমার জন্য চিরবৈরাগী হয়। সে সংসারের ধনমানের দিকে আর ফিরে তাকায় না, সংসারের সুখ সৌভাগ্য, মান মর্য্যাদা কিছুই চায় না; তোমার চরণের অনুরাগী কাঙ্গালী হয়ে সে যে সব ভুলেছে, সব ছেড়েছে। তুমি রাজার রাজা মহারাজা, অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি; তোমার দ্বারে যে ভিখারী হয়, তাকে তুমি, নিত্য নূতন জিনিষ সব খেতে পরতে দাও, নিত্য নবভাবে সাজাও, আর মুগ্ধ করে রাখ। আর তোমার ঘরে আরও কত নূতন নূতন জিনিষ সব রয়েছে, সে দেখতে পায় আর তোমার কাছে প্রার্থনা করে। দাতা, এমনি করে তোমার দানও ফুরায় না, ভক্ত কাঙ্গালের প্রার্থনাও ফুরায় না। তাঁরা বলছেন, দাও দাও, আর তুমি বলছ, নাও নাও। দীননাথ, তোমার দ্বারে কাঙ্গাল হলে যে কত ধনের অধিকারী হওয়া যায়, বুঝতে দিচ্ছ; কিন্তু কাঙ্গালের কাঙ্গালত্ব ঘোচে না, সে দীনের দীন অতি দীন হয়ে চরণে পড়ে থাকে। কাঙ্গালের তাই ভারি মজা; সে কাঙ্গাল হয়ে চৌদ্দ ভুবনের অধিকারী, সে অনন্ত ঐশ্বর্য্যের মালিক! এত পেয়েও কিন্তু সে যে কাঙ্গাল, সেই কাঙ্গাল। ক্রমাগত তাকে আরও কাঙ্গাল করে চরণে রাখ। তোমার চরণে রাখবার এই একটা ফাঁদ পেতেছ। যে এসেছে দ্বারে

একবার, সে চিরদিনের তরে আপনাকে হারাইয়াছে। তাকে চরণে রেখে কত সুখী কর, কত ধন্য কর। মা, সাধ হয়, এমনি করে তোমার দ্বারে চির কাঙ্গাল হয়ে পড়ে থাকি। দীনের ভাগ্যে কি এমন সুদিন হবে? তোমার কৃপায় সব হয়, তাই তোমার কৃপার ভিখারী হয়ে ভক্তিভরে বার বার শ্রীচরণে প্রণাম করি।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

—•—

প্রকৃত কাঙ্গাল কে?

পৃথিবীতে অনেক প্রকারের কাঙ্গাল আছে; কেহ ধনজনের কাঙ্গাল, কেহ মান মর্য্যাদার কাঙ্গাল, কেহ সুখ সম্পদের কাঙ্গাল; কেবল ভক্ত শ্রীভগবানের কাঙ্গাল। মানুষ পৃথিবীতে আসে, যতদিন পৃথিবীতে থাকে, পৃথিবীর অনেক কিছু তাহার প্রয়োজন; তাহা না হলে তাহার জীবনধারণ অসম্ভব। বিধাতাও মানুষের প্রয়োজনীয় বিচিত্র দ্রব্যসম্ভারে পৃথিবীকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। যাহা চায়, সে তাহাই পায়; কিছুরই অভাব নাই। তবে ভগবান্ কাকে কি দেন? ভাগবতের ঋষি বলিলেন,—

"সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্॥"

"ঈশ্বর মনুষ্যগণের প্রার্থিত বিষয় অর্পণ করেন, এ কথা সত্য; কিন্তু তিনি ভক্তগণকে সামান্য বিষয় দেন না, কেন না তাহা পাইয়া প্রার্থনার নিবৃত্তি হয় না। সমুদায়কামনা-পরিশূন্য হইয়া যাহারা তাঁহাকে ভজনা করে, তাহাদিগকে তিনি স্বয়ং সমুদায় অভিলাষের পরিসমাপ্তিকর নিজ পাদপল্লব দান করেন।"

জড়ের দ্বারা জড়ের ক্ষুধা-নিবৃত্তি হয়, কিন্তু মানবের আত্মার ক্ষুধা জড়ের দ্বারা নিবৃত্ত হয় না; এজন্য ভক্তের আত্মা অনন্ত ভগবানের জন্য চিরলালায়িত। ভগবান্ তাঁহার ভক্তগণকে সামান্য বিষয় দেন না, আপনাকে দান করেন। মানুষ যখন সমুদায়কামনা-পরিশূন্য হইয়া, দীনাত্মা অকিঞ্চন হইয়া কেবল তাঁহাকেই চায়, তখনই তাঁহাকে পায়। ভগবান্‌ও এই অবসরে আপনার অনন্ত বিভূতি লইয়া, মানবের প্রাণ মন অধিকার করিয়া, নিত্য নব নবরূপে তাহার মন প্রাণ হরণ করেন। ভক্তাত্মা এইরূপে ভগবানের জন্য চির কাঙ্গাল, ভগবান্‌ও এহেন ভক্তের জন্য চির কাঙ্গাল। ভগবান্ বলেন, আমি ভক্তাধীন, ভক্ত ভিন্ন কিছু জানিনা, ভক্তও আমা ভিন্ন কিছু জানেনা।

ভগবান্ অনন্ত, মানবাত্মা অনন্ত উন্নতিশীল ও অনন্তের সাধক। যার চির উন্নতি, তার চির অভাব। তার আর পূর্ণতা কোথায়? সে চিরদিন পূর্ণতার সাধক। তার জীবনের গতি কোথাও গিয়া স্থিরত্ব লাভ করিতে পারে না, থামিলেই তার মৃত্যু; তাই সে অবিরত কাঙালের মত মহাব্যাকুল হইয়া, প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্ত্তে কিছু পাবার আশায়, অনন্তের পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিতেছে। এই ছুটাছুটির ভিতর অনন্তের কৃপায় যাহা কিছু পায়, তাহাকে জীবনের সম্বল করে নিয়ে, শক্তিমান হয়ে আরও দ্রুতগতিতে অনন্তকে ধরবার জন্য সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে। "সম্মুখেতে স্বর্গরাজ্য, পশ্চাতে চেও না ফিরে"—পশ্চাতে আর ফিরে তাকায় না; কি আশার আনন্দে, কি ব্যাকুলতার ঝড়ের ভিতর দিয়া, অবিরাম সম্মুখের দিকে অনন্ত অজানার পথে ছুটিয়া চলিয়াছে।

মানবাত্মার অনন্ত ভগবানের জন্য এই যে অনন্ত ক্ষুধা—যে ক্ষুধা বেড়েই চলেছে, যত পায় তত আরও চায়,—এই ক্ষুধাই মানবকে অনন্ত জীবনের পথে ভগবানের দ্বারে চির ভিখারী করে রেখেছে। অনন্ত ভগবানের ভিখারী যে, সে যে চির কাঙাল। পৃথিবীর ধনের ভিখারী যে, সে ধন পেয়ে ধনী হয়, পার্থিব কাঙালত্ব তার ঘুচে যায়; কিন্তু ভগবদ্ধনের পরমধনের কাঙাল যে, সে অমূল্য ধন পেয়েও বলে, কিছুই পাই নাই, দেখেও বলে, আমার যে কিছুই দেখা হয় নাই। সম্মুখে কি অনন্ত রত্নের সৌন্দর্য্য সে দেখেছে, একেবারে মুগ্ধ হয়ে আরও পেতে চাচ্ছে, আর দেখতে চাচ্ছে, আরও সম্ভোগ করতে চাচ্ছে। তার যে কিছুই হয় নাই, এ দৈন্য তার আর ঘোচে না।

অনন্ত ঐশ্বর্য্যের রাজা শ্রীভগবান্ এমনি করে মানবাত্মার মধ্যে তাঁর জন্য ক্ষুধার উদ্রেক ক'রে, নব নব স্বর্গীয় ভোগ খেতে দিয়ে দিয়ে আরও ক্ষুধা বাড়িয়ে, নব নব সৌন্দর্য্য দেখতে দিয়ে দিয়ে আরও দর্শনপিপাসা বাড়িয়ে, নিত্য নবলীলারসে একেবারে চিরতরে মুগ্ধ ক'রে, তাঁর দুয়ারে চির ভিখারী করে রাখেন। যে অনন্তকে চায়, সে এমনই করে চির কাঙাল হয়। এ কাঙালের পরম

সৌভাগ্য এই যে, সে নিত্য ধনের অধিকারী। পৃথিবীর ধনে তার কি প্রয়োজন, যাহা আজ আছে, কাল থাকে না? অক্ষয় ধনের সামান্য পেলেও তাহার মহা লাভ, কেন না তাহাই তাহার চির সম্বল। সে অক্ষয় অনন্ত নিত্যধনের জন্যই চির কাঙাল। অনন্ত নিত্য পূর্ণের দ্বারে অনন্ত উন্নতিশীল ভক্তাত্মা চির দীন, চির অকিঞ্চন, চির কাঙাল। তাই চির দৈন্যই তাহার সাধনপথের সিদ্ধি, অনন্ত জীবন-পাথার অনন্তকে পথে একমাত্র সহায়।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সঙ্গী চাই

খেলা ধূলা করিতে সঙ্গী চাই; সংকীর্ত্তন করিতে খোল, করতাল, গায়ক বাদক চাই; সংসার পাতিতে স্ত্রী সন্তান ও পরিজন ভৃত্যাদি চাই; যৌথ কারবার করিতেও অংশীদার চাই। নববিধান বিধাতার নবলীলা, নববিধান মহা সংকীর্ত্তনের বিধান, নববিধান ধরায় প্রেমপরিবার গঠনের বিধান, নববিধান পৃথিবীতে স্বর্গের যৌথ কারবার। তাই এ বিধান একা একা সাধন হয় না, ধর্ম্মের সঙ্গী বিনা নববিধান সাধন হয় না, সপরিবারে ও সদলে সাধন বিনা নববিধান প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাই শ্রীকেশবচন্দ্র বলিলেন, "ধর্ম্মের সঙ্গী চাই" "অভিন্নহৃদয় পরিবার চাই, আমি উচ্চদরের পরিবার চাই। যাদের এক ইচ্ছা, এক রুচি। তা কেউ এ দেশে, কেউ ওদেশে থাকিলেই বা; সবার মুখ এক মুখ হবে।" কবে এমন হবে?

ধর্ম্মসমন্বয়বাদ ও নববিধান

সমন্বয়বাদ (Eclecticism) বহুকাল পূর্ব্ব হইতে দর্শনশাস্ত্রের একটি তত্ত্বরূপে সিদ্ধান্ত হইয়াছে। ধর্ম্মসমন্বয়ের চেষ্টা আকবার বাদসাহও করিয়াছিলেন। গুরু নানকও হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়কে সমন্বয়ধর্ম্ম শিক্ষাদান করেন। বঙ্গের পল্লীগ্রামেও হিন্দুরা ওলা বিবির সিন্নি দেন, সত্যপীরের গান করেন। মুসলমানেরাও শীতলা দেবীর পূজা দেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস যে ধর্ম্মসমন্বয়বাদের প্রবক্তা বা কলির সমন্বয়ধর্ম্মাবতার, এই বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যেরা মহা আন্দোলন উদ্যোগ করিতেছেন; কিন্তু বস্তুতঃ রামকৃষ্ণদেবের ধর্ম্মসমন্বয় পল্লীগ্রামের হিন্দুদিগের সমন্বয়ধর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই নয়। তিনি মতেতে সমন্বয়বাদী হইলেও কার্য্যতঃ কেবল হিন্দু সাম্প্রদায়িক যোগী ভক্ত ছিলেন, এবং তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যেরাও আপনাদিগকে হিন্দু-সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। বর্ত্তমান যুগে শ্রীকেশবচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথমে, রামকৃষ্ণদেবের সহিত পরিচয় হইবার দশবৎসর পূর্ব্বে Future Church নামে বক্তৃতা করেন, তখন ধর্ম্মসমন্বয়ের বার্ত্তা ঘোষণা করেন; এবং জীবনে তাহা সাধন করিয়া সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়মূর্ত্তিমান হইয়া বলিলেন, "শ্রীঈশা আমার ইচ্ছাশক্তি, সক্রেটিস আমার মস্তক, চৈতন্য আমার হৃদয়, হিন্দুঋষিগণ আমার আত্মা, এবং পরোপকারী হাউয়ার্ড আমার দক্ষিণ হস্ত।" তাহাতেই তিনি জগতের সমক্ষে, ধর্ম্মসমন্বয় যে জগতের পরিত্রাণের জন্য স্বয়ং ঈশ্বর-প্রেরিত "নববিধান", ইহাই ঘোষণা ও প্রতিষ্ঠা করিলেন। কেবল মতেতে (Theory) সমন্বয়বাদ এক, জীবনে চরিত্রে তাহা প্রদর্শন আর এক; তাহার উপর শ্রীঈশ্বর-প্রেরণায় ইহাকে বিধাতার নববিধান বলিয়া ঘোষণা ও প্রতিপন্ন কেবল এক কেশবচন্দ্রই করিয়াছেন। ইহা অভ্রান্ত এবং অপ্রতিবাদ্য সত্য। কার সাধ্য, ইহা খণ্ডন করে।

যুগধর্ম্মসমস্যা

(৯ই মাঘ, ব্রহ্মমন্দিরে প্রদত্ত বক্তৃতার সার মর্ম্ম)

যুগধর্ম্ম সম্বন্ধে এই শ্রীমন্দিরে গত ৭০ বৎসর অনেক আলোচনা হইয়াছে, এ বিষয়ে আমার নূতন করিয়া কিছু বলিবার নাই। যাহা বলিব, তাহাই পুনরুক্তি হইবে। কিন্তু ভালকথা বহুবার বলিলেও দোষ হয় না; তাই সাহস করিয়া এই গুরুতর বিষয়ে দু'চারিটী কথা আপনাদিগের নিকট বলিতে চাই। যুগধর্ম্ম-সমস্যার নানাদিক আছে, তাহার দু'একটী দিক মাত্র আজ আমার বলিবার বিষয়। আমি প্রধানতঃ এই সমস্যার দুটী দিকের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে ভাবিতে গেলে দেখিতে পাই, এ যুগে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মে অতি প্রবল সংঘাত আরম্ভ হইয়াছে। অনেক লোক ঈশ্বর-বিশ্বাস হারাইয়া বসিয়াছেন। আজ পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত রব উঠিয়াছে, "ঈশ্বরের মৃত্যু হইয়াছে, মনুষ্য জীবিত থাক।" রুশিয়া ও আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে বহুলোক মানবধর্ম্মের আনুগত্য স্বীকার করিতেছেন, তাঁহারা ঈশ্বর মানিবার প্রয়োজন অনুভব করেন না। তাই প্রথম সমস্যাকে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মে সংঘাত না বলিয়া ঈশ্বরবাদ ও নিরীশ্বর-বাদের সংঘর্ষ বলিলে ভাল হয়। দ্বিতীয় সমস্যা, যাঁহারা ঈশ্বর মানেন, এই সব লোকের ভিতর মতানৈক্য—বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বীদের বিরোধকে দ্বিতীয় ধর্ম্মসমস্যা বলিব। আজ আমার নিবেদনে মাত্র এই দুটী বিষয়ের আলোচনা করিব।

যাঁহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না, কোন কালেই এরূপ লোকের অভাব নাই। আমাদের দেশেও প্রাচীনকালে চার্ব্বাক ও সাংখ্যমতাবলম্বীরা ঈশ্বর-বিশ্বাসের আবশ্যকতা মনে করেন নাই। জৈন ও বৌদ্ধ সাধকগণও ঈশ্বর বিশ্বাসের সঙ্গে ধর্ম্মসাধনের বিশেষ যোগ স্বীকার করেন নাই। হিন্দুর ধর্ম্ম প্রধানতঃ পুরুষকারের ধর্ম্ম; তাই গীতার পূর্ব্বে দেখিতে পাই, হিন্দুধর্ম্মসাধনায় ঈশ্বরের স্থান গৌণ, মুখ্য নহে। ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহের অবস্থা অতি প্রাচীন হইলেও, এ যুগে যেরূপ ব্যাপকভাবে এই

মুক্ত প্রচারিত হইতেছে, পৃথিবীর কোনও যুগে এরূপ দেখিতে পাই না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বহুলোকে ঈশ্বরবিশ্বাস হারাইয়াছিলেন, ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবে তাহার প্রমাণ দেখিতে পাই। কিন্তু সে যুগেও ভলটেয়ার, রুশো, হিউম প্রভৃতি চিন্তানায়কেরা ঈশ্বরে বিশ্বাস হারান নাই। কিন্তু এযুগে প্রবল জলপ্লাবনের মত ঈশ্বরবিশ্বাসহীনতা পৃথিবীর উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বহুলোক এই স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে।

Bertrand Russell (বার্ট্রাণ্ড রাসেল) Free-man's worship নামক একটী প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, স্বাধীন মুক্ত জীবের উপাসনা কাহারও পদানত হওয়া নয়; এ বিশ্ব নিশ্চিত ধ্বংসের পথে যাইতেছে—এই ধ্বংসের পথে সাহসে ভর করিয়া চলিয়া যাওয়াই প্রকৃত উপাসনা। মরিতে হয়, সাহসে ভর করিয়া প্রাণদান করিব, এই ভাবে নির্ভীক জীবন যাপন করাই শ্রেয়ঃ। বিশ্বজগৎ যে নিশ্চিতই ধ্বংস হইবে, মনুষ্যের সভ্যতার চিহ্ন বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি সকলই এক সময় কালস্রোতে ভাসিয়া আসিয়াছে ও সেই স্রোতেই ভাসিয়া যাইবে—মানুষের ধর্ম্ম স্বপ্ন, শুধু স্বপ্ন ভিন্ন আর কিছুই নয়, অনেক বৈজ্ঞানিক ইহাই বিশ্বাস করেন। কিন্তু বিশ্ব যদি ধ্বংসের পথেই যায়, আবার সেই ধ্বংসের অবস্থা হইতে নূতন বিশ্বের সৃষ্টি হইতে পারে, এ বিশ্বাস করিতে কোন বাধা দেখি না। তারপর এই দৃশ্য জগৎ, বিজ্ঞানের জগৎ এই বিপুল বিশ্বের এক কণিকা মাত্র; বিজ্ঞানের জ্ঞান সত্যসিন্ধুর এক বিন্দুর কণিকাও নয়; তাহার উপর বিশ্বাস করিয়া সকল আধ্যাত্মিক সত্যকে উড়াইয়া দেওয়া, শিশুর কল্পনা ভিন্নতো কিছুই মনে হয় না। এক পশলা বৃষ্টি হইবার পর, নিদ্রোত্থিত শিশু জানালা দিয়া দেখিল, তার বাড়ীর ক্ষুদ্র বাগানটী জলে পূর্ণ হইয়াছে; তাহা দেখিয়া সে মনে করিতে পারে, পৃথিবী জলময়, পৃথিবীতে জল ছাড়া আর কিছুই নাই। বৈজ্ঞানিকও তাঁহার ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়জ্ঞানের জানালা দিয়া দেখিলেন, বাহিরের খানিকটা জায়গায় রূপরসগন্ধের জগৎ—আর অমনি সিদ্ধান্ত করিলেন, রূপ রস ছাড়া বিশ্বে অন্য কিছুই নাই। ঐ শিশু বা এই বৈজ্ঞানিকের মত ধ্রুব সত্য বলিয়া মানিয়া লইবার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। অন্য দেশে যাহাই হউক, ভারতে ধর্মবিশ্বাস লোকের অস্থিমজ্জাগত, সুতরাং ঈশ্বরবিশ্বাসহীনতা এ দেশে প্রবলাকার ধারণ করিবে, ইহা মনে হয় না। আমি এইবার সংক্ষেপে দ্বিতীয় সমস্যা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য নিবেদন করিব।

নানাধর্ম্মের দল পৃথিবীর উদার বক্ষে মিলিত হইয়া আজ এক গুরুতর কুরুক্ষেত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রতি ধর্ম্মের শিবিরে নিজ নিজ নিশান উড়িতেছে—চারিদিকে রণদামামা বাজিয়া উঠিতেছে—প্রতি ধর্ম্মশিবিরেই এই বিশ্বাস যে, তাঁহাদের পতাকাতলে যে ধর্ম্মের জয় গীত হইতেছে, একদিন উহাই জগতের একমাত্র ধর্ম্মরূপে পরিণত হইবে। এ ধর্ম্মসমস্যা অতি গুরুতর—ইহার সমাধান কি? এই পথের পরিণতি কোথায়? এই সম্বন্ধে কিছু বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব।

এই সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে মতগুলিকে আমি পাঁচভাগে বিভক্ত করিতে চাই।

১। অন্তিম বিধানের পথ—অনেকে মনে করেন, এই ধর্ম্মসংগ্রামের শেষে এক ধর্ম্মই জয় লাভ করিবে। বহু খৃষ্টান, মুসলমান, বৈদান্তিক বিশ্বাস করেন যে, পরিণামে তাঁহাদের নিজ নিজ ধর্ম্ম পৃথিবীতে জয়যুক্ত হইবে, এবং সকল লোক একই ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে। ঈশার বিধান সমগ্র জগতের জন্য, খৃষ্টানেরা যখন একথা বলেন, আমরা সমগ্রহৃদয়ে একথায় সায় দেই; কিন্তু যখন তাঁহারা বলেন, অন্য কোনও ধর্ম্ম এইরূপে জয়যুক্ত হইবে না, তখন তাঁহাদের কথায় সায় দিতে পারি না। কেন না, প্রত্যেক ধর্ম্মশাস্ত্রেই এক কথা আছে যে, সেই শাস্ত্রকথিত সত্য ধর্ম্ম সমগ্র জগতের জন্য। বৈদান্তিক যখন মনে করেন, তাঁহার বেদান্তবাদ পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইবে, আমরা পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত বলি, তাহাই হইবে; কিন্তু তাঁহারা যদি মনে করেন, ঈশার ধর্ম্ম বা ইসলাম জগতে সেইরূপ ব্যাপ্ত হইবে না, আমরা তাহা স্বীকার করিতে পারি না। যদি সকল ধর্ম্মনেতা ও তাঁহাদের সকল শাস্ত্রের কথা বিশ্বাস করিতে হয়—তবে বলিতে হয়, সকল ধর্ম্মই জগতের জন্য এবং সকলের জন্য। তাই প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীর হৃদয়গত সদ্‌বিশ্বাসের সহিত আমরা ঐক্যমত; কিন্তু তাঁহারা যখন হৃদয় হইতে অন্যকে তাড়াইতে চান, আমরা তখন তাঁহাদের সহিত ঐক্যমত হইতে পারি না।

তারপর কোন বিধানকে সর্ব্বশেষ বিধান বলিলে, ভগবানের সৃষ্টিক্রিয়াকে খর্ব্ব করিতে হয়। তাই প্রথম মতের সহিত আমাদের আংশিক মিল, সমগ্র মিল নহে।

২। অনেকে মনে করেন—ধর্ম্ম প্রথম নির্ম্মলাকারে পৃথিবীতে আসে, কালক্রমে ধর্ম্মে আবিলতা আসে; তাই বুদ্ধি দ্বারা ধর্ম্মগুলিকে সুমার্জ্জিত করিয়া যে ধর্ম্ম পাওয়া যায়, তাহাই জগতের ধর্ম্ম। অষ্টাদশ শতাব্দী এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর অনেক বুদ্ধিবাদী চিন্তাশীল লোক এইমত পোষণ করেন। ব্রাহ্মসমাজের অধিকাংশ লোক এই মত সমীচীন মনে করেন। এই মতকে The path of Abstraction অথবা ছিন্নসত্তার পথ বলা যাইতে পারে। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বেদ, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া ধর্ম্মের কয়েকটী মূলসূত্রে ঐক্য দেখিতে পান। অনন্ত ঈশ্বর ও আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস, নৈতিক নিয়মানুবর্ত্তিতা সকল ধর্ম্মেই দেখিতে পাই। ইহাই সার ও সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম। কালক্রমে ইহার সঙ্গে যে আবিলতা মিশিয়াছে, তাহা বর্জ্জন করিয়া এই ধর্ম্ম সাধন করাই মানবজীবনের সার্থকতা। ব্রাহ্মসমাজের অধিকাংশ লোক এই মত পোষণ করেন। ইহা কিছু মন্দ নয়। তাই আমরা Back to jesus, Back to the Rishis এই সব কথা শুনিতে

পাই। কিন্তু সকল ধর্ম্মের ইতিহাসই ধর্ম্মের অবনতির ইতিহাস, এ কথা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। ভগবান একটী ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের সময় আবির্ভূব হন, কিন্তু কোনও ধর্ম্মের পরবর্ত্তী অভিব্যক্তির সহিত তাঁহার বিশেষ সম্বন্ধ নাই, এই মত বিশ্বাস্য নয়।

ভগবান সকল ধর্ম্মের প্রেরয়িতা, তিনিই ধর্ম্মের অভিব্যক্তির নিয়ামক। ইহার ভিতর যে দোষ ত্রুটী আছে, তাহা মানবীয়; কিন্তু ধর্ম্মের দিক বিধাতার। সকল ধর্ম্ম তাঁহারই আত্মপ্রকাশ। রাজা রামমোহন বিশ্বাস করিতেন, উপনিষদুক্ত ধর্ম্মই ভারত-ধর্ম্মের মুকুটমণি; একদিক দিয়া দেখিলে ইহা সত্য। কিন্তু পৌরাণিক যুগে এই ধর্ম্মের যে গম্ভীরতা ও বিশালতার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। একথা সাহস করিয়া বলিবার কারণ এই যে, ডাক্তার ভাণ্ডারকার প্রভৃতি পণ্ডিত ব্যক্তি এক স্থলে বলিয়াছেন যে, বঙ্গদেশে ব্রাহ্মসমাজের লোক উপনিষদ্‌গুলির নিকট বিশেষ ঋণী, কিন্তু আমরা পশ্চিমে প্রার্থনা-সমাজের লোকেরা মধ্যযুগের সাধকদের নিকট—নানক, কবির, তুকারাম, নামদেব, রামদাস প্রভৃতির নিকট অত্যধিক ঋণী। তাই মনে হয়, বৈদিক সাধনা ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত, কিন্তু পৌরাণিক সাধনার ধারা মানববুদ্ধি-প্রণোদিত, এ ধারণা প্রাচীন ব্রাহ্মেরা করিতে পারেন, নবযুগের নবীন ব্রাহ্মেরা স্বীকার করিতে পারেন না। কলিকাতার গঙ্গার জলে আবিলতা আছে, হরিদ্বারের গঙ্গার পরিষ্কার স্বচ্ছ জল। তাই বলিয়া কি আমরা কলিকাতার গঙ্গা ছাড়িয়া হরিদ্বার যাইতে পারি? এখানকার গঙ্গার জলই পরিষ্কার করিয়া আমাদের ব্যবহারের উপযোগী করিয়া লইতে হইবে। তাই পৌরাণিক সাধনার ভক্তিধারাকে কিরূপে শুদ্ধ করিয়া লইতে হয়, আমাদের অগ্রণী বিধানবাদীরা জানিতেন; জানিতেন বলিয়াই তাঁহারা গাইতে পারিয়াছিলেন, "প্রেমে পাগল হয়ে হাসিব কাঁদিব, সচ্চিদানন্দসাগরে ভাসিব; আপনি মাতিয়ে সকলে মাতাব, হরিপদে নিত্য করিব বিহার।" তাই বৈদিক সাধনার সহিত কিরূপে পৌরাণিক ভক্তির সাধনা মিলাইয়া লইতে হয়, ব্রহ্মানন্দের দল জানিতেন; তাই কয়েকটী মূলসূত্রের উপর বিশ্বজনীন ধর্ম্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা প্রশংসা-যোগ্য—কিন্তু ইহার সহিত ধর্ম্মের অভিজ্ঞতা ও অনুষ্ঠানের সামঞ্জস্য হওয়া চাই। এগুলি বর্জ্জন করার জন্য এই পথকে বর্জ্জনের পথ, বা ছিন্নমস্তার পথ বলা হইয়াছে। এই পথে গিয়া আমরা ধর্ম্মের পরিপূর্ণরূপ দেখিতে পাই না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগঙ্গাসিংহ ঘোষ।

—

সাক্ষ্যদান

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি,এল, কর্ত্তৃক ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটে, প্রচার-কার্য্যালয়ের উৎসবে বিবৃত এবং শ্রীমান্ সতীকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক লিখিত)

আমি অনেকদিন থেকে, প্রায় ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের পর থেকেই কলিকাতার বাহিরে আছি। আমার অনেক দিনকার প্রাণের ইচ্ছা—বক্তৃতা নয়, ধীরে ধীরে, তরুণদের কাছে আমার অন্তরের কতকগুলি কথা বলতে। এতদিন সুযোগ হয় নাই; আগে সুযোগ হলেই ভাল হ'ত। এখন আমার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ, বেশীক্ষণ বসিতে পারি না, দৃষ্টিশক্তিও হারিয়েছি। তবু আমায় বলিতে হবে সেই সব আগেকার কথা।

আমায় আচার্য্য কেশবচন্দ্রের কাছে প্রথম উপস্থিত করেন ত্রৈলোক্য বাবু (সঙ্গীতাচার্য্য ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল), ছোট্টবেলায়, ব্রাহ্মসমাজের বাইরে। তখন সমাজ-বিদ্রোহ ছিল না, পরম শান্তিতে সাধনার নূতন নূতন স্তর উন্মুক্ত হচ্ছে। সেই সময় মাঝে মাঝে গিয়ে আমি তাঁর কাছে বসিতাম। বুঝিতাম না, তবু ভাললাগিতো। স্তাবক বলিতে চান বলুন, কিন্তু ভাল-লাগিতো। সেই মৃদু, বালক ভুলানো সহাস্য কথা। তখন মনেই হোতোনা যে, আবার সিংহবিক্রমে বক্তৃতা, সিংহগর্জ্জন তাঁরই ভিতর দিয়ে বেরোতে পারে। কালীচরণ বাবু (রেঃ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রভৃতি অনেকে ধর্ম্মমত ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার মতামত নিতে আসতেন। Pleasant Conversation! ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি Oxford Mission এ যখন থাকিতাম, সেখানে কথায় কথায় Groule সাহেবের সঙ্গে তাঁর (আচার্য্য কেশবচন্দ্রের) বিষয় কথা হয়। তিনি বল্লেন, Delightful……Delightful! তাঁর কথাবার্ত্তায় সবাই আনন্দ উপভোগ করিতেন—তর্ক ছিল না, মুগ্ধ করিতো; অর্থ বুঝিতাম না, কিন্তু কেন জানি ভাললাগিতো। মুখের সে কি প্রসন্নতা! কখনও, সারাজীবনে তাঁহার মুখে বিষাদ দেখি নাই। সদাই হাসিতেন, প্রফুল্লতার বিকাশ, দৃঢ় বিশ্বাস, বিশাল বাহিক শরীর। সেই সৌম্যমূর্ত্তি অনেকের স্মরণে আছে। তেমন আদর্শ পুরুষ আর দেখি নাই। স্পষ্ট বলিতে পারি, Personal bias নয়, আদপে নয়। প্রতিভাপূর্ণ মুখ, তাতে হাসি খেলা করে বেড়াচ্ছে। কোন রকম পারিবারিক বিরক্তির কারণ হলে শুধু চোখ বুজে বসতেন। একটুখানি কিছু হলেই, এমন করে চোখ বুজে বসতেন যে, কাউকে আর তর্ক করিতে হইত না। তাঁহার চির অবলম্বন, চির-সঙ্গীর সঙ্গে এক হয়ে যেতেন। Lily Cottageএর পুকুর ধারে বসিতেন, ঠিক যেন—যোগী। কঠোরতা নাই, কৃচ্ছ্র সাধন নাই, প্রশান্ত নরম তৃপ্তিমাখা মুখমণ্ডল। যেন আনন্দকে প্রত্যক্ষ করছেন। মহর্ষির দেওয়া ব্রহ্মানন্দ নাম বর্ণে বর্ণে সার্থক হয়েছে।

চটুকটানি কখনও দেখি নাই, সর্ব্বদা প্রসন্ন, মুখ উজ্জ্বল; যাঁহার উপর বিশ্বাস, তাঁহাকে যুক্তি তর্ক দিয়া নয়, শ্রদ্ধা দিয়া প্রত্যক্ষ করিতেন। মুখটীও তাহার সাক্ষ্য দিত।

১৮৮১ হইতে ১৮৮৩, সেই পুণ্যস্মৃতি। আমার একটা স্থান দেওয়া হয়েছিল। উপাসনা শুনিতাম। তিনি সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া বাঁয়ের ছোট ঘর বসিতেন। ডাইনে প্রচারকেরা, আর বাঁয়ের দেওয়াল পিছনে করিয়া আমি বসিতাম। সেই উপাসনা! সদা, প্রত্যক্ষ কাছে বসে বসে আনন্দে তাঁহার সঙ্গে কথা কইতেন। তিনি কার কাছে নেই? ভগবান এত কাছে? সে উপাসনা প্রাচীন Godhead-এর বা বামপন্থা দী নয়। এ ভাষা প্রত্যক্ষ। আপনার মা বাপের কাছে বসে কথা কওয়ার মত কথা। আর এই উপাসনায় তাঁর মুখে কি প্রসন্নতা আসিতো!

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের প্রকাণ্ড কোলাহল। তাঁর "নববিধান" কথা নিয়ে বহু আলোচনা, বক্তৃতা, তীব্র আক্রমণ হচ্ছে। নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র আমায় একটী বক্তৃতা শুনিতে নিয়ে গেলেন। সে সব শুনে আমার, আর আমাদের মধ্যে তখন ছিলেন ভবানীদা (ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বা উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব), আরো অনেকে—সে বক্তৃতায় আমাদের মনে একটা আন্দোলন উঠিলো, সন্দেহ হল। আমরা সে সমালোচনায় তুষ্ট হইলাম না। স্থির হ'ল, কেশবচন্দ্রকে সোজা এবিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। আমাকেই তাঁহারা জোর করে মুখপাত্র করিলেন। কেন করিলেন, জানিনা। সব এসে বসিলেন। আমি গিয়ে এগিয়ে তাঁর পায়ের গোড়ায় বসিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—"এ ধর্ম্মতো পুরাণো কালেও ছিল, তবে নববিধান বলিবার দরকার কি?" সে কি soft হাসি চোখে—আমার দিকে তাকিয়ে বল্লেন, "ধর্ম্মের যে আর কোনও নাম দিতে পারিনে।" আরো গোটাকতক কথা বলেছিলেন। আমার উপর তার impression কথায় ব্যক্ত করিতে পারি না। আমার অন্তরে চিরদিনের মত মুদ্রিত হয়ে গেল। এমন সহজ আর সোজা কথা কখন শুনি নাই। তার থেকে, পরে আমার যা মনে হয়েছে, তাই বলিতেছি। সত্যি, ধর্ম্মের আর কোন্ নাম হতে পারে? সাম্প্রদায়িকতা-গন্ধহীন নাম। "নব" আমি প্রথম বল্লাম বলে নয়, কিন্তু নূতন; আশ্চর্য্য নূতন বলেই। সেই কথার অর্থ এই যে, মানুষের যে ধর্ম্ম, যেমন ক্রমবিকাশ জীবনে, তেমনি ধর্ম্মের ক্রমবিকাশও প্রতিমুহূর্ত্ত, প্রতিপদে। প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে নূতন করে অগ্রসর হতে হবে। যদি তাহা না হয়, যদি নিত্য নূতনতা না আসে, যদি বাঁধা বুলি মুখস্থ করি, তবে ধর্ম্ম কোথায়? তবে কে যেন রোধ করেছে পথ! কেবল মালা জপ করে যাচ্ছি। মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে, ভগবানের দয়া যদি নূতন করে ঝরে না পড়ে, নূতন করে প্রত্যেকটী সম্বন্ধ নূতন না হয়, তবে ধর্ম্ম কোথায়? সে ধর্ম্ম যে বদ্ধ জড়তা। Pleasure of Life-এর গ্রন্থকার বলেছেন যে, পৃথিবীকে সুখী করার জন্য প্রকৃতি এই যে কত ছবি দেখায়, তাহা নিত্য নূতন নূতন বেশ ধরে। পুরাতন আকাশ নিত্য নূতন, পুরাতন বাতাস নিত্য নূতন, ফুটন্ত ফুলের শোভা সেতো প্রতিমুহূর্ত্তে নূতন, স্রোতস্বিনীর ধারা নিত্য নূতন। এই নিত্য নূতনতাই যে ধর্ম্মেরও aspect। ধর্ম্মের সেইরূপই যে "নববিধান"। "নববিধান" এমন মোহনমন্ত্র আর কি আছে? "নববিধান" কথাটীর মতন এমন কোনও বাণী পাই নাই, যা ধর্ম্মের পথে এগিয়ে দেবার এত সহায়তা করে। ধর্ম্মের যে সত্যকার রূপ "নববিধান" এই একটী কথায় যেমন প্রকাশ করে, এমনটী আর শুনিনি।

তাঁর আরেকটী বাণীর কথা বলি। তিনি অসুস্থ শরীরে, দিনের বেলায় মন্দিরে উপাসনা করিবেন ও জীবন-গ্রন্থের কথা নিবেদন করিবেন বলে প্রচার করিলেন। তখন পাছে জায়গা না পাই, তাড়াতাড়ি এসে সকাই বসিতাম। খুব ভিড় হ'ত, মন্দির ভরে যেতো। "নববিধানের" বাণী যুক্ত হল, অঙ্গে মনে। নূতন কথা "জীবনবেদ"। তারা এমন করে প্রাচীনকে আঁকড়ে ছিল যে, তারা যখন এই কথা নিয়ে আমার সঙ্গে তর্ক করিত, আমি এ বিষয়ে কথা বলে শব্দের পবিত্রতা নষ্ট করি নাই। শাস্ত্র মানতে হবে, বা শাস্ত্র কিছুই নাই। উপাধ্যায়ের (উপাধ্যায় ভাই গৌরগোবিন্দ রায়) "সুবিশালমিদং" শ্লোকে শাস্ত্র প্রত্যক্ষ। প্রতি জীবন, প্রতি যুগ, প্রতিজনের কাহিনী সব আলাদা; তারা আলাদা আলাদা জীবনে অভিজ্ঞতার ইতিহাস দিয়ে ভগবানের কাছে নৈবেদ্য করে এমন আলোক পায় যে, পথ খুঁজে পায়। এ বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করিতে পারে। আমিও প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারি নাই। এখন মৃত্যুর দরজার ভিতরের আলো এসে পড়েছে, কথা শুনে কথা মেনে চলার সঙ্গে দ্বন্দ্ব থেমে গেছে। জীবনকে উৎসর্গ ক'রে, ভিতরে আঁঠা বাঁধে; মনের ভিতরে ফুটে উঠেছে এ সৌভাগ্যের কথা। সবাই পারে কিনা, সন্দেহ হতে পারে? তারাও পায়, তারাও পারে, এই বলার আমার অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়েই আমি এসেছি। জীবন চালনের পথ পেয়ে তাদের জীবনও ধন্য হয়ে যায়।

দুর্ব্বল শরীর, আমার সাধ্য নাই। আরো বলবার আছে, কিন্তু বলে ফুরিয়ে উঠা যায় না। হয়তো এ সাহস আমার ধৃষ্টতা; কিন্তু প্রবল বেগ এসেছে আমার এই কথা বলে যেতে। আজ উৎসবে এঁরা যে আমায় সুযোগ দিয়েছেন, সেজন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আর যাঁর অমৃতময় পুণ্যস্মৃতি বুকে করে এখানে এসেছি, তাঁকে প্রণাম করি।

—০—

শ্রীমান্ প্রসন্নকুমার

(জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রায় সাহেব ডাঃ প্রবোধচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত)

জন্ম :—৩রা সেপ্টেম্বর, ১৮৮৬ খৃঃ

মৃত্যু :—১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৭ খৃঃ

আমাদের প্রাণের ভাই প্রসন্নকুমারের জীবন একটী ক্ষুদ্র জীবন—কিন্তু ইহা অতি সুন্দর মনোরম। একটী ছোট প্রদীপ, কিন্তু বড় শান্ত, স্নিগ্ধ, উজ্জ্বল আলোক ; একটী ক্ষুদ্র কুসুম, কিন্তু বড়ই মধুর পবিত্র সুরভিপূর্ণ। সদা সর্ব্বদা মৃদু মধুর হাস্যমাখা প্রসন্ন মূর্ত্তিখানি তাঁহার নামটীকে সার্থক করিয়া রাখিয়াছিল। নববিধানমণ্ডলীর একটী সামান্য সেবক—অক্লান্ত কর্ম্মী—সকলের আদরের "ফেলু"—এই নামে আমাদের ভাইটী সকলের কাছে পরিচিত ছিলেন। আজ কয়দিন হইল, এই শুভ্র, সুন্দর জীবন-প্রদীপটী এ জগতে নিবে গেল—কিন্তু জানি না, কোন অজানিত জ্যোতিষ্মান লোকের দিব্য জ্যোতির সঙ্গে তাহা মিলিত হইল। সেই সুন্দর জীবন-কুসুমটী এখানে ঝড়ে পড়ল—জানি না, কোন দিব্য লোকের নূতন উদ্যানে তাহা প্রস্ফুটিত হইল। পরমজননী পরম আদরে সেই কর্ম্মক্লান্ত সন্তানকে পৃথিবীর রোগ-যন্ত্রণা হতে মুক্ত করে স্নেহবক্ষে তুলে নিয়েছেন।

কাংড়া জেলার মধ্যে "অমরাগড়ী" একটী ছোট গ্রাম। ব্রাহ্ম-সমাজের ইতিহাসে এই সামান্য স্থানটী এক সময়ে বড় আকর্ষণের, বড় পরিচয়ের স্থান হয়েছিল। আমাদের পরম পূজনীয় জ্যেষ্ঠতাত ভক্তিভাজন সাধু ফকির দাস এবং আমাদের পিতৃদেব, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের মধুর আকর্ষণে ব্রাহ্মসমাজের ভিতর স্থান লাভ করেন। তখন তাঁহারা মাত্র ২০।২২ বৎসরের যুবক, কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। জানিনা, কি শুভ মুহূর্ত্তে সে শুভ সম্মিলন হয়েছিল! যে মিলনে এই দুই ভাই একেবারে পরিবর্ত্তিত রূপান্তরিত হয়ে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন এবং নিজেদের জীবন-প্রদীপ এই মহা তেজোময় মহাপুরুষের উজ্জ্বল জীবন-জ্যোতিতে প্রজ্বলিত করিয়া, সেই অগ্নিশিখা এই ক্ষুদ্র গ্রামে বহন করিয়া লইয়া গেলেন—তাহাতে আরো কত কত জীবন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তাঁহারা বিধানজগতের সেই চির গৌরবময় নব-বিধাননিশান নিজেদের জন্মভূমিতে প্রোথিত করিলেন। যখন এই ক্ষুদ্র গ্রামে ব্রহ্মনামের বিজয়শঙ্খ বাজিয়া উঠিল, তখন কি মহা আন্দোলন এই প্রদেশটীকে একেবারে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিল। যত কিছু দুর্নীতি ও কুসংস্কার, তাহার বিরুদ্ধে মহা সংগ্রাম ঘোষিত হইল। এখানে যে সংগ্রাম সংঘটিত হইয়াছিল, ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে তাহার তুলনা মিলে না। পরবর্ত্তী সময়ে বহু বহু সাধু ভক্তের পদধূলিতে এই দেশের বক্ষ অনুরঞ্জিত হইয়া আসিতেছে।

পুণ্যশ্লোক মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান অমরাগড়ী হইতে মাত্র ৪মাইল দূরে অবস্থিত। এজন্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র অমরাগড়ীর লোকদিগকে আদর করে "রাজার দেশের লোক" বলে ডাকতেন। পূজনীয় জ্যেষ্ঠতাত ও পিতৃদেব এবং তাঁহাদের অন্যান্য সমধর্ম্মী ও সহকর্ম্মীরা তাঁদের জীবনের রক্ত দিয়ে, এই প্রদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন এবং ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। আজও ক্ষীণ জ্যোতিতে সেই বর্ত্তিকাটী প্রজ্বলিত আছে। সেই আলোকটী উজ্জ্বল রাখবার জন্য আমাদের ভাই প্রসন্নকুমার আমরণ কত আগ্রহে, কত যত্নে কত না সেবা করিয়া গিয়াছেন।

এই পবিত্র দেশে এই ভক্তবংশে প্রসন্নকুমারের জন্ম। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর শুক্লা পঞ্চমীতে তাঁহার জন্ম হয়। মাত্র ছয় বৎসর বয়সে আমাদের পিতৃবিয়োগ হয়। ধর্ম্মপরায়ণা মাতৃদেবী পাঁচটী অপগণ্ড শিশুকে নিজ বক্ষপুটে গ্রহণ করিয়া এক মাত্র ধর্ম্মকে—'নববিধানকে' জীবনের অবলম্বন করিয়া কি কঠোর জীবন যাপন করেন, তাহার দৃষ্টান্ত এ সংসারে বড়ই বিরল! কত প্রলোভন আসিয়াছিল, কত নির্য্যাতন আসিয়াছিল, কিন্তু তিনি অবিচলিত ছিলেন ; সে সব ঘটনার কথা বলে শেষ করা যায় না।

আমাদের পিতামহ মহাত্মা সূর্য্যকুমার অতি নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন হিন্দু ছিলেন এবং তিনি মহা সমৃদ্ধিশালী জমিদার ছিলেন, অর্থে বিত্তে ও প্রদেশে কেহ তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না ; কিন্তু শেষ জীবনে তাঁহাকে অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে নিপতিত হইতে হয়। বিশেষভাবে তাঁহার উপযুক্ত শিক্ষিত সন্তানেরা—জ্যেষ্ঠতাত ও পিতৃদেব—পৈত্রিক সংসারের সংস্রব ত্যাগ করিয়া, ধর্ম্মের জন্য ও দেশ-সেবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিলেন। অতি অল্প বয়সে, মাত্র ৩৩ বৎসর বয়সে পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করেন। সুতরাং আমাদের বাল্যজীবন বড় কঠোর সংগ্রামের ভিতর দিয়া চলিয়াছিল কি ভীষণ দারিদ্র্য ও দুঃখ কষ্টের ভিতর আমরা লালিতপালিত হইয়াছি। সে নিষ্পেষণে আমরা কিরূপে জীবিত ছিলাম এবং সেই ভীষণ অবস্থার মধ্যে আমাদের মাতৃদেবীর অতি আশ্চর্য্য স্থির ধীর নিষ্ঠা ও ভগবদ্ভক্তি ও নির্ভরতাপূর্ণ অসামান্য শ্রীমূর্ত্তি-খানি চিন্তা করিয়া আজ নিজদিগকে ধন্য মনে করিতেছি।

এই দারিদ্র্য তীব্র হইতে এত তীব্রতর হইল যে, আমাদিগের এই ভাইটীর জন্য ভক্তিভাজন প্রচারক শ্রীমৎ প্রাণকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের শরণাপন্ন হইতে হইল! তিনি দয়া করিয়া তাঁহার আশ্রমে প্রসন্নকুমারকে স্থান দিয়া তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন—যদিও অল্পদিনের জন্য তাহাকে সেখানে থাকিতে হইয়াছিল—তত্রাচ আজও আমি কৃতজ্ঞহৃদয়ে তাঁদের চরণে প্রণত হই এবং পরম জননীকে প্রাণের ভিতর লইয়া তাঁর চরণে অবলুণ্ঠিত হই।

ক্রমশঃ আমি ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম এবং বিধাতার আশীর্ব্বাদে এই সহরের মধ্যেই আমার কর্ম্মস্থল নির্দ্দিষ্ট হইল। তখন কয়টী ভাইকে নিয়ে আমাদের পরমারাধ্যা মাতৃদেবী মহা-

দুঃখের অবসানে একটী ছোট্ট সংসার পাতিলেন। ভীষণ ঝটিকার পর যেমন একটী নিস্তব্ধতা আসে, তেমনি এই কঠোর জীবন-সংগ্রামের পর আমরা চারিটী ভাই মাতৃদেবীর চরণতলে বসিয়া একটু নিশ্চিন্ততার নিঃশ্বাস ফেলিলাম। প্রসন্নকুমারকে কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল। নিজের ক্ষমতা ও চেষ্টায় অতি অল্প দিনের মধ্যেই তিনি সেখান হইতে ভাল করিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। উত্তীর্ণ হইবার অব্যবহিত পরেই চাকুরী লইয়া বাঁকীপুরে তাঁহার কর্ম্মজীবনের প্রথম ভাগটী কাটাইলেন—এখানে তিনি যাঁহাদের সংস্পর্শে আসিলেন, তাঁহাতে তাঁহার ধর্ম্মজীবন গড়ে উঠিবার বিশেষ সহায়তা হইল। অতি অল্প দিনের মধ্যেই তিনি সেখানে সকলের স্নেহপাত্র হইলেন—কিন্তু কিছু দিন পরেই তিনি কলিকাতায় বদলি হইয়া আসিলেন। এই সময়ে আমরা কয়টী ভাই মাতৃদেবীকে বেষ্টন করিয়া কিছু দিন বড় আনন্দে কাটাই। সেই দিনগুলির স্মৃতি আমাদিগের বড় আনন্দের।

আমাদের ভক্তিভাজন প্রচারক শ্রদ্ধেয় কালীনাথ ঘোষ মহাশয় রাজবাড়ীনিবাসী তাঁহার এক বন্ধুর কন্যার সঙ্গে প্রসন্ন কুমারের বিবাহ দেন। তাঁহার কোনও সন্তানাদি হয় নাই, আজ এই দুঃখের দিনে এই অভাবটী আমরা বিশেষভাবে অনুভব করিতেছি।

কর্ম্মক্ষেত্রে তিনি সকলের বড় প্রিয় পাত্র ছিলেন। তাঁহার নির্ব্বিরোধ প্রসন্ন ভাব তাঁহার বন্ধুমণ্ডলীর নিকট বড় আকর্ষণের জিনিষ ছিল; আজ তাঁর বন্ধুমণ্ডলী চারিদিক হইতে সহানুভূতি জানাইয়া, এই দুঃখের দিনে আমাদিগকে কত না সান্ত্বনা দিতেছেন।

কলিকাতা ও অমরাগড়ীতে মণ্ডলীর সেবা করিবার জন্য তাঁর কত না আকিঞ্চন ও উৎসাহ। অমরাগড়ীতে ছেলেদের স্কুল, মেয়েদের স্কুল প্রভৃতির উন্নতির জন্য সব সময় যথেষ্ট যত্ন চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। স্থানীয় সমাজের সহকারী সম্পাদকরূপে বহু দিন কার্য্য করিয়াছেন—প্রতি বৎসর উৎসবের ব্যবস্থার জন্য কত চেষ্টা ছিল। দেশে পিতামাতার সাম্বৎসরিক দিনে উপাসনার ব্যবস্থা করিয়া, নিজে যোগদান করিবার সব সময়ে বিশেষ উৎসাহ ছিল। কলিকাতার মণ্ডলীর সঙ্গেও তাঁহার বিশেষ যোগ ছিল। ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের সংলগ্ন লাইব্রেরীগৃহ এবং মন্দিরের পশ্চাৎ ভাগের গৃহটী বিশেষভাবে প্রসন্নকুমারের চেষ্টা যত্নের ফল। এই দুইটী গৃহের নির্ম্মাণকার্য্যের পর্য্যবেক্ষণের জন্য নিজের সুখ স্বাস্থ্য অবহেলা করিয়াছেন। নববিধান আশ্রমের সংস্কারকার্য্য অধিকাংশ নিজ ব্যয়ে সমাধা করেন। এতদ্ব্যতীত যে কোন ব্রাহ্মবন্ধু যখনই তাঁহার কাছে সাহায্য চাহিয়াছেন, নিজের ব্যক্তিগত ক্ষতি করিয়াও সকল সময়ে সাহায্য করিয়াছেন।

তাঁহার চরিত্রে কতকগুলি সদ্গুণ সকল সময় দেখিয়াছি। নিজে সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে ভালবাসিতেন, নিজের পোষাক পরিচ্ছদও সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিতেন। অত্যন্ত অধ্যবসায়ী ও মিতব্যয়ী ছিলেন, সামান্য আয় হইতে সঞ্চয় করিয়া সুন্দর করিয়া একটী অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। নিজের বাড়ীখানি কতই সুন্দরভাবে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। যিনি তাহা দেখিয়াছেন, তিনিই বিশেষ প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অতিথি অভ্যাগত সকলের মনোরঞ্জন করিতে কত না তাঁহার আগ্রহ ছিল।

গুরুজনের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ছিল, তাঁহার সভক্তি আনুগত্য ও ভ্রাতৃপ্রেম আমাদিগকে সব সময় মুগ্ধ করিয়াছে। পরিবারের শিশু সন্তানদিগকে কত আদরে কত স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। এইরূপ আরও কত গুণের অধিকারী ছিলেন।

বিশেষভাবে ভগবানের উপর দৃঢ় বিশ্বাস কোনও দিন হারান নাই। বিদায়ের শেষ দৃশ্য কি সকরুণ! সারা দিন অজ্ঞান অবস্থায় কাটাইলেন, কারো সঙ্গে কোনও কথা হইল না; হঠাৎ রাত্রি ৮৷৷॰ টার সময় জ্ঞান হইল, সকলে কত আশায় উৎফুল্ল হইলেন। নিজের স্ত্রীকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "আমি একটু আগে চলিলাম—আর আমাকে ক্ষমা করো—কত সময় ভাল ব্যবহার করিতে পারি নাই।" জিজ্ঞাসা করা হইল, কোথায় যাইবে? স্থিরভাবে উত্তর করিলেন, স্বর্গে যাইতেছি।

আমাকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "দাদা, সব শেষ, আপনারা আমাকে রাখিতে পারিলেন না।" ক্রমশঃ সকলকে একে একে ডাকিয়া বিদায় চাহিলেন, তাহার পর দুইটী হাত যোড় করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ভগবান্‌কে ডাকিলেন—তারপর নীরবে প্রার্থনা করিলেন। সত্যই তার পর সব শেষ।

—০—

প্রার্থনা

(ভক্ত শ্রীনাথের স্মৃতিবাসরে পঠিত)

"Blessed are they that mourn for they shall be comforted."—Jesus

"As the cloud darkens the earth but to cool and fructify it, so the clouds of grief cast a shadow over the heart to prepare it for noble things."

—James Allen.

"I know my sheep and my sheep know me."

—Gew Misce

ইচ্ছাময় ঠাকুর! তুমি আজ তোমার বিধানে কোন তীর্থে আনিলে! তোমার নববিধানে কি তুমি সবই নূতন করিতেছ? আজ যাঁর স্মৃতি তীর্থে আনিলে, তাঁহাকে কোন্ ভাষায় সম্বোধন করিব, জানিনা। তাঁহাকে পিতা বলিব, কি মাতা বলিব? তুমি আজ আমাদিগকে লইয়া এই পবিত্র শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত হইলে।

যখন তোমার এই নববিধানভক্ত সন্তানের দিকে তাকাইয়াছি ও তোমার ব্রহ্মমন্দিরে তাঁহার পার্শ্বে বসিয়াছি, তখন তাঁহাকে তন্ময় ঋষির মত তোমার উপাসনায় সব ভুলিয়া যাইতে দেখিয়াছি। ঠাকুর! প্রায় ষাট বৎসর পূর্ব্বে এই তন্ময় ঋষির পার্শ্বে বসিয়া, আমাদের ধর্ম্মপিতা শ্রীব্রহ্মানন্দের প্রাণস্পর্শী উপাসনায়, তাঁহার সঙ্গে যে মহামিলন ও মধু যোগের সম্বন্ধ অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা এখনও নবীন স্মৃতির মত সম্মুখে বর্ত্তমান। তোমার ভক্ত যে বিশ্বাসে হিমালয়ের মত অটল, প্রেম ভক্তিতে যে মীরা, মৈত্রেয়ী ও সরলতায় শিশু ধ্রুব ও তোমার নববিধানে ব্রহ্মানন্দের একখানি পঞ্জর হইয়া, তাঁহার ধর্ম্মজীবনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গেলেন। নববিধানের উপর কত তরঙ্গ তুফান আসিল, আর ভক্ত শ্রীনাথ বিশ্বাসের হাল ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন! তোমার প্রেরিত ও তোমার আজ্ঞা-সম্মত কুচবিহার বিবাহ আসিল ও যে তরঙ্গে কত লোক কোন দিকে ভাসিয়া গেল, সেই তরঙ্গে বিশ্বাসী শ্রীনাথ বালক নাবিক কাসাবায়াংকার মত স্বস্থানে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। তোমার প্রত্যাদেশ ও তোমার সুসমাচারের নিকট মস্তক অবনত করিলেন। আজ তাই বলিতেছি যে, তোমার এই ঋষিকে পিতা বলিব, কি মাতা বলিব, কিম্বা অটল শিক্ষাগুরু বলিব, তাহা জানি না। তিনি যে অনেক কিছুর মহাদৃষ্টান্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। শ্রীনাথ তোমার নির্দ্দিষ্ট শ্রীধামে প্রবেশ করিলেন। আজ কি তুমি তাই তোমার এই বিলাপকারী এই সমস্তের ভিতর সান্ত্বনা দিতে আসিলে? আজ কি তাই বলিতে আসিলে যে, "আকাশের মেঘ পৃথিবীকে শীতল ও শস্যপ্রসূ করিবার জন্য তোমার বিধানে প্রকাশিত হইতেছে?" আজ কি তুমি বলিতেছ যে, "আমি আমার ভক্তকে জানি ও ভক্তও আমাকে জানেন?" ঠাকুর, আজ তুমি তাহাই শিখাও! আজ তোমার ভক্তের ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী, যিনি তোমার কাছে উপস্থিত, তাঁহাকে তাঁহার অনন্তকালের সহধর্ম্মিণী করিয়া আরও উচ্চতর নববিধানে দীক্ষিত কর এবং তাঁহার বিশ্বাসী পুত্রকেও এই নববিধান শিখাও। ইঁহাদের সঙ্গে আমরাও শিখিয়া লই—তোমার নিকট আজ এই ভিক্ষা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

—•—

আত্মিক যোগ

(শ্রীশ্রীনাথ দত্তের শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত)

শ্রদ্ধেয় ভ্রাতঃ! আজ আপনার অদেহী আত্মা পৃথিবীর শোকতাপ, জ্বালা যন্ত্রণা, সুখ দুঃখ ও আনন্দ অবসাদের অতীত হইয়া, দিব্যধামবাসী অমর আত্মাদের সহিত মিলিত হইয়াছে। আজ আপনার সতী সাধ্বী, পুত্র ও পরিবারবর্গ, আত্মীয় বন্ধুগণ আপনার বিচ্ছেদে শোকার্ত্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আজ আপনার পবিত্র আত্মার স্পর্শ লাভ করিবার জন্য আমরা কত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছি। আমরা আরো ব্যাকুল হইয়াছি এই জন্য যে, আপনার জন্য আমাদিগের যাহা করা উচিত ছিল, তাহা হয়ত সব করি নাই—যাহা ভাবা উচিত ছিল, তাহা হয়ত সব ভাবি নাই—যাহা বলা উচিত ছিল, তাহা হয়ত সব বলি নাই। এখানে আমরা যেমন কাতর হইয়া পড়িয়াছি, আজ আপনিও আপনার চিরজরাগ্রস্ত মন লইয়া আমাদের জন্যও আপনি বেদনা অনুভব করিতেছেন। মৃত্যু বিশ্বাসীর পক্ষে ভয়াবহ নহে। আপনি তাহার পরিচয় দিয়া গেলেন। যার নাম করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। আপনার এই আদর্শ আমাদের পথপ্রদর্শক হউক! আপনিও আমাদের সকল কথা বলিয়া যাইতে পারিলেন না। যাহা আপনার করণীয় ছিল, তাহা শেষ হইল না। এখানে সকল সাধ পূর্ণ হয় নাই। সেইজন্য বিধাতা পরলোক সৃষ্টি করিলেন, এখানে যাহা পূর্ণ হইল না, তাহা পরলোকে পূর্ণ হইবে। আজ আপনার বিদেহী আত্মা ব্রহ্মানন্দদলে মিশিয়া পূর্ণানন্দ সম্ভোগ করিতেছেন। আপনি উন্নত হইতে আরো উন্নত লোকে বিহার করুন! স্বর্গের শান্তি সম্ভোগ করুন! আজ বিধাতাও আমাদের শোকার্ত্ত প্রাণে স্বর্গের সান্ত্বনা প্রেরণ করুন!

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

—•—

সপ্তাধিকশততম মাঘোৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১১ই মাঘ, ব্রহ্মমন্দিরে সমস্তদিনব্যাপী উৎসব। প্রাতে ৭॥টায় কীর্ত্তন, কীর্ত্তনের পরে ৮॥টায় উপাসনা আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস এ বেলায় উপাসনার কার্য্য করেন। উদ্বোধনে বলা হয়—"উৎসব তোমার প্রণতির মধ্যে"। ঈশ্বরের চরণে প্রণাম, তৎপর সাধু ভক্ত মহাজনগণের চরণে প্রণাম; ধর্ম্মপিতামহ রামমোহন, ধর্ম্মপিতা দেবেন্দ্রনাথের চরণে প্রণাম, ভক্ত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের চরণে প্রণাম। এই প্রণতি মধ্যে ঈশ্বরচরণে, সাধুভক্তচরণে আত্মার অবনতি, আত্মার দীনতাপূর্ণ আত্মসমর্পণ—এই প্রণতি-যোগে জীবাত্মায় ঈশ্বরের অবতরণ, স্বর্গের অবতরণ, তাই উৎসবের অবতরণ। তাই মিলিত প্রণতিতে জীবনময় উৎসব, মহা মহোৎসব। দীর্ঘ আরাধনা, ধ্যান, সমস্বরে প্রার্থনা, সাধারণ প্রার্থনা ও পাঠাদির পর দীর্ঘ সারগর্ভ উপদেশ হয়। উপদেশ মধ্যে কয়েকটী বিশেষ কথার এখানে উল্লেখ মাত্র হইল।

বিভিন্ন মহাপুরুষ, বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র, প্রকৃতিরাজ্যের সকল বিচিত্রতার মধ্যে এক অখণ্ড ঈশ্বর-সত্তা বর্ত্তমান বলিয়া, সকল

বিচিত্রতা লইয়া মহা সমন্বয়-সাধন সম্ভব হইয়াছে। নববিধানের সমন্বয় একটা নূতন জগৎ। কীর্ত্তির অর্থ সৌন্দর্য্যরচনা। জীবনে যেখানে বিচিত্রতার মিলন, সেখা ন সৌন্দর্য্য। প্রাণময় বিচিত্রতায় সমন্বয়ের সৌন্দর্য্য। বিধান প্রকাশিত হয় চরিত্রে। প্রত্যেকের মধ্যে তিনি স্বর্গ। নববৃন্দাবন সেইখানে, যেখানে শ্রীহরি সকল জীবনের মধ্যে আপনাকে ঢেলে দিয়াছেন। শ্রীহরি আপনাকে বন্ধুরূপে ঢেলে দিয়াছেন, তাই পরমেশ্বরের মধ্যে বন্ধুসম্মিলন। অতীত বর্ত্তমান সকল বিধানের মীমাংসা, সকল প্রকারের সমন্বয় এই উপাসনার ভিতর দিয়া। বিধানে Miracle হয়। Logic ও Magic—সৃষ্টি Magic এ পূর্ণ। ঋষিগণ সৃষ্টিকে মায়া বলেছেন। মায়া অর্থ Magic, Magic অর্থ অপরূপ সৌন্দর্য্য। পবিত্রাণের অর্থ মাণিক মন্ত্রে মাণিক। নূতন বিধানে বন্ধুতা-স্থাপন একে অন্যে অনুপ্রবিষ্ট হওয়া। উপাসনা প্রার্থনার মধ্য দিয়া জীবনলাভ। মুহূর্ত্ত পরিবর্ত্তন—প্রতাপচন্দ্রের জীবনের পরিবর্ত্তন। রামকৃষ্ণের জীবনের প্রভাবে বিবেকানন্দের জীবনের পরিবর্ত্তন। শেষে প্রণতি মন্ত্র প্রার্থনা করেন।

অপরাহ্ণ ৩টার পর ভাই অমৃতলাল রায় মধ্যাহ্নের উপাসনা নির্ব্বাহ করেন। তৎপর পাঠ প্রসঙ্গ হয়। শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্রনাথ রায় "নিরবলম্ব সাধন" আচার্য্যদেবের উপদেশ পাঠ করেন। তদবলম্বনে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ প্রসঙ্গ করেন। তৎপর শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি প্রসঙ্গ করিলে কীর্ত্তনের সময় উপস্থিত হয়। তৎপর বিধানমুকুলী শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে কীর্ত্তন হয়। ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ সন্ধ্যা বেলায় উপাসনার কার্য্য করেন।

১২ই মাঘ, নববিধান-ঘোষণার দিন। প্রাতে ৮টার পর ব্রাহ্মমন্দিরে উপাসনা ভাই গোপালচন্দ্র গুহ নির্ব্বাহ করেন। এদিনের গৌরব, গুরুত্ব ও নববিধানের বিশেষ বিষয় উপাসনা ও আত্মনিবেদনে বিবৃত হয়। অপরাহ্ণ ৫॥টার পর ব্রহ্মমন্দির হইতে নগরকীর্ত্তন বাহির হয়। এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় নির্দ্দিষ্ট রাজপথ ঘুরিয়া কীর্ত্তনের দল প্রমত্ত কীর্ত্তন করিতে করিতে নবদেবালয়ে উপস্থিত হইয়া কীর্ত্তন শেষ করেন। তৎপর শান্তিকুটীরে প্রীতিভোজন হয়।

১৩ই মাঘ, প্রাতে ৯টায় মঙ্গলবাড়ীর উৎসব। নবদেবালয়ে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ এই উৎসব উপলক্ষে পূর্ব্বাহ্ণে উপাসনা করেন। উপাসনার পর নবদেবালয় হইতে কীর্ত্তন করিতে করিতে সাধু অঘোরনাথের সমাধিক্ষেত্রে যাওয়া হয়। কীর্ত্তনান্তে শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্রনাথ রায় ও ভাই গোপালচন্দ্র গুহ প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যায় কমলালেবু বিতরণ করা হয়। এদিন প্রাতে ৮টায় ১৪৮নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটে কেশব একাডেমী স্কুলে উৎসব হয়। লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল জ্যোতিলাল সেন (I.M.S) উপাসনা করেন।

১৪ই মাঘ, ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৯টায় আর্য্যনারীসমাজের ও ব্রাহ্মিকাসমাজের উৎসব হয়। মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী উপাসনার কার্য্য করেন। শ্রীমতী নির্ভরপ্রিয়া ঘোষ তাঁহার নিজের লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন।

১৫ই মাঘ, প্রাতে ৯টায় ১২।১ বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীটে অনাথ-আশ্রমের উৎসব হয়। ভক্তিমতী শ্রীমতী মলিকা মহলানবিশ উপাসনার কার্য্য করেন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ, শ্রীমতী হেমলতা চন্দ ও শ্রীযুক্ত হরিপদ ত্রিবেদী প্রার্থনা করেন। উপাসনার শেষভাগে প্রমত্ত কীর্ত্তন হয়। এদিন সন্ধ্যা ৭টায় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভা হয়। ডাঃ জ্যোতিলাল সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। আগামী বৎসরের জন্য শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন।

১৬ই মাঘ, ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটে অপরাহ্ণে ৫টায় প্রচারকার্য্যালয়ে উৎসব। শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দের নেতৃত্বে প্রায় ৭টা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন হয়। তৎপর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়চন্দ্র মজুমদার নববিধান বিষয়ে, ভক্ত ব্রহ্মানন্দ-জীবনের সংস্পর্শে তাঁহার আপনার জীবনের জীবন্ত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া, সাক্ষ্য দান করেন। এই সাক্ষ্যদান স্থানান্তরে দ্রষ্টব্য। তৎপর মহারাণী সুচারু দেবী উপাসনা করেন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ এস্থানের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া প্রার্থনা করেন।

১৭ই মাঘ, বালকবালিকাদিগের নীতিবিদ্যালয়ের উৎসব। প্রাতে ৮টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা অধ্যাপক খড়্গসিংহ ঘোষ নির্ব্বাহ করেন। অপরাহ্ণ ৪॥টায় ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট হলে বালকবালিকাসম্মিলন ও পুরস্কার-বিতরণ হয়। লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল জ্যোতিলাল সেন (I.M.S.) সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। সভায় বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ, বালকবালিকাদের কর্ত্তৃক সঙ্গীত, আবৃত্তি, খণ্ড অভিনয় প্রভৃতি কার্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন হয়। পুরস্কারবিতরণের কার্য্য শেষ হইলে সভাপতির অভিভাষণান্তে সভার কার্য্য শেষ হয়।

১৮ই মাঘ, ১৪৮নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটে অপরাহ্ণ ৪টায় সুনীতি-বিদ্যালয়ের পুরস্কারবিতরণের কার্য্য কুমার হিরণ্যকুমার মিত্রের সভাপতিত্বে সম্পন্ন হয়, সভাপতি স্কুলফণ্ডে ১২০৲ টাকা দান করেন। মিসেস জে, সি, মুখার্জ্জি পুরস্কার বিতরণ করেন। সন্ধ্যা ৬॥টায় ব্রহ্মমন্দিরে অধ্যাপক খড়্গসিংহ ঘোষ উপাসনা করেন। তিনি শান্তিবাচনের বিচিত্রতা বিষয়ে উপদেশ দেন। তৎপর কমলকুটীরস্থ নবদেবালয়ে শান্তিবাচন হয়। সঙ্গীত, কীর্ত্তন ও প্রার্থনা এবং আচার্য্যদেবকৃত শান্তিবাচনের প্রার্থনা পঠিত হইলে, শেষ কীর্ত্তন হইয়া শান্তিবাচনের কার্য্য শেষ হয়।

২৫শে মাঘ, রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের আলমবাজারস্থ বাগানে উদ্যান-সম্মিলন উৎসব সম্পন্ন হয়। পূর্ব্বাহ্ণে ১০॥টার পর উপাসনা হয়। মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী সুমিষ্ট উপাসনা করেন। শ্রীমতী মলিকা মহলানবিশ আচার্য্য-

দেবের প্রার্থনা পাঠ করিয়া নিজেও প্রার্থনা করেন। তৎপর প্রীতিভোজন হয়। অপরাহ্নে ম্যাজিক, ছেলেদের খেলা ধূলা ইত্যাদি আমোদ প্রমোদ হয়। শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত দিননাথ সরকার এই উৎসবে প্রীতিভোজনের প্রায় সমস্ত ব্যয় ভার বহন করিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

এই মহা মহোৎসবে উৎসব-জননীর অপার কৃপা স্মরণ করিয়া, তাঁহার শ্রীপদে বারবার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

সংবাদ।

জন্মদিন—গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী, চট্টগ্রামে নবীনভবনে, ডাঃ শৈলেন্দ্রভূষণ দত্তের জ্যেষ্ঠপুত্র ডাঃ শ্রীমান্ বিনয়শেখর দত্তের (এম.বি.) শুভজন্মদিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

শুভবিবাহ—গত ১লা ফাল্গুন (১৩ই ফেব্রুয়ারী), বালীগঞ্জে, স্বর্গগত শাস্ত্রসাধক ভাই কেদারনাথ দের পৌত্রী, শ্রীযুক্ত মনোনীতধন দের প্রথমা কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী সুধীরার (B.Sc.) সহিত, কিশোরগঞ্জের অন্তর্গত চাতলনিবাসী স্বর্গীয় কমলাকান্ত দাশ রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ সূর্য্যকান্ত দাশ রায়ের (M.Sc.) শুভবিবাহ নবসংহিতা অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ শুভানুষ্ঠানে আচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য্য করেন। ভগবান্ নবদম্পতিকে শুভাশীষ দান করুন। কন্যার পিতা প্রচারভাণ্ডারে ২৲ দান করিয়াছেন।

তীর্থ-বাস—ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক ও ভাই অখিলচন্দ্র রায় গত ৬ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১২ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত পুরী নবশ্রীক্ষেত্রে গিয়া তীর্থবাস সাধন করেন। ১১ই ফেব্রুয়ারী বিশেষ উপাসনা ও প্রার্থনান্তে, নবনির্ম্মিত প্রেমেন্দ্র-স্মৃতিতীর্থ হলে শ্রীমৎ নববিধানাচার্য্যদেবের ও শ্রীমান্ প্রেমেন্দ্রনাথের ছবি প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ১২ই বালেশ্বর যোগকুটীরে শ্রীমান্ পূর্ণচন্দ্র দাসের গৃহে পরিবারবর্গ সহ উপাসনাদি করা হয় ও কয়েকটী বিশ্বাসী পরিবারেও প্রার্থনাদি করা হয়।

উৎসব—কুচবিহারে মাঘোৎসব উপলক্ষে, ১১ই মাঘ, সমস্তদিনব্যাপী উৎসবে, নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৭॥টা হইতে সঙ্গীত ও কীর্ত্তন এবং তৎপর প্রার্থনা, ৯টায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে উপাসনা, মধ্যাহ্নে ১১॥টায় কেশবাশ্রমকুটীরে উপাসনা, সন্ধ্যা ৫॥টায় পাঠ, আলোচনা এবং সংকীর্ত্তন, তৎপরে উপাসনা। ১২ই মাঘ, প্রাতে ৮টায় কেশবাশ্রমস্থিত সমাধিপার্শ্বে উপাসনা ও শান্তিবাচন। শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী উপাসনাদি করেন।

পারিতোষিকবিতরণ—গত ৮ই ফেব্রুয়ারী, এলবার্ট হলে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সভাপতিত্বে, কলিকাতা শ্রমজীবিবিদ্যালয়ের পুরস্কার-বিতরণ যথাবিহিতরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

দীক্ষা—গত ১লা ফেব্রুয়ারী, স্বর্গীয় সাধক মহেন্দ্রনাথ নন্দনের পৌত্রী, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ নন্দনের কন্যা কল্যাণীয়া কুমারী সবিতা নবসংহিতামতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া নববিধানমণ্ডলীভুক্ত হন। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক দীক্ষা দান করেন। ভগবান্ নবদীক্ষিতাকে শুভাশীষ দান করুন।

আদ্যশ্রাদ্ধ—গত ২রা ফাল্গুন, (১৪ই ফেব্রুয়ারী) ৩৬ ডি, যতীনদাস রোডে (কালীঘাট), স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার রায়ের আদ্যশ্রাদ্ধ নবসংহিতামতে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক ও ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনাদি করেন, ডাঃ সত্যানন্দ রায় শ্লোকাদি পাঠ করেন। রায় সাহেব ডাঃ প্রবোধচন্দ্র রায় অগ্রজ ভ্রাতার সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন। তাহা স্থানান্তরে দেওয়া গেল। ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ প্রশান্তকুমার ভ্রাতাদের সঙ্গে দণ্ডায়মান হইয়া প্রধান শোককারীর প্রার্থনা পাঠ করেন। এই উপলক্ষে ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ প্রশান্তকুমার ও শ্রীমান্ পরমানন্দ প্রভৃতি পাঁচ জনের নামে অনাথাশ্রমে পাঁচটা তোজা ২৫৲, নববিধান প্রচারাশ্রমে ১০৲ এবং অমরাগড়ি নববিধান ব্রাহ্মসমাজে ১৫৲ টাকা, মোট ৫০৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

গত ৯ই মাঘ (২১শে ফেব্রুয়ারী), ৪৫নং বেনিয়াটোলাস্থ "মিত্র-ইন্‌ষ্টিটিউসন" গৃহে (হ্যারিসন রোড ও বেনিয়াটোলার সংসনে) স্বর্গীয় শ্রীনাথ দত্তের আদ্যশ্রাদ্ধ নবসংহিতামতে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক ও ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনাদি করেন। ডাঃ সত্যানন্দ রায় শ্লোকাদি পাঠ করেন। পুত্র বিধানমুরলী শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রধান শোককারীর প্রার্থনা পাঠ করিয়া প্রার্থনা করেন। শ্রীমান্ সুধীরকুমার দাস দাদামহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসাদ মজুমদারের ও শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রেরিত প্রার্থনা পাঠ করেন। প্রার্থনা দুটী স্থানান্তরে দেওয়া গেল। অনেকেই পবিত্র অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া আচার্য্যদেবের সমকালীন বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রদ্ধেয় আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করিয়াছেন। এই উপলক্ষে নিম্নলিখিত দান উৎসর্গিত হইয়াছে :—

পুত্রের দান :—

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির ১০৲, নববিধান প্রচারাশ্রম ১০৲, ঢাকা নববিধানসমাজ ৫৲, ময়মনসিংহ নববিধান সমাজ ৫৲, চট্টগ্রাম নববিধান সমাজ ৫৲, মুঙ্গের নববিধান সমাজ ৫৲, পাটনা নববিধান সমাজ ৫৲, ভাগলপুর নববিধান সমাজ ৫৲, করাচী নববিধানসমাজ ৫৲, হায়দ্রাবাদ নববিধানসমাজ ৫৲, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ রিলিফ ফাণ্ড ৫৲, উত্তর সাজড় গ্রামের দরিদ্রদিগের জন্য ২০৲, কলিকাতা হিন্দু অনাথাশ্রম ৫৲, কলিকাতা মুসলমান অনাথাশ্রম ৫৲, মোট ১০০৲ টাকা; এবং ২টা তোজা ও ৫টা কাঁসার গেলাস।

কন্যা শ্রীমতী সুমনা দত্তের দান—

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির ৫৲, নববিধান প্রচারাশ্রম ৫৲, কলিকাতা হিন্দু অনাথাশ্রম ৫৲, মোট ১৫৲ এবং একটী তোজা।

দৌহিত্রী শ্রীমতী সুদেবী গোড়ির দান—

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির ৫৲, নীতিবিদ্যালয় (বালক এবং

বালিকাদিগের) ৫৲, ভগ্নীসমিতি ৩৲, ব্রাহ্ম রিলিফ ফাণ্ড ২৲, মোট ১৫৲।

এতদ্ব্যতীত বন্ধু শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১০৲ টাকা এবং ভ্রাতুষ্পুত্র রাসেন্দ্রনাথ দত্ত ১০৲ শ্রদ্ধার সহিত দরিদ্রদিগের সেবার জন্য দান করিয়াছেন।

পরমজননী তাঁর প্রিয় সন্তানদিগের আত্মাকে তাঁর শান্তি-ক্রোড়ে স্থান দান করুন এবং শোকার্ত্ত পরিবারে ও আত্মজনগণের প্রাণে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ৩০শে জানুয়ারী, কলিকাতায় স্বর্গীয় মিসেস পি, সি, সেনের সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে, পুত্র মিঃ অমরেন্দ্রনাথ সেনের ল্যান্সডাউন রোডস্থ ভবনে ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন।

গত ১লা ফেব্রুয়ারী, স্বর্গীয় গৃহস্থ প্রচারক রামমোহন বসুর কন্যা কুসুমকুমারীর সাম্বৎসরিক দিনে নবদেবালয়ে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন।

গত ১লা ফাল্গুন, বালীগঞ্জে, ৪৩নং ফার্ণরোডে, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চাটার্জির গৃহে, তাঁহার শ্বশুর স্বর্গীয় রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে, শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস উপাসনা করেন।

অদ্য ২০নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীটে, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মুখার্জির গৃহে, তাঁহার শ্বশুর স্বর্গীয় শরৎকুমার লাহিড়ীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে, ডাঃ সত্যানন্দ রায় উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী মনোরমা মুখার্জি প্রচারভাণ্ডারে ১০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

অদ্য বেলগাছিয়া কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের রেসিডেণ্ট সার্জ্জন ডাঃ বিবেকমোহন সেনের পিতৃদেব স্বর্গীয় মদনমোহন সেনের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। সহধর্ম্মিণী বিশেষ প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

গত ৩রা ফাল্গুন, শ্রীপঞ্চমীতিথিতে ১০।২ পটুয়াটোলা লেনে, শ্রীযুক্ত বিভুরঞ্জন দাশের গৃহে, তাঁহাদের পিতৃদেব ও মাতৃদেবী, চট্টগ্রাম আশাকুটীরের স্বর্গীয় রায় বাহাদুর কৈলাসচন্দ্র দাশ ও তাঁহার সাধ্বী সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া ইচ্ছাময়ী দেবীর পুণ্যস্মৃতি উপলক্ষে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

অদ্য ৬৫।১ হ্যারিশন রোডে, স্বর্গীয় শ্রীনাথ দত্তের কন্যা স্বর্গীয়া সুরমা দেবীর সাম্বৎসরিক দিনে অধ্যাপক খড়্গসিংহ ঘোষ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে স্বামী শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ দত্ত প্রচারভাণ্ডারে ৪৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী, স্বর্গগত ভাই মহেন্দ্রনাথ বসুর সাম্বৎসরিক দিনে নবদেবালয়ে ও তাঁর গৃহে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন।

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী, বালীগঞ্জে শ্রীমান্ অমিয় সেনের গৃহে, ডাঃ এককড়ি সিংহের সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। স্থানীয় অনেকগুলি বন্ধুবান্ধব যোগদান করেন।

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী, ৭নং ময়ূরভঞ্জ রোডে, রাজবাগে, ময়ূরভঞ্জের স্বনামধন্য ভূতপূর্ব্ব মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জ দেওর সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী, ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক ও সেবিকা হেমলতা চন্দ বিশেষ প্রার্থনা করেন।

অদ্য সন্ধ্যায়, ৫৫নং ক্যানাল ইষ্ট রোডে, বার্ড কোম্পানীর ইণ্ডিয়ান প্যাটেণ্ট ষ্টোন ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার গুপ্তের সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া উমা দেবীর সাম্বৎসরিকে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

অদ্য সন্ধ্যায়, স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ নন্দনের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে, পুত্র শ্রীমান্ মণীন্দ্রনাথ নন্দনের গৃহে, ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন।

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী, রামকৃষ্ণ নিত্যধামে প্রাতে ও সন্ধ্যায়, স্বর্গীয় লোকনাথ মল্লিকের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে পত্নী প্রচারভাণ্ডারে ২৲ দান করেন।

গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী, চট্টগ্রামে প্রসাদভবনে, স্বর্গীয় রাজেশ্বর গুপ্তের সহধর্ম্মিণীর প্রথম সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে ভাই অক্ষয়কুমার লধ কলিকাতা হইতে তথায় গিয়া উপাসনাদি করেন। পূর্ব্বদিনও পারিবারিক ভাবে উপাসনা হয়। দুইদিনই জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন গুপ্ত ও মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত শান্তিপদ গুপ্ত প্রার্থনা করেন। ২৬শে উপাসনান্তে সমাধিতীর্থে গিয়া কীর্ত্তন ও প্রার্থনা হয়। শ্রীযুক্ত জানকীনাথ দাস ও ভাই অক্ষয়কুমার লধ প্রার্থনা করেন। স্থানীয় ব্রাহ্মগণ প্রায় সকলেই যোগদান করেন। এই উপলক্ষে চট্টগ্রাম নববিধান সমাজ ৩৲, কলিকাতা প্রচারভাণ্ডার ২৲, আতুর আশ্রম ২৲, কুষ্ঠাশ্রমে ২৲ টাকা এবং ১৫০জন ভিখারীকে চাউল আদি দান করা হইয়াছে। উক্ত দিবসে কলিকাতায় শ্রীমান্ ব্রহ্মানন্দ গুপ্তের গৃহে, ৫৭।২এ রাজা দিনেন্দ্র ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস উপাসনা করেন। কয়েকজন বন্ধু বান্ধব যোগদান করেন।

"আচার্য্য কেশবচন্দ্র"

"আচার্য্য কেশবচন্দ্র" পুনর্মুদ্রণের নিমিত্ত, ১৬ই কার্ত্তিক ও ১লা অগ্রহায়ণের ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত দানপ্রাপ্তি ব্যতীত, নিম্নলিখিত দানপ্রাপ্তি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি :—

পূর্ব্বপ্রকাশিত দানপ্রাপ্তি	১৮১৭৲
শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মিত্র	২৲
" কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
মিসেস নবজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
Lt. Col. J. L. Sen (2nd instalment)	৮০৲
(পূর্ব্বের দেওয়া ২০৲ লইয়া মোট ১০০৲)	
Prof. B. B. Dey (Madras Presidency College)	২৫৲
Mr. J. C. Mukerji (Chief Executive Officer, Calcutta Corporation)	১০০৲
শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র দাস	২৲
শ্রদ্ধেয় হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের আদ্যশ্রাদ্ধে দান	১০৲
শ্রীমতী অকিঞ্চনবালা বসু (ভাগলপুর)	৫০৲
শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসাদ মজুমদার (পাটনা)	১৫৲
অপূর্ব্বকৃষ্ণ পাল ট্রষ্ট ফণ্ড (পাটনা)	১০০৲
মোট	২২০৩৲

"জ্ঞানকুটীর", নিউকাটরা, এলাহাবাদ। } শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

Edited on behalf of the Apostolic Durber New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priya-nath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্।
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭২ ভাগ। ৫ম সংখ্যা। | ১লা চৈত্র, সোমবার, ১৩৪৩ সাল, ১৮৫৮ শক, ১০৮ ব্রাহ্মাব্দ
15th. March, 1937 | অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা

হে জীবনের পরম সারথি! এ নবযুগে, নববিধানে ধর্ম্মপথের পথিক যাঁহারা, তাঁহাদিগের জীবনের কণ্টকময়, পরীক্ষাময় বিপদসঙ্কুল, অথচ অনন্ত উন্নতির পথে, জীবন-পরিচালনের ভার তুমিই গ্রহণ করিয়াছ। ইহা অপেক্ষা মানবজীবনের পথে কল্যাণকর ব্যবস্থা আর কিছুই হইতে পারে না। সঙ্গীতে শুনিতে পাই "আন্ধারে নামিয়া, আন্ধার ঠেলিয়া, আন্ধারে চলিয়া যাই; আছেন জননী এইমাত্র জানি, যা থাকে কপালে ভাই।" জীবনপথে এই আলোক, এই অন্ধকার; অন্ধকারের পর আবার অন্ধকার, ইহাতো পূর্ব্বে জানিতাম না। এই সংসারের পথে শরীর বলি, ধন, জন, বিত্ত, স্বামিত্ব যে কোন কিছু বলি, এ সকলেরই এই বৃদ্ধি, এই ক্ষয়, এই ধ্বংস। এই আশার প্রদীপ জ্বলিতেছে, কোথা হইতে একটা ঝাপটা প্রতিকূল বাতাস উঠিয়া সে প্রদীপ নিবাইয়া দিতেছে। কি রহস্যময়, পরীক্ষাময় এই বহির্জ্জগৎ! অন্তর্জ্জগৎ কি আরও রহস্যময়, পরীক্ষাময় নয়? প্রথমে কত অন্ধকার, পরে কি আশার দিবালোক! বহির্জ্জগৎ ও ও অন্তর্জ্জগৎ এই দুই লইয়াই আমাদের জীবন। এই উভয় জগতে আমাদের যথার্থ জ্ঞানদাতা গুরু তুমি, পথ-প্রদর্শক তুমি, বুদ্ধিদাতা, বলদাতা ও অভয়বাণীতে পরিচালক তুমি। বাহিরের কোন শিক্ষাই এ পথে যথেষ্ট নয়, অন্য কাহারও পরিচালন এখানে নিরাপদ নয়। তোমার শিক্ষায় বুঝিতেছি, অন্তর্জ্জগতের উন্নতিই মানবজীবনের লক্ষ্য, বহির্জ্জগতের যাহা কিছু সকলই সেই সাধনে সহায়তার জন্য। বাহিরের ব্যাপার দুই দিনের জন্য, আত্মিক জগতের ব্যাপার অনন্তকালের জন্য। কিন্তু হায়! জীবনের পরীক্ষায় বুঝিতেছি, এখনও কুহক-মুক্ত হইয়া, তোমার একমাত্র পরিচালনে পরিচালিত হইতে শিখি নাই, এখনও তোমার অভয়বাণীর অনুসরণে সম্পূর্ণ ভীতিমুক্ত হই নাই। এখনও, হে জননি! তোমার শ্রীমুখ দর্শন করিয়া, আত্মহারা হইয়া, তোমার অমৃত ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি নাই। এখনও তোমার বল সম্বল করিয়া সকল পরীক্ষা বিপদকে ভ্রূকুটী দেখাইয়া, বিশ্বাসের জ্বলন্ত সাক্ষ্যদান করিতে পারি নাই। তাই কাতর প্রার্থনা, জীবনপথে অন্ধকার আসে আসুক, পরীক্ষা আসে আসুক, যেন তোমার আলোকে সকল অন্ধকারমুক্ত হইয়া, তোমার বলে ও পরিচালনে সকল পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, অনন্তের পথে, অমৃতের পথে, আমরা তোমার সাধুভক্ত সঙ্গিদলসহ অগ্রসর হইতে পারি, তুমি সেই আশীর্ব্বাদ কর। এ পথে আরও সহায় হও। কৃপা করিয়া এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

সাধনের ত্রিধারা

বিশ্লেষণে ঈশ্বরের বিচিত্র স্বরূপ-সাধন, বিশ্লেষণে ঈশ্বরের বিভিন্ন প্রকাশের জমাট ও গভীর সাধন মহা সমন্বয়ের নবধর্ম্ম নববিধানের সাধনার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। সত্যং জ্ঞানং অনন্তং প্রভৃতি স্বরূপ অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের সত্তা সাধন, ঈশ্বরের ধ্যান ধারণা সাধনা আমাদের সাধনার সাধারণ পন্থা। এই সাধন-যোগে ঈশ্বরের বিচিত্র প্রকাশ, বিবিধ প্রকাশ সম্ভব হইয়াছে। বর্ত্তমান বিধানে এই সাধনা-যোগে ঈশ্বরের ত্রিবিধ প্রকাশ বিশেষ-ভাবে আমাদের অবলম্বনের বিষয় হইয়াছে, এবং ধ্যান ধারণার বিষয় হইয়াছে। এই ত্রিবিধ প্রকাশের প্রথম প্রকাশ 'ব্রহ্ম'নামে, দ্বিতীয় প্রকাশ 'হরি'নাম, তৃতীয় প্রকাশ 'মা' নামে পরিব্যক্ত হইয়া থাকে। 'ব্রহ্ম'নাম বৃহদ্‌ভাববোধক। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বড়, যিনি অনন্ত, তাঁহাকে ব্যক্ত করিবার উপায় এই 'ব্রহ্ম' শব্দ। ব্রহ্ম বলিলেই অসীম কে বুঝায়। প্রথম ব্রহ্মনামে ঈশ্বরের প্রকাশ, এই নূতন যুগে নববিধানে সমাগত। সমগ্র বঙ্গ, ভারত, এমন কি সমগ্র পৃথিবীর জন্য, এই বৃহৎ ভাব, অনন্ত ভাবের প্রকাশক ব্রহ্মনামে ঈশ্বরের প্রকাশ প্রয়োজন হইয়াছে। কেন না, যে ধর্ম্ম সকল খণ্ডকে এক অখণ্ডে পরিণত করিবে, সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়কে এক অখণ্ড সম্প্রদায়ে পরিণত করিবে, সে ধর্ম্মের উপাস্য যিনি, তিনি সর্ব্বান্তর্ভাবক, সর্ব্বগত এবং সর্ব্বা-তীত হওয়া প্রয়োজন; অনন্ত ভিন্ন তাহা সম্ভব হয় না। তাই যে শব্দ সীমাতীত অনন্তকে, সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তমকে প্রকাশ করে, সেই শব্দে তাঁহার প্রকাশ সর্ব্বপ্রথমেই প্রয়োজন হইয়াছে। তাই ভারতীয় ঋষিজীবনের উপাসনা, অনন্তের উপাসনা রামমোহন কর্ত্তৃক পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল, এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঋষিভাবে সাধন করিয়া সেই ব্রহ্মোপাসনা বঙ্গভারতে মূর্ত্তিমান করিয়া তুলিলেন। ব্রহ্ম-নামে যখন ঈশ্বর অখণ্ড অনন্তরূপে অন্তরে প্রতিভাত হন, তখন বুঝিতে পারি, খণ্ড পূজা, মূর্ত্তিতে ঈশ্বর-পূজার আর প্রয়োজন নাই। এক অখণ্ড অনন্তের প্রকাশই মূর্ত্তিকে ধ্বংস করে, মূর্ত্তিপূজাকে উচ্ছেদ করে, সকল খণ্ড ভাবকে এক অখণ্ডে পরিণত করে। তাই উচ্চারণ করি, 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম'। যিনি ব্রহ্ম, তিনি সত্য জ্ঞানময়, চিন্ময় অনন্ত। এইরূপ অনন্ত মন্ত্রে দীক্ষিত থাকিয়া, অনন্তের পূজাবন্দনা-যোগে অনন্তের ধ্যান ধারণায় অগ্রসর হইতে থাকি। কে না জানে, কে না স্বীকার করে, আমরা অনন্তকে প্রকাশিত দেখিয়া তাঁহাতে হাবুডুবু খাই, ধারণা করিয়াও দীর্ঘ সময় ধারণ করিতে পারি না, ধারণ করিয়াও অতি অল্পই ধরিয়া রাখিতে পারি, অতি অল্পই তাঁহাকে গ্রহণ ও আত্মস্থ করিতে পারি; এ ধারণায় তাঁহার ব্যক্তিত্বের তত প্রকাশ হয় না, সত্তার প্রকাশ যত হয়। পাছে দুর্ব্বল সাধক হয়রান হইয়া পড়ে, পাছে কাহার জীবনে নিরাশার ভাব উপস্থিত হয়, তাই অল্প-অধিকার-বিশিষ্ট দুর্ব্বল জনের প্রতি তিনি কৃপা করিয়া, দয়াময় নামে, হৃদয়বিহারী মধুময় অমৃতময় হরিনামে প্রকাশিত হইলেন, হরিরূপে অবতীর্ণ হইলেন, জীবের হৃদয়রাজ্যে দখল স্থাপন করিলেন। কোন একটী বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়াছেন—সাধারণতঃ মানুষের হৃদয় সংসারের ছোট বড় সকল বস্তুতে ছড়ান রহিয়াছে, সকল বস্তুতে আপনাকে ঢালিয়া দিয়া বিশেষ বিশেষ বস্তুতে আপনাকে আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে; এই সংসারজালে তাহার কি শোচনীয় বদ্ধাবস্থা! ব্রহ্মভাব জ্ঞানরাজ্যকে, আত্মানুভূতির রাজ্যকে যেমন অধিকার করে, হৃদয়রাজ্যকে তেমন অধিকার করে না; এই হৃদয়রাজ্যকে অধিকার করিবার জন্য, এই হৃদয়রাজ্যকে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া মানবজীবনের মুক্তির পথ নির্ব্বিঘ্ন করিবার জন্য, অহেতুক প্রেমের দায়ে, প্রেমময় ঈশ্বরের জীবহৃদয়ে প্রেমময়, মধুময়, অমৃতময় হরিরূপে অবতরণ দুই অক্ষরবিশিষ্ট 'হরি'নামরূপে। এই হরিনামে কত মহাপাপী উদ্ধার হইল, কত জগাই মাধাই তরিয়া গেল; নিমাই পণ্ডিতের ন্যায় মহাজ্ঞানী, গুণী, পরম পণ্ডিত, ব্রাহ্মণকুলজাত, সুঠাম, সুশ্রী যুবক মস্তক মুণ্ডন করিয়া, কৌপীন পরিয়া, স্নেহের প্রতিমা শচীমাতাকে কান্দাইয়া, প্রেমের প্রতিমা পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়াকে জীবনের অর্দ্ধমুকুলিত অবস্থায় সন্ন্যা-সিনী সাজাইয়া, আপনি জ্বলন্ত বৈরাগ্যের মূর্ত্তিতে সজ্জিত হইলেন, সেই পাষাণ-গলান বৈরাগ্যের মূর্ত্তিতে পরিত্রাণ-প্রদ মধুর হরিনাম ঘরে ঘরে বিলাইয়া দেখাইলেন, সুমধুর অথচ মহাশক্তির আধার হরিনাম কি প্রকারে মানবহৃদয়কে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া জ্বলন্ত ত্যাগের মূর্ত্তিতে সাজাইতে পারে। তাই গীত হইল, "এ হরিনাম কোথায় ছিল, কে আনিল।" হরিনাম কেমন জাতিকুল পাণ্ডিত্য মহত্ত্বের অভিমান চূর্ণ করিয়া, মানুষকে

তৃণ হইতে নীচ করিতে পারে, সকলের পদধূলি হইয়া হরিকৃপালাভের জন্য সর্ব্বজীবকৃপার ভিখারী হইয়া ধূলিকণারূপে সকলের পদধূলির জন্য ব্যাকুল করিতে পারে, বৈষ্ণব সাধুগণ পরস্পরের পদধূলি গ্রহণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া তাহাই দেখাইলেন। সর্ব্বজনপ্রাণ শ্রীহরির কৃপারূপ মুক্তিপ্রদ বারিবিন্দু বুঝি হরিকৃপা-ভিখারী তৃষিত ভক্তজনের মস্তকে পড়ে না, সেই ভক্তিপথের কাঙ্গাল পথিকের প্রতি সর্ব্বজীবের কৃপা-দৃষ্টি ভিন্ন, সর্ব্বজনের প্রসন্নতা ও আশীর্ব্বাদ ভিন্ন। মানবজীবনের কি প্রলয় পরিবর্ত্তন হরিনামের গুণে! আহা! এই ভোগ বিলাসিতার যুগে আবার নবভাবে অবতীর্ণ হইলেন, সেই হৃদয়বিহারী হরি জীবের সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য। অন্তর-সন্ন্যাস সর্ব্বজনের জন্য নবযুগের ব্যবস্থা, বাহ্য সন্ন্যাস নহে। তাই অন্তর-সন্ন্যাসী নবগৃহবাসী ভক্ত ব্রহ্মানন্দের নবভক্তির জীবন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ব্রহ্মভক্ত হইয়া, বিবেকের পথে ব্রহ্ম-বাণীর অনুসরণে সাধনে অগ্রসর হইতেছিলেন; হঠাৎ হরিনাম-শ্রবণে, হরিগুণানুকীর্ত্তনে তাঁহার হৃদয়ে ভক্তির উৎস উৎসারিত হইল; তিনি ভক্তিপথে প্রথমে হরিনামে, শেষে মাতৃনামে মত্ত হইলেন। হায়! কবে আমরা নববিধান-পরিবারে হরিনামসাধনে অন্তরসন্ন্যাসী গৃহী ভক্ত হইব।

গৃহে বাস করিলে, গৃহে পিতামাতা চাই; পিতার বিধিব্যবস্থা ভিন্ন, গুরুরূপে সুশিক্ষাদান ভিন্ন জীবন গড়িয়া উঠে না। তাই ধর্ম্মগৃহে পরম পিতার বিধি অনুসরণ, পাদপদ্মে মাথা রাখিয়া তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন প্রয়োজন। আর ধর্ম্মগৃহে, ধর্ম্মপরিবারে, অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেমের মূর্ত্তি জগজ্জননীর অবতরণ ভিন্ন, সাক্ষাৎ তাঁহার লালনপালন ভিন্ন কি গৃহে সুখ স্বচ্ছন্দতা, আনন্দ শান্তি বিরাজ করিতে পারে? তাই এবার নববিধানধর্ম্মের পূর্ণতা বিধান জন্য, নববিধানের গৃহ পরিবার পূর্ণ শান্তি, পূর্ণ আনন্দে উৎসবানন্দময় করিয়া স্বর্গের দিব্য সজ্জায় সাজাইবার জন্য, জগজ্জননীর জীবন্ত জাগ্রতরূপে, পরমজননীরূপে গৃহে গৃহে অবতরণ। এই মাতৃপ্রকাশ, মাতৃপূজা ভক্ত ব্রহ্মানন্দের জীবনেই প্রথম প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা। এই মাতৃপূজা ব্রহ্মানন্দ-যোগে ব্রহ্মমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, ব্রহ্মমন্দিরের পূজাকে কত সরস, সুন্দর ও সম্ভোগের বিষয় করিয়াছে; এই মাতৃপূজা প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রতি জীবনকে, গৃহ পরিবারের জীবনকে কত উৎসবময় করিয়াছে। ভক্ত ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "যদি পূজা করিতে হয়, মাতৃপূজার মত পূজা নাই।" যদি ঈশ্বরকে ব্যক্তি-রূপে দর্শন করিতে হয়, মাতৃদর্শনের ন্যায় আর দর্শন নাই; যদি জীবন্ত স্বর্গে বাস করিতে হয়, অনন্ত শক্তিরূপা, অনন্ত প্রেমরূপা, অনন্ত সৌন্দর্য্যরূপা পরমজননীর বক্ষে সজ্ঞানে বাসের মত আর কিছু নাই।

আমরা নিত্য নির্দ্দিষ্ট আরাধনা, প্রার্থনাদির যোগে ঈশ্বরকে ব্রহ্মরূপে, হরিরূপে, পরমজননীরূপে প্রধানতঃ এই তিন রূপেই দর্শন করি, ধ্যান ধারণা করিয়া আত্মস্থ করিতে চেষ্টা করি। আরাধনায় ঈশ্বরস্বরূপের বর্ণনা-যোগে অন্তরে তাঁহার বিবিধ স্ফুরণ লাভ হয়, ধ্যান ধারণায় সে সকল স্ফুরণ বহু পরিমাণে আত্মস্থ হয়; কিন্তু সহজে ঘাটে মাঠে পথে, নানা কার্য্যব্যস্ততার মধ্যে, সময় সময় নির্জ্জনেও, তাঁহাকে ভাল করিয়া আয়ত্ত করিবার জন্য নামসাধনার সুন্দর ব্যবস্থা। ব্রহ্মনাম, হরিনাম, মানাম, এই তিনটী নাম আমাদের নামসাধনের উপায়স্বরূপ বিশেষভাবে অবলম্বনীয়। কোন একজন প্রবীণ ও প্রাচীন নববিধান-ক্ষেত্রের সাধক বলিয়াছেন—প্রণালী-বদ্ধ আরাধনাদি-যোগে বিশ্লেষণে ঈশ্বরের বিভিন্ন স্বরূপকে অন্তরে স্ফুরণ ও ধারণের বিষয়, ধ্যানের বিষয় করিতে হয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু জীবনকে সকল অবস্থায় ঈশ্বরের জীবন্ত স্বর্গীয় প্রকাশে সতেজ, সরস ও সুন্দর রাখিবার জন্য, সমষ্টিগতভাবে ব্যক্তিরূপে সহজে তাঁহাকে প্রাণে স্ফুরিত দেখিবার জন্য নাম-সাধন বিশিষ্ট উপায়। নব-বিধানে এই ত্রিধারার বিশেষ প্রকাশ আসিয়াছে, বিশেষ সাধন আসিয়াছে; এই সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়া আমরা ধন্য হই।

ধর্ম্মতত্ত্ব

পরলোক-সাধন

পরলোক আত্মলোক। দেহ আমাদের আত্মার আধার; মানবাত্মাকে পরমাত্মা স্বয়ং নিজ অংশ হইতে জন্ম দিয়াছেন ক্রমবিকশিত ও পরিপুষ্ট করিবার জন্য দেহাধারে রাখিয়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়াছেন। তিনিই তাঁহার ইচ্ছামত আবার দেহমুক্ত করিয়া তাঁহার আত্মলোকে তুলিয়া লন। ঈশ্বর

ইহপরলোকে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। সুতরাং তাঁহারই মধ্যে ইহলোক, তাঁহারই মধ্যে পরলোক। বিশ্বাসচক্ষে যেমন আমরা চিন্ময় পরমাত্মাকে দর্শন করি, তেমনি তাঁহার মধ্যে আমরা সব লোকও দেখিতে পাই। সুতরাং পরলোকগত আত্মাদের সঙ্গ সাধন করিতে হইলে, ঈশ্বরের মধ্য দিয়া করিতে হয়। তাঁহাকে ছাড়িয়া আমরা পরলোকগত আত্মাদের সঙ্গ করিতে পারি না। আত্মা সকল ব্রহ্মজলে বিচরণ করেন। পরলোকগত আত্মাদিগকে ব্রহ্মের ভিতর দিয়া দেখিলেই, তাঁহাদের স্বরূপ চরিত্র উজ্জ্বলরূপে দেখা যায়। ব্রহ্মের ভিতর দিয়া না দেখিলে, কি ইহলোকস্থ, কি পরলোকস্থ, কোন আত্মাকেই চিনিতে বা দেখিতে পাই না। ইহলোকস্থ, পরলোকস্থ আত্মার আত্মায় মিলন, ব্রহ্মভিন্ন কেহ করিয়া দিতে পারে না।

যুগধর্ম্মসমস্যা

(৯ই মাঘ, ব্রহ্মমন্দিরে প্রদত্ত বক্তৃতার সার মর্ম্ম)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৩। অনেকে মনে করেন, পরমতসহিষ্ণুতা (toleration) ধর্ম্মসমস্যা-সমাধানের শ্রেষ্ঠতম পথ। আমাদের দেশে এই পথ বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এই পরমতসহিষ্ণুতাকে হিন্দু ধর্ম্মের যুগপৎ গৌরব ও লজ্জার কথা বলা যাইতে পারে। যখন ধর্ম্মে ধর্ম্মে এদেশে ও অন্যান্য দেশে এত গোলযোগ দেখিতেছি, তখন হিন্দুরা যে সাহস করিয়া বলিতে পারেন, 'যত মত তত পথ,' ইহা বিশেষ গৌরবের বিষয়, সন্দেহ নাই। অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বীরা যে এ কথা এত সাহস করিয়া বলিতে পারেন, মনে হয় না। ইহা যদিও বিশেষ গৌরবের কথা, তবু এই মতই এদেশের লজ্জার কারণ হইয়াছে ; কেন না, অনেকে মনে করেন, ধর্ম্ম একটী ব্যক্তিগত সাধন মাত্র। যাঁহার যাহা অভিপ্রেত, তিনি তাহাই এ বিষয়ে করিতে পারেন। এই মত বহুলরূপ প্রচারের জন্য, হিন্দুরা তাঁহাদের ইতিহাসের যুগে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে পারেন নাই এবং বর্ত্তমান যুগেও পারিতেছেন না। তাহার ফলে হিন্দুধর্ম্মদেহ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, জাতীয়তার সংগ্রামে আজ আমরা প্রতিপদে পশ্চাৎপদ হইতেছি। এই পরমতসহিষ্ণুতার পথ তাই আমাদের যুগপৎ গৌরব ও লজ্জার কারণ। ইহার ফলে বিশ্বমানবের অখণ্ডতার জ্ঞান আমাদের মনে এখনও পরিস্ফুট হইতে পারে নাই—একের ধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে আমরা অপরের ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না, একের সুখ এবং দুঃখকে আমরা অপরে বুক পাতিয়া লইতে পারিতেছি না। ব্রাহ্মসমাজে পূর্ব্ব হইতেই "একাকী যাইলে পথে নাহি পরিত্রাণ যে"—এই মন্ত্র গাহিয়া, আমাদের নেতৃবৃন্দ মানবের অখণ্ডতায় তাঁহাদের বিশ্বাস ঘোষণা করিয়াছিলেন। সংসারের সামান্য সামান্য ঘটনা ও বস্তুতে আমরা দেখিতে পাই, মানুষ একাকী চলিয়া কিছুই করিতে পারে না। সামান্য একটী ছুঁচ, একটী পেন্‌সিল বা একটি পিন প্রস্তুত করিতে লক্ষ লক্ষ, কোটী কোটী লোকের সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন হইয়াছে। আমি যে বস্ত্রখানা পরিধান করিয়াছি, ইহা প্রস্তুত করিতে কত লোকের প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা গণনা করিয়া শেষ করিতে পারা যায় না। কত লোক কার্পাস সংগ্রহ করিয়াছে, কত লোক সূত্র নির্ম্মাণ করিয়াছে, কত শত লোক খাটিয়া ইহার জন্য লৌহ ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়াছে, আবার ইহাদের সেবার জন্য যে সব লোকের প্রয়োজন হইয়াছে, কে গণনা করিবে ? বাহিরের দিক দিয়া যেমন, অন্তরের দিক দিয়াও তেমনি সামান্য ভাব বা ভাষার জন্য আমি অগণিত লোকের নিকট ঋণী। ধর্ম্মসম্বন্ধেও তদ্রূপ, আমরা কেহ একা চলিতে পারি না। কতশত সাধু মহাত্মার জীবনপ্রভাবে আমাদের ভিতর ধর্ম্মভাব সংক্রামিত হইতেছে, কে তাহা নির্দ্ধারণ করিবে ? এইরূপে দেখিতে পাই, প্রতি জীবন কত জীবনের সঙ্গে গ্রথিত। তাই শুধু পরমতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে, আমরা ধর্ম্মরাজ্যে চলিতে পারি না। তাই বিধানের আলোকে আমরা দেখিতেছি, পরমতসহিষ্ণুতাই যথেষ্ট নহে, সকলের সাধুতা ও ধর্ম্মভাব-গ্রহণই ধর্ম্মজীবনপথের বিধি-নির্দ্দিষ্ট পথ. সে কথা পরে বলা যাইবে। এইবার ধর্ম্মসমস্যা-সমাধানের অন্য একটী পথের কথা বলিব।

৪। সমুচ্চয়বাদের পথ (Eclecticism)। অনেকে মনে করেন, মানববুদ্ধি দ্বারা নানামত সংগ্রহ করিয়া আমরা ধর্ম্মসমস্যার সমাধান করিতে পারি। আমাদের দেশে সম্রাট আকবরের সময় ও রোমক সম্রাটদের সময় এইরূপ বহুমত একত্র করিয়া উদার ধর্ম্মমত-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়। সম্রাট্ আকবরের দরবারে হিন্দু, মুসলমান, ঈশাহি পণ্ডিতগণ মিলিত হইয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেন ; সম্রাট আকবর এইরূপে তর্ক যুক্তির ভিতর দিয়া এক উদার ধর্ম্মমত-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু ইহা হইতে কোনও বিশেষ ফল পাওয়া যায় নাই। রোমক সাম্রাজ্যেও দেখিতে পাই, সম্রাটগণ নানাদেশ জয় করিয়া, নানা দেবদেবী আনিয়া রোমের ধর্ম্মমন্দির পূর্ণ করিয়াছিলেন। মানুষের মন শুধু বুদ্ধি নয়, তাই এ সব চেষ্টা ইতিহাসের গায়ে শুধু চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে ; কিন্তু যুগপ্লাবী কোন ধর্ম্মধারার সৃষ্টি করিতে পারে না। শুধু বুদ্ধির পথে, বাক্‌বিতণ্ডার পথে, রাজানীতির সার্থকতার পথে গিয়া স্থায়ী ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে নাই। রোমক সম্রাটেরা এবং আকবরের ন্যায় অসামান্য নরপতি যাহা পারেন নাই, অল্পশক্তি অন্য মানুষের সে চেষ্টা করা বৃথা, এ কথা বলা বাহুল্য।

ধর্ম্মসমস্যা-সমাধানের আমি যে চারিটী পথের কথা নিবেদন করিলাম, তাহা আবার উল্লেখ করি—শেষ বিধানের পথ, ছিন্নসত্তার পথ, পরমতসহিষ্ণুতার পথ এবং সমুচ্চয়বাদের পথ।

৫। শেষ পথটীকে বিধানের বা সমন্বয়ের পথ বলিতে চাই। এই পথ শুধু বুদ্ধির পথ নয়, ইহা দেবনিঃশ্বসিতের পথ, বিধানের পথ। এই পথ কি? কেশবচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "Long since the little bird 'I' flew away from this sanctuary, I know not where, never to return."—"অনেক দিন হয়, 'আমি' পাখী এই দেহপিঞ্জর হইতে উড়িয়া গিয়াছে, কোথায় গিয়াছে জানিনা, কিন্তু আর ফিরিয়া আসিবেনা।" ব্রহ্মানন্দ পরম দেবতার সহিত মিলিত হইয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। আধ্যাত্মিক জগতের নিয়মানুসারে এক ক্ষেত্রে আমিত্ব ও ব্রহ্মত্ব থাকিতে পারে না। যখন এই 'কাঁচা আমি' উড়িয়া যায়; তখন 'পাকা আমি' আবির্ভূত হন; এবং বিধাতার অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে, স্বর্গস্থ দেবগণ ভক্তগণ প্রাণে আবির্ভূত হন। তখন আমাদের জীবন রূপান্তরিত হয়, আমরা ভাবগতী তনু লাভ করি—আমরা প্রাণে নববৃন্দাবন ধারণ করিয়া কৃতার্থ হই—শ্রীহরি ভক্তদলসহ জীবহৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া তাহাকে নানা সদ্‌গুণে ভূষিত করেন—ধর্ম্মের নানা সম্পদ্‌-দানে তাহাকে কৃতার্থ করেন। ব্রহ্মানন্দ এই অবস্থা লাভ করিয়া বলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—সক্রেটিশ আমার মস্তক, চৈতন্য আমার হৃদয়, ঈশা আমার ইচ্ছা ইত্যাদি। এই ভাবে জীবনে যে ধর্ম্মসমন্বয় হয়—তাহা বুদ্ধিপ্রসূত নয়, ভগবানের প্রসাদ—তাঁহার কৃপায় ইহা সম্ভব হয়। তখন আর কোন ধর্ম্ম, কোন সাধু মহাত্মাকে পর বলিয়া মনে হয় না—নিজ জীবনে শ্রীহরির কৃপায় সকলে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। ব্রহ্মানন্দের জীবনে, তাঁহার দলের ভিতর এই নব সমন্বয়ের নূতন বন্যা প্রবাহিত হইয়াছিল। বহু অধ্যয়ন করিয়া, চিন্তা করিয়া, বা বুদ্ধির আশ্রয় লইয়া এই ধর্ম্মসমন্বয় লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই—কেবল ভগবৎকৃপার প্রসাদে ইহা লাভ হয়।

শ্রীখড়্গসিংহ ঘোষ।

—•—

উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়

(১লা মার্চ্চ, স্বর্গারোহণের দিন উপলক্ষে)

আজ ভক্তিভাজন উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়ের স্মৃতি-তর্পণের দিন। বিধানমণ্ডলী তাঁহার নিকট যে ঋণে ঋণী, তাহা কখনও শোধ হইবার নয়। যতদূর স্মরণ হয়, সাধু অঘোরনাথের সহিত তাঁহার রংপুরে প্রথম পরিচয় হয়, তিনি অঘোরনাথের চরিত্রমাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হন। একবার কলিকাতায় আসিয়া ব্রহ্মানন্দের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় এক সঙ্গত সভায় উপস্থিত হন, এবং সেখানে একটী প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া ব্রহ্মানন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ও তাঁহার বিশেষ স্নেহ লাভ করেন। সেই স্নেহবন্ধনে এরূপে জড়িত হইয়া পড়েন যে, আর স্বকার্য্যে সংসারে ফিরিয়া যাইতে পারিলেন না। ব্রহ্মানন্দের নিকট যে কি পরশমণি ছিল, তাহার সংস্পর্শে আসিয়া এইরূপে কত জীবন রূপান্তরিত হইয়াছিল, কত সংসারতপ্ত প্রাণ ধর্ম্মের অনির্ব্বচনীয় শান্তি লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিল, স্মরণ হইলে মন বিস্ময়ে আপ্লুত হয়।

কার্লাইল বলিয়াছিলেন, "যে মানুষ স্বীয় জীবনের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য লাভ করিয়াছে, সে ধন্য, তাহার আর অন্য কোন সম্পদের প্রয়োজন নাই।" ব্রহ্মানন্দের মানুষ চিনিয়া লইবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল; যাহাদ্বারা যে কাজ হইবে, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিতেন, এবং সেই কার্য্যে উপযুক্ত লোক নিয়োজিত করিবারও তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। এই ভাবেই বিধানের মণ্ডলী গড়িয়া উঠিয়াছিল। আজ আমরা কে কি কাজের উপযুক্ত, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না, এবং কেহ কিঞ্চিৎ বুঝিলেও সেই কর্ত্তব্য জীবনের ব্রত করিয়া, আমরা তাহাকে দৃঢ় করিয়া সযত্নে ধরিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আজ তাই মণ্ডলীর দুর্গতি।

ব্রহ্মানন্দের দলে আসিয়া যোগ দান করিলে, হিন্দুশাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া তাহা হইতে সমন্বয়াদর্শ উদ্ভাসিত করার গুরুভার উপাধ্যায়ের উপর অর্পিত হইল; তিনি জীবনের সমগ্র শক্তি ও সাধনা এই কার্য্যে নিয়োগ করিলেন, ইহার ফলে আমাদের যে অমূল্য সাহিত্য-সম্পদ্‌ লাভ হইয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। বঙ্গদেশের ধর্ম্মসাধনায় প্রগল্‌ভা ভক্তির সঙ্গে গভীর দার্শনিক দৃষ্টির অপূর্ব্ব মিলন হইয়াছে। এদেশে ভক্তের এবং দার্শনিকের অভাব নাই। বঙ্গদেশে কপিল, বিজ্ঞানভিক্ষু, জীবগোস্বামী ও শাস্তরক্ষিত প্রভৃতি অনেক পণ্ডিতবর্গ দার্শনিক জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আজ ব্রাহ্মসমাজের বাহিরে গৌরগোবিন্দের নাম লোকে বড় জানে না; কিন্তু একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় ও বলা যাইতে পারে, বিজ্ঞানভিক্ষুর পর সামঞ্জস্যমূলক দর্শনের অভিব্যক্তি উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দের গ্রন্থাদিতে যেরূপ দেখিতে পাই, এরূপ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। বেদান্তসমন্বয়, গীতাসমন্বয়-ভাষ্য ও গীতাপরিপূর্ত্তিতে তিনি এই সমন্বয়ের দর্শন বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করেন। এই দর্শনের আলোচনার এ সময় নয় এবং আমার সে ক্ষমতাও নাই। তবে এখানে এইমাত্র উল্লেখ করা যাইতে পারে, বিজ্ঞানভিক্ষু যেরূপ হিন্দুর ষড়দর্শনগুলি এক অখণ্ড দর্শনের বিভিন্নস্তর মনে করিতেন, উপাধ্যায় মহাশয়ও বেদান্তদর্শন ও গীতার—দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ইত্যাদি-মূলক ব্যাখ্যাগুলিকে এক বিরাট দর্শনের বিভিন্নভাব মনে করেন। শঙ্কর, রামানুজ, বল্লভ, নিম্বার্ক মাধ্ব প্রভৃতির মতের ভিতর যে অভিনব সামঞ্জস্য রহিয়াছে, তিনি তাহা দেখাইতে প্রয়াস পান। গীতার নানা ব্যাখ্যা বদেশে প্রচলিত আছে; এমন কি, এ যুগেও বালগঙ্গাধর তিলক ও মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি ইহার বিভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কেহ ইহাকে জ্ঞানপথ, কেহ বা ভক্তিপথ, কেহ বা কর্ম্মপথের গ্রন্থ বলিয়া প্রমাণিত করিতে

ইহপরলোকে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। সুতরাং তাঁহারই মধ্যে ইহলোক, তাঁহারই মধ্যে পরলোক। বিশ্বাসচক্ষে যেমন আমরা চিন্ময় পরমাত্মাকে দর্শন করি, তেমনি তাঁহার মধ্যে আমরা সব লোকও দেখিতে পাই। সুতরাং পরলোকগত আত্মাদের সঙ্গ সাধন করিতে হইলে, ঈশ্বরের মধ্য দিয়া করিতে হয়। তাঁহাকে ছাড়িয়া আমরা পরলোকগত আত্মাদের সঙ্গ করিতে পারি না। আত্মা সকল ব্রহ্মজলে বিচরণ করেন। পরলোকগত আত্মাদিগকে ব্রহ্মের ভিতর দিয়া দেখিলেই, তাঁহাদের স্বরূপ চরিত্র উজ্জলরূপে দেখা যায়। ব্রহ্মের ভিতর দিয়া না দেখিলে, কি ইহলোকস্থ, কি পরলোকস্থ, কোন আত্মাকেই চিনিতে বা দেখিতে পাই না। ইহলোকস্থ, পরলোকস্থ আত্মায় আত্মায় মিলন, ব্রহ্মভিন্ন কেহ করিয়া দিতে পারে না।

যুগধর্ম্মসমস্যা

(১১ই মাঘ, ব্রহ্মমন্দিরে প্রদত্ত বক্তৃতার সার মর্ম্ম)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৩। অনেকে মনে করেন, পরমতসহিষ্ণুতা (toleration) ধর্ম্মসমস্যা-সমাধানের শ্রেষ্ঠতম পথ। আমাদের দেশে এই পথ বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এই পরমতসহিষ্ণুতাকে হিন্দু ধর্ম্মের যুগপৎ গৌরব ও লজ্জার কথা বলা যাইতে পারে। যখন ধর্ম্মে ধর্ম্মে এদেশে ও অন্যান্য দেশে এত গোলযোগ দেখিতেছি, তখন হিন্দুরা যে সাহস করিয়া বলিতে পারেন, 'যত মত তত পথ,' ইহা বিশেষ গৌরবের বিষয়, সন্দেহ নাই। অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বীরা যে এ কথা এত সাহস করিয়া বলিতে পারেন, মনে হয় না। ইহা যদিও বিশেষ গৌরবের কথা, তবু এই মতই এদেশের লজ্জার কারণ হইয়াছে; কেন না, অনেকে মনে করেন, ধর্ম্ম একটী ব্যক্তিগত সাধন মাত্র। যাঁহার যাহা অভিপ্রেত, তিনি তাহাই এ বিষয়ে করিতে পারেন। এই মত বহুলরূপ প্রচারের জন্য, হিন্দুরা তাঁহাদের ইতিহাসের যুগে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে পারেন নাই এবং বর্ত্তমান যুগেও পারিতেছেন না। তাহার ফলে হিন্দুধর্ম্মদেহ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, জাতীয়তার সংগ্রামে আজ আমরা প্রতিপদে পশ্চাৎপদ হইতেছি। এই পরমতসহিষ্ণুতার পথ তাই আমাদের যুগপৎ গৌরব ও লজ্জার কারণ। ইহার ফলে বিশ্বমানবের অখণ্ডতার জ্ঞান আমাদের মনে এখনও পরিস্ফুট হইতে পারে নাই—একের ধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে আমরা অপরের ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না, একের সুখ এবং দুঃখকে আমরা অপরে বুক পাতিয়া লইতে পারিতেছি না। ব্রাহ্মসমাজে পূর্ব্ব হইতেই "একাকী যাইলে পথে নাহি পরিত্রাণ রে"—এই মন্ত্র গাহিয়া, আমাদের নেতৃবৃন্দ মানবের অখণ্ডতায় তাঁহাদের বিশ্বাস ঘোষণা করিয়াছিলেন। সংসারের সামান্য সামান্য ঘটনা ও বস্তুতে আমরা দেখিতে পাই, মানুষ একাকী চলিয়া কিছুই করিতে পারে না। সামান্য একটী ছুঁচ, একটী পেন্‌সিল বা একটি পিন প্রস্তুত করিতে লক্ষ লক্ষ, কোটী কোটী লোকের সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন হইয়াছে। আমি যে বস্ত্রখানা পরিধান করিয়াছি, ইহা প্রস্তুত করিতে কত লোকের প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা গণনা করিয়া শেষ করিতে পারা যায় না। কত লোক কার্পাস সংগ্রহ করিয়াছে, কত লোক সূত্র নির্ম্মাণ করিয়াছে, কত শত লোক খাটিয়া ইহার জন্য লৌহ ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়াছে, আবার ইহাদের সেবার জন্য যে সব লোকের প্রয়োজন হইয়াছে, কে গণনা করিবে? বাহিরের দিক দিয়া যেমন, অন্তরের দিক দিয়াও তেমনি সামান্য ভাব বা ভাষার জন্য আমি অগণিত লোকের নিকট ঋণী। ধর্ম্মসম্বন্ধেও তদ্রূপ, আমরা কেহ একা চলিতে পারি না। কতশত সাধু মহাত্মার জীবনপ্রভাবে আমাদের ভিতর ধর্ম্মভাব সংক্রামিত হইতেছে, কে তাহা নির্দ্ধারণ করিবে? এইরূপে দেখিতে পাই, প্রতি জীবন কত জীবনের সঙ্গে গ্রথিত। তাই শুধু পরমতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে, আমরা ধর্ম্মরাজ্যে চলিতে পারি না। তাই বিধানের আলোকে আমরা দেখিতেছি, পরমতসহিষ্ণুতাই যথেষ্ট নহে, সকলের সাধুতা ও ধর্ম্মভাব-গ্রহণই ধর্ম্মজীবনপথের বিধি-নির্দ্দিষ্ট পথ, সে কথা পরে বলা যাইবে। এইবার ধর্ম্মসমস্যা-সমাধানের অন্য একটী পথের কথা বলিব।

৪। সমুচ্চয়বাদের পথ (Eclecticism)। অনেকে মনে করেন, মানববুদ্ধি দ্বারা নানামত সংগ্রহ করিয়া আমরা ধর্ম্মসমস্যার সমাধান করিতে পারি। আমাদের দেশে সম্রাট আকবরের সময় ও রোমক সম্রাটদের সময় এইরূপ বহুমত একত্র করিয়া উদার ধর্ম্মমত-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়। সম্রাট্ আকবরের দরবারে হিন্দু, মুসলমান, ঈশাহি পণ্ডিতগণ মিলিত হইয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেন; সম্রাট আকবর এইরূপে তর্ক যুক্তির ভিতর দিয়া এক উদার ধর্ম্মমত-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু ইহা হইতে কোনও বিশেষ ফল পাওয়া যায় নাই। রোমক সাম্রাজ্যেও দেখিতে পাই, সম্রাটগণ নানাদেশ জয় করিয়া, নানা দেবদেবী আনিয়া রোমের ধর্ম্মমন্দির পূর্ণ করিয়াছিলেন। মানুষের মন শুধু বুদ্ধি নয়, তাই এ সব চেষ্টা ইতিহাসের গায়ে শুধু চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে; কিন্তু যুগপ্লাবী কোন ধর্ম্মধারার সৃষ্টি করিতে পারে না। শুধু বুদ্ধির পথে, বাক্‌বিতণ্ডার পথে, রাজনীতির সার্থকতার পথে গিয়া স্থায়ী ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে নাই। রোমক সম্রাটেরা এবং আকবরের ন্যায় অসামান্য নরপতি যাহা পারেন নাই, অল্পশক্তি অন্য মানুষের সে চেষ্টা করা বৃথা, এ কথা বলা বাহুল্য।

ধর্ম্মসমস্যা-সমাধানের আমি যে চারিটী পথের কথা নিবেদন করিলাম, তাহা আবার উল্লেখ করি—শেষ বিধানের পথ, ছিন্নসত্তার পথ, পরমতসহিষ্ণুতার পথ এবং সমুচ্চয়বাদের পথ।

৫। শেষ পথটীকে বিধানের বা সমন্বয়ের পথ বলিতে চাই। এই পথ শুধু বুদ্ধির পথ নয়, ইহা দেবনিঃশ্বসিতের পথ, বিধানের পথ। এই পথ কি? কেশবচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "Long since the little bird 'I' flew away from this sanctuary, I know not where, never to return."—"অনেক দিন হয়, 'আমি' পাখী এই দেহপিঞ্জর হইতে উড়িয়া গিয়াছে, কোথায় গিয়াছে জানিনা, কিন্তু আর ফিরিয়া আসিবেনা।" ব্রহ্মানন্দ পরম দেবতার সহিত মিলিত হইয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। আধ্যাত্মিক জগতের নিয়মানুসারে এক ক্ষেত্রে আমিত্ব ও ব্রহ্মত্ব থাকিতে পারে না। যখন এই 'কাঁচা আমি' উড়িয়া যায়; তখন 'পাকা আমি' আবির্ভূত হন; এবং বিধাতার অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে, স্বর্গস্থ দেবগণ ভক্তগণ প্রাণে আবির্ভূত হন। তখন আমাদের জীবন রূপান্তরিত হয়, আমরা ভাগবতী তনু লাভ করি—আমরা প্রাণে নববৃন্দাবন ধারণ করিয়া কৃতার্থ হই—শ্রীহরি ভক্তদলসহ জীবহৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া তাহাকে নানা সদ্‌গুণে ভূষিত করেন—ধর্ম্মের নানা সম্পদ্‌-দানে তাহাকে কৃতার্থ করেন। ব্রহ্মানন্দ এই অবস্থা লাভ করিয়া বলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—সক্রেটিশ আমার মস্তক, চৈতন্য আমার হৃদয়, ঈশা আমার ইচ্ছা ইত্যাদি। এই ভাবে জীবনে যে ধর্ম্মসমন্বয় হয়—তাহা বুদ্ধিপ্রসূত নয়, ভগবানের প্রসাদ—তাঁহার কৃপায় ইহা সম্ভব হয়। তখন আর কোন ধর্ম্ম, কোন সাধু মহাত্মাকে পর বলিয়া মনে হয় না—নিজ জীবনে শ্রীচরিত্র রূপায় সকলে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। ব্রহ্মানন্দের জীবনে, তাঁহার দলের ভিতর এই নব সমন্বয়ের নূতন বন্যা প্রবাহিত হইয়াছিল। বহু অধ্যয়ন করিয়া, চিন্তা করিয়া, বা বুদ্ধির আশ্রয় লইয়া এই ধর্ম্মসমন্বয় লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই—কেবল ভগবৎকৃপার প্রসাদে ইহা লাভ হয়।

শ্রীখড়্গসিংহ ঘোষ।

—•—

উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়

(১লা মার্চ্চ, স্বর্গারোহণের দিন উপলক্ষে)

আজ ভক্তিভাজন উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়ের স্মৃতি-তর্পণের দিন। বিধানমণ্ডলী তাঁহার নিকট যে ঋণে ঋণী, তাহা কখনও শোধ হইবার নয়। যতদূর স্মরণ হয়, সাধু অঘোরনাথের সহিত তাঁহার রংপুরে প্রথম পরিচয় হয়. তিনি অঘোরনাথের চরিত্রমাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হন। একবার কলিকাতায় আসিয়া ব্রহ্মানন্দের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় এক সঙ্গত সভায় উপস্থিত হন, এবং সেখানে একটী প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া ব্রহ্মানন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ও তাঁহার বিশেষ স্নেহ লাভ করেন। সেই স্নেহবন্ধনে এরূপে জড়িত হইয়া পড়েন যে, আর স্বকার্য্যে সংসারে ফিরিয়া যাইতে পারিলেন না। ব্রহ্মানন্দের নিকট যে কি পরশমণি ছিল, তাহার সংস্পর্শে আসিয়া এইরূপে কত জীবন রূপান্তরিত হইয়াছিল, কত সংসারতপ্ত প্রাণ ধর্ম্মের অনির্ব্বচনীয় শান্তি লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিল, স্মরণ হইলে মন বিস্ময়ে আপ্লুত হয়।

কার্লাইল বলিয়াছিলেন, "যে মানুষ স্বীয় জীবনের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য লাভ করিয়াছে, সে ধন্য, তাহার আর অন্য কোন সম্পদের প্রয়োজন নাই।" ব্রহ্মানন্দের মানুষ চিনিয়া লইবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল; যাহাদ্বারা যে কাজ হইবে, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিতেন, এবং সেই কার্য্যে উপযুক্ত লোক নিয়োজিত করিবারও তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। এই ভাবেই বিধানের মণ্ডলী গড়িয়া উঠিয়াছিল। আজ আমরা কে কি কাজের উপযুক্ত, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না, এবং কেহ কিঞ্চিৎ বুঝিলেও সেই কর্ত্তব্য জীবনের ব্রত করিয়া, আমরা তাহাকে দৃঢ় করিয়া সমনে ধরিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আজ তাই মণ্ডলীর দুর্গতি।

ব্রহ্মানন্দের দলে আসিয়া যোগ দান করিলে, হিন্দুশাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া তাহা হইতে সমন্বয়াদর্শ উদ্ভাসিত করার গুরুভার উপাধ্যায়ের উপর অর্পিত হইল; তিনি জীবনের সমগ্র শক্তি ও সাধনা এই কার্য্যে নিয়োগ করিলেন. ইহার ফলে আমাদের যে অমূল্য সাহিত্য-সম্পদ্ লাভ হইয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। বঙ্গদেশের ধর্ম্মসাধনায় প্রগল্‌ভা ভক্তির সঙ্গে গভীর দার্শনিক দৃষ্টির অপূর্ব্ব মিলন হইয়াছে। এদেশে ভক্তের এবং দার্শনিকের অভাব নাই। বঙ্গদেশে কপিল, বিজ্ঞানভিক্ষু, জীবগোস্বামী ও শান্তরক্ষিত প্রভৃতি অনেক পণ্ডিতবর্গ দার্শনিক জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আজ ব্রাহ্মসমাজের বাহিরে গৌরগোবিন্দের নাম লোকে বড় জানে না; কিন্তু একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় ও বলা যাইতে পারে, বিজ্ঞানভিক্ষুর পর সামঞ্জস্যমূলক দর্শনের অভিব্যক্তি উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দের গ্রন্থাদিতে যেরূপ দেখিতে পাই, এরূপ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। বেদান্তসমন্বয়, গীতাসমন্বয়-ভাষ্য ও গীতাসপ্তকে তিনি এই সমন্বয়ের দর্শন বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করেন। এই দর্শনের আলোচনার এ সময় নয় এবং আমার সে ক্ষমতাও নাই। তবে এখানে এইমাত্র উল্লেখ করা যাইতে পারে, বিজ্ঞানভিক্ষু যেরূপ হিন্দুর ষড়দর্শনগুলি এক অখণ্ড দর্শনের বিভিন্নস্তর মনে করিতেন, উপাধ্যায় মহাশয়ও বেদান্তদর্শন ও গীতার—দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ইত্যাদি-মূলক ব্যাখ্যাগুলিকে এক বিরাট দর্শনের বিভিন্ন ভাব মনে করেন। শঙ্কর, রামানুজ, বল্লভ, নিম্বার্ক মাধ্ব প্রভৃতির মতের ভিতর যে অভিনব সামঞ্জস্য রহিয়াছে, তিনি তাহা দেখাইতে প্রয়াস পান। গীতার নানা ব্যাখ্যা দেশে প্রচলিত আছে; এমন কি, এ যুগেও বালগঙ্গাধর তিলক ও মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি ইহার বিভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কেহ ইহাকে জ্ঞানপথ, কেহ বা ভক্তিপথ, কেহ বা কর্ম্মপথের গ্রন্থ বলিয়া প্রমাণিত করিতে

চান—দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, শঙ্কর ইহাকে একমাত্র জ্ঞান-পথের গ্রন্থ, এবং এযুগে বালগঙ্গাধর তিলক ইহাকে কর্ম্মপথের গ্রন্থরূপে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। উপাধ্যায় গৌর-গোবিন্দ রায় নানাযুক্তি সহকারে দেখাইয়াছেন যে, ইহাতে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির সামঞ্জস্যের পথই প্রদর্শিত হইয়াছে।

তত্ত্বের দিক দিয়া এই দুই অভিনব গ্রন্থে যাহা দেখাইয়াছেন, জীবনের দিক দিয়া তাহা দেখাইতে গিয়া, তাঁহাকে এ দেশের দুইটী বিশিষ্ট মহাপুরুষের জীবনচরিত লিখিতে হইয়াছে। তিনি যোগাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণের জীবনচরিতে এই মহাপুরুষকে কলঙ্কমুক্ত করিয়াছেন—তিনি একস্থলে বলিয়াছেন, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রই তাঁহাকে এই মহাপুরুষের জীবনচরিতালোচনায় প্রবর্ত্তিত করেন। উপাধ্যায় এই গ্রন্থে দেখাইয়াছেন—ভারতের তদানীন্তন নানা ধর্ম্মসাধনা যোগাচার্য্যের জীবনে সমঞ্জসীভূত হইয়াছিল। "শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্ম" মত দ্বিতীয় গ্রন্থ এদেশে আর আছে বলিয়া আমার জানা নাই। তিনি বিশ্বাস করিতেন, প্রাচীন ভারতে যেমন নানা সাধনার স্রোত যোগাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণের জীবনে সমঞ্জসীভূত হইয়াছিল—বর্ত্তমান ভারতে নানাধর্ম্মের মিলিত সাধনা সেইরূপ ব্রহ্মানন্দের জীবনে রূপপরিগ্রহ করিয়াছিল। ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য তিনি বিপুল গ্রন্থ "আচার্য্য কেশবচন্দ্র" রচনা করেন। বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ বৃহৎ আয়তনের জীবন-চরিত আর নাই। ইহা শুধু আয়তনে বৃহৎ নহে, আলোচনার দিক দিয়াও ইহা অতি গভীর। এই গ্রন্থ একেবারে নিঃশেষ হইয়া যাওয়ায়, আবার তাহা ছাপান হইতেছে; এ কাজের উদ্যোক্তাকে আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।

এই সকল গ্রন্থ ব্যতীত তিনি অনেকগুলি বক্তৃতাতে, ব্রহ্মানন্দের জীবনের নানাদিক বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। নববিধানের আদর্শ বুঝিবার পক্ষে সেগুলি বিশেষ অনুকূল। "ধর্ম্মতত্ত্ব" পত্রিকায় তাঁহার অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এখনও বহু প্রবন্ধ ধর্ম্মতত্ত্বের ফাইলে লোকচক্ষুর অন্তরালে পড়িয়া রহিয়াছে। এগুলির পুনরুদ্ধার করার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে।

আর দু'একটী কথা বলিয়া এ নিবেদন শেষ করিব। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কথা আলোচনা করিতে গিয়া, তাঁহার গভীর ব্যক্তিত্বের কথা ভুলিলে চলিবে না। যখন পৃথিবীতে কোনও ধর্ম্মবিধান প্রেরিত হয়, তাহা শুধু তত্ত্বে পর্য্যবসিত থাকে না; তাহাকে মানবজীবনে, অনুষ্ঠানে অর্থাৎ ধর্ম্মে ধরিয়া না রাখিতে পারিলে, বিধান ম্লান হইয়া যায়। এ দিকে উপাধ্যায়ের বিশেষ দৃষ্টি ছিল, তাই নবসংহিতার বিধির প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ও শ্রদ্ধা ছিল। সামাজিক বিধির অনুবর্ত্তিতা ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, এ দুটীকে সমঞ্জসীভূত করিয়া নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা কি বিপুল ব্যাপার, তাহা ব্রাহ্মসমাজের গত শত বর্ষের ইতিহাস যাঁহারা আলোচনা করিয়াছে, তাঁহারা জানেন। কত শত লোক প্রাণহীন দেশাচারের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, আবার কত লোক দেশাচার ছাড়িতে গিয়া স্বেচ্ছাচারিতার আবর্ত্তে পড়িয়া সমাজকে বিনাশের পথে লইয়া যাইতেছে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতাই যে যুগের মূলমন্ত্র ছিল, সেই যুগে উপাধ্যায় আমাদিগকে বিধি-নির্দ্দিষ্ট বিধান মানিয়া চলিতে বলিতেন—এই জন্য নবসংহিতা, শ্রীদরবার প্রভৃতির গৌরবের যাহাতে হানি না হয়, সে বিষয়ে সচেষ্ট ছিলেন।

বিধাতার কৃপায় উপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ হইয়াছিল। মণ্ডলীর দুর্দ্দশার কথা আলোচনা করিতে গিয়া, কখনও তাঁহার মুখে পরনিন্দা শুনি নাই। মণ্ডলীর উপর দিয়া কত ঝড় চলিয়া গেল, কিন্তু তিনি এ সকলের মধ্যে অবিচলিত থাকিয়া, বিধিনির্দ্দিষ্ট কার্য্যে আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন। কোন বিধি অমান্য না করিয়া যে মিলন, তিনি তাহারই পক্ষপাতী ছিলেন—এবং শ্রীদরবারের মিলিত নির্দ্ধারণই তাঁহার অনুসর্ত্তব্য, এই কথা বার বার বলিতেন—ইহাতে যোগ না দিয়া যাঁহারা ইহার নির্দ্ধারণের সমালোচনা করিতেন, তাঁহাদের সঙ্গে তিনি একমত ছিলেন না।

মানসিক বল তাঁহার অসাধারণ ছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু বিধাতার কৃপায় তিনি কার্য্যোপযোগী দৈহিক স্বাস্থ্যও পাইয়াছিলেন। কল্য কি পানাহার করিব, এ চিন্তা তাঁহার ছিল না; প্রচারাশ্রমে যে অন্ন জুটিত, তাহাই ভক্তির সহিত গ্রহণ করিতেন। কিন্তু স্বল্পাহারে বা অনাহারে এরূপ মানসিক শ্রম করিতে আমি আর কাহাকেও দেখি নাই। আমার এম, এ পরীক্ষার কিছুদিন পূর্ব্বে, আমি প্রচারাশ্রমে তাঁহার পার্শ্বের ঘরে থাকিতাম। আমি পড়াশুনার পর রাত্রিতে একবার ঘুমাইয়া যখন জাগিয়া উঠিতাম, দেখিতাম, উপাধ্যায় ক্ষীণ কেরোসিনের আলোতে তাঁহার টেবিলে বসিয়া কাজ করিতেছেন। রোজ ১৭।১৮ ঘণ্টা এইরূপে বহুবৎসর অনায়াসে কাজ করিয়া গিয়াছেন।

ব্রহ্মানন্দের নির্দ্দেশের প্রতি তাঁহার কি গভীর শ্রদ্ধা ছিল, তাহার একটী দৃষ্টান্ত দিয়া আজকার নিবেদন শেষ করিব। শ্রদ্ধাস্পদ কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের উপর প্রচারাশ্রমের বিশেষ ভার অর্পিত হইয়াছিল। উপাধ্যায় এই বিধান সর্ব্বান্তঃকরণে মানিয়া লইয়াছিলেন। একবার তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র কলেরায় মত হইয়া প্রায় মৃত্যুমুখে পতিত হন, উপাধ্যায় তখন মন্দিরে সামাজিক উপাসনায় যোগ দিতেছেন। প্রচারাশ্রম হইতে একটী লোক ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে গোপনে এই সংবাদ দিলে, তিনি অবিচলিতচিত্তে কাকাবাবুকে এই খবর দিতে বলিয়া, আবার গভীর উপাসনায় নিযুক্ত হইলেন।

গুরুতর খাটিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইলে, শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার মতিবাবু তাঁহাকে প্রতিদিন কিছু দুগ্ধ পান করিতে বলিয়াছিলেন। অতি অনিচ্ছাসত্ত্বে এই দুগ্ধ অল্প কিছু গ্রহণ করিতেন। প্রচারাশ্রমে তাঁহার জন্য অধিক কিছু ব্যয় হয়, ইহা তিনি চাহিতেন না।

ধ্যানমগ্ন যোগী দিব্যধামে চলিয়া গিয়াছেন ও ব্রহ্মানন্দের দলে মিলিত হইয়াছেন। স্থিতপ্রজ্ঞ, জীবন্মুক্ত যোগীর কথা যাহা পুস্তকে পড়িয়াছিলাম, তাঁহার জীবনে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইয়াছি। আজ তিনি অমরলোক হইতে আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন। তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনা করিয়া বিধানজননীর চরণে প্রণিপাত করি।

শ্রীপ্রজ্ঞাসিংহ ঘোষ।

—•—

কেশবচন্দ্রের জীবনকথা ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কেশব ছিলেন প্রেমিক ভক্ত, তাঁহার প্রেমঘন ও ভাবঘন ভক্তরূপ তৎকালীন বাঙ্গালার এক বিস্ময়ের বস্তু। ভক্ত কেশব নারীর মহিমায় শ্রীভগবানের মাতৃভাব লক্ষ্য করিয়া রসে তন্ময় হইয়া যাইতেন। নারীর কোমলতার মধ্যে কেশবের একাত্মবোধ-সূচক প্রার্থনা কি সুন্দর, কি গভীর, দেখুন:—"নারীভক্তি, নারীবিনয়, নারীক্ষমা, নারীচরিত্র আমাদের মধ্যে স্থান লাভ করুক। দেবী হও, হে ভাই! প্রকৃতি হও, হে পুরুষ! আমরা এই মন্ত্র উচ্চারণ করি—শ্রীমতি, শ্রীমতি—কোথায় রহিলে? এসো, ইচ্ছাময়ী, জ্ঞানময়ী, আকাশরূপিণী, জ্ঞানাকাশরূপিণী, তুমি এস আমাদের নিকট। দেবীপূজা করিতে করিতে দেবী হইব। * * * * মাকে দেখিব, মার মত শান্ত হব, ধৈর্য্য ধরিব, মার মত সকলকে ভালবাসিব। মা যেমন, তেমনি উপযুক্ত ছেলে হব।"—ইহা কেশবের তন্ময় অনুভূতির কথা। এই প্রসঙ্গে একটি কাহিনী উল্লেখ করিতেছি। কথিত আছে যে, 'গজা' কেশবচন্দ্রের এক অতি প্রিয় বস্তু ছিল। ভাই মহেন্দ্র নাথের পত্নী এই কথাটি জানিতে পারিয়া, একদিন 'গজা' প্রস্তুত করিয়া ভক্তির সহিত তাঁহাকে গজা নিবেদন করিলেন এবং গজা দেখিবামাত্রই নিবেদিকার মধ্যে কেশব মাতৃভাব উপলব্ধি করিয়া আকুল হইয়া উঠিলেন, বলিলেন—"মা, তোমার এত দয়া, তুমি আমায় এত স্নেহ কর!" বলিতে বলিতে সমাধিস্থ হইয়া গেলেন। বলা বাহুল্য, ইহা সাধারণ মানুষের জীবনের কাহিনী নহে।

এই ভক্তি ও প্রেমের গভীরতা নিয়াই কেশবচন্দ্র সমাজ-সংস্কারে অগ্রসর হইতেন। তাঁহার শুচিতা ও পবিত্রতা শুষ্ক নৈতিক উপদেশ নহে,—গভীর সত্য ও রসানুভূতির অপরিহার্য্য ব্যঞ্জনা। ভক্তি বস্তুটী একটী নেশা বা ভাবালুতা নহে এবং কেশব এই জন্যই তাঁহার সত্তার সম্পূর্ণ শক্তি নিয়া মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন। ইহা বর্ত্তমানযুগের মহাত্মা গান্ধীর অনুষ্ঠিত সামাজিক আন্দোলন মাত্র নহে, বহুকাল পূর্ব্বে কেশব এই আন্দোলনকে বাঙ্গালীর জীবনে বাস্তব করিয়া গিয়াছিলেন। ১৮৭০খৃষ্টাব্দে বিলাত হইতে প্রত্যাগমনের পর, বিলাতের পেনি পেপারের অনুকরণে, কেশবচন্দ্র সাপ্তাহিক পত্রিকা "সুলভ-সমাচার" প্রকাশিত করেন। কাগজে মন্ত্ররূপে এই বাক্যটী লিখিত ছিল—

"সহজে পাইতে যদি চাও জ্ঞানধন,
'সুলভ' সংবাদপত্র কর অধ্যয়ন;
সকলের প্রিয় ইহা গরীবের মিত্র,
প্রকাশে বিবিধ তত্ত্ব মানব-চরিত্র।"

সুলভ সমাচারে বিশেষতঃ মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য করা হইত। মদ সম্বন্ধে নীতিবাক্য ছিল, "মদ না গরল?" "Touch not, taste not, smell not." "ছোঁবনা খাবনা তাহা, দিবনা কাহার।" সুলভসমাচারই বাংলাদেশের সর্ব্বপ্রথম একপয়সার কাগজ।

শ্রীকেশবের হৃদয়ের প্রসারতার যে পরিচয় আমরা লাভ করি, তাহাই কেশবের সেকালে জনপ্রিয়তার বিশিষ্ট কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কেশবচন্দ্রের নিকট ধর্ম্ম বাহিরের সাজসজ্জা বা একটী পোষাকী ব্যাপার ছিল না। তাঁহার প্রত্যেকটী প্রার্থনা ও তৎসম্পর্কিত উচ্চারিত বাক্যাবলী হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে উৎসারিত হইত এবং তাহা শ্রোতৃগণের মর্ম্মতল স্পর্শ করিত।

শ্রেষ্ঠ সাহিত্য প্রধানতঃ মানুষের হৃদয়ের ভাষা। কেশবের সহজ স্বচ্ছন্দতা ও আন্তরিকতাপূর্ণ প্রত্যেকটী বাণী বাস্তবিকই উচ্চাঙ্গের সাহিত্য হইয়া রহিয়াছে। সাহিত্য যদি রস-রচনা হয়, তবে কেশবচন্দ্রের প্রত্যেকটী প্রার্থনাই উচ্চাঙ্গের সাহিত্য; এবং সাহিত্য রসরচনা নয়, এমন কথা নিশ্চয়ই কেহ বলিবেন না। কেশবচন্দ্র যে যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে যুগে তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাব বাংলার তরুণগণকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল। তাঁহার উদ্দীপনাময়ী বাণী বাঙ্গালীর ভাব ও অনুভূতির জগতে বিপ্লব আনয়ন করিয়াছিল। তাহাতে জাতির স্বাধীনতাবোধ জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রথম জাগরণের আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। কাব্যে, সঙ্গীতে ও সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রে কেশবের ব্যক্তিত্বের প্রেরণা যে নবীনতা ও সরসতা দান করিয়াছিল, তাহা উপেক্ষা করিলে বাংলা সাহিত্যের একটী বিশিষ্ট 'যুগ' সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে না।

কেশবচন্দ্র সাহিত্যসাধনা কতকটা তাঁহার পিতামহ রামকমল সেন হইতে প্রাপ্ত হন। ইনি প্রথমে Calcutta School Book Societyএর প্রেসে ৮৲ টাকা বেতনে কাজ করিতেন। বাঙ্গালা ভাষায় একখানা অভিধান প্রণয়ন করেন। ইনি Bengal Bank এর দেওয়ান হইয়া মাসিক ১২০০৲ বেতন পাইয়াছিলেন।

কেশবের সাহিত্যসাধনা কেবল তাঁহার নিজের জীবন ও বাণীতেই সীমাবদ্ধ ছিলনা। তাঁহার সংস্পর্শে যে সকল মনীষীরা আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেই কেশবের জীবনরসের

উৎস হইতে উদ্দীপনা লাভ করিয়া, সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরাজী ভাষা পর্য্যন্ত সম্পচ্ছালিনী করিয়া গিয়াছেন। এখানে ভাই গৌরগোবিন্দ রায়, ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল (চিরঞ্জীব শর্ম্মা), ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র, ভাই গিরিশচন্দ্র সেন * এবং আরো অনেকের নাম করা যাইতে পারে।

কেশবের স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ছিল এ যুগেরও কল্পনার অতীত। এসম্বন্ধে শুধু একটী অংশ 'জীবনবেদ' হইতে উদ্ধৃত করিতেছি:—"গুরুগিরি কখনও করিব না। অধীন হওয়াকে আমি অত্যন্ত ঘৃণা করি; আমাতে যাহা ঘৃণা করি, অন্যেতে তাহা ঘৃণা করি না? দলের সামান্য কাহাকেও আমি অধীন দেখিতে পারি না। কেহ যে অন্যের অধীন হইবে, তাহা দেখিতে পারি না; আমার অধীন যদি কেহ হয়, তাহাও আমার অত্যন্ত অসহ্য। অন্য এক মনুষ্য আমার অধীন হইবে? পিতার নিকট আমি কি উত্তর দিব? আমার 'মত' আরেক জনের ঘাড়ে চাপাইব? আমার শাসনে অপরকে শাসিত করিব? মায়ার মোহিনীমূর্ত্তি দেখাইয়া দলে আনিবার চেষ্টা করিব? অপরকে আমি আমার অধীন করিয়া রাখিব? ইহাতে নরক আমাকে হাঁ করিয়া গিলিবে, স্বর্গও লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিবে। * * * কাহাকেও গুরু অথবা শাসনকর্ত্তা বলিতে বলি না; ঈশ্বরকেই কেবল গুরু ও শাসনকর্ত্তা বলিয়া জানি। অধীনতা-প্রিয় কেহ যদি ঠক হইয়া ঢুকিয়া থাকেন, সে ঠককে বাহির করিয়া দিব, দিবই দিব। * * * একটী ভাল মতেরও অন্ধ হইয়া অনুকরণ করিতে চাই না। আমি অন্ধ হইয়া অন্ধ চালিত করিব না। স্বাধীনতা মহামন্ত্র! এতদূর যদি স্বাধীনতা হয়, এ'যে স্বেচ্ছাচারের কাছে গেল! স্বাধীনতা পূর্ণ হইবে, স্বেচ্ছাচার হইবেনা। * * কোনো মানুষকে জীবনের আদর্শ কখনও মনে করি নাই, করিবও না। পূর্ণ আদর্শ মানুষ হইতে পারে না। কোনও পুস্তক নাই, যাহাতে পূর্ণজ্ঞান পাইতে পারি, এইজন্য বইকে আদর্শ করিয়া লই নাই।" পুণ্যময় প্রাণের কি সুন্দর অমৃতময় নির্ভীক উক্তি!

জীবপ্রেমেই ভক্তিধর্ম্মের সার্থকতা এবং কেশবচন্দ্রের জীবনে ইহা বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল; কেন না বলিয়াছি, ভক্তিধর্ম্ম কেশবের জীবনে ভাবালুতা বা Sentimentalism মাত্র ছিল না। কেশবচন্দ্রের নিকট দয়া আত্মার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। ইহার স্থান বিচার বুদ্ধির বহু উর্দ্ধে; এইজন্য কেশব বলিতেন—"দয়া বিচার করে না, বিশ্বাস করে।" বলা বাহুল্য, ইহা কেশবের নিকট নীতিশাস্ত্রের উপদেশ ছিল না,—ইহা ছিল তাঁহার সত্তার অপরিহার্য্য অংশ। ঠিক যেমনটী ছিল যীশুখৃষ্টের মধ্যে, শ্রীচৈতন্যের মধ্যে।

এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, দলগত ভাবে জনসেবা ও জীবসেবা কেশবচন্দ্রই আধুনিক যুগে সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ভগিনী নিবেদিতা ও ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের ইহাই মত। বিবেকানন্দ দরিদ্র-নারায়ণের সেবা সঙ্ঘবদ্ধভাবে অনুষ্ঠিত করিয়াছেন—মহাত্মা কেশবের অনেক পরে।

এই কেশবচন্দ্রের পক্ষে কবি ও সাহিত্যিক হওয়া একটা স্বাভাবিক ব্যাপার মাত্র। বেদের মন্ত্র যেমন শ্রেষ্ঠ সাহিত্য এবং গদ্যে লিখিত হইলেও শ্রেষ্ঠ কবিতা, সেইরূপ কেশবের প্রার্থনা-গুলিও শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ও অপূর্ব্ব গদ্য কবিতা। সরল শিশুর কলধ্বনি ও পাখীর কাকলীর মত স্বতঃ স্ফুরিত, স্বতঃ উচ্ছ্বসিত। ইহার মধ্যে ঘটিয়াছে গভীর জ্ঞানের সহিত গভীর প্রেমের সমন্বয়।

জীবনে রস-স্বরূপের উপলব্ধি করিয়া যিনি সর্ব্ব সত্তায় প্রেমিক পুরুষ—শ্রীগৌরাঙ্গের দ্বিতীয় আত্মপ্রকাশের ন্যায় আবির্ভূত—তাঁহার সম্পর্কে আসিয়া বাঙ্গালী জীবন যে ভাবরসে গৌরবান্বিত হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। কেশব-চরিত—অমিয়মাখানো। তাঁহার স্পর্শে যে কত লোকের ভাবজীবন পবিত্র প্রেমরসে অভিসিঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা আমাদের নিকট অপরিজ্ঞাত।

কেশব ছিলেন—পরশ পাথর। জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে তাঁহার স্পর্শে যে ভাবের প্রকাশ হইয়াছিল, তাহা সত্যের অনাবিল রূপ। সত্যের বাস্তব উপলব্ধি কেশবকে এমন শুদ্ধ ও অপাপ-বিদ্ধরূপ দান করিয়াছিল, যত কিছু কদাচার ও কুসংস্কার তাহার স্পর্শে ঝরিয়া পড়িয়াছে। মানুষের প্রতি, জীবের প্রতি তাঁহার অগাধ প্রেম,—সকল বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতাকে ধুইয়া মুছিয়া মানুষের অন্তরাত্মাকে বিশ্বজনীনতার উর্দ্ধলোকে স্থাপন করিয়াছে এবং আত্মস্বরূপকে জানিবার সুযোগ দান করিয়াছে।

যে সকল সাহিত্যিক ও ধর্ম্মপ্রচারকদিগকে নিয়া কেশবচন্দ্র তাঁহার দল গঠন করিয়াছিলেন, আজ তাঁহাদের সকলকে আমার প্রণাম জানাইয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিতেছি।

মালতীশ্যাম।

* প্রবন্ধে ইঁহাদের অতি সংক্ষিপ্ত জীবনী দেওয়া ছিল। স্থানাভাবে তাহা বাদ দেওয়া হইল। (ধং, সং)

স্বর্গীয় শ্রীনাথ দত্তের জীবন-স্মৃতি

(শ্রাদ্ধবাসরে দৌহিত্র শ্রীমান্ সুধীরচন্দ্র দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক পঠিত)

বেদনা-ব্যাকুল সংসারে ধৈর্য্যের স্থান কোথায়? উপলবন্ধুর জীবন-পথে অধ্যবসায়ের স্থান কোথায়? হিংসা দ্বেষের কুহেলিকা-সমাচ্ছন্ন জনারণ্যে সৌভ্রাত্র ও সমবেদনার স্থান কোথায়? দুর্ভাগ্যের কুটিল ভ্রূকুটির সম্মুখে নির্ভীক সত্যনিষ্ঠা ও ঈশ্বরানুরক্তির স্থান কোথায়? নিশ্চয়ই উত্তর আসিবে, "সে স্থান সুলভ নহে, সে স্থান সামান্য নহে, সেই স্থান একমাত্র সাধনায় লভ্য, অনুদিন স্মরণে গাঁথিয়া রাখিবার যোগ্য।"

যদি তাহাই হয়, তবে এই সকল গুণে গুণী জনের জীবনকে মূল্যহীন বলিয়া গণ্য করা নিশ্চয়ই ঘোর অন্যায় ও চরম ধৃষ্টতা। আপনাকে আপনার কাজে প্রচার করিতে চাহিলেন না, কর্ম্মোন্মাদনায় দিন কাটিয়া গেল, রাত্রি ঘনাইয়া আসিল; তাই জীবনদিনের অসীম ক্লান্তি দূর করিবার ছলে তাঁহারা ঘুমাইয়া পড়িলেন, আর জাগিলেন না! এমন জীবন আমরা পূর্ব্বেও দেখিয়াছি, এখনও দেখিতেছি। কর্ত্তব্যের পাদপীঠে ব্যক্তিত্বকে নিঃশেষে উৎসর্গ করিয়া দেওয়ায়, সমগ্র জীবনটী কর্ম্মোচ্ছ্বাসের তলায় তলায় লোকচক্ষুর অন্তরালে যাপিত হইল, কেহ দেখিল না, কেহ জানিল না; এইজন্য যদি তাঁহাদের জীবনাদর্শকে আমাদের জীবনে অর্থহীন ও নিষ্প্রয়োজনীয় মনে করিয়া বিস্মৃতির অতল তলায় সমাধিস্থ করিয়া রাখি, তাহা হইলে আপনার ক্ষতি ও আপনার অপরাধকেই স্পষ্ট করিয়া তুলিব। অতীতে বহুবার এই অপরাধ আমরা করিয়াছি; তাই তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইতেছে, যুগযুগান্তের সমাধি খনন করিয়া, কঙ্কালের মুখে ভাষা ফুটাইবার ভৌতিক প্রয়াসে!

এই চিন্তাই এক শীতের গোধূলি বেলায় আমার মনের এক কোণ হইতে অন্য কোণে মুহুর্ম্মুহু ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। আমি তখন আমার পূজ্যতম দাদামহাশয় ৺শ্রীনাথ দত্ত মহাশয়ের শেষ শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলাম। গোধূলি ম্লানায়মান, দাদা মহাশয়ের জীবনদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ। দাদামহাশয়ের ধৈর্য্য ছিল অসীম, অধ্যবসায় অনন্যসাধারণ। তাঁহার হৃদয়ে ছিল সরল প্রীতি, সত্যনিষ্ঠা, ভক্তি ও বিশ্বাস। একাধারে এতগুণ যাঁহার আছে, তিনি সামান্য ইচ্ছা করিলেই জগতে কীর্ত্তিমান হইতে পারেন, যদি জীবনে সময়ের অভাব না ঘটে। দাদামহাশয় ৮৯ বৎসর কাল সময় পাইয়াছিলেন, অথচ কীর্ত্তি সঞ্চয় করিতে পারেন নাই; তাহার একমাত্র কারণ এই যে, যশোলাভেচ্ছা তাঁহার আদৌ ছিল না। এবং এই খ্যাতিহীন জীবন যাপন করায়, তাঁহার জীবনাদর্শ আমাদের জীবনে নিষ্ফল ও নিষ্প্রয়োজনীয় হইল কি না—ইহাই যখন চিন্তা করিতেছিলাম, তখন মনে হইল, এইরূপ মনে করিলে নিজেকেই প্রতারণা করিতে হইবে। এই জীবন অন্যের নিকট, হইতে পারে নগণ্য, হইতে পারে তুচ্ছ, কিন্তু আমাদের নিকট ইহার মূল্য সুপ্রচুর। এই সিদ্ধান্তে আমি এক মুহূর্ত্তে পৌঁছাই নাই। তাঁহার সমগ্র জীবনটীকে তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিয়াছি। আজ তাঁর শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহার গুণগ্রাহী, সজ্জন সুহৃদ ও আত্মীয় বর্গের নিকট এই কর্ম্মময় জীবনকাহিনী বিবৃত করা আমার কর্ত্তব্যের অঙ্গীভূত বলিয়া মনে করিলাম; ইহাকেই F. T. Turnbullএর ভাষায় বলা যায়, "A Function craving fulfilment." এই কর্ত্তব্য সম্পাদিত হইলে, পরলোকগত আত্মা আমার প্রতি তুষ্ট হইবেন, আমি ধন্য হইব। এই ধন্য হইবার সুযোগই আমি আপনাদের নিকট ভিক্ষা করিতেছি, আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

আমাদের দাদামহাশয় ১২৫৫ সালের ৭ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত হবিগঞ্জ মহাকুমার অধীন উত্তর সাঙ্গড় গ্রামে প্রসিদ্ধ দত্তপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ৺শিবপ্রসাদ দত্ত ও মাতার নাম ৺করুণাময়ী দত্ত। ৺শিবপ্রসাদ দত্ত মহাশয় অতিশয় ধার্ম্মিক ও সংকীর্ত্তনানুরাগী ছিলেন। ইনি স্বদেশে জমিদারী ও কলিকাতায় তেজারতি এবং কড়া ইত্যাদি লৌহদ্রব্যের বৃহৎ ব্যবসায়ী বলিয়া যথেষ্ট প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

এই শিবপ্রসাদ দত্তের পুত্র শ্রীনাথ বাল্যকাল হইতে প্রচুর আদরে লালিতপালিত হইতেছিলেন, তিনি ষষ্ঠ পুরুষের প্রথম পুত্র সন্তান, অতএব পরিবারের সকলেরই অতিমাত্রায় স্নেহভাজন ছিলেন। স্নেহান্ধ পিতামাতা শিশু শ্রীনাথের সপ্তম বর্ষ বয়ঃক্রম না হওয়া পর্য্যন্ত, তাঁহাকে লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না। সম্ভবতঃ সপ্তম বর্ষেই তাঁহার বিদ্যারম্ভ হইল, পীঁড়ির উপর বালি ছড়াইয়া কঞ্চি কলমের সাহায্যে 'অ' 'আ' 'ক' 'খ' ইত্যাদি বর্ণমালা লিখিয়া এবং সর্ব্বাঙ্গে ঐ ধূলা বালি মাখিয়া। তৎপর কলার পাতে প্রমোশন এবং আরও পরে গুরুগৃহে অর্থাৎ গ্রামের পুরোহিতের বাড়ীতে সংস্কৃতশিক্ষার জন্য গমন; সে শিক্ষা বেশী দূর অগ্রসর হইল না। ৯।১০ বৎসর বয়সে বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত কলিকাতায় আসিবার কথা উঠিল, কিন্তু সফল হইল না। সদর শ্রীহট্টেই তাঁহাকে যাইতে হইল। সদর ঘাটে এক বৃদ্ধ পাদরীর স্কুলে মাসে মাসে এক আনা বেতন দিয়া, প্যারীচরণ সরকারের First Book of Reading পড়িতে লাগিলেন। আমাদের দাদামহাশয় First Bookর I met a lame man ইত্যাদি যে গভীর অনুরাগের সহিত পড়িতেন, একথা আমি বলিতে পারিলাম না; কারণ সেই সময় যদি কেহ তাঁহার নিকট থাকিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইত যে, তিনি দিনে তিনবার নদীর ঘাটে যাইয়া মাঝিদের জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "এই মাঝি, কোন গাঁয়ের নৌকা রে? সাঙ্গড়ের নৌকা আছে এখানে?" এবং দিনে চারবার পাঁজি খুলিয়া দেখিতেছেন, পূজার ছুটি সুরু হইবার আর ক'মাস, ক'দিন, ক'দণ্ড বাকী আছে। দাদামহাশয় আমার কাছে এই গল্পই করিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন, "জানিস, আমি প্রথম যে পাদরীর স্কুলে পড়তাম, সেখানে মাসিক বেতন ছিল এক আনা, আর কামাই করলেই জরিমানা এক আনা"। আমি তখন বলিয়াছিলাম, "তবে ত দাদামশাই, আপনার মাসে গড় পড়তা ১৸৶৹ একটাকা পনর আনাই খরচ হত।" উত্তরে দাদামহাশয় খুব হাসিয়াছিলেন। যাহা হউক, স্থূল কথা এই যে, দশ এগার বৎসর বয়সেও দাদামহাশয়ের বাড়ীর জন্য মন কাঁদিত; তাই তিনি গ্রীষ্ম অথবা পূজাবকাশ সুরু হইবার কয়েকদিন আগেই বাড়ী চলিয়া আসিতেন এবং স্কুল খুলিবার পর মাসখানেক অতীত না হইলে শিক্ষাস্থলে ফিরিতেন না। বৎসর দুই শ্রীহট্টে থাকিয়া

বিদ্যালাভের নিমিত্ত কলিকাতায় আনীত হইলেন। বড়বাজার গলির কদর্য্য রাস্তা, গঙ্গার লবণাক্ত জল, এবং সম্ভবতঃ গৃহশিক্ষক গোলক মাষ্টারের শাসন এক যোগে ষড়যন্ত্র করিয়া দাদামহাশয়ের উপর এত অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিতে লাগিল যে, দাদামহাশয় বাধ্য হইয়া স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু আবার কলিকাতায় আসিতে হইল। এবার চোরবাগানের প্যারীচরণ সরকারের স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন এবং Second Book of Reading পড়িতে লাগিলেন; কিছুদিন পরে অজ্ঞাত কারণে দেশে চলিয়া গেলেন এবং ভূতপূর্ব্ব কলিকাতার গৃহশিক্ষক গোলকচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে থাকিয়া, তাঁহারই অভিভাবকত্বে তিন মাইল পথ হাঁটিয়া লস্করপুর নামক স্থানের স্কুলে পড়িতে লাগিলেন। এই গোলকবাবু পরবর্ত্তীকালে তাঁহার বৈবাহিক হইয়াছিলেন, ইনি লস্করপুরের স্কুলে মাষ্টারী করিতেন। ষোল কি সতর বৎসর বয়সে কলিকাতায় আসিয়া পড়িবার জন্য দাদামহাশয়ের ইচ্ছা জাগে।

এই পর্য্যন্ত শুনিয়া হয়ত বা আপনারা মনে মনে বলিতে পারেন, "A slipping stone gathers no moss"—গড়ানে পাথরের গায়ে শেওলা ধরে না। কিন্তু যদি একটী বিশিষ্ট পাথর কোনও এক প্রকারের বিশিষ্ট শ্যাওলার সন্ধান করিতে থাকে এবং উহা না পায়, তবে সেই পাথর ঈপ্সিত শৈবালের ব্যাকুল প্রতীক্ষায় গড়াইতে থাকিলে তাহাকে নিন্দা করা যায় না। দাদামহাশয়ের হৃদয়-পাষাণ এতদিন যে শিক্ষা-শৈবালের সন্ধান করিতেছিল, তাহা শ্রীহট্টের পাদরী স্কুল, চোরবাগানের প্যারীচরণ সরকারের স্কুল ও লস্করপুরের স্কুল তাঁহাকে দিতে পারে নাই; তাই উৎকণ্ঠিত হইয়া দাদামহাশয়কে স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে হইয়াছিল। এবার যখন কলিকাতায় আসিলেন, তখন এমন স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন, যেখানে তাঁহার আশা ও আকাঙ্ক্ষা, সাধনা ও বাসনার পূর্ণতা প্রচ্ছন্নরূপে বিরাজ করিতেছিল; তাই এই স্কুল ত্যাগ করিবার প্রয়োজন হইল না। বরং যে শিক্ষাকে এতদিন আতঙ্কের চোখে দেখিয়া, আত্মীয় স্বজনদের স্নেহকোলে পলাইয়া আসিতেন, আজ সেই স্নেহপরায়ণ আত্মীয় স্বজনের সমস্ত মমতাকে উপেক্ষায় লাঞ্ছিত করিয়া, সেই স্কুলের কোলেই একান্ত নির্ভরতার সহিত আশ্রয় লইলেন। এই স্থলে আমি তাঁহার আত্মজীবনী হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না। তিনি বলিতেছেন :—

"১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে মার্চ্চ, আমার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। আমার ধর্ম্মজীবনের সূত্রপাত এই ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ২১শে মার্চ্চ। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ ঘটিল এই ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ২১শে মার্চ্চ। জীবনে প্রথম প্রাণের স্পন্দন জাগিল ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে মার্চ্চ। এই দিনটীর নিকট আমি সারাজীবনের জন্য কৃতজ্ঞ হইয়া রহিলাম।"

বস্তুতঃই এই ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে মার্চ্চ দাদামহাশয়ের জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই তারিখেই দাদামহাশয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা কলেজে ভর্ত্তি হন, এই তারিখেই রেভারেণ্ড অমৃতলাল বসু মহাশয়ের স্নেহভাজন হইয়া পড়েন। ইতিপূর্ব্বে তিনি অনেক স্কুলে পড়িয়াছেন, কিন্তু এমন একব্যক্তির নামোল্লেখ করেন নাই, যাহার সহিত তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্রও অন্তরঙ্গতা জন্মিয়াছিল; কিন্তু এই স্কুলে অতি অল্পদিনের মধ্যেই চারিজন সহপাঠীর সহিত ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল বলিয়া তিনি তাঁহার আত্মজীবনীতে উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহাদের নাম ৺নন্দলাল দত্ত, দীনবন্ধু দাস, ত্রৈলোক্যনাথ গাঙ্গুলী ও লালবিহারী দে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে এইখানে তাঁহার মনের অবলম্বন মিলিয়াছে। এখানকার উপদেশ তাঁহার মনে প্রাণে নূতন সাড়া জাগাইয়া দিল, তাই দিবসের অধিকাংশ সময়ই স্কুলে কাটাইতে লাগিলেন। পূজার ছুটীর পর বাড়ী হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যখন জনৈক সহপাঠীর মুখে শুনিলেন যে, ইতিমধ্যে ব্রহ্মানন্দের কলুটোলাস্থ বাটীতে উৎসব হইয়া গিয়াছে, তখন তাঁহার অনুশোচনার অবধি রহিল না। পর বৎসর ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে, মাঘ মাসের ১১ই তারিখে যখন ব্রহ্মানন্দ স্বহস্তে কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীটস্থ মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন, তখন তিনি অকুস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং এই ঘটনার একটী লোভনীয় বিবরণ তিনি চিত্রের ন্যায় অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন তাঁহার আত্মজীবনীতে। সময়ের অপ্রতুলতা না ঘটলে আমি তাহা আদ্যোপান্ত আবৃত্তি করিতাম।

যাহা হউক, এখন হইতে ব্রহ্মানন্দই হইলেন তাঁহার জীবনের আদর্শ—ব্রহ্মানন্দের প্রার্থনা, উপাসনা, আরাধনা তাঁহাকে যেন এক স্বপ্নময় স্বর্গলোকের সন্ধান বলিয়া দিল; তিনি সেই স্বপ্নলোকের সুষমা কুড়াইতে যাইয়া, অপার আনন্দে যত অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিয়াছেন, আজ তাহাই তাঁহার আত্মজীবনীর বর্ণে বর্ণে মুক্তাহার হইয়া রহিয়াছে। দিন যতই যাইতে লাগিল, ততই যেন তিনি কেশবচন্দ্রের প্রভাবের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে লাগিলেন। "তোরা আয়রে ভাই, এতদিনে দুঃখের নিশি হল অবসান, নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম।" এই গানের আহ্বানে যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মে যোগ দিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের একজন। তাই এই গান শুনিবার পরদিন হইতেই তিনি মনে মনে ব্রাহ্ম হইয়া পড়িলেন ও পরের রবিবার হইতে কলুটোলায় উপাসনাতে নিয়মিত যোগ দিতে লাগিলেন। "এই সময় প্রতি রবিবারে উপাসনার একঘণ্টা পূর্ব্বে কেশব বাবুর কলুটোলাস্থ বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইতাম এবং কেশববাবুর দিকে অনিমেষনয়নে চাহিয়া থাকিতাম। তাঁহার সেই সৌম্যমূর্ত্তিদর্শনে প্রাণে আপনা হইতেই ভক্তিভাবের উদয় হইত।" এই কথা মহর্ষির উক্তির প্রতিধ্বনি বলিয়াই মনে হয়। যাহা হউক, যাঁহাকে দেখিবা মাত্র অন্তরে ভক্তি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত, তাঁহাকে একান্তভাবে আপনার বলিয়া স্পর্দ্ধা করিবার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা জাগিবে, তাহা খুবই স্বাভাবিক। এই আকাঙ্ক্ষা দাদামহাশয়ের জাগিয়াছিল, কিন্তু কিরূপে ইহাকে সার্থক করা যায়, তাহা তাঁহার জানা ছিল না;

তাই একবার কুমুদিনী-চরিত তারস্বরে পাঠ করিয়া, একবার বরাহনগরে সমস্তদিন কাটাইয়া, বাসার আত্মীয়গণকে অতিমাত্রায় রুষ্ট করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আশা ছিল, হয়ত উত্যক্ত আত্মীয় স্বজন তাঁহাকে তিরস্কার করিবেন, আর তিনি সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মানন্দের দলে যোগ দিয়া, অতি সংক্ষেপে তাঁহাদের তিরস্কারের জবাব দিবেন। কিন্তু সমস্ত কৌশল ব্যর্থতায় পরিণতি লাভ করিল। মনে জাগিল, এক তুমুল সংগ্রাম। এই সময় সাধু অঘোরনাথ কর্ত্তৃক সূচিত মুঙ্গেরের ভক্তি আন্দোলন ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি দাদামহাশয়ের আসক্তিকে শতগুণ বাড়াইয়া দিল। ইহারই ফলে, চিৎপুরের স্কুলের ছাত্রগণ ভাষা-শিক্ষার পরিবর্ত্তে, "ডাকার মত ডাক" শিখিবার চেষ্টায়, উদার আকাশের দিকে দৃষ্টি মেলিয়া conjugation পড়িতে লাগিল, I love, We love, Thou lovest—জননী, আমি আজ তোমায় ভালবাসিলাম, আমার ভ্রাতাগণ তোমাকে ভালবাসিল এবং তুমি আমাকে আর আমার ভ্রাতাগণকে ভালবাসিলে। চোখের জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল, তৃষিত ধরার শুষ্ক কণ্ঠ যে একদিন ব্রহ্মানন্দ ভিজাইবেন, এই চিৎপুরের স্কুল বাড়ীতেই তার বরাভয় পাইতেছি!

(ক্রমশঃ)

সংবাদ।

কেশবস্মৃতিভবনের উদ্বোধন—গত ৬ই মার্চ্চ, শনিবার, অপরাহ্ণে, ৭৮ বিসার্কুলার রোডস্থ ভিক্টোরিয়া ইন্‌ষ্টিটিউশনে, নবনির্ম্মিত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন স্মৃতিভবনের উদ্বোধন এবং ইন্‌ষ্টিটিউশনের পুরস্কারবিতরণী সভার অনুষ্ঠান হয়। শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে শিক্ষায়তনটী সুন্দররূপে পত্র পুষ্প ও জাতীয় পতাকা দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। বিদ্যালয়সংলগ্ন প্রাঙ্গণে উৎসবের অনুষ্ঠান হয় এবং চন্দ্রাতপতলে সভানেত্রীর স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। তাহার এক পার্শ্বে উচ্চ বেদীর উপরে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পুণ্যাকৃতি তৈলচিত্র সুসজ্জিত করিয়া রাখা হয়। শিক্ষায়তনের ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক বেদগান, সঙ্গীত ও ক্রীড়ানুষ্ঠানের পর সভানেত্রী পুরস্কার বিতরণ করেন। তৎপর সম্পাদক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বিদ্যালয়ের রিপোর্ট পাঠ করেন। বিদ্যালয়টী ক্রমে ক্রমে কলেজে পরিণত হইয়াছে। ১৯৩২ খৃঃ আই-এ এবং ১৯৩৫ খৃঃ বি-এ ক্লাস খোলা হয়। বর্ত্তমানে কলেজ বিভাগে ১০০ জন ছাত্রী আছে। স্কুলের ছাত্রীসংখ্যাও বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছে। সভানেত্রী বক্তৃতান্তে নবনির্ম্মিত ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। সভানেত্রীর বক্তৃতার মর্ম্ম আগামী সংখ্যায় দিতে চেষ্টা করিব। কেশবপ্রদর্শিত নারী-শিক্ষার আদর্শে আমরা এই শিক্ষায়তনের উত্তরোত্তর উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি আকাঙ্ক্ষা করি।

সাম্বৎসরিক—গত ১৬ই ফাল্গুন, ৭নং ময়ূরভঞ্জ রোডে, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বীরের গৃহে, তাঁহার পিতৃদেবের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন, এবং জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী কুমুদিনী দাস প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচার-ভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

গত ১লা মার্চ্চ, নবদেবালয়ে, ব্রহ্মানন্দের সহধর্ম্মিণি ব্রহ্মনন্দিনী জগন্মোহিনী দেবীর এবং নববিধানের উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়ের সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন, মহারাণী সুচারু দেবী, শ্রীমতী মণিকা দেবী, শ্রীমতী হেমলতা চন্দ প্রার্থনা করেন এবং শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র সেন আচার্য্যদেবের ও মাতৃদেবীর প্রার্থনা পাঠ করেন।

গত ৭ই মার্চ্চ ১৪০বি হরিশ মুখার্জ্জি রোডে শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বসুর গৃহে, তাঁহার শ্বশুর স্বর্গীয় রেভারেণ্ড যোগেন্দ্রনাথ দত্তের তৃতীয় সাম্বৎসরিক উপলক্ষে অধ্যাপক খড়্গসিংহ ঘোষ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বসু প্রচারাশ্রমে ২৲ টাকা দান করেন।

গত ৮ই মার্চ্চ, শাস্ত সাধক ঋষি কেদারনাথ দের স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক দিনে, ২৫৭ রাসবিহারী এভিনিউতে, মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত মনোনীতধন দের গৃহে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। নবদেবালয়েও অদ্য এই উপলক্ষে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন, ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক ও ভাই অখিলচন্দ্র রায় প্রার্থনা করেন। অদ্য শ্রীমতী হেমলতা চন্দ এবং শ্রীমতী অশোকলতা দাস কন্যা ও বালক দৌহিত্র সহ গোরবডাঙ্গায় গিয়া ভক্তের সমাধিপার্শ্বে উপাসনাদি করেন। এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত মনোনীতধন দে প্রচার ভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করেন।

ভ্রম সংশোধন—স্বর্গীয় শ্রীনাথ দত্তের শ্রাদ্ধে তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুমনা দত্ত উপস্থিত ছিলেন, এবং তিনি প্রার্থনা-সহকারে পিতৃ-আত্মার উদ্দেশে ভক্তির অঞ্জলি দান করেন, ইহা ভুলক্রমে পূর্ব্বে শ্রাদ্ধের সংবাদে উল্লিখিত হয় নাই।

কোচবিহার-সংবাদ—কেশবাশ্রমে গত ১লা জানুয়ারী নববর্ষ উপলক্ষে ও ৮ই জানুয়ারী ব্রহ্মানন্দের স্বর্গারোহণদিনে, ২০শে জানুয়ারী মহর্ষিদেবের স্বর্গারোহণ দিনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে, ২২শে জানুয়ারী মহেশবাবুর গৃহে শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী উপাসনা করেন। গত ১৫ই ডিসেম্বর, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখার্জ্জির গৃহে তাঁহার কন্যা কুমারী বাসনারাণীর এবং ৬ই মাঘ পুত্র পরিমলকুমারের জন্মদিনে পিতা উপাসনা করেন।

ভাগলপুর-সংবাদ—ভাগলপুর হইতে শ্রীমতী নির্ম্মলা বসু লিখিয়াছেন, ভাগলপুর ব্রহ্মমন্দির-প্রতিষ্ঠার সপ্তত্রিতম ব্রহ্মোৎসব নিম্নলিখিত প্রণালী অনুযায়ী সম্পন্ন হইয়াছে :—

২০শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার সন্ধ্যায় শ্রীমতী সুনীতি ঘোষের গৃহে আরতির সঙ্গীত সহ উদ্বোধন—আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর বসু। ২১শে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা—আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর

বসু। ২২শে সন্ধ্যায় শ্রীমতী অকিঞ্চনবালা বসুর গৃহপ্রতিষ্ঠার উৎসব—আচার্য্য শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার চাটার্জি। ২৩শে পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে উপাসনা—আচার্য্য শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ব্যানার্জ্জি; মধ্যাহ্নে স্বর্গীয় নিবারণচন্দ্র মুখার্জ্জির গৃহে প্রীতি-ভোজন; সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা—আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর বসু। ২৪শে প্রাতে স্বর্গীয় নিবারণচন্দ্র মুখার্জ্জির গৃহে মহিলা-উৎসব ও প্রীতিভোজন—আচার্য্য শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ব্যানার্জি; বৈকাল ৫টায় নবনির্ম্মিত ব্রহ্মমন্দিরসংলগ্ন গৃহে নূতন লাইব্রেরী স্থাপন—আচার্য্য শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী; সন্ধ্যায় স্থানীয় রঘুনন্দন হলে লণ্ঠনলেকচার—বক্তা শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, বিষয়—ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস। ২৫শে প্রাতে জলা-বাংলায় উদ্যানস্থ সমাধিচত্বরে স্বর্গীয় হরিনাথ চাটার্জ্জির দেহভস্ম স্থাপন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা—আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর বসু; সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে বালক বালিকাদিগের উৎসবে আবৃত্তি, প্রবন্ধ-পাঠ, সঙ্গীতাদি—সভাপতি শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ব্যানার্জ্জি। ২৬শে সন্ধ্যায় ডাঃ সুকুমার মিত্রের গৃহে উপাসনা ও 'শান্তিবাচন' —আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর বসু।

দান-প্রাপ্তি—আমরা কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে দাতাদিগকে প্রণাম করিয়া নিম্নলিখিত দান-প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি :—

সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬—স্বর্গীয় শরৎকুমার দাসের সাম্বৎসরিকে তদীয় সহধর্ম্মিণী ২৲, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন মাসিকদান ২৲, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি মাসিকদান ১৲, শ্রীযুক্ত অমিয়-কুমার মুখার্জি মাসিকদান ১৲, শ্রীমতী মনোরমা মুখার্জ্জি মাসিকদান ২৲, মাতৃসাম্বৎসরিকে ১০৲ ও স্বামীর বিলাতযাত্রা উপলক্ষে ৫৲, শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি মাসিকদান ১৲, শ্রীযুক্ত গগনবিহারী সেন পত্নীর সাম্বৎসরিকে ৪৲, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ কন্যা শ্রীমতী মণিকার শুভবিবাহে ৫৲, লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল জ্যোতিলাল সেন (I.M.S.) মাসিকদান ২৲, শ্রীযুক্ত মতিরাম লখিরাম আদভানি মাসিকদান ২৫৲, শ্রীমতী মাধবীলতা চাটার্জ্জি মাসিকদান ১৲, শ্রীমতী হেমন্তবালা চাটার্জ্জি মাসিকদান ১৲, রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় মাসিকদান ১৲, স্বর্গীয় অমৃতলাল ঘোষের পুণ্যস্মৃতিতে মাসিক দান ২৲, শ্রীমতী সুমতি মজুমদার মাসিকদান ১৲, ডাক্তার সচ্চিদানন্দ হোসেন পাল ১৯৩৬ সনের বার্ষিক দান ১২৲, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার হালদার মাসিকদান ৫৲, শ্রীমতী সরলা দাস মাসিকদান ১৲, শ্রীমতী কমলা সেন মাসিকদান ১৲, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত মাসিকদান দুইমাসের ৪৲, শ্রীমান্ বিজয়চন্দ্র সিংহ নবজাত শিশুকন্যার জাতকর্ম্মে ২৲, শ্রীমতী হেমন্তকুমারী মল্লিক শ্বশ্রুমাতার সাম্বৎ-সরিকে ১৲, শ্রীমতী সন্তোষিণী রায় পৌত্রীর নামকরণে ১৲, স্বর্গীয়া কাদম্বিনী মণ্ডলের উইল অনুসারে পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণের সহযোগে ৭৫৲, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রমোহন সেন ভগ্নী শ্রীমতী রেণুকার শুভবিবাহাশীর্ব্বাদে ৫৲ এবং পিতৃসাম্বৎসরিকে ২৲ টাকা।

বিশেষ নিবেদন

("আচার্য্য কেশবচন্দ্র" পুনর্মুদ্রণ)

"আচার্য্য কেশবচন্দ্র" পুস্তকের পুনর্মুদ্রণ কার্য্য চলিতেছে। আদি বিবরণ ছাপা শেষ হইয়া, মধ্য বিবরণের ছাপা চলিতেছে। ইহাতে যাহা খরচ হইবে, Estimate করা গিয়াছে, তাহার মধ্যে এখনও [illegible] শত টাকা চাঁদা উঠা আবশ্যক। এজন্য যাঁহারা সাহায্যদানে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট এবং যাঁহারা এখনও সাহায্যদানে অগ্রসর হন নাই, তাঁহাদের নিকট আমার অতি বিশেষ ভাবে নিবেদন যে, সত্বরই এই মহৎ কার্য্যে সাহায্য দান করিয়া বাধিত করুন ও অর্থের সদ্ব্যয় ও পুণ্য সঞ্চয় করুন। এই নিবেদনই যেন শেষ নিবেদন হয়, পুনর্ব্বার নিবেদন প্রকাশের আবশ্যক না হয়।

"জ্ঞানকুটীর", নিউকাটরা, এলাহাবাদ। } শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুঙ্গের ভক্তিতীর্থ

নানা বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়া, মা বিধানজননীর বিশেষ কৃপায়, শ্রীমদাচার্য্য ব্রহ্মানন্দদেবের প্রিয় ভক্তিতীর্থের যাত্রীদিগের জন্য একখানি তিনকুঠারী পাকা-গৃহের কন্‌ক্রিট ছাদ ও তৎসংলগ্ন একটী বাথরুম নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ কার্য্যে সমবিশ্বাসী বন্ধু ডাক্তার শশিভূষণ দাস গুপ্ত মহাশয়ের হাত দিয়া ৯০০৲ নয়শত টাকা ব্যয় হইয়াছে। এখনও ঐ তিনটী ঘরের সম্মুখের বারাণ্ডার ছাদ ও সমস্ত পাকা মেজে ও অন্যান্য বাকী কাজে কমবেশী ৩০০৲ তিনশত টাকা ব্যয় হইবে। আমাদের বিনীত আবেদনে দাতাগণ ও দয়াবতী মাতা এবং ভগ্নীগণ এপর্য্যন্ত যে সাহায্যভিক্ষা দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ৪২৫৲ টাকা মাত্র উক্ত তত্ত্বাবধায়ক মহাশয়কে দেওয়া হইয়াছে এবং ঐ আশ্রম-ফণ্ডের কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকটে ১০০৲ একশত টাকার কিছু বেশী মজুত আছে। অতএব, উক্ত যাত্রীদিগের আশ্রম-গৃহের ঋণশোধ ও বাকী কাজের জন্য এখনও মোট ৭০০৲ সাতশত টাকা আবশ্যক। যাঁহারা দীনদরিদ্র এবং বিধানমণ্ডলীর চির-সেবক, তাঁদের একমাত্র ভরসা, দয়ালু ও দয়াবতী মাতা এবং ভগ্নীগণের কৃপার দান। তাই এই অযোগ্য সেবক ভক্তিতীর্থ-যাত্রী সমিতির পক্ষ হইতে আপনাদিগের বিশেষ কৃপা প্রার্থনা করিতেছে। ভরসা করি, ভক্তবাঞ্ছিত এই মহৎ কার্য্যে আপনাদিগের কৃপালাভ করিব। ইতি ১০ই মার্চ্চ, ১৯৩৭।

শান্তিকুটীর,
নববিধান আশ্রম;
৮৪নং অপার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা।

ভক্তিতীর্থের সেবক—
শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়,
সহকারী সম্পাদক;
মুঙ্গের নববিধান ব্রাহ্মসমাজ।

Edited on behalf of the Apostolic Durber New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priya-nath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭২ ভাগ। ৬ষ্ঠ সংখ্যা। | ১৬ই চৈত্র, মঙ্গলবার, ১৩৪৩ সাল, ১৮৫৮ শক, '০৮ ব্রাহ্মাব্দ | 30th. March, 1937 | অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা

নববিধানজননী, যুগে যুগে তুমি ভক্তহৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া কত লীলাই কর। ভক্তদের জীবন তোমার ঘনীভূত লীলার জীবন্ত মূর্ত্তি। তোমার লীলা ভক্তদের জীবনে যেমন প্রকট, এমন আর কোথায়? তুমি যে লীলাময়ী, অনন্তরূপিণী, বিচিত্র গুণধারিণী মা, ভক্তদের জীবনই তাহার সাক্ষ্য দেয়। আমরা কত কাল, তাঁরা কত ভাল! কালকে ভাল করিবার জন্যই তাঁরা তোমার আদেশে এসেছেন। তাই ভক্তদের জীবন আমাদের কাছে অমূল্য সম্পদ করে রেখেছ। সাধুরা জীবনে অসাধ্য সাধন করিয়া গেলেন তোমার কৃপায়। আমাদের পরিত্রাণের পথ তাঁরা দেখাইয়া গেলেন। আমাদের পরিত্রাণ-পথে তাঁরা যে আশার মাণিক। নববিধানে সাধুদের কেবল বাহিরে শ্রদ্ধা দেওয়া নয়, অন্তরের অন্তরে তাঁদের গ্রহণ। আমাদের আত্মার অন্নপান তাঁদের জীবন। তাঁরা পৃথিবীতে আমাদের যেমন আত্মীয়, এমন আর কে? তাঁহারা আমাদের আত্মার অন্তরঙ্গ বন্ধু। তুমিই কৃপা করে আমাদিগকে এসব ধনে ধনী করেছ। তোমার বক্ষের ধন, মনের মতন সাধু ভক্তদের জীবন আমাদের জীবনপথের সহায় করে দিয়ে, পাপী তাপীর পরিত্রাণের উপায় করে দিয়েছ। সাধুদের রক্ত মাংস আহার পান করেই, আমাদের জীবনে বিশ্বাস, বিবেক, বৈরাগ্য, প্রেমভক্তি ও নিষ্ঠা জন্মিবে, দুর্ব্বল প্রাণে বল আসিবে, পৃথিবীর দুঃখ তাপ নির্য্যাতন বিপদ পরীক্ষা বহন করিবার শক্তি বাড়িবে। দুঃখে তোমাকে কেমন করে পেতে হয়, আনন্দেও তোমাকে কেমন করে পেতে হয়, দুঃখ সুখ তোমার হাতের দান বলে মাথা নত করে তাহা কেমন করে গ্রহণ করতে হয়, জীবনের রক্ত দিয়া তোমার ইচ্ছাপালন করে তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত তাঁরা রাখিয়া গেলেন। শ্রীঈশার জীবনে, শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনে তোমার অপরূপ প্রেমলীলার মাধুরী দেখাইয়া আমাদিগকে ধন্য করিলে। নববিধানে শ্রীঈশার সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের মহামিলন হল, তোমার পুত্রের সঙ্গে তোমার ভক্ত দাসের মহাযোগ সংঘটিত হল; পুত্রই ভক্ত, ভক্তই পুত্র পুত্রই দাস, দাসই পুত্র। তুমি কৃপা করে এই দুইটা জীবন মিলিত করে ভক্ত পুত্র কেমন করে হতে হয়, যদি তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখালে, তবে তোমার আলোকে এই দুইটি জীবন যথাযথ গ্রহণ করিয়া ধন্য হই, তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

শ্রীঈশা ও শ্রীচৈতন্য

বিধাতার বিচিত্র বিধানে দেশকালের মধ্যে, শ্রীঈশার স্বর্গারোহণোৎসব এবং শ্রীচৈতন্যের জন্মোৎসব যুগপৎ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হল। দুইটী জীবনের বিশেষত্ব এবং সামঞ্জস্য বিধানের আলোকে আজ ভাল করে দেখি। একজন আদর্শ পুত্র, একজন আদর্শ ভক্ত। নূতন বিধানে যিনি আদর্শ পুত্র, তিনিই আদর্শ ভক্ত; যিনি আদর্শ ভক্ত, তিনিই আদর্শ পুত্র।

ভক্ত চিরঞ্জীব এই দুইটি জীবনকে নববিধানের আলোকে যেমন দেখিয়াছিলেন, আমরাও আজ তাঁহারই ভাবে দেখি। ঈশাচরিতামৃতে তিনি বলিলেন, "হায়! যিশু, কাঙ্গালের ধন, কি বিষম যন্ত্রণাই তুমি সহ্য করিয়া গেলে! মানুষকে তুমি এমনি ভালবাসিতে যে, তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য অনায়াসে নিজপ্রাণ বিসর্জ্জন করিলে। সার্থক তুমি পিতার পুত্র, তাঁহার জন্য সকল কষ্টই তোমার সহ্য হইল! অপমান প্রহার অঙ্গের ভূষণ হইল। নিরপরাধী হইয়াও এই সমুদায় দুঃখভার বহন করিয়াছ। সাধুর পবিত্র শোণিত না হইলে পাপীর প্রায়শ্চিত্ত হয় না; এই জন্যই তোমার আত্মবলিদানের ব্যবস্থা।" খ্রীষ্টীয় জগতের প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, যিশু মৃত্যুর পর তিনদিনের দিন সশরীরে সমাধি হইতে উঠিলেন। কিন্তু আমরা তাঁহার অন্য প্রকার পুনরুত্থান দেখিলাম। কি ভাবে, কি আকারে তিনি ভক্তদলের মধ্যে রহিলেন? বিশ্বাস, বৈরাগ্য, ক্ষমা, প্রীতি, ন্যায়, পবিত্রতা, বিনয়, আত্মসমর্পণ, সেবা, ভক্তি, প্রত্যাদেশ, বাধ্যতা, পুত্রত্ব এবং মহাযোগের গুণময় আকারে রহিলেন। ইহারই নাম পুনরুত্থান। যিশু ভগবানের পুত্র—অনুগত সৎপুত্র। নরবংশের মুখ উজ্জ্বল করিবার উপযুক্ত পুত্র তাঁহার একটিও ছিল না, সেইজন্য যিশুর জন্ম হয়। তিনি পিতার মান সম্ভ্রম ও মনুষ্যত্বের গৌরব রক্ষা করিলেন। তিনি পুত্রত্বের সার্ব্বভৌম অবতার, মানুষত্বের আদর্শ। তাঁহার মনুষ্যত্ব অপূর্ব্ব, এবং অনন্ত উন্নতিশীল ঈশ্বরত্ব ভিন্ন আর কিছুই নাই। এইজন্য তাঁহাকে নরহরি বা নরদেব বলা হয়। পিতারূপী পুত্র, কিন্তু পুত্ররূপী পিতা তিনি নহেন। পিতাপুত্রের মধ্যে কেমন সৌসাদৃশ্য, তিনি তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। যিশু আত্মত্যাগী মহাযোগী। সমস্ত বিশ্ব মধ্যে ঈশ্বর, ঈশ্বরেতে আমি, এবং আমাতে ঈশ্বর ও সমস্ত বিশ্ব, এই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। পিতৃযোগ, ভ্রাতৃযোগে একাকার হইয়া তিনি অনন্ত ব্রহ্মেতে নিত্য অধিবাস করিতেন। যিশু উচ্চ অর্থে অদ্বৈতবাদী ভক্ত ছিলেন। আর্য্য যোগী ঋষিরা নিষ্ক্রিয় অদ্বৈতবাদী; বাসনানির্ব্বাণপূর্ব্বক সচ্চিদানন্দস্বরূপে লীন হওয়াকেই তাঁহারা শ্রেয়ঃ বোধ করিতেন। কিন্তু যিশুর উদ্দেশ্য সেরূপ নহে। তিনি ইচ্ছাযোগে মিলিত হইয়া, জীবগণের হিতসাধনে প্রাণ মন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি কর্ম্মযোগে জীবিত ব্রহ্মযোগী এবং ঈশ্বরত্ব ও মনুষ্যত্ব উভয় পক্ষে প্রতিনিধি।

চিরঞ্জীবের ভক্তি-চৈতন্য-চন্দ্রিকায় শ্রীচৈতন্যের মহাভাবরসলীলা বর্ণিত হইয়াছে। সেই ভাবে আমরা বলি, পাপানলে সন্তপ্ত সংসারভারে আক্রান্ত, জরা দারিদ্র্য শোক দুঃখে অভিভূত নরনারী একবিন্দু দেবদুর্লভ স্বর্গের হরিপ্রেমামৃত ভক্তিরসামৃত পান করিয়া হৃদয় জুড়াইবে, এই জন্যই চৈতন্যের আগমন। প্রেমরসসিন্ধু গোরাচাঁদের প্রেমাশ্রুবিগলিত মুখচন্দ্রমা নরনারীর প্রাণে কি শান্তি-জ্যোৎস্না ঢালিয়া দিত! তাঁহার জীবন একটী অখণ্ড অবিমিশ্র প্রেমপদার্থ, ধর্ম্মোন্মত্ততার আদর্শ। ধর্ম্মানুরাগের আতিশয্যবশতঃ সংকীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা তাঁহাতে স্থান পাইত না। ঘনসচ্চিদানন্দ পুরুষকে তিনি যথাযথরূপে দর্শন করিয়াছিলেন। সচ্চিদানন্দ জ্বলন্ত জাগ্রৎ শ্রীহরির রূপসাগরে অনুক্ষণ সন্তরণ করিতেন। পূর্ণ অবিমিশ্র ভক্তির বিকাশ কেবল তাঁহাতেই দেখা যায়। দিবানিশি ভাবরসে উন্মত্ত। "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥" এই ছিল তাঁর উপদেশ। শ্রবণ কীর্ত্তনাদি দ্বারা সাক্ষাৎ ঈশ্বরের সংসর্গলাভে স্বাভাবিকী নির্গুণা নিষ্কামা কেবলা আত্যন্তিকী অকিঞ্চনা রাগানুগা ভক্তিযোগে সর্ব্বদা প্রমত্ত থাকিতেন। দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে হরিনাম বিলাইলেন, পাণ্ডিত্যের অভিমান বিসর্জ্জন করিয়া বিনয়ী হইয়া পণ্ডিতগণের গর্ব্ব খর্ব্ব এবং নীচকে উচ্চ করিলেন। তাঁহার উদ্দন্ত নৃত্যের ভীষণ পদাঘাতে পাষণ্ড হৃদয় কম্পিত হইত, ব্যাকুলতার উচ্চ ক্রন্দনধ্বনিতে বুক ফাটিয়া যাইত, প্রেমবিস্ফারিত বদনকমলের উল্লাসকর হাস্যধ্বনিতে প্রাণ পাগল হইত, তাঁহাকে ডগমগ পরম সুন্দর ভাগবতীতনুদর্শনে মন নৃত্য করিত। ভগবান্ শ্রীহরির প্রেমমুখের মধুর হাসি ও সৌন্দর্য্যরসে মজিলে মানুষ কিরূপ হয়, তাহা তিনি দেখাইয়া গেলেন। এমন

সুমিষ্ট ভক্তিযোগ, ভগবানের সহিত জীবের এতাদৃশ ব্যক্তিগত প্রেমব্যবহার আর দেখা যায় না। যেমন তাঁহার বৈরাগ্য, তেমনি ভাবুকতা। গৌরাঙ্গ যে প্রগল্‌ভা ভক্তি, প্রেম, মহাভাব, বৈরাগ্য, অনাসক্তি, সাধুভক্তি, শিষ্য-বাৎসল্য, ভ্রাতৃপ্রেম, বিনয়, উৎসাহ, জিতেন্দ্রিয়তা, তেজস্বিতা, ঐকান্তিকী আস্থা, সাধুভাব, জীবে দয়া, নামে ভক্তি প্রভৃতি ধর্ম্মভাব দেখাইয়া গেলেন, তাহা পৃথিবী চিরকাল তাঁহার পদতলে পড়িয়া শিক্ষা করিবে। দয়াময় হরি তাঁহার প্রিয়ভক্ত গৌরাঙ্গের দ্বারা অভূতপূর্ব্ব ভক্তিলীলা দেখাইয়া বঙ্গদেশকে ধন্য করিয়াছেন। যদি গৌরাঙ্গকে ভালবাস এবং সুখী ও পুণ্যাত্মা হইতে চাও, তবে সজনে নির্জ্জনে হরিনাম সংকীর্ত্তন কর। যে হরিনামরসে মজে, সে গৌরের ভাবাপন্ন হয়; যে বিষয়বাসনা ছাড়িয়া হরি-প্রেমামৃত পান ও বিতরণ করে, তখনই সে চৈতন্য হয়।

আজ শ্রীঈশা ও ভক্ত চৈতন্যকে গ্রহণ করি, আত্মস্থ করি।

—০—

ধর্ম্মতত্ত্ব

বিচার

শাস্ত্রকার বলেন, "বিচার করিও না, তুমি বিচারিত হইবে।" বাস্তবিক যখনই আমরা কাহার বিচার করি, তখন আত্মপরীক্ষা করিলে দেখিতে পাই, যে দোষটী আমার নিজের অধিক, সেইটীই ভাইয়ের মধ্যে দেখিয়া ভাইকে দণ্ডনীয় মনে করি। ধন্য তিনি, যিনি ভাইকে দর্পণ করিয়া আপনার মুখ দেখেন ও ভাইকে বিচার করিবার পূর্ব্বে আপন দোষ সংশোধন করেন। নির্দ্দোষ ব্যক্তি পরের দোষ দেখিতে পান না। কেশব বলিলেন, "আমি সামান্য কাহাকেও বিচার করি না"।

নববিধান ও ধর্ম্মসমন্বয়

নববিধান কেবল ধর্ম্মসমন্বয় নয়। ধর্ম্মসমন্বয় নববিধানের একটি অঙ্গ মাত্র। নববিধান সর্ব্বসমন্বয়; ধর্ম্মসমন্বয়, কর্ম্মসমন্বয়, জ্ঞানবিজ্ঞানসমন্বয়, মানবসমন্বয়, জাতিসমন্বয়, আবার ধর্ম্ম ও সংসারের সমন্বয়, স্বর্গ ও পৃথিবীর সমন্বয়, পুরাতন ও নূতনের সমন্বয়, বিভিন্ন সাধনের ও সাকার নিরাকারের সমন্বয় ইত্যাদি। শুধু তাহাই নয়, ইহা সর্ব্বধর্ম্ম, সর্ব্বসাধু, সর্ব্বশাস্ত্র, সর্ব্বজ্ঞান-বিজ্ঞান, সর্ব্বপ্রকার সাধন ও জীবনে নিত্য নবজীবন দিবার জন্য নববিধ আবির্ভূত কেবল মত নয়, ইহা জীবন্ত জীবনের নিত্য নব নব উদ্যাপন ও প্রগতি। ইহা অনন্ত জীবনপ্রবাহ, ইহা অনন্ত ধর্ম্মবিধানের উৎসব। ইহা 'যত মত, তত পথকে' এক অখণ্ড মীমাংসাশাস্ত্রে পরিণত করিতে আসিয়াছে। ইহার সঙ্গে আর কাহারও তুলনা নাই।

মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তন

কবে কোন্ কালে তোমাকে কি বলিয়াছি, তোমার সঙ্গে কি ব্যবহার করিয়াছি, তাই ধারণা লইয়া বসিয়া আছ; তবে তুমি নববিধানবিশ্বাসী নও। নববিধানে পলকে পলকে পরিবর্ত্তন হইতেছে। নিমেষে পাতকী যায় অমরধামে, ইহা কি জাননা? ইহা কি মান না? কালকে আমাকে যাহা দেখিয়াছ, আজ আমি সে আমি নই। আমার হাতে আমি নই—ইহাই নববিধান।

উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়

(১লা মার্চ্চ, স্বর্গারোহণের দিন উপলক্ষ্যে)

আজ ১লা মার্চ্চ, এই ১লা মার্চ্চ তারিখে আমাদিগের পূজ্যপাদ উপাধ্যায় মহাশয় দেহলীলা সম্বরণ করেন। আজ প্রাতঃকালে তাঁহার অমরাত্মার সহিত যোগ সাধন করিবার সময়, কয়েকটী কথা স্মৃতিপথে উদিত হইল, আজ তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইলাম। আমি যখন প্রকাশ্যে উপবীত ত্যাগ করিলাম, তখন আমার বাল্যবন্ধু স্বর্গীয় নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র আমাকে দীক্ষা লইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমি নগেন্দ্র বাবুর সহিত একত্রে সাধন ভজন করিতাম, একত্রে ধর্ম্মালোচনা করিতাম, একত্রে তাঁহার সহিত প্রচার করিতে যাইতাম, আমি তাঁহার প্রতি চিরদিন শ্রদ্ধাবান। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কাহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিব? তিনি বলিলেন যে, উপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট। আমি একদিন দীক্ষাপ্রার্থী হইয়া তাঁহার নিকট গমন করিলাম, উপাধ্যায় মহাশয় আমাকে অনেক প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। আমি তাহার যথাসাধ্য উত্তর দান করিলাম। তিনি বলিলেন, আর একদিন আসিও। আমি আর একদিন তাঁহার নিকট গমন করিলাম এবং দীক্ষার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলাম। তিনি আমাকে উপাসনা করিতে বলিলেন। আমি ভয়ে ভয়ে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উপাসনার আসনে উপবিষ্ট হইলাম। কম্পিতকলেবর হইয়া উপাসনা করিতে লাগিলাম। "সত্যং জ্ঞানং" মন্ত্র উচ্চারণ করিবা মাত্র ব্রহ্মানুভূতি লাভ করিলাম। আরাধনা শেষ হইল, প্রার্থনা করিয়া উপাসনা সমাপ্ত করিলাম। তিনি বলিলেন, তোমার উপাসনা বেশ হইয়াছে, ঈশ্বর স্বয়ং তোমাকে দীক্ষা দান করিয়াছেন, তোমার আর দীক্ষার প্রয়োজন নাই। তাঁহার বাক্য আমি ভক্তির সহিত বেদবাক্যরূপে গ্রহণ করিলাম, সেই অবধি আমি আর কাহারও নিকট দীক্ষাগ্রহণ করি নাই; তাঁহাকেই আমি এখনও আমার দীক্ষাগুরু বলিয়া স্বীকার করি।

একদিন উৎসবের পূর্ব্বে, বোধ হয় ৫১ বৎসর হইবে, যে সময় ৬নং কলেজ স্কোয়ারে প্রচারাশ্রম উঠিয়া গিয়াছে, পৌষ মাস সন্ধ্যাকাল, আমি একটী "সেবকের নিবেদন" কিনিয়া আনিলাম, তাঁহার হাতে উহার মূল্য ২৲ দিলাম। তিনি টাকা দুটী পাইয়া আমাকে বলিলেন যে, দুটী টাকার চাল ডাল কিনিয়া প্রচারক-পরিবারদের খাওয়ার ব্যবস্থা করিব। তাঁহারা সমস্ত দিন উপবাস করিয়া আছেন। আমার বাড়ীতে চাল ছিল, আমি খাইতে পারিতাম; কিন্তু সকলে উপবাসী, আমি খাইব কি করিয়া? এই বার আমি মুখে জল দিব! কি অসাধারণ ত্যাগ! এরূপ বৈরাগ্যের সাধনা মানবসমাজে দুর্লভ, এমন কি ধর্ম্মসমাজেও দৃষ্টিগোচর হয় না। তাঁহার সংকল্প ছিল বজ্রের ন্যায় দৃঢ়, পর্ব্বতের ন্যায় অটল। যে সংকল্প লইয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইতেন, পৃথিবীর কোন আপদ বিপদ সংকট সে সংকল্পকে বিচলিত করিতে পারিত না। বোধ হয়, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে, আচার্য্যদেবের তিরোধানের পর, তিনি একবৎসর কাল নির্জ্জন সাধন গ্রহণ করিলেন; সেই সময় তাঁহার একটী পুত্রের বিসূচিকা রোগ হইল। পীড়ার ভঙ্গী দেখিয়া সকলে ভীত হইলেন। তাঁহার নিকট সংবাদ আসিল, তিনি ইঙ্গিত করিয়া কান্তিবাবুর নিকট যাইতে বলিলেন। তিনি ঘুণাক্ষরেও বিচলিত হইলেনা! শ্রীবুদ্ধদেব যেমন বলিয়াছিলেন, আমার অঙ্গ হইতে যদি মাংস খসিয়া পড়ে এবং অস্থিগুলি যদি ধূলিসাৎ হইয়া যায়, তথাপি সিদ্ধিলাভ না করিয়া আমি এস্থান পরিত্যাগ করিব না। উপাধ্যায় মহাশয়ের সংকল্পও তাঁহারই অনুরূপ। কি কঠোর প্রতিজ্ঞা! কি বজ্রের ন্যায় দৃঢ় সংকল্প।

একদিন ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটে স্বর্গীয় ডাক্তার মতিলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আমার দেখা হইল। তিনি বলিলেন যে, একবার তাঁহার পিঠে একটী পৃষ্ঠব্রণ হইয়াছিল। তাহাতে অস্ত্রাঘাত করিতে হইলে, রোগীকে অজ্ঞান করিয়া অস্ত্রাঘাত করিতে হয়। উপাধ্যায় মহাশয় তাহাতে সম্মত হলেন না। তিনি বলিলেন, আমাকে অজ্ঞান না করিয়াই অস্ত্র করুন, আমি সহ্য করিব। অজ্ঞান না করিয়াই অস্ত্র করা হইল। মতিবাবু বলিলেন, তিনি বসিয়া রহিলেন, কোন প্রকার অস্ত্রাঘাতের যাতনা তিনি প্রকাশ করিলেন না। যেন আর কাহারও অস্ত্র করা হইতেছে, তিনি এইরূপ সহ্য করিলেন। তিনি একজন যোগী ছিলেন; সকল সময়েই, যখন লেখাপড়া করিতেন না, তিনি গভীর যোগে নিমগ্ন হইতেন। শ্রীবুদ্ধদেব যেমন যোগবলে ক্ষুৎ-পিপাসা শরীর মনকে উড়াইয়া দিয়া সাধনা করিয়াছিলেন, উপাধ্যায় মহাশয় সেইরূপ পৃথিবীর দুঃখ কষ্ট, শরীরের কষ্ট, ক্ষুধা পিপাসাকে উড়াইয়া দিয়া, যোগবলে পৃথিবীর অতীত হইয়া বহু ঊর্দ্ধে বাস করিতেন। এরূপ অসাধারণ সাধক, জ্ঞানী ও যোগী পৃথিবীতে দুর্লভ!

স্বর্গীয় শ্রীনাথ দত্তের জীবন-স্মৃতি

(শ্রাদ্ধবাসরে দৌহিত্র শ্রীমান্ সুধীরচন্দ্র দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক পঠিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রায় ৭০ বৎসর পরে আজ আমরা যাহাকে বরাভয় বলিলাম, সত্তর বৎসর পূর্ব্বে ঐ যুবকগণের অভিভাবকদের কাছে তাহাই ছিল পরম আশঙ্কার বস্তু। দাদামহাশয়ের খুড়ামহাশয় দাদা-মহাশয়ের চালচলন দেখিয়া, তাঁহাকে অগ্রজ ৺শিবপ্রসাদ দত্তের সহিত বাড়ী পাঠাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ভোরের গাড়ীতে পিতা বাড়ী রওয়ানা হইলেন, পুত্র শ্রীনাথ দত্ত শত ডাকেও জবাব দিলেন না। রজনীর অন্ধকারে পলাতক পুত্র বৌবাজারের মোড় হইতে সাড়া দিলে, সে সাড়া বড়বাজারের গদিতে পৌঁছাইবে কিরূপে? যাহা হউক, গাড়ীর সময় উত্তীর্ণ হইল, শ্রীনাথ বাসায় ফিরিলেন, তিরস্কারের ঝড় বহিল, তিনি মূর্ত্তিমান ধৈর্য্যের ন্যায় অবিকম্প হইয়া রহিলেন। পূজার ছুটীতে বাড়ীতে গেলে পর তাঁহাকে পুনরায় কলিকাতায় পাঠাইতে নিষেধ করিয়া খুল্লতাত পত্র পাঠাইলেন; অতএব ঢাকায় পড়িবার ব্যবস্থা হইল। কিন্তু ঢাকায় আসিয়া পুনরায় প্রচার-রত ব্রহ্মানন্দের দলে দাদামহাশয় ভিড়িয়া গেলেন এবং ১০।১২ দিন পর কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। পুনরায় বাড়ী যাইতে হইল এবং সেখান হইতে শ্রীহট্ট। এই শ্রীহট্ট হইতে অজস্র ক্লেশ ভোগ করিয়া ডাকের নৌকায় দাদামহাশয় কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পূজার ছুটিতে পুনরায় দেশে গেলেন, অভিভাবকগণ ব্রাহ্ম হইয়া যাওয়ার ভয়ে কাহাকেও কোথাও পাঠাইবেন না স্থির করিলেন; কিন্তু পৌষ মাস অতীত হইতে চলিল দেখিয়া, দাদামহাশয় পলাইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। তাঁহার জননীর একান্ত আশা ছিল যে, এই পৌষ সংক্রান্তিতে ছেলেকে পিঠা খাওয়াইবেন; কিন্তু তাহা আর হইল না, আনন্দময়ী জননীর অমৃতাস্বাদ যে একবার পাইয়াছে—পৌষ সংক্রান্তির পিষ্টকের লোভ তাহার থাকিবার কথা নহে। দাদামহাশয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা দ্বারকানাথকে (এই শ্রাদ্ধ-বাসরে উপস্থিত আছেন) সুপ্ত রাখিয়া, রাত্রি-যোগে পলায়ন করিলেন; এবং অসহ্য কষ্ট ভোগ করিয়া, ঢাকা পোগোজ স্কুলের তৎকালীন শিক্ষক বঙ্গচন্দ্র রায়ের নিকট, কলিকাতায় আসিয়া মাঘোৎসবে যোগদান করিবার ইচ্ছা জানাইলেন। এইস্থানে পরমশ্রদ্ধাস্পদ ৺বিহারীলাল সেন মহাশয়ের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। এইবার কলিকাতায় আসায় তাঁর ডাক্তারী শিক্ষা সুরু হইল। আড়াই বৎসর দাদামহাশয় ডাক্তারী পড়িয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পরীক্ষা দেন নাই। ইতিমধ্যে পরিবারে খুনের মামলা বাধিল, এই ব্যাপারে দাদামহাশয় কলিকাতা ও শ্রীহট্টে অনবরত যাতায়াত করিতে লাগিলেন। মামলা রফা হইল, কিন্তু দাদামহাশয় বাড়ী হইতে ছুটি পাইলেন না। বাধ্য হইয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ তারিখে গভীর

রাত্রে বাড়ী হইতে পলায়ন করিলেন। পথে দুর্ব্বিষহ কষ্ট সহ্য করিয়া, ভয় বিপদের তাড়নাকে উপেক্ষা করিয়া, কালিকচ্ছে ৺আনন্দচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং সেখান হইতে ঢাকায় ৺আনন্দবাবুর খুল্লতাত ভ্রাতা কৈলাসচন্দ্র নন্দীর বাসায় যাইয়া উপস্থিত হন ও পরে কলিকাতায় আসেন। আমি আর এই ইতিহাস বাড়াইব না। শুধু এই টুকুই অনুধাবন করিতে আপনাদিগকে অনুরোধ করি যে, ধর্ম্মপিপাসা কত তীব্র হইলে মানুষ এইরূপ বার বার পৈতৃক সম্পদ ইত্যাদির লোভ সম্বরণ করিয়া পলায়ন করিতে পারে। বিশ্বাস কতখানি গভীর হইলে, মানুষ এইরূপ প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে সাহস পায়। মানুষ কতখানি আত্মভোলা হইলে, এত লাঞ্ছনা, এত গঞ্জনা, এত তিরস্কার সহ্য করিয়াও অকপটে হাসিতে পারে। এই ক্ষুদ্র কাহিনীতেই আপনারা অনুমান করিতে পারিবেন যে, ব্রহ্মানন্দের ধর্ম্ম তাঁহাকে যাহা দিয়াছিল, তাহা তাঁহার পরম দুঃখের ধন, এই ধন লাভ করিতে যাইয়া তাঁহার সমস্ত আত্মা আপনার শক্তি ব্যয় করিয়াছে; তাই তিনি কঠোর কঠিন যন্ত্রণায় কাতর হওয়া সত্ত্বেও, মৃত্যুশয্যায় পরম অবলীলায় বলিতে পারিয়াছিলেন, "কষ্ট? আমার আবার কষ্ট কিসের? মার কোলে আর বাবার কোলে শুয়ে আছি।" এই বিশ্বাস, এই ভক্তি ই হইল তাঁহার জীবনের ধ্রুব তারা। জীবনে এক মুহূর্ত্তের জন্যও এই বিশ্বাস হারান নাই, ইহাই তাঁহার গৌরব।

ডাক্তারী পড়া ছাড়িয়া দাদামহাশয় ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন এবং Brothers & Co. নামে এক দোকান করেন। মূলধন তাঁহার একার ছিল না, অন্য অন্য বহু ব্রাহ্মবন্ধু ইহার মূলধন যোগাইয়াছিলেন; কিন্তু ধর্ম্ম ও ব্যবসায় পরস্পরের পরিপন্থী, অতএব ম্যানেজারদ্বয়ের (দাদামহাশয় অন্যতর) অদূরদর্শিতায় দোকানে রাত্রে চুরি এবং দিনে প্রতারণা চলিতে লাগিল। যে কোনও লোক বিদ্যাসাগরী চাদর গায়ে দিয়া এবং সযত্নে শ্মশ্রু রক্ষা করিয়া মিষ্টস্বরে কথা কহিলেই দাদামহাশয়ের মনে হইত, ইনি ব্রাহ্মভ্রাতা—এইরূপ ব্রাহ্মভ্রাতারা কর্জ্জ চাহিলে অথবা ধারে মাল চাহিলে ম্যানেজারদ্বয় আপত্তি করিতেন না; তাই পরিশেষে Brothers & Co. ফেল হইল। কিন্তু তখনকার দিনে পরস্পরের উপর ব্রাহ্মগণের এতই বিশ্বাস ছিল যে, ম্যানেজারদ্বয় চুরি করিয়াছেন, এইরূপ ধারণা দোকানের কোন অংশীদারই পোষণ করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, ব্রহ্মমন্দির-প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরবর্ত্তী বৎসরে দাদা মহাশয় ব্রহ্মানন্দের নিকট দীক্ষিত হন। এদিকে Brothers Company ফেল হওয়ার পর, দাদামহাশয় Order Supplier এর কাজ আরম্ভ করিলেন। এই সময় একদিন ময়মনসিংহের শরৎ দাস রায়, মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী ও দাদামহাশয় ৫০নং পটুয়াটোলা লেনে বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছেন, সেই প্রসঙ্গে শরৎবাবু বলিলেন, "আজকাল বাঙ্গালীর ছেলেরা এত লেখাপড়া শিখেছে, অথচ কোন ছেলে ইংরাজী কালী তৈয়ী করিতে পারে না, আমি বাজারে কালী পেলাম না।" ইহার উত্তরে মহেন্দ্রবাবু Chemistry দেখিয়া কালীর formula বলিয়া দিবার, শরৎবাবু ব্যয়ভার বহন করিবার এবং দাদামহাশয় কায়িক পরিশ্রম করিবার ভার লইলেন। কালী প্রস্তুত হইল। তিনজনের প্রাধান্য সমান রাখিবার জন্য কালীর নাম হইল, Roy Brothers Blue Black Ink; কারণ ঐ তিনজনেরই নামের অন্তে Roy শব্দটী ছিল। দাদামহাশয় বহুদিন এই কালীর ব্যবসায় করিয়াছিলেন, তাঁহার মাতৃবিয়োগকালে দেশে যাইবার সময় এই কালীর ব্যবসায়ের ভার শ্যালক নরনারায়ণ চৌধুরীর হাতে ন্যস্ত করেন; কিন্তু নরনারায়ণবাবুর তৎকালীন অসুস্থতার সুযোগ লইয়া, হরিচরণ চক্রবর্ত্তী নামক তাঁহারই জনৈক কর্ম্মচারী কালী প্রস্তুতির প্রণালী শিখিয়া লইলেন এবং যে কোন কারণেই হউক, আরও ৫।৭জন লোককে এই কালী প্রস্তুতির প্রণালী শিক্ষা দেন। পরে দাদা মহাশয় রাজেশ্বর কুণ্ডু নামক এক ব্যক্তির পরামর্শে রবার ষ্ট্যাম্পের ব্যবসায় সুরু করিলেন এবং ঝামাপুকুর লেনস্থ মতিলাল ঘোষ নামক এক ব্যক্তির নিকট হইতে টাইপ খরিদ করিয়া এবং রবার ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতির প্রণালী শিক্ষা করিয়া, স্বয়ং স্বাধীনভাবে ব্যবসায় চালনা করিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পর দাদামহাশয়ের বিবাহ হইয়াছিল। এই বিবাহ শ্রদ্ধেয় প্রচারক প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের পৌরোহিত্যে সম্পন্ন হইয়াছিল।

এই বিবাহের পরবর্ত্তী জীবন, সুখ ও দুঃখ, বৈরাগ্য ও ও দৈন্য, শান্তি ও অশান্তি, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম, শোক ও সান্ত্বনার এক অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। বিস্তৃত ভাবে সে জীবন বর্ণনা করিবার অবকাশ বর্ত্তমানে নাই। অথচ এই সময়টাই ছিল, তাঁহার চরম পরীক্ষার কাল; ভাবিলে আনন্দ হয় যে, এই চরম পরীক্ষায় দাদামহাশয় উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছিলেন। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার আনন্দকে পূর্ণরূপে সম্ভোগ করিবার বাসনায় তিনি বৈষয়িক সংস্রব ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইলেন এবং প্রথম পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের উপর ব্যবসায়-পরিচালনের ভার দিয়া তিনি অবকাশ গ্রহণ করিলেন। তখন বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহার পরীক্ষা এখনও শেষ হয় নাই। দ্বিজেন্দ্রনাথ অকস্মাৎ দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার পাঁচপুত্র ও চার কন্যার মধ্যে আজ কেবল পূজনীয় মাতুল সত্যেন্দ্রনাথ এবং মাতৃস্বসা সুমনা বাঁচিয়া আছেন। এতদ্ব্যতীত অপর সকলেরই মহাপ্রয়াণ দাদামহাশয়কে দেখিতে হইয়াছে। ইঁহাদের মৃত্যুর পর দাদামহাশয়ের মন নিশ্চয়ই আরও অধিক বিরাগী হইয়া থাকিবে, তাই Arts School এ শিক্ষাব্রতী কনিষ্ঠ পুত্রকে সংসারের সমস্ত ভার দিয়া তিনি এক প্রকার সংসার-নির্লিপ্ত হইয়া পড়িলেন। এই সময় হইতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত, এই বৃদ্ধের শিয়রে

স্মৃতদীপ জ্বলে নাই, জ্বলিয়াছে পুত্রকন্যাদের অভ্রভেদী চিন্তা। এরূপ অবস্থায় অবিশ্বাসী ও অসহিষ্ণু ব্যক্তিগণ নিশ্চয়ই উন্মাদ হইয়া যাইত ; কিন্তু পরম বিশ্বাসী, অসীম সহিষ্ণু শ্রীনাথ ঊর্দ্ধে দুই হাত তুলিয়া প্রার্থনা করিলেন, কবিতাবাবু সেই প্রার্থনা আর কিছুই নহে, শুধু—

"ইচ্ছা যদি হয় দেব আনো বজ্রনাদ
প্রলয়মুখর হিংস্র ঝটিকার সাথে,
পলে পলে বিদ্যুতের চক্র কষাঘাতে
সচকিত করো মোর দিক দিগন্তর।"

যে আঘাত তিনি পাইয়াছিলেন, হয়ত সেই সম্বন্ধে এইটুকুই বলিয়াছিলেন "মা, আঘাত করেছ ? আঘাত, সে যে পরশ তব, সেই ত পুরস্কার।"

পুরস্কার তিনি সত্যই পাইয়াছিলেন, এবং সেই পুরস্কার কি, তাহা তাঁহার মৃত্যুর পর কেহ প্রচার করিবে, তিনি তাহার অবকাশ রাখেন নাই। আনন্দের আতিশয্যে রাজপ্রাসাদ হইতে আরম্ভ করিয়া পর্ণকুটিরের অধিবাসী পর্য্যন্ত প্রত্যেকের নিকট তিনি নিজেই একাধিকবার তাঁহার সেই পুরস্কারপ্রাপ্তির কথা রটনা করিয়াছেন এবং ইহাতেই তিনি সর্ব্বাধিক আনন্দ পাইতেন, তাঁহার উৎসাহ বাড়িয়া যাইত। পরবর্ত্তী জীবন সম্বন্ধে আমি যতটুকু জানি, আপনারাও ঠিক ততটুকুই জানেন ; কাজে কাজেই এসম্বন্ধে মৌন রহিলাম।

স্বদেশের জলকষ্ট নিবারণ করিবার জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা, দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত গ্রামবাসিগণের মুখে এক মুঠা অন্ন দিবার জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা চাওয়া করা এই সমস্তই আপনারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। দেশের বেকার সমস্যার ভয়াবহ বিবরণ শুনিয়া তিনি কাতর হইতেন ; নিজে স্বাধীন ব্যবসায় দ্বারা সামান্য অবস্থাকেই সচ্ছল করিতে পারিয়াছিলেন—তাই তিনি পথে ঘাটে, স্থানে ও অস্থানে বসিয়া পথের বেকার যুবকগণকে স্বাধীন ব্যবসায় করিবার উপদেশ দিতেন। ইহাতে দাদামহাশয় কলঙ্ক কম সঞ্চয় করেন নাই ; আমাদের নিকট হইতে এইজন্য তিনি কম লাঞ্ছনা ভোগ করেন নাই। এই লাঞ্ছনা, এই অবজ্ঞা ও এই কলঙ্কই আজ তাঁহার স্মৃতিটিকে আমাদের নিকট প্রিয়তর করিয়া তুলিতেছে। তিনি যাহা বলিতেন, তাহা উপেক্ষার বস্তু নহে, তবে প্রচার করিবার পন্থাটিই ছিল গ্লানিময়। যখন ভাবি যে, দাদামহাশয়ের শুধু একটা তীব্র ভাবোন্মাদনাই ছিল, মৌলিক চিন্তার সামর্থ্য ছিল না, তখন যে ভাবের প্রেরণায় তিনি এইরূপ করিতেন, সেই স্বদেশহিতৈষণা, মানবপ্রীতি ও পরোপকার-সাধনের ইচ্ছা তাঁহার ঐ কলঙ্ক ও গ্লানিকে অপূর্ব্ব মহিমামণ্ডিত করিয়া দিয়াযায়।

আজ সেই জীবন ইহলোকে নাই। অমৃতলোকে চলিয়া গিয়াছে দশ দিন পূর্ব্বে। এই জগতে রহিয়াছে শুধু স্মৃতিটুকু। তিনি কি ভাবে হাসিতেন, কি ভাবে চলিতেন, কি ভাবে কাহাকে ডাকিতেন, গল্প করিতেন, ঠাট্টা পরিহাস করিতেন, আদর করিতেন, একে একে সেই সমস্তই মনে জাগিতেছে। এই সকল মনে জাগে, আর বুক জ্বালা করিতে থাকে ; মনে হয়, যেন গলায় কিছু আটকাইয়া আছে, অথচ চোখ হইতে জল ঝরিতে চায় না। পরম আদরের ধন, আজ না জানি, কোন দূর দূরান্তরে অবস্থান করিতেছে। আজ দাদামহাশয়কে হারাইয়া মনে হয়, যেন একটা মস্ত মূল্যবান বস্তু হারাইলাম। কিন্তু যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন কি আমরা তাঁহার যোগ্য আদর করিয়াছি ? যখন কাছে ডাকিয়াছেন, তখন কাজের ওজর দেখাইয়াছি। যখন সেবা চাহিয়াছেন, তখন বিরক্তি জানাইয়াছি। যখন কোন কিছুর জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন, তখন অবজ্ঞাভরে উপেক্ষা করিয়াছি। ঔষধ চাহিয়াছেন, জলকেই ঔষধ বলিয়া খাওয়াইয়াছি। অন্ধ, বধির বৃদ্ধের প্রতি এত অনাদর, এত অবজ্ঞা আমরা করিয়াছি।

দাদু! আজ তুমি কোথায় ? কতদূরে ? একবার যদি তোমাকে পাইতাম, তবে দুটী পা জড়াইয়া ধরিয়া আমাদের ঐ সমস্ত অপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিয়া লইতাম। আজ যে এই স্মৃতি মনের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণার সৃষ্টি করিতেছে। তুমি আজ স্বর্গে, আমরা এই ধরণীতে—কত ব্যবধান! ডাকিলে তোমার সাড়া পাইব না, কাছে যাইতে চাহিলে কাছে যাইতে পারিব না, আজ আমরা সত্যই অসহায়। তবুও আমাদের ভুলে থেকোনা যেন। তোমার অধ্যবসায়, তোমার উৎসাহ আমাদের জীবনকে সফল করিয়া তুলুক—তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর। আজ আচার্য্য বলিলেন, "প্রেহি প্রেহি পথিভিঃ পূর্ব্যেভির্যত্রানঃ পূর্ব্বপিতরঃ পরেয়ুঃ।" কিন্তু দাদু, আমার মন কেবলই বলে, "যত্তে বিশ্বমিদং জগন্মনো জগাম দূরকম্ তত্ত আবর্ত্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে॥" তোমার আনন্দময়ী জননী কি আমার এই প্রার্থনা শুনিবেন না! তুমি যেখানেই থাক না কেন, আমার এই মরাল সংগীত যেন তোমার আত্মাকে স্পর্শ করে—কারণ আমার সমস্ত হৃদয়কে মথিত করিয়া এই মরাল সঙ্গীত, এই প্রার্থনাই গুঞ্জরিত হইতেছে :—

মর জগতের অমর তুমি গো
আমাদের ছিলে প্রাণের প্রিয়—
দাবী করিবার সাধ নাই কিছু
আশিষ তোমার দিও দিও।

—•—

প্রার্থনা

(স্বর্গীয় শ্রীনাথ দত্তের শ্রাদ্ধবাসরে কন্যা শ্রীমতী সুমনা দত্তের প্রার্থনা)

হে দেবতা, আজ অশ্রুসিক্তহৃদয়ে স্বর্গগত পিতার পবিত্র শ্রাদ্ধবাসরে তোমার চরণতলে উপস্থিত হইয়াছি ; আজ কি বলে

তোমার কাছে প্রাণের প্রার্থনা জানাব, জানি না। যিনি ইহ-সংসার থেকে চলে গেলেন, অন্তিম সময়ের সেই তাঁর সুমিষ্ট বাণী শুনিবার, এবং তোমার প্রতি সরল বিশ্বাস ও অনুরাগের যে গভীর পরিচয় দিয়ে গেলেন, সেই সব স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিবার সৌভাগ্য তো আমার হ'ল না। কাতরপ্রাণে আজ তোমার চরণে বসে তাঁর আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

সংসারে তাঁকে পিতারূপে পেয়ে, আমরা তাঁর পুত্র কন্যা আজ কত ধন্য হয়েছি। তুমি তাঁকে দীর্ঘকাল এই সংসারে রেখে, তাঁর সেই সুন্দর সরল শিশুর মত যে পবিত্র জীবনখানি আমাদের পরিবারের আদর্শরূপে সকলের সামনে ধরেছিলে, আজ এই অনিত্য সংসারের রঙ্গমঞ্চ হইতে সেই দীর্ঘজীবনের চিত্রপটটী তুমি আমাদের সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলে। তাঁর রক্ত মাংসের দেহ হইতে মুক্ত হয়ে তিনি ইহসংসার থেকে চলে গিয়েছেন, গৃহ সংসার সব আজ শূন্য মনে হইতেছে; কিন্তু আমাদের প্রতিজনের প্রাণের মধ্যে তিনি এক ছাপ রেখে গেছেন, সে ছাপের দাগ কখন অন্তর থেকে মুছে যাবে না তাঁকে আমাদের পিতারূপে সংসারে পাঠিয়ে, তোমার প্রতি ভক্তি বিশ্বাস, সকলের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালবাসার এই যে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখালে, তাহা আমাদের সকলের অন্তরে আদর্শ হয়ে গাঁথা থাকুক। জীবনে কত শোকতাপ পেয়েছেন, তন্মধ্যে এবং সংসার-সংগ্রামের মধ্যে, তুমি যে দয়াময়ী মা জননী, এই গভীর বিশ্বাসে তাঁহাকে কোন অবস্থায় বিচলিত হইতে দেখি নাই। শেষ জীবনেও তোমার প্রতি সেই গভীর বিশ্বাসের পরিচয় দিয়ে গেলেন। "ধর্ম্মই কেবল একই মিত্র, যিনি মরণ-কালেও অনুগামী হন্" এই মটোটী জীবনের একখানি কবচরূপে প্রাণের মধ্যে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। জীবনের উষাকালে তোমার এই পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া এবং নববিধানাশ্রিত তোমার অনুগত সেবক হইয়া, সুদীর্ঘ কাল ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোকে জীবনকে আলোকিত করিয়া মরলোক হইতে প্রস্থান করিলেন। সংসারে আমাদের জন্য রাখিয়া গেলেন, তাঁর সেই সুন্দর দেবচরিত্র। তিনি অনেকগুলি সন্তানের পিতা হয়েছিলেন, আবার একে একে প্রায় সকলগুলিকেই হারাইয়াছিলেন; কিন্তু সেই এক এক শোকের আঘাতে মুহ্যমান হইতে দেখি নাই, করজোড়ে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া "দয়াময়, দয়াময়, দয়াময়" এই নাম সাধন করিতে দেখিয়াছি। যেখানেই তোমার নামগান হইয়াছে, কত বাধা বিঘ্নের মধ্যেও যোগদান করিয়া সুখী হইতেন।

হে দেবতা, এ জীবনের কাহিনী তো বলিয়া শেষ করা যায় না; কত সুন্দর সদ্‌গুণরাশি দিয়া জীবন-পুষ্পটী বিকশিত করিয়াছিলে। তোমারি আদেশে সংসারে আসিয়াছিলেন, আবার জীবনের কাজ সাজ করিয়া, তোমার 'মা' নামের জয়ধ্বনি করিতে করিতে অমরধামে যাত্রা করিলেন। অসার যাহা তাহা সংসারে পড়িয়া রহিল, তুমি তাঁর সেই অবিনাশী আত্মাকে তোমার চিরশান্তিময় ক্রোড়ে তুলিয়া লইলে। প্রাণ আজ কাঁদিয়া উঠিতেছে, গৃহ আজ শূন্য ঠেকিতেছে, কাহার অবর্ত্তমান-তায় আজ সব শূন্যময়। হে! পিতার পিতা, পরম পিতা, তুমি আমাদের পূজ্যপাদ পিতৃদেবকে তোমার ঐ অমরলোকে ব্রহ্মানন্দদলে ও সকল সাধুভক্তগণের সঙ্গে মিলিত করিয়া কত সুখী করিতেছ! এই মরধামে থাকিতে সেই ভক্তবৃন্দের সঙ্গে মিলিত হইয়া তোমার পবিত্র ব্রহ্মনামের সুধাপানে মত্ত হইয়া-ছিলেন। স্বর্গলোকে আজ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ, স্নেহের পুত্র কন্যাগণ, সকল সাধু মহাজনগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া, মা আনন্দ-ময়ী, তোমার 'মা' নামের জয়গান করিয়া সুখী ও ধন্য হউন। তাঁর সেই আত্মাকে তোমার চিরশান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় দান কর। মা জননী, আজ আমাদের সকলকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন সংসারের সকল অবস্থায়, পরীক্ষা বিপদ ও রোগ শোকের ভিতরে, প্রাণ খুলে বিশ্বাস ও অনুরাগভরে যেন বলিতে পারি, "তোমার ইচ্ছা হউক পূর্ণ, করুণাময় স্বামী!"

শান্তিঃ　　শান্তিঃ　　শান্তিঃ!

কেশবচন্দ্র-স্মৃতি-ভবনের উদ্বোধন

(৬ই মার্চ্চ, সভানেত্রী শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু প্রদত্ত বক্তৃতার সার মর্ম্ম)

আজ এই স্মৃতিভবনের উদ্বোধন করিতে আসিয়া আমার মনে অনেক বাল্যস্মৃতি উদয় হইতেছে। আমার পিতা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের সহকর্ম্মী ছিলেন এবং আমার মাতা মহারাণী সুচারু ও সুনীতি দেবীর খেলার সঙ্গী ছিলেন।

কেশবচন্দ্র সেনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া শ্রীযুক্তা নাইডু বলেন যে, কেশবচন্দ্র ছিলেন পৌত্তলিকতাবিরোধী। তিনি সেই সময়কার সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণ করিয়া-ছিলেন। সেই সময় সমাজ যে সমস্ত অর্থহীন কুপ্রথা, মিথ্যার মোহ ইত্যাদিতে পূর্ণ ছিল, সেই সমস্ত দূরীকরণে তিনি ছিলেন অগ্রদূত—মুক্তিকামী। তাঁহার জীবনে এবং মৃত্যুকালেও তিনি মানবজাতির আধ্যাত্মিক মুক্তির উপাসক ছিলেন—তাঁহার মধ্যে কোন জাতি বা সম্প্রদায়গত পার্থক্য ছিল না। নারীদিগের সামাজিক অবরোধ-প্রথার তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং নারীরাও যে পুরুষের মত সমাধিকার পাইবার যোগ্য, একথা তিনি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেন। তাঁহার এই মতবাদ বহু বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হইলেও, এই শিক্ষায়তনের মধ্য দিয়া সার্থক হইতে চলিয়াছে। তিনি বলেন যে, তিনি আজ এই শিক্ষায়তনের মধ্যে একটি নবজীবনের এবং নবশক্তির জাগরণ দেখিতে পাইতেছেন এবং আশা করেন, এই স্মৃতিভবন প্রকৃত কৃষ্টির

কেন্দ্র হইবে। অতঃপর তিনি বলেন, মেয়েরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পাক বা না পাক, আদর্শ জীবনের পক্ষে ইহার সার্থকতা খুব অল্পই আছে। আমি চাই সেই সংস্কৃতি, যে সংস্কৃতির দ্বারা মানবত্ব ও নারীত্বের পূর্ণ বিকাশ হয়। মানবাত্মার মুক্তিই আমার একমাত্র কামনা। সেই মানবাত্মা অতীতের সমস্ত সংস্কারমুক্ত হইয়া নবজীবন লাভ করুক। আমি আশা করি, বাঙ্গলার নারীগণ এই শিক্ষায়তনের মধ্য হইতে মুক্তি-প্রেরণা পাইবেন। আমি দেখিতে চাই যে, অদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গলার নারীজাতি সাহসী, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, মার্জ্জিত এবং সংস্কারমুক্ত হইবেন। তাহাকেই আমি বলিব, বর্ত্তমান যুগের আদর্শ।

শ্রীযুক্তা নাইডু আরও বলেন, ডাঃ রায় সত্যই বলিয়াছেন যে, আমার কোন ডিগ্রি নাই (হাস্য)। আমি মনে করি না যে, ডিগ্রি না থাকায় আমার দেশসেবার পক্ষে তাহা কোন বিঘ্নস্বরূপ হইয়াছে। আমি মনে করি, আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে আমি আমার দেশের যথাসাধ্য সেবা করিতে সক্ষম হইয়াছি। এবং অন্যকেও দেশসেবায় উদ্বুদ্ধ করিতে পারিয়াছি। ইহার সঙ্গে বিদ্যার কোন সম্পর্ক নাই—ইহার সঙ্গে পাঠ্যপুস্তকের শিক্ষার কোন সম্পর্ক নাই; ইহা হইতেছে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত চিন্তা ও কৃষ্টির সাধনাকে নিজস্ব করিয়া গ্রহণ করা—যাহা কেবলমাত্র ভারতবর্ষের নহে, সমগ্র বিশ্বের। এই পবিত্র স্মৃতিমন্দিরে স্বর্গীয় কেশবচন্দ্রের চিতাভস্মও রক্ষিত হইয়াছে এবং তাঁহার স্মৃতি দেশবাসীর মনে এখনও উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। আমি আশা করি, বাঙ্গলার নারীজাতি বুঝিবে যে, ভারতবর্ষ নিজেকে কখন বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখে নাই, সমগ্র পৃথিবীর চিন্তা ও প্রতিভার উত্তরাধিকারকে বর্জ্জন করে নাই। দেশপ্রেমের অর্থ সংকীর্ণতা নয়, জাতিগত ঔদ্ধত্যও নয়, দেশসেবার অর্থ সংকীর্ণ প্রাদেশিকতাও নয়; প্রত্যেক দেশ এবং প্রত্যেক যুগ হইতে চিন্তাধারা, বিজ্ঞান, কলাশিল্প এবং আদর্শবাদ আহরণ করিয়া জাতীয় জীবনকে সমৃদ্ধ করাই দেশ-প্রেমের ধর্ম্ম। কেশবচন্দ্র সেন হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি মানুষের অন্ধ বিশ্বাসের সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করিয়াছিলেন এবং হিন্দু ঐতিহ্যের প্রতি অনুরক্ত থাকিয়াও বিশ্বসংস্কৃতি ও আদর্শের দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি আশা করি, এই স্মৃতিভবনে বাঙ্গালার নারীগণ কেশবচন্দ্রের প্রতিভায় অনুপ্রাণিত হইয়া প্রকৃত আত্মচেতনা লাভ করিবেন।

("আনন্দবাজার পত্রিকা" হইতে উদ্ধৃত)

মং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ও তাঁহার ধর্ম্ম

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের শতবার্ষিকী উপলক্ষে, শ্রদ্ধেয় স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের তিন নেতার ধর্ম্মসম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন। ব্রজেন্দ্রবাবু ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের মধ্যে একজন বিখ্যাত জ্ঞানী ও দার্শনিক পণ্ডিত। তাঁহার দার্শনিক পাণ্ডিত্যের তুলনা নাই। "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ।" তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ভ্রমাত্মক। তিনি ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া বলিয়াছেন যে, কেশবচন্দ্র প্রথম জীবনে খৃষ্টধর্ম্মের অনুসরণ করিয়াছিলেন এবং তৎপরে বৈষ্ণব ধর্ম্মের পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহা বলিলে তাঁহার প্রতি অবিচার করা হয়। শ্রীকেশবচন্দ্র ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইয়াই, প্রথম যৌবনেই মহর্ষি ঈশাকে গ্রহ করিয়াছিলেন, একথা সত্য। তিনি খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাকে গ্রহণ করেন নাই। তিনি খ্রীষ্টের ত্রিত্ববাদ খণ্ডন করিয়া, তাহার স্থানে একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। খৃষ্ট-চরিত্রের নূতন ব্যাখ্যা জগৎকে দান করিলেন। আমি অনেক ইংরাজ বিশপকে বলিতে শুনিয়াছি যে, কেশবচন্দ্র খৃষ্টধর্ম্মের নূতনতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তিনি খ্রীষ্টধর্ম্মের নূতন Theology পৃথিবীর ইতিহাসে রাখিয়া গিয়াছিলেন। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবকে গ্রহণ করিলেন; কিন্তু চৈতন্যদেবের ভক্তি আর কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দের ভক্তি এক নহে। শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তি অকর্ম্মক, আর কেশবচন্দ্রের ভক্তি সকর্ম্মক। তিনি বলিলেন, ভক্তি কর্ম্মের প্রসূতি; এই ভক্তির উন্মাদনায় তিনি বহু প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিলেন। ব্রহ্মবিদ্যালয়, নীতিবিদ্যালয়, নারীমঙ্গলপ্রতিষ্ঠান, নারীদিগের শিক্ষা ও সাধনার ক্ষেত্র, জনসাধারণের জন্য সংবাদপত্র-প্রচার, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, মন্দির ও আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া ভক্তির সার্থকতা সম্পন্ন করিলেন। একা একশত হইয়া সিংহবলে সকল কর্ম্ম সমাধা করিলেন। এইরূপে তিনি শ্রীবুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ, সক্রেটিসের আত্মজ্ঞান, ঋষিদিগের যোগ, বৈষ্ণবের ভক্তি ও খ্রীষ্টানদিগের পুত্রভাব, মুসলমানের সার্ব্বভৌমিক ভ্রাতৃত্ব আত্মস্থ করিলেন। তিনি নিজে আত্মস্থ করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না, পরন্তু এক একজন বিশিষ্ট ধর্ম্মপ্রচারককে এক এক ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব অধ্যয়ন ও সাধন করিবার জন্য আদেশ করিলেন। যাহাতে প্রত্যেক নরনারী সকল ধর্ম্মের সাধনবিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারেন, তাহার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিলেন। তাঁহার জীবনের এই বিশিষ্টতা সর্ব্বজনবিদিত। ইহাকে উড়াইয়া দিলে বা অস্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ করা হয়।

তিনি প্রত্যেক প্রাচীন বিশ্বাসের নূতন অর্থ দান করিলেন। পুরাতন সংস্কারের পরিবর্ত্তে নূতন সংস্কার সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার আবির্ভাবে এক নূতন সাধন-ক্ষেত্র প্রস্তুত হইল। ব্রজেন্দ্রবাবু

বলিয়াছেন যে, কেশবচন্দ্রের নববিধান পাঁচ ফুলের সাজি; অর্থাৎ সকল ধর্ম্ম হইতে সত্য সংগ্রহ করিয়া, পাঁচ ফুলে যেমন তোড়া নির্ম্মাণ করে, কেশবচন্দ্র তাহাই করিলেন। ইহা ব্রজেন্দ্র বাবুর ভ্রান্ত ধারণা। শ্রীকেশবচন্দ্রের সাধনা ভিন্ন। তিনি সত্য উপলব্ধি না করিয়া কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন না। আমরা অতি সরল ও সহজ ভাবে শ্রীকেশবের ধর্ম্মসাধনের প্রণালী ব্যাখ্যা করিব।

আমরা যখন শরীর-বিজ্ঞান আলোচনা করি, তখন দেখিতে পাই যে, শরীরের ভিতর ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র আছে, যথা হৃৎপিণ্ড (heart), ফুস্ ফুস্ (lungs), মূত্রাশয় (kidneys), মস্তিষ্ক Brain) প্রভৃতি। ইহাদের কার্য্য অর্থাৎ একটী যন্ত্র হইতে অন্য যন্ত্রের কার্য্য সম্পূর্ণ পৃথক, অথচ একটী অপরটীর অধীন হইয়া কার্য্য করিতেছে, একটীর অভাবে অন্যটীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, ইহা অভ্রান্ত সত্য। কেশবচন্দ্র অন্তর্দৃষ্টিযোগে দর্শন করিলেন যে, আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনও এই নিয়মের অধীন; যোগ বিনা ভক্তি অথবা ভক্তি বিনা কর্ম্ম অপূর্ণ, একটীকেও পরিহার করিলে ধর্ম্মজীবন মৃত হয়, ধর্ম্মজীবন অপূর্ণ হয়।

ভগবান্ যেরূপ অনন্ত, তাঁর সত্যও সেইরূপ অনন্ত। পৃথিবীর আদিম কাল হইতে যুগে যুগে সাধু, ভক্ত ও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ ভগবানের এক একটী সত্য ও ভাব লইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন। প্রত্যেক সত্য ও ভাব ভগবানের খণ্ড প্রকাশ, সেই সকল খণ্ড সত্য ও ভাবের ভিতর একটী যোগের সূত্র নিহিত আছে; সেইগুলিকে অখণ্ড সত্যে পরিণত না করিতে পারিলে, ধর্ম্ম পূর্ণ হইবে না। তিনি যোগ-নেত্রে যাহা দর্শন করিলেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া গেলেন যে—"we believe in the church universal, which is the depository of all ancient wisdom and the receptacle of all modern science, which recognises in all prophets and saints a harmony, in all scriptures a unity and through all dispensations a continuity, which abjures all that separates and divides and always magnifies unity and peace, which harmonises reason and faith, yoga and Bhakti, asceticism and social duty in their highest forms, and which shall make of all nations and sects one kingdom and one family in the fulness of time."

ইহা একটী নূতন ধর্ম্মবিজ্ঞান, ইহা তাঁহার সাক্ষাৎ যোগদৃষ্টি। সমুদায় পৃথিবী, জড় জীব তরুলতা ও মানব যে এক মহাযোগের ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়া ক্রমোন্নতির পথে যাত্রা করিয়াছে এবং উন্নত হইতে উন্নততর অবস্থার দিকে অগ্রসর হইতেছে, ইহা যেমন ভৌতিক জগতের একটী অভ্রান্ত সত্য, সেইরূপ অন্তর্দৃষ্টি-যোগে তিনি দর্শন করিলেন যে, ধর্ম্মজগৎও সেই একই মহাযোগের সূত্র ধরিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে। তাঁহার এই যোগসূত্রকে কোন দর্শন শাস্ত্র খণ্ডন করিতে পারে না। ইহা পাঁচটী ফুল দিয়া একটী তোড়া বাঁধা নয়, ইহা একটী অঙ্গাঙ্গীভূত জীবন্ত সত্য। ইহা সকল খণ্ডের অখণ্ড সমন্বয়। যুগ যুগান্ত এবং কাল কালান্তের ভিতর দিয়া, ইহা অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে এক সূত্রে গ্রথিত করিয়াছে। বর্ত্তমান যুগে এই মহা যোগসূত্র শ্রীকেশবচন্দ্র অন্তর্দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিলেন। যাঁহারা এই মহাযোগের ভিতর প্রবেশ না করিয়া, ভাসা ভাসা ভাব লইয়া বিচার করিতে বসেন, তাঁহাদের বিচার যে অসঙ্গত ও ভ্রান্ত পথে গমন করিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কারণ নাই। ব্রজেন্দ্রবাবু একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও দার্শনিক; তিনি যদি শ্রীকেশবচন্দ্রের ধর্ম্মনীতির বিশিষ্টতা মনোযোগপূর্ব্বক অধ্যয়ন করেন ও গভীর ভাবে চিন্তা করেন, তাহা হইলে হয়ত একদিন তাঁহার ভ্রান্ত ধারণা অপনোদন হইতে পারে।

আমি শ্রীকেশবচন্দ্র ও পরমহংসদেব উভয়ের নিকট হইতেই অনেক বহু মূল্য উপদেশ লাভ করিয়াছি, উভয়কে অতিশয় ভক্তির সহিত দর্শন করিতাম। পরমহংসদেবের বিশেষ কথা অনেকবার শুনিয়াছি; তিনি বলিতেন, ভিন্ন ভিন্ন মত ও ভিন্ন ভিন্ন পথে সকলেরই উদ্দেশ্য ব্রহ্মপ্রাপ্তি। প্রত্যেক হিন্দু সাধক, আমি যাঁহাদের সহিত ধর্ম্মের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে মিলিত হইয়াছি, তাঁহারা সকলেই ঐ কথা বলিতেন, ভিন্ন ভিন্ন মত, ভিন্ন ভিন্ন পথ; এই উদার মত প্রত্যেক হিন্দু সাধকের বিশিষ্টতা। শ্রীকেশবচন্দ্রের সমন্বয় ইহা হইতে পৃথক, ইহা যোগশাস্ত্রের একটী নূতন অধ্যায়, ইহা বর্ত্তমান যুগের একটী নূতন ধর্ম্মবিজ্ঞান।

ব্রজেন্দ্র বাবু বলিয়াছেন যে, কেশবচন্দ্র সমুদ্রজাতীয় অনুষ্ঠান-পদ্ধতি হইতে সংগ্রহ করিয়া একটী নূতন অনুষ্ঠানপদ্ধতি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইহা ঠিক কথা নয়। শ্রীকেশবচন্দ্রের জীবনের বিশিষ্টতা এই ছিল যে, তিনি ঈশ্বরের দ্বারা প্রত্যাদিষ্ট না হইয়া কোন কার্য্যে হস্তার্পণ করিতেন না। তিনি ঈশ্বরের দ্বারা সাক্ষাৎ ভাবে আহূত হইয়া এবং সংসার ও ধর্ম্মের সমন্বয় রক্ষা করিবার জন্য, প্রত্যেক বিশ্বাসী নরনারী যাহাতে ধর্ম্মনিষ্ঠা বজায় রাখিয়া ব্রহ্মগত জীবন যাপন করিতে পারেন, তাহারই বিধিগুলি নবসংহিতায় প্রকাশিত করিয়াছেন। আমরা পরমহংসকে শ্রদ্ধা করি; তাঁহার যাহা প্রাপ্য, তাঁহাকে তাহা দেওয়া হউক, ইহাই আমাদিগের আন্তরিক প্রার্থনা।

আমাদিগের ইহা দৃঢ় বিশ্বাস যে, সত্য কখন প্রচ্ছন্ন থাকিবে না। এমন একদিন আসিবে, যে দিন মিথ্যার ব্যূহ ভূমিসাৎ করিয়া, সত্য আপনার জয় আপনি ঘোষণা করিবেন।

শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নববিধান সমাজান্তর্গত বালিকাদিগের নীতিবিদ্যালয়ের

বার্ষিক কার্য্যবিবরণী

১৯৩৬

(৩০শে জানুয়ারী, ১৯৩৭, শিশুসম্মিলনীর উৎসবে পঠিত)

বৎসরের পর বৎসর ঘুরিয়া আসে, এই ৩১ বৎসর ধরিয়া আমরা এই বিদ্যালয়ের কার্য্যবিবরণ লইয়া ভাই ভগ্নীগণের কাছে এমনই আসিয়া দাঁড়াই। সারা বৎসরের কার্য্য-পরিচালনায় কত ত্রুটী থাকে, অন্তরের আদর্শ সকল সময় কার্য্যে ফুটাইয়া তুলিতে পারি না; বন্ধুগণ কেহ বা স্নেহভরে সে সকল ক্ষমা করেন, কেহ বা প্রতিকূল আলোচনা করেন। আজ আমরা সকল বন্ধুকে সাদরে আহ্বান করিতেছি, তাঁহাদের সকলের সহায়তায় এই প্রতিষ্ঠানকে সার্থক করিয়া তুলুন; যে মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া ইহার প্রথম প্রতিষ্ঠা, তাহা সফল করুন।

গত বৎসর ৯ই ফেব্রুয়ারী ৫০টী বালিকা লইয়া নীতি-বিদ্যালয়ের ১৯৩৬ সনের কার্য্য আরম্ভ হয়। শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষ মহাশয় উপস্থিত থাকিয়া বৎসরের কার্য্য আরম্ভ করেন এবং জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে সকল বালিকাকে উপদেশ দান করেন। ক্রমশঃ নূতন বালিকা আসিয়া যোগদান করায়, বৎসরের প্রথম ভাগে ১০৫ জন বালিকা লইয়া কার্য্য আরম্ভ হয় এবং ৮৪ জন বালিকা লইয়া বৎসরের কার্য্য শেষ হইয়াছে।

বৎসরের ভিতর ২৮টী রবিবার ক্লাস হইয়াছে। সহকারী সম্পাদিকা শ্রীমতী সুধা সেন এবং সম্পাদিকা অধিকাংশ সময় প্রথম শ্রেণীতে শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীমতী সুজাতা লাহিড়ী, শান্তিসুধা বসু, অন্নপূর্ণা সেন এবং প্রতিমা মুখার্জ্জি নিয়মিতভাবে শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীমতী সুধা দাস, শোভা সেন, মাখনবালা মল্লিক, মণিমালা দে, দীপ্তিমা সেন এবং পূর্ণিমা চট্টোপাধ্যায় মধ্যে মধ্যে শিক্ষা দান করিয়া বালিকা-দিগকে উৎসাহ দিয়াছেন।

গত বৎসর পাঁচটী বিভাগে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীতে দেশীয় এবং বিদেশীয় সাধু সাধ্বীগণের জীবন ও বাণী, উপনিষদ্ ও পুরাণাদি হইতে সহজ উপদেশ, গল্প ও শ্লোক, এবং ইংরাজী, বাংলা কবিতা ও সঙ্গীত ইত্যাদি দ্বারা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ শ্রেণীতেও সাধুজীবন, উপদেশমূলক গল্প, কবিতা ও সঙ্গীত শিখান হইয়াছে। শিশু-শ্রেণীতে অধিকাংশ বালিকা নিজেরা লিখিতে পারে না; শিক্ষয়িত্রীগণ তাহাদের কবিতা লিখিয়া দেন, সহজ গল্পের ভিতর দিয়া ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দেন এবং চরিত্র-পুস্তক দেখিয়া তাহাদের দোষ ত্রুটী সংশোধন করিতে চেষ্টা করেন। মধ্যে মধ্যে নিম্ন দুই শ্রেণীর বালিকাগণকে নানা প্রকার ক্রীড়ার ভিতর দিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ হইতে এবং নিয়মানুবর্ত্তিতা (discipline) বুঝিতে শিক্ষা দেওয়া হয়।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় নিম্ন তিনটী শ্রেণীতে চরিত্র পুস্তক দেওয়া হয়; তাহাতে অভিভাবিকের স্বাক্ষরিত সপ্তাহের দিনলিপি থাকে, যাহাতে দোষ ত্রুটী স্বীকার করিয়া ব্যবহার ও চরিত্র সুন্দর করিতে পারে। উচ্চ শ্রেণীর বালিকাগণ নিজেরাই দিনলিপি লিখিয়া আনে, তাহাদিগকে চরিত্র-পুস্তক দেওয়া হয় না।

ভিক্টোরিয়া বালিকা-বিদ্যালয়ের মোটর বাস ব্যবহারের তৈলের জন্য মাসিক ৩০৲ টাকা করিয়া ব্যয় হয়। এই জন্য বালিকাগণের নিকট প্রতি মাসে ।০ (চারি) আনা করিয়া লওয়া হয়। ইহাতে ব্যয়ের আংশিক পূরণ হয়; এতদ্ব্যতীত বন্ধুগণের নিকট প্রাপ্ত অর্থে এই প্রতিষ্ঠান স্থায়ী হইয়াছে। তাঁহারা আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আর্ট প্রেসের স্বত্বাধিকারী বন্ধু শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট আমরা বিশেষ ঋণী; তিনি শিশুসম্মিলনীর নিমন্ত্রণ-পত্র ইত্যাদি মুদ্রণের ব্যয়ভার বহন করিয়া আমাদের অশেষ উপকার করেন। তাঁহাকেও ধন্যবাদ জানাইতেছি।

১৯৩৬ সনে ১৮ই জানুয়ারী শনিবার বালকবালিকাদিগের উৎসব উপলক্ষ্যে প্রাতে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হয়। নীতিবিদ্যালয়ের বালক বালিকারা সঙ্গীত করে, এবং ডাক্তার সত্যানন্দ রায় উপাসনা করেন। অপরাহ্নে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট গৃহে বালক ও বালিকাদিগের নীতি-বিদ্যালয়ের পারিতোষিক-বিতরণ সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত কর্ণেল মণি দাস সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং তৎপত্নী শ্রীমতী লাবণ্য দাস বালক বালিকাদিগকে পুরস্কার বিতরণ করিয়া তাহাদিগের আনন্দবর্দ্ধন করেন। সেদিনে সমাগত সকল বালক বালিকার জলযোগের ব্যয়ভারও তাঁহারা বহন করেন। ইঁহাদিগকে এবং ইন্‌ষ্টিটিউট গৃহের কর্ত্তৃপক্ষগণকে আমরা বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

নববর্ষ উপলক্ষ্যে, গত ১২শে এপ্রিল, বিদ্যালয়-গৃহেই বিশেষ উৎসব হয়। শ্রীমতী মণিকা মহলানবিশ উপাসনা করেন, বালিকাগণ সঙ্গীত করে। পরে শিশু শ্রেণীর কেহ কেহ আবৃত্তি করে এবং সকলে মিলিয়া সরবৎ ও মিষ্টান্ন খাইয়া তৃপ্তিলাভ করেন। বালিকাগণই উৎসাহভরে সকল আয়োজন করিয়াছিল। এ দিনের জলযোগের জন্য শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন মিষ্টান্ন পাঠাইয়াছিলেন।

১৯৩৬ সনের ক্রীড়াপ্রতিযোগিতার জন্য, গত ২৭শে ডিসেম্বর, ভিক্টোরিয়া বিদ্যালয়ের উদ্যানেই ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই সকল ক্রীড়ার জন্য বিশেষ পুরস্কার প্রদত্ত হইয়াছে।

গত ২৯শে ডিসেম্বর, বালিকাগণকে আলিপুরের পশুশালায় বেড়াইতে লইয়া যাওয়া হয় এবং সেখানে জলযোগের ব্যবস্থা করা হয়। নীতিবিদ্যালয়ের দু'চার জন পূর্ব্বতন ছাত্রী পুত্র কন্যা-সহ এই আনন্দোৎসবে যোগদান করায়, সকলেই বিশেষ

সুখী হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের নিকট ও বর্ত্তমান ছাত্রীদিগের নিকট প্রাপ্ত চাঁদা হইতে এই দিনের সকল ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়াছিল।

যে সকল শুভানুধ্যায়ী বন্ধুর সাহায্যে এই ক্ষুদ্র নীতিবিদ্যালয় অনেক প্রতিকূল অবস্থার ভিতরেও এতদিন পর্য্যন্ত তাহার কার্য্যভার বহন করিয়া আসিতেছে, তাঁহাদের সকলকে আজ আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। পরলোকস্থ বন্ধুগণের প্রতিও আজ আমাদের শ্রদ্ধার্পণের দিন। এই বিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী নিপুণিকা দেবীর অকাল মৃত্যুতে আমরা সকলেই ব্যথিত। তাঁহার শোকার্ত্ত আত্মীয় স্বজনদের আমরা অন্তরের সমবেদনা জানাইতেছি। শ্রীমতী নিপুণিকা এই বিদ্যালয়েরই পুরাতন ছাত্রী ছিলেন। প্রার্থনা করি, ভগবান এই কন্যার আত্মাকে আনন্দ শান্তিতে রক্ষা করুন।

যে সকল কন্যার সহযোগিতায় ইহার শিক্ষাকার্য্য চলিতেছে, তাঁহাদিগকে কি বলিব, জানিনা। অনেকেই হয়তো জানেন না যে, একজন ব্যতীত নীতিবিদ্যালয়ের সকল শিক্ষয়িত্রী এবং সহঃ সম্পাদিকা নিজে এই বিদ্যালয়ের পুরাতন ছাত্রী। ভগবানের চরণে ইহাদের জন্য আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি, তিনি ইহাদের আদর্শ জীবন দান করুন। যে ঋষিজীবনের অনুপ্রাণনায় নীতিবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, ইঁহাদিগের ভিতরে সেই জীবনাদর্শ জাগাইয়া তুলুন। ইঁহাদের দেখিয়া যেন কনিষ্ঠা ভগ্নীগণ এই যুগপরিবর্ত্তনের দিনে, দেশের এই সঙ্কট-সময়ে যথার্থ সুপথ দেখিয়া আশ্বস্ত হয়, শিক্ষার সার্থকতা কিসে, তাহা বুঝিতে পারে। যথার্থ শিক্ষা আমাদের প্রাচ্যজীবনধারাকে বিক্ষুব্ধ হইতে দেয় না। সে শিক্ষা ভারত নারীর বিশেষত্ব হারাইতে দেয় না। সে শিক্ষা নারীকে ত্যাগে, ধৈর্য্যে, সেবায় শক্তিশালিনী করে; ব্রতচারিণী করিয়া পরিবারের, সমাজের, দেশের রক্ষয়িত্রীরূপে পরিণত করে; সে শিক্ষা জীবনের চরম সত্য আমাদের চিনাইয়া দেয়। ভগবান্ আশীর্ব্বাদ করুন, এই ক্ষুদ্র নীতিবিদ্যালয় যেন এই শিক্ষার আদর্শ তাহার কার্য্যধারায় ফুটাইয়া তুলিতে পারে।

আয় ও ব্যয়

(১৯৩৬ সনের জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত)

আয় ঃ—

১৯৩৫ সনের হস্তে স্থিত ২১৫৫, সমস্ত বৎসরে মাসিক চাঁদা ২০৫৷৷০, এককালীন দান ২৫৭৲, বালিকাদিগের নিকট বাসের ভাড়া হিসাবে প্রাপ্ত ১৯১৷৶০। মোট আয় ৮৭৪৸৶৫।

ব্যয় ঃ—

দ্বারবানের মাহিনা ১৮৲, দ্বারবানের বাসভাড়া ও ভৃত্যদিগের বক্‌শিস ইত্যাদি ১১৴০, ছাপা খরচ ৬৸৶০, ডাক খরচ ১৲, খুচরা খরচ ২৷৶৫, পারিতোষিক ৭২৷৷১০, পারিতোষিক-বিতরণ-সভার জন্য হলের ভাড়া ও অন্যান্য খরচ ৪০৷৷০, ভিক্টোরিয়া বিদ্যালয়কে (বাসের ভাড়া হিসাবে) ৩৪৪৶০, বালকদিগের রবিবাসরীয় বিদ্যালয় ফণ্ডে ৩০৲, শিশুদিগের জলযোগ (পারিতোষিক দিবসে) ৮৫৲, উদ্যান-সম্মিলনীর ব্যয় ১৭৴০, নববর্ষে আনন্দোৎসবে ব্যয় ৪৷৶০। মোট ব্যয় ৬৩০৷১৫।

মোট আয় ৮৭৪৸৶৫
মোট ব্যয় ৬৩০৷১৫

হস্তে স্থিত—২৪৪৷৴১০

শ্রীশকুন্তলা দেবী
সম্পাদিকা।

সংবাদ।

শ্রীচৈতন্যের জন্মোৎসব—গত ২৬শে মার্চ্চ সন্ধ্যায়, শ্রীচৈতন্যের জন্মোৎসব উপলক্ষে, কমলকুটীরস্থ নবদেবালয়ে, কীর্ত্তন, পাঠ ও প্রার্থনা হয়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ প্রার্থনা করেন, ভাই অক্ষয়কুমার লধ "সাধুসমাগম" হইতে "চৈতন্যসমাগম" পাঠ করেন।

গত ২৭শে মার্চ্চ, সন্ধ্যায়, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে, নববিধান ট্রাষ্টের উদ্যোগে, "গৌরাঙ্গ-উৎসব ও হোরিখেলা" উপলক্ষে সংকীর্ত্তন ও উপাসনা হয়। ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন উপাসনা করেন।

গুড ফ্রাইডে—গত ২৬শে মার্চ্চ, শুক্রবার, শ্রীঈশার ক্রুশারোহণ (গুড্ ফ্রাইডে) উপলক্ষে, শান্তিকুটীরে ৮৩নং অপার সার্কুলার রোডে, অধ্যাপক খড়্গসিংহ ঘোষ উপাসনা করেন। শ্রীমতী হেমলতা চন্দ, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ এবং ভাই অখিলচন্দ্র রায় বিশেষ প্রার্থনা করেন।

জন্মদিন—গত মাঘী পূর্ণিমার দিনে শ্রীমান্ ক্ষিতীশচন্দ্র সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ কেশবচন্দ্র সিংহের জন্মদিন উপলক্ষে, তাঁহাদের ৯নং ষ্টার লেন ভবনে, ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন।

গত ৪ঠা মার্চ্চ, মঙ্গলবাড়ীতে, ৮২৷১নং অপার সার্কুলার রোড ভবনে, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ নন্দনের জ্যেষ্ঠা কন্যা কুমারী শোভিতার জন্মদিন উপলক্ষে ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন। ঐদিনে তাঁহার একটী শিশু কন্যা হাসপাতাল হইতে আরোগ্য হইয়া আসে, এই উপলক্ষেও ভাই প্রিয়নাথ বিশেষ প্রার্থনা করেন।

আশীর্ব্বাদ—গত ২৭শে মার্চ্চ, কলিকাতায় বেনিয়াটোলা লেনস্থ মিত্রইনষ্টিটিউশন্ স্কুল গৃহে, স্বর্গগত প্রেরিত ভাই দীননাথ মজুমদারের প্রপৌত্রী, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মজুমদারের জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী অরুণার সহিত, হাওড়ার কদমতলা-নিবাসী স্বর্গীয় ডাঃ শরৎকুমার দাসের তৃতীয় পুত্র কল্যাণীয়

শ্রীমান্ সুকুমার দাসের শুভবিবাহ সম্বন্ধ পাকা হইয়া আশীর্ব্বাদানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। ভগবান তাঁহার প্রিয় পুত্র কন্যাকে আশীর্ব্বাদদানে পবিত্র ব্রতের জন্য প্রস্তুত করিয়া লউন।

তীর্থ-বাস—গত ১০ই মার্চ্চ, ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক সস্ত্রীক কলিকাতা হইতে পুরী যাত্রা করিয়াছেন। সেখানে "প্রেমেন্দ্র স্মৃতিতীর্থ" নির্ম্মিত হইতেছে।

উৎসব—খাঁটুরা (গোবরডাঙ্গা) ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে, ব্রহ্মমন্দিরে গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় উপাসনা এবং ২৮শে পূর্ব্বাহ্নে স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন দত্তের সাম্বৎসরিক পুণ্যস্মৃতিতে উপাসনা শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্রনাথ রায় করেন। অপরাহ্নে স্থানীয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে স্মৃতিসভায়, শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত হরিসুন্দর দাস, শ্রীযুক্ত কুমুদবিহারী রায় ক্ষেত্রবাবুর গুণাবলী উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা করেন। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত হরিসুন্দর দাস শান্তিবাচনের উপাসনা করেন। ১লা মার্চ্চ, চণ্ডীতলায় ক্ষেত্রবাবুর সহধর্ম্মিণী সতী কুমুদিনীর পরীক্ষাস্থলে শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্রনাথ রায় উপাসনা করিলে উৎসবান্ত হয়।

বিশেষ উপাসনা—ভাই প্রিয়নাথ মঙ্গলবাড়ীর প্রতি বাড়ীতে এক এক দিন বিশেষ পারিবারিক উপাসনা করেন। গত ৯ই মার্চ্চ ৮১নং ভবনে পাড়ার সকলকে সমবেত করিয়া উপাসনা হয়।

পরলোকগমন—আমরা দুঃখের সহিত শোকসহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়ে নিম্নলিখিত পরলোকগমন-সংবাদ পত্রিকাস্থ করিতেছি :—

গত ১৮ই মার্চ্চ, প্রাতে, অমরাগড়ী নববিধান সমাজের উপাচার্য্যা, স্বর্গগত ভাই ফকিরদাস রায়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী শশীমুখী দেবী, ৮১ বৎসর বয়সে, সজ্ঞানে দয়াময়ী মার নাম শুনিতে শুনিতে, অমরলোকে পতিদেবতার সহিত মিলিত হইয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শায়িত ছিলেন। তাঁর দুই পুত্র ও দুই কন্যা বর্ত্তমান। মৃত্যু-সংবাদে জয়পুর হাই স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকগণ, বালিকাবিদ্যালয়ের ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীগণ, নিকটস্থ পল্লীবাসী নরনারীগণ বিধানকুটীরে সমবেত হইয়া এবং শবানুগমন করিয়া অমরাত্মার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করিয়াছেন। মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা এবং কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সত্যানন্দ রায় কাতর প্রার্থনা করেন। সংকীর্ত্তনযোগে শ্মশানে পবিত্র শবদেহ নীত হইলে, নবসংহিতামতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

গত ২২শে মার্চ্চ, প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাঃ সুশীলকুমার নাগ (Dr. S. K. Nag), ১৮নং বীডন ষ্ট্রীটে, ৫৭ বৎসর বয়সে, অপ্রত্যাশিতভাবে সন্ন্যাস-রোগে, বৃদ্ধ পিতা মাতা, সহধর্ম্মিণী, তিন পুত্র, দুই কন্যা, দুই ভ্রাতা এবং বহু আত্মীয়স্বজনদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অমৃত-লোকে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অভাবে দেশের ও দশের এবং চিকিৎসাক্ষেত্রের বহুতর ক্ষতি হইল।

গত ২৫শে মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার, রাত্রে বালীগঞ্জে, স্বর্গীয় হরগোপাল সরকারের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত কিরণগোপাল সরকার, ৪৭ বৎসর বয়সে, অন্ত্র জড়িয়া যাওয়াতে পায়খানা বন্ধ হইয়া হঠাৎ ইহলোক হইতে অমরলোকে প্রস্থান করিলেন। এই এক বৎসরের মধ্যে তিনটী ভ্রাতা একে একে পিতামাতার কাছে চলিয়া গেলেন। দশটী ভাই বোনের মধ্যে একটী ভাই ও দুইটী বোন পৃথিবীতে রহিলেন।

বিধানজননী তাঁহার প্রিয় সন্তানদিগকে প্রেমবক্ষে স্থান দান করুন এবং শোকার্ত্ত পরিবারে শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

মাসিক স্মৃতি—গত ১৪ই মার্চ্চ, ৬৫।১ হ্যারিসন রোডে, স্বর্গীয় শ্রীনাথ দত্তের পরলোকগমনের একমাস পূর্ণ দিনে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

সাম্বৎসরিক—গত ১লা ফাল্গুন, ভাগলপুরে, স্বর্গীয় ভক্ত হরিসুন্দর বসুর সাম্বৎসরিকে, তাঁহার পুত্র ডাঃ প্রেমসুন্দর বসু তাঁহার গৃহে মণ্ডলীস্থ সকলকে লইয়া উপাসনা করেন। তথায় ১৬ই ফাল্গুন, শ্রীমতী সুনীতি ঘোষের গৃহে তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গীয় জগন্মোহন বীরের সাম্বৎসরিকে, শ্রীমতী নির্ম্মলা বসু উপাসনা করেন। শ্রীমতী সুনীতি ঘোষ প্রার্থনা করেন।

গত ১লা চৈত্র, বেলগাছিয়া কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের রেসিডেণ্ট সার্জ্জন ডাঃ বিবেকমোহন সেনের গৃহে, তাঁহার মাতুল স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র দাসের সাম্বৎসরিকে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন; ভগ্নী শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী সেন প্রার্থনা করেন এবং মুঙ্গেরের আশ্রমনির্ম্মাণার্থ ৫৲ দান করেন।

গত ১৭ই মার্চ্চ ৫।১ রাজা দিনেন্দ্র ষ্ট্রীট, স্বর্গীয় নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের সাম্বৎসরিকে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে সাধু প্রমথলাল শিক্ষাতীর্থে ২৲ দান করা হয়।

গত ৪ঠা চৈত্র, (১৮ই মার্চ্চ), ১৭নং রামমোহন দত্ত রোডে, কুচবিহারের স্বর্গীয় কুমার গজেন্দ্রনারায়ণের মধ্যম জামাতা স্বর্গীয় কাপ্তান কল্যাণকুমার মুখার্জ্জির সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

গত ৯ই চৈত্র, (২৩শে মার্চ্চ), ২০নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জির গৃহে, তাঁহাদের পিতৃদেব স্বর্গীয় রায় বাহাদুর ডাঃ মতিলাল মুখার্জ্জির সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে পুত্রকন্যাগণ প্রচারভাণ্ডারে ১০৲, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ১০৲, অন্ধ বিদ্যালয়ে ৫৲, অনাথ আশ্রমে ৫৲ টাকা এবং জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী মনোরমা চাটার্জ্জি প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ১০ই চৈত্র, (২৪শে মার্চ্চ), ভবানীপুরে ৫।১ মাধব লেনে, স্বর্গীয় মনোগতধন দের কনিষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় সুহাসকুমারের প্রথম সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে মাতৃদেবী ব্রহ্মমন্দিরে ফুলের জন্য ২৲ টাকা দান করেন। অদ্য অপরাহ্নে, ৫—২০মিনিটের সময় সুহাসের মেজো পিসীমা অশোকলতা দাসের গৃহে, ২১৪নং লোয়ার সার্কুলার রোডে, ধ্যানযোগে পরলোকসাধন, সঙ্গীত ও প্রার্থনাদিই হয়। এ উপলক্ষে বালকভোজনে ১৲ টাকা উৎসর্গ করা হয়।

Edited on behalf of the Apostolic Durber New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭২ ভাগ। ৭ম সংখ্যা। | ১লা বৈশাখ, বুধবার, ১৩৪৪ সাল, ১৮৫৯ শক, ১০৮ ব্রাহ্মাব্দ
14th. April, 1937 | অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা

হে অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর! তুমি তোমার অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অণুকণা লইয়া বহির্জ্জগৎকে সজ্জিত করিয়াছে; তাই এই বহির্জ্জগতের এত শোভা সৌন্দর্য্য! অন্তর্জ্জগৎকে তোমার যে অতুল ঐশ্বর্য্য সৌন্দর্য্যে সজ্জিত করিয়াছ, তাহার তুলনা কোথায়? তুলনায় বহির্জ্জগতের শোভা সৌন্দর্য্য অন্তর্জ্জগতের শোভা সৌন্দর্য্যের ছায়া মাত্র কি বলিব? বিশ্বাসীর নিকট এরূপ তুলনা শোভা পায় না। বিশ্বাসীর নিকট অন্তর্জ্জগতের ঐশ্বর্য্য সৌন্দর্য্য ও বহির্জ্জগতের ঐশ্বর্য্য সৌন্দর্য্য, এক অখণ্ড ঐশ্বর্য্য সৌন্দর্য্য; এক অখণ্ড ঐশ্বর্য্য সৌন্দর্য্যের বহির্ম্মুখীন ও অন্তর্ম্মুখীন প্রকাশ। তুমিই তো এক অখণ্ড অদ্বিতীয় অনন্ত ঐশ্বর্য্য সৌন্দর্য্য। বহির্জ্জগতেও তোমারই প্রকাশ, অন্তর্জ্জগতেও তোমারই প্রকাশ। একেরই অখণ্ড প্রকাশ, একের প্রকাশের অন্তর্ব্বাহ্য মাত্র। বিশ্বাসীর চক্ষে অন্তর্জ্জগতে যে তোমার প্রকাশ, তাঁহার তো তুলনা নাই, তাহার তো যথাযথ বর্ণনাই সম্ভবে না। কিন্তু বিশ্বাসীর চক্ষে তোমার বহির্জ্জগতের শোভা সৌন্দর্য্য ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের প্রকাশেরই বা তুলনা কোথায়? ধন্য সেই সকল তোমার বিশ্বাসী সন্তান, যাঁহারা এই বহির্জ্জগৎ রূপ দর্পণের ভিতর দিয়া তোমার শ্রীমুখ ভাল করিয়া দর্শন করেন, তোমার ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য সৌন্দর্য্য-দর্শনে মুগ্ধ হইয়া ছায়া ছাড়িয়া কায়াকেই অনুরাগভরে প্রাণে ধারণ করেন। চৈত্র, বৈশাখ এই দুইটী মাস, হে বিশ্ব-স্রষ্টা! তোমার বহির্জ্জগতের রচনা ও অভিনয়ের মধ্যে তোমার ঐশ্বর্য্য সৌন্দর্য্য বিশেষ ভাবে প্রকাশ করে। তোমার কি ইচ্ছা নয়, যে আমরা তোমার মানব সন্তান বিশ্বাসচক্ষু লাভ করিয়া, সেই চক্ষে যেমন তোমার ঐশ্বর্য্য সৌন্দর্য্য অন্তর্জ্জগতে দর্শন করি, সম্ভোগ করি, বহির্জ্জগতেও তেমনই দর্শন করি ও সম্ভোগ করি। কিন্তু তুমি অন্তর্য্যামী, স্বয়ং নিজ চক্ষে দেখিতেছ, আমাদের বিশ্বাস-চক্ষু তেমন খোলে নাই, বিশ্বাসদৃষ্টি তেমন উজ্জ্বল হয় নাই, যে চক্ষে, যে দৃষ্টিতে অন্তরে বাহিরে তোমাকে তোমার মনের মত দর্শন করি, স্বীকার করি এবং দেখিয়া, স্বীকার করিয়া প্রাণে গ্রহণ করিয়া মুগ্ধ হই, ধন্য হই। এবার বিশ্বাসের ধর্ম্মজগতে আনিয়াছ; বিশ্বাস-চক্ষু খুলিয়া বিশ্বাস-দৃষ্টিতে সুধু তোমাকে অন্তরে নয়, বাহিরেও উজ্জ্বল ভাবে কিরূপে দেখিতে হয়, দেখিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তাহারও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছ। সরল ব্যাকুল প্রার্থনা হইলেই নাকি তুমি আমাদের অভাব পূর্ণ কর; তাই সরল অন্তরে তোমার নিকট

ব্যাকুল প্রার্থনা করিতেই তুমি আমাদিগকে যথার্থ বিশ্বাসী কর, এবং আমাদের অন্তরে সেই বিশ্বাসচক্ষু খুলিয়া দেও, যে চক্ষে, যে দৃষ্টিতে আমরা যেমন অন্তর্জ্জগতে, তেমনি তোমার এই বহির্জ্জগতে তোমাকে দর্শন করি, তোমার ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য সৌন্দর্য্য দর্শন করি এবং এ সময় এই বাহ্যপ্রকৃতির লীলাভিনয়ে তোমার স্বর্গের লীলা দর্শন করি, পাঠ করি, সেই লীলাক্ষেত্রে তোমাকে ভাল করিয়া স্বীকার করিয়া গ্রহণ করিয়া মুগ্ধ হই, তুমি কৃপা করিয়া এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

—•—

বৈশাখ-বরণ

হে পুণ্য বৈশাখ! হে নববর্ষের প্রথম মাস! তোমাকে নমস্কার। হে নববর্ষের আরম্ভ! হে আশা উৎসাহের উৎস! হে একটি পূর্ণ বৎসরের তেজোময়, উত্তাপময় প্রাথমিক অভিব্যক্তি, তোমাকে নমস্কার। হে ভারতরবি শ্রীবুদ্ধের শুভ জন্মমাস, সাধনে সিদ্ধির পুণ্যমাস ও মহাপ্রয়াণের চিহ্নিত মাস, তোমাকে নমস্কার। হে নব বৈশাখের প্রথম দিন ১লা বৈশাখ, ভক্ত ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্রের আচার্য্যপদে বরিত হইবার শুভপুণ্যদিন, তোমাকে নমস্কার। হে ভারতের আর্য্যজাতির নব নব পুণ্যব্রতগ্রহণের মাস, নব নব পুণ্য অনুষ্ঠানের মাস, দান ধ্যানের ও বিশেষ পূজা বন্দনার মাস, তোমাকে নমস্কার। হে প্রাকৃতিক নব নব তাণ্ডব নৃত্যের মাস, তোমাকে নমস্কার। হে বৈশাখ! তোমার অনেকগুণ, অনেক গৌরব; প্রাকৃতিক জগতে যেমন তোমার গুণগৌরব, আধ্যাত্মিক জগতে ততোধিক তোমার গুণগৌরব। তোমার প্রতি প্রভাতের প্রাথমিক সুবিমল সূর্য্যকিরণপাতে বাহ্যপ্রকৃতি, বৃক্ষ, লতা, পত্র, পল্লব, ফুল, ফল, নদ, নদী, পাহাড়, পর্ব্বত কি মনোহর শোভা ধারণ করে, কি অপরূপ সৌন্দর্য্য বিকাশ করে! নানা পাখীর দল আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে মিলিত কণ্ঠের উচ্চরবে আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া, তানলয়যুক্ত শ্রুতিমধুর রৌসন চৌকীর দিব্য অভিনয় করে; তাহাদের লাভের অভিলাষ নাই, সেবার মত্ততা আছে। তোমার প্রভাতের তরুণ বিমল কিরণ কত জড়পায় অলস, নিরুদ্যম প্রাণে কার্য্যতৎপরতার সঞ্চার করে, কত ঘুমন্ত জীবনে তীব্র তপস্যার উদ্বোধন করে। তোমার নব নব সুপ্রভাত কত তপস্যারত, ধ্যানমগ্ন সাধকজীবনে ব্রহ্মপ্রকাশের শুভ সুপ্রভাত খুলিয়া দেয়। বন, উপবন, নদ, নদী, পাহাড়, পর্ব্বত প্রভৃতি প্রকৃতির রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ ব্রহ্মান্বেষী সাধকের প্রাণে ব্রহ্মস্ফুরণের কতই সহায়তা করে। যে সাধক প্রাণের ঘরে বসিয়া, আরামের শয়ন-শয্যায় উপবেশন করিয়া যখন ব্রহ্মচিন্তা, ব্রহ্মস্মরণে নিমগ্ন হন, এই বৈশাখের বিমল প্রভাতে, এই বৈশাখের বিমল প্রভাতের প্রভাবে সে সাধকের অন্তরে যে ব্রহ্মস্ফুরণ লাভ হয়, যে গভীর ও জীবন্ত ব্রহ্মদর্শন সম্ভব হয়, যে ধ্যান ধারণা ও উচ্চ সমাধির অবস্থা উপস্থিত হয়, তাহার তুলনা কোথায়? আহা! গভীর, সুনির্ম্মল, সুপ্রভাতের সুপ্রভাবে সাধক-প্রাণে যে অতুলনীয়, অবর্ণনীয় নব নব ব্রহ্মদর্শন লাভ হয়, দিব্য ব্রহ্মস্পর্শ লাভ হয়, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, দিব্য ব্রহ্মানুভূতিতে আত্মিক জীবন সরল সুন্দর ও সবল হয়, স্বর্গের ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য সৌন্দর্য্যে বিভূষিত হয়, তাহার তুলনা কোথায়? প্রভাতের প্রভাবে, প্রভাতের দিব্য স্পর্শে এমন দেবদুর্ল্লভ ব্রহ্মলাভ! তাই প্রভাতের নাম বুঝি হইল ব্রহ্মমুহূর্ত্ত। হে প্রভাত! তুমি ধন্য, কেন না তুমি ব্রহ্মনামে চিহ্নিত হইলে চিরকালের জন্য। প্রত্যেক প্রভাতই ব্রহ্মস্মরণ-মননের অনুকূল সময়, প্রত্যেক প্রভাতই ব্রহ্মমুহূর্ত্ত। কিন্তু বৈশাখ যদি সকল মাসের মধ্যে 'পুণ্যমাস' নাম লাভ করিয়া থাকে, ঈশ্বরের পুণ্য স্বরূপের স্ফুরণ এই মাসে ঋষি-জীবনে যদি সমধিক সম্ভব হইয়া থাকে, তবে বৈশাখের প্রভাত সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মমুহূর্ত্ত নাম প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

অতএব বৈশাখের প্রভাতের জন্য, হে পুণ্য বৈশাখ! তোমাকে নমস্কার। হে বৈশাখ! তুমি স্মরণাতীত কাল হইতে পুণ্যনাম পাইয়াছ, বৎসরের অন্য কোন মাস পুণ্যনাম পায় নাই। বৎসরের অন্যান্য মাসগুলি অন্য লক্ষণে লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া অন্য নাম পাইয়াছে, কিন্তু তুমিই বিশেষ ভাবে স্বর্গের ভূষণ পুণ্য নামে চিহ্নিত হইয়াছ। যেখানে পুণ্য, সেখানেই ঈশ্বর, ঈশ্বর ভিন্ন পুণ্য কোথায়? ঈশ্বর সকল পুণ্যের পরম উৎস। বৈশাখ যদি পুণ্য বৈশাখ নাম পাইয়া থাকে, তবে ইহা সহজ সিদ্ধান্তের বিষয় হইল যে, বৈশাখে পুণ্যস্বরূপ ঈশ্বরের বিশেষ প্রকাশ অবশ্যই সম্ভব হইয়াছে। ঈশ্বর বিভিন্ন

স্বরূপের আধার। তিনি কোন বিশেষ অবস্থার ভিতর দিয়া সত্যস্বরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন, কোন অবস্থার ভিতর দিয়া জ্ঞানস্বরূপ রূপে, কোন অবস্থার ভিতর দিয়া অনন্তস্বরূপ রূপে প্রকাশিত হইয়া, তাঁহার বিশেষ বিশেষ প্রকাশের মহিমা মাহাত্ম্য জগতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বৈশাখ মাস রূপ অবস্থার যোগে তিনি পুণ্যস্বরূপে বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছেন। বৈশাখ মাস উত্তাপের মাস। পুণ্যের লক্ষণ উত্তাপ, পুণ্য উত্তাপময়। তাই বৈশাখের উত্তাপের যোগে ঈশ্বরের পুণ্য স্বরূপের উত্তাপ বিশেষরূপে প্রকাশিত; এবং তাই বৈশাখের উত্তাপ মধ্যে ঈশ্বরের পুণ্যস্বরূপের অনুভূতি বিশেষ ভাবে লাভ হইয়া থাকে। তাই বৈশাখের প্রাতঃসমীরণে প্রাণ সমধিক শুদ্ধ হয়, বৈশাখের সূর্যকিরণে প্রাণ সহজে পুণ্যের উত্তাপ লাভ করে। বৈশাখের সংস্পর্শে প্রার্থনা সহজে শুদ্ধ সাত্ত্বিক হয়। সকল মাসে সকল কালেই লোকে স্নান করে, প্রাতঃস্নানও করে; কিন্তু বৈশাখের নবীনস্রোতোধারাবক্ষঃশোভিত নদীজলে স্নান কত সাত্ত্বিক, কত পুণ্যপ্রদ! তাই বৈশাখে দান, ধ্যান, নব নব ভাবে পূজা বন্দনার অনুষ্ঠান। বসন্তকাল প্রকৃতিকে নবীন সাজে সজ্জিত করিয়া, বাহ্য প্রকৃতির জীবনে নূতন জীবন দান করে, মানবমনকে বাহ্যপ্রকৃতির দিকে আকর্ষণ করে। বসন্ত কাল নূতন প্রাকৃতিক সাজে সজ্জিত হইয়া স্রষ্টার জ্ঞান-কৌশল, রচনা-কৌশল ও প্রেম পুণ্যের জীবন্ত ছবি প্রকাশ করে বটে; কিন্তু সিদ্ধমন, শুদ্ধমন ভিন্ন কয়জন লোক সেই বসন্তের প্রকৃতির মধ্যে পরম জীবনের উৎস, সৌন্দর্য্যের উৎস, বসন্তের বসন্ত পরম বসন্তকে দর্শন করে, প্রত্যক্ষ করে? বসন্তকাল সর্ব্ব সাধারণকে উচ্চৈঃস্বরে বলে, তোমরা ভাল করিয়া পুণ্যতাপে উত্তপ্ত হও, ভাল করিয়া সাত্ত্বিক জীবনে শুদ্ধ হও; অন্যথা আমার সৌন্দর্য্যের মধ্যে স্রষ্টার দিব্য কারুকার্য্য ও আমার কমনীয়তার মধ্যে স্রষ্টার দিব্য কমনীয়তা এবং আমার মধ্যে তাঁহার উদ্ভাসিত রূপ-মাধুর্য্য দেখিতে পাইবে না। প্রস্তুতির জন্য পুণ্য সূর্য্যের দিব্য উত্তাপ গ্রহণ কর। তাই বসন্তের প্রকৃতি হইতে যেমন নব শাসন উপস্থিত হইল, নব জাগরণ লাভ হইল, সেই জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে পুণ্য বৈশাখের সমাগম হইল। পুণ্য বৈশাখ পুণ্যের সাজ, উত্তাপের সাজ, গূঢ় ভাবে শাসনের সাজ পরিধান করিয়া লোকালয়ে উপস্থিত। যাঁহারা সমধিক ধর্ম্মপ্রাণ, ধর্ম্মের জন্য, ঈশ্বরের জন্য, সাত্ত্বিক ভাবের জন্য ব্যাকুলাত্মা, তাঁহারা বৈশাখের স্বরূপ-লক্ষণের মধ্যে পুণ্যের লক্ষণ, সাত্ত্বিকতার লক্ষণ সহজে প্রত্যক্ষ করিয়া, সেই ভাবেই বৈশাখ মাসকে গ্রহণ করেন। আর যাহারা নিতান্ত বিষয়ী, বাহিরের সংসারই যাহাদের নিকট সর্ব্বস্ব, তাহারা বৈশাখের মধ্যে কোন পুণ্য লক্ষণ বা সাত্ত্বিকতার সুগন্ধ প্রত্যক্ষ করে না। তাহারা দেখে বৈশাখের প্রাকৃতিক নৃত্যের ভিতরে তাণ্ডব নৃত্য, তাহারা দেখে রৌদ্রের প্রচণ্ড উত্তাপের মধ্যে স্রষ্টার গূঢ় শাসন, তাহারা প্রচণ্ড ঝড়, ঝঞ্ঝাবাত, মেঘগর্জ্জন, বিদ্যুৎপাতের মধ্যে দেখে স্রষ্টার রুদ্রমুখ। তাহারা বৈশাখের প্রকাশের মধ্যে স্রষ্টার, পরমশাসনকর্ত্তার কেবল শাসন-দণ্ডই প্রত্যক্ষ করে, নানাভাবে গূঢ় শাসনেই শাসিত হয়। স্রষ্টার পালনের মধ্যে শাসন, শাসনের মধ্যে পালন।

হে পুণ্য বৈশাখ, তুমি কতবার আসিতেছ, কতবার যাইতেছ। ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা তোমাকে স্বর্গের আশীর্ব্বাদরূপে গ্রহণ করেন। ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা তোমার আগমনে সমধিক সাত্ত্বিক, পুণ্যবান্, ধ্যানশীল, সাধনশীল হন।

আমরা পুণ্যের কাঙ্গাল, সাত্ত্বিকতার কাঙ্গাল, ঈশ্বর-দর্শনের কাঙ্গাল, ঈশ্বরের ধ্যান ধারণার কাঙ্গাল। এবার তোমার শুভ আগমনে, আমরা তোমার প্রভাব ও স্পর্শের মধ্য দিয়া অধিক সাত্ত্বিক হইব, পুণ্যবান্ হইব, ঈশ্বরের নব নব দর্শন ও ধ্যান ধারণায় সমধিক উন্নত হইব, অনন্তের পথে সমধিক অগ্রসর হইব, এই আশায় তোমাকে আমরা সাধনপথের বন্ধুরূপে, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদরূপে গ্রহণ করিয়া, হে পুণ্য বৈশাখ, তোমাকে বারবার আদরে বরণ করি, হৃদয়ে ধারণ করি।

ধর্ম্মতত্ত্ব

প্রাতঃস্মরণমনন

নববিধানের সাধক সাধিকা মাত্রেই প্রাতরুত্থান করিবার পূর্ব্বে কিছু কিছু স্মরণ মনন করেন, ইহা প্রার্থনীয়। সকলে না হোক্, অনেকেই এ সাধন করিয়া থাকেন। নববিধান ঐক্যসাধনের বিধান; সকল সাধন ভজনে সমতানতা, সমপ্রাণতা, সমযোগসাধনই নববিধান-সাধন। সুতরাং উপাসনায় সময় যেমন আমরা সমস্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করি, সমবেত প্রার্থনা করি, কিম্বা নাম পাঠ

করি, এইরূপ যে যেখানেই থাকি, বা যখন যেখানে এক পরিবারে বা একত্রে কয়েকজন ভাই বোন মিলিত হই, তখন স্মরণ মননের ও একতা থাকিলে আধ্যাত্মিক সমযোগসাধনের সহায়তা হয়। শ্রীমৎ আচার্য্যদেব যে দিন দেহমুক্ত হইয়া মহাপ্রয়াণ করেন, সে দিন তাঁহার দেহ পরিবেষ্টন করিয়া প্রেরিত প্রচারকগণের সঙ্গে অন্যান্যেরাও সমস্বরে ব্রহ্মস্তোত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্ব কয়দিন হইতেই এই স্তোত্রপাঠ প্রাতঃস্মরণীয় বলিয়া, আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশে প্রেরিত প্রচারকগণ ও সাধকগণ দৈনন্দিন প্রাতঃস্মরণ করিয়া আসিতেছিলেন। এখনও প্রতি ৮ই জানুয়ারী সেই স্তোত্রপাঠ প্রাতঃস্মরণীয় সাধনরূপে অবলম্বিত হইয়া আসিতেছে। অতএব যদি, যে যেখানেই থাকি, যাঁরা যখন একত্র মিলি, সকলে এই ব্রহ্মস্তোত্রই প্রাতঃরুত্থান করিয়া পাঠ করি, তাহার পর যাঁহার যাহা স্মরণীয় মননীয় নিঃশব্দে সাধন করি, তাহা হইলে আমাদের ঐক্যবন্ধন সংসাধিত হইতে পারে।

আঁধার, না আলো ?

আমার চক্ষে যেদিন ছানি পড়িতে আরম্ভ হইল, আমি যাহাকেই দেখি, তাহারই মুখ কালিমামণ্ডিত দেখিতে আরম্ভ করিলাম। সুন্দর সুন্দরী ভাই বোনকেও বিবর্ণ দেখিতে পাইলাম। তাহাদের মুখশ্রী আর তেমন সুশ্রী দেখিতে পাই না। এমনি যখন আমার মনের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়, তখনই আমি যাঁহাকে দেখি, তাঁহার কালো দিকই দেখিতে পাই, ভাল দিক দেখিতে পাই না। এই রূপ ভাইবোনের দোষ ত্রুটি বিচার করিবার পূর্ব্বে, আমাদিগের আত্মবিচার করিয়া দেখা উচিত, আমি অন্যের সম্বন্ধে যাহা সিদ্ধান্ত করিতেছি, তাহা আমার দৃষ্টিহীনতাবশতঃ কি না? অন্ধকারেই আমরা ভূত দেখি, আলো জ্বালিয়া দেখিলেই অন্ধকারও আলো হইয়া যায়। তাই ব্রহ্মের চিন্ময় আলো দিয়া যদি ভাই বোনকে দেখি, তাঁহাদের ভেতর ব্রহ্মপুত্র ব্রহ্মকন্যাকেই দেখিতে পাই ; তাঁহাদের জড় ছায়া, আঁধার কায়া দেখিতে পাই না।

নববর্ষ

নববর্ষ আসিল। পুরাতন বর্ষ বিদায় লইল। বৃক্ষের পুরাতন পত্র ঝরিয়া পড়িল। নব পত্র উদ্গত হইল, নূতন ফুল ফুটিল, নূতন ফল ফলিল। নববর্ষাগমে এইরূপে আমাদের জীবনে যাহা কিছু শুষ্ক পত্রাদি একেবারে ঝড়িয়া পড়িয়া যাক ; নববর্ষাগমে এইরূপ আমাদের জীবন-তরুতে নবপল্লব উদ্গত হউক, নবজীবনের নূতন ফুল ফল ফুটিয়া ফলিয়া উঠুক।

নববিধান নববর্ষের বিধান। রাতারাতি যেমন পুরাতন বৎসরটা চলিয়া গেল, আর নূতন বৎসর আসিয়া উপস্থিত হইল, তেমনি যদি আমরা প্রকৃত নববিধান-বিশ্বাসী হই, আমাদের জীবনের পরিবর্ত্তন রাতারাতি বিধাতার কৃপায় হইবেই হইবে।

শ্রীমৎ আচার্য্যদেব বলিলেন, "যাহার স্ত্রী পুত্র পরিবার পুরাতন, যাহার কিছু পুরাতন, সে নববিধানবিশ্বাসী নয়।"

কাল যে আমি ছিলাম, আজও যদি সেই আমি থাকি, তবে আমি নববিধান মানিনা। মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তন নববিধানের বিধান। এই ছিল মাতাল, এই পরিবর্ত্তিত হইল জগাই মাধাই। এই ছিল নরহন্তা সল, এই হইল সাধুপল। ইহাই নববিধানের আশ্চর্য্য নিদর্শন। যারা অবিশ্বাসী, তারা এ পরিবর্ত্তন বিশ্বাস করিতে পারে না। তারা বলে, ওতো সেই ছুতোরের ছেলে, ও আবার কি করিয়া খ্রীষ্ট হইবে? তাই ইহুদীরা এখনো যিশু খ্রীষ্টকে রাজদ্রোহী ধর্ম্মদ্রোহী বলিয়া ক্রুশাহত করে, অগ্রাহ্য করে। ওতো শচীপিসির ছেলে নিমাই, আবার কি করে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ হবে, এই বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়া থাকে। নূতন বিধানে বিধাতা, প্রত্যেক মানুষ মুহূর্ত্ত মধ্যেই পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, ইহাই আশা এবং বিশ্বাস দিতেছেন। অতএব নববর্ষে এই বিশ্বাস লাভ করিয়া আমরা যেন নববিধানের উপযুক্ত হই।

এই নববর্ষদিনে শ্রীকেশবচন্দ্র আচার্য্যপদে অভিষেক লাভ করিয়া ব্রহ্মানন্দ হইলেন। শ্রীমতী জগন্মোহিনী দেবী সংসার, গৃহবাস, রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া, সীতার ন্যায় স্বামীর অনুগমনে বনবাসিনী হইয়া ব্রহ্মনন্দিনী হইলেন। আমরাও আজ তেমনি ব্রহ্মানন্দের অনুগমনে, সস্ত্রীক সপরিবারে সদলে প্রকৃত নববিধান-বাদিবাদিনী হই এবং নিত্য নব নব জীবনলাভে যেন নববিধান জীবনে সপ্রমাণ করিতে পারি। মা দয়া করিয়া আমাদিগকে এমন আশীর্ব্বাদ করুন।

গুড ফ্রাইডে

(জীবনের সফলতা ও বিফলতা)

এক এক জন লোক যে অতি দরিদ্র গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া জীবনে প্রচুর ধন সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়া থাকেন, এ কথা সত্য। এক এক জন সামান্য সৈনিক পুরুষ যে সাহস ও প্রতিভাবলে প্রধান সেনাপতির পদ লাভ করিয়া থাকেন, একথাও সত্য। এমন কি, এক এক জন লোক যে অতি হীন অবস্থা হইতে রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন, ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্তও দেখা যায়। সংসার এই সকল কীর্ত্তিমান লোকদিগের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আমাদিগকে বলে যে, প্রতিজ্ঞা ও অধ্যবসায়ের নিকটে সকল বিঘ্ন পরাজিত। তোমরাও উঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণের চেষ্টা কর, তোমরাও সংসারে নাম ও কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে সমর্থ হইবে।

এইরূপ উপদেশ ও উৎসাহবাক্য ভালই। এইরূপ উপদেশে অনেক দুর্ব্বল ও অবসন্নচিত্ত লোকের অন্তরে আশা ও উৎসাহ জাগ্রত হয়। তবে যাহাদের প্রকৃতির মধ্যে বড় হইবার শক্তি,

নিহিত থাকে এবং যাহারা সংসারের অবস্থাচক্রে শুভ সুযোগ লাভ করে, তাহারাই ঐ সকল কীর্ত্তিমান বিজয়ী বীরদিগের পদাঙ্ক অনুসরণে সমর্থ হয়। কিন্তু এরূপ লোকের সংখ্যা বড় কম। কোটী কোটী নরনারীর মধ্যে অতি অল্পলোকেরই সেরূপ শক্তি থাকে এবং জীবনে সেরূপ শুভসুযোগ আসে। অধিকাংশ লোককে অতি সামান্যভাবে দিনপাত করিয়াই সংসার হইতে বিদায় লইতে হয়। অধিকাংশ লোকের ভাগ্যে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিবার কোন সম্ভাবনা নাই। ঐ সকল কীর্ত্তিমান ও সৌভাগ্যশালী পুরুষদিগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা সাধারণ লোকদিগের পক্ষে অসম্ভব।

প্রথম জীবনে অনেক লোক বড় হইবে বলিয়া কত স্বপ্ন দেখে। বড় বড় কাজ করা, সংসারে নাম রাখিয়া যাওয়া, কীর্ত্তি রাখিয়া যাওয়া কত সহজ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ক্রমশঃ যতই বয়স হইতে থাকে, ততই স্বপ্ন সকল ভাঙ্গিয়া যাইতে থাকে। নিজেদের শক্তি সামর্থ্য যে কত তুচ্ছ, তাহা যাহারা বুঝিয়াছে এবং অবস্থার প্রতিকূলতায় যাহারা একান্ত হতাশ হইয়া পড়িয়াছে, আমরা তাহাদের কি এমন কোন দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারি, যে দৃষ্টান্ত দুঃখ কষ্ট দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনার মধ্যেই তাহাদিগকে বল দিবে? এমন কি কোন দৃষ্টান্ত আছে, যে দৃষ্টান্ত দুঃখ কষ্ট দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনাকেই তাহাদের চক্ষে মহিমান্বিত করিবে?

আছে এমন দৃষ্টান্ত। মহাত্মা যীশুর জীবনই এমন দৃষ্টান্ত। তিনি অতি দরিদ্র ছিলেন। ধন মান লাভ করিবার চেষ্টাও জীবনে কখন করেন নাই। পৃথিবীতে তাঁহার মাথা রাখিবার স্থান পর্য্যন্ত ছিল না। সংসারের দিক হইতে দেখিলে তাঁহার জীবন সৌভাগ্যের জীবন ছিল না। তাঁহাকে সাধারণ মানুষেরই মত পাপ প্রলোভনের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু তিনি প্রলোভনকে জয় করিয়াছিলেন। যাহার সহিত নীতি ও ধর্ম্মের কিছুমাত্র সংস্রব নাই, শাস্ত্রের এইরূপ বিধিনিষেধ পালনকে ও ক্রিয়া কর্ম্মের বাহ্যাড়ম্বরকেই তাঁহার স্বদেশবাসীরা ধর্ম্ম বলিয়া জানিত। যীশু তাহাদিগকে এই কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিয়া নির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম দান করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাহারা উহা গ্রহণ করিল না। তাঁহার শিষ্যগণও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যেই একজন সামান্য অর্থের লোভে তাঁহাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিল। রাজমুকুটের পরিবর্ত্তে উপহাসের সহিত তাঁহার মস্তকে কণ্টক মুকুট স্থাপিত হইল। য়িহুদী ধর্ম্মের পাণ্ডারা তাঁহাকে বাঁধিয়া নির্ম্মমভাবে কশাঘাত করিল, অবশেষে দস্যু তস্কর ও নরহত্যাকারীদের সঙ্গে তাঁহাকে ক্রুশে ঝুলাইয়া বধ করিল। সংসারের দিক হইতে দেখিলে যীশুর জীবন বিফলতার দৃষ্টান্ত।

কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে জীবনের সকল আশা ও সকল সাধ যখন চূর্ণ হইয়া যাইতেছে বলিয়া তিনি বুঝিলেন, এবং যাহার অপেক্ষা ভীষণতর যন্ত্রণাময় মৃত্যুদণ্ড মানুষ, বোধ হয়, আজ পর্য্যন্ত উদ্ভাবন করিতে পারে নাই, সেই ক্রুশের মৃত্যুদণ্ডকে যখন তিনি সম্মুখে দেখিলেন—মৃত্যুর পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে সেই ঘন বিষাদের মধ্যে তিনি শিষ্যদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, "আমি সংসারকে জয় করিয়াছি। আমার অন্তরের শান্তি আমি তোমাদের জন্য রাখিয়া যাইতেছি।"

সে শক্তি কি, যাহার বলে তিনি সংসারকে জিতিলেন? সে শান্তি কি, জীবনের বিফলতার মধ্যে যাহা তিনি লাভ করিলেন?

ধর্ম্ম যে সত্য, ভগবান যে সত্য, পাপী ও পতিত নরনারীর জন্য ভগবানের অপার করুণা যে সত্য—এই বিশ্বাসই যীশুর জীবনের সেই আশ্চর্য্য শক্তি। ঈশ্বরের অদৃশ্য হস্ত যে ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করিয়া আছে এবং সকল ঘটনার পশ্চাতে যে ঈশ্বরের ইচ্ছা সংসারকে মঙ্গলের দিকে পরিচালিত করিতেছে, এই বিশ্বাসেই তাঁহার অন্তরের শান্তি। যতই আমরা যীশুর ভাবের মধ্যে প্রবেশ করি, ততই আমরা বুঝি যে, জীবনের বাহ্যিক অবস্থা যেমনই হোক না কেন, ধৈর্য্যের সহিত, বিশ্বাসের সহিত, প্রেমের সহিত ভগবানের বিধানকে মস্তকে ধারণ করিয়াই তিনি সংসারকে জয় করিয়াছিলেন।

যে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন পুরুষ ছলে বলে কৌশলে অপরের সর্ব্বনাশ করিয়া সম্পদের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহার অপেক্ষা সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, যাঁহার সাংসারিক উন্নতির জন্য সকল চেষ্টা বিফল হইলেও যিনি সত্য ও ধর্ম্মের পথেই দণ্ডায়মান থাকেন। জীবনে যাঁহাকে দুঃখ কষ্ট কখনও স্পর্শ করে নাই, তাঁহার অপেক্ষা সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, দুঃখ কষ্ট যাঁহাকে কর্কশ, স্বার্থপর ও ঈর্ষ্যান্বিত করিতে পারে নাই, কিন্তু যিনি নিজের বেদনা ভুলিয়া অপরের রোগ শোক এবং দারিদ্র্যে সহানুভূতি দান করিতে সমর্থ। যে পরাক্রান্ত বীর পুরুষ বিপদের সময়ে বহুলোককে ঠেলিয়া ফেলিয়া নিজে নিরাপদ স্থান অধিকার করেন, তাঁহার অপেক্ষা তিনিই শ্রেষ্ঠ, যিনি দুর্ব্বলকে নিরাপদ স্থান ছাড়িয়া দিয়া অম্লানবদনে বিপদকেই আলিঙ্গন করেন।

অবশ্য বড় বড় আপদ বিপদ পরীক্ষা প্রলোভন সাধারণ লোকের জীবনে বড় আসে না। আমাদের দৈনিক জীবন ছোট খাট কাজ কর্ম্মের মধ্যে অতি সামান্য ভাবেই অতিবাহিত হয়। তথাপি আমাদের জীবনেও ত রোগ শোক লাঞ্ছনা উপহাস দারিদ্র্য—আমাদের জীবনেও ত এগুলি কম নয়। যাঁহারা এই সকল অশান্তি ও উদ্বেগের মধ্যে শুষ্ক ও কঠোর হইয়া না যান, কিন্তু আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশী ও দাসদাসীর প্রতি সুকোমল ব্যবহার করিতে পারেন, নিজে অবসন্ন ও পরিশ্রান্ত হইয়াও তাহাদের মঙ্গলসাধনে চেষ্টা করেন, এবং সর্ব্বোপরি যিনি নীরবে নির্জ্জনে উর্দ্ধনেত্রে ভগবানের দিকে চাহিয়া এবং তাঁহারই ইঙ্গিত লাভ করিয়া তাঁহারই পথে চলেন—সেই ব্যক্তিই জীবনদীর পারে যান, তিনিই সংসার সমুদ্রকে অতিক্রম করেন।

এইরূপে জীবন যাপন করা আমাদের কাহারও পক্ষেই

অসম্ভব নয়। ইহার জন্য অসাধারণ প্রতিভারও প্রয়োজন নাই, নানা শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যেরও প্রয়োজন নাই, অবস্থা চক্রের শুভ সংযোগেরও প্রয়োজন নাই।

সাধুতাই ধর্ম্ম, সাধুতাই স্বর্গ, সাধুতাই মুক্তি, সাধুতাই পরিত্রাণ। এ জগতে সাধুতারই জয়। সাংসারিক উন্নতি ও ধন সম্পদ ধর্ম্মের পুরস্কার নয়, সাংসারিক দুঃখ কষ্টও পাপের শাস্তি নয়। যে ব্যক্তি সাধু জীবন লাভ করিয়াছেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ঈশ্বরের চরণে পড়িয়া থাকেন, তিনি যাহা কিছু করিবার চেষ্টা করেন, সে সমস্ত বিফল হইলেও জয় তাঁহারই। তিনিই ভবনদী পার হইয়াছেন, তিনিই সংসারসমুদ্র অতিক্রম করিয়াছেন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

স্বর্গীয় শ্রীনাথ দত্ত

স্বর্গীয় শ্রীনাথ দত্ত আমার আপন জ্যেঠ্‌তুত ভাই। তিনি আমার জ্যেষ্ঠতাত ৺শিবপ্রসাদ দত্তের জ্যেষ্ঠপুত্র। আমরা একান্নবর্ত্তী পরিবারে জাত ও প্রতিপালিত হইয়াছিলাম। শিবপ্রসাদ দত্ত মহাশয় অতি ধার্ম্মিক ও সর্ব্বসম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। বাল্য ও যৌবনকালে তিনি আদর্শস্থানীয় ছিলেন। তাঁহার দৈনিক জীবন ধর্ম্মসাধন ও অচল নিয়মে নিয়ন্ত্রিত ছিল। শেষ রাত্রিতে তাঁহার উচ্চারিত পবিত্র মন্ত্র শুনিয়া আমাদের নিদ্রাভঙ্গ হইত। প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়ংকালে তিনি দীর্ঘকাল নির্জ্জনে সাধন করিতেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে জমীদারির খাতাপত্র লিখিতেন এবং প্রজাদিগের অভিযোগ শুনিতেন। বৈকালে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ২।১জন সঙ্গী লইয়া কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' পড়িতেন, এবং প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে বাড়ীর লোক এবং অভ্যাগতদিগের সঙ্গে সংকীর্ত্তন করিতেন। বিশেষ বিশেষ পর্ব্ব উপলক্ষে বাড়ীতে সমারোহের সহিত তাঁহার পরিচালনায় সংকীর্ত্তন হইত। তাহাতে তিনি ভাবে বিভোর হইতেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর উচ্চ ও মধুর ছিল। বিধানমুরলী শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মধুর ও ভাবপূর্ণ কীর্ত্তনশক্তি পিতামহ হইতে উত্তরাধিকারিত্বসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি।

পিতার ধর্ম্মজীবন-প্রভাবের মধ্যে বর্দ্ধিত ও প্রতিপালিত হইয়া, স্বর্গীয় শ্রীনাথ দত্ত অল্পবয়সেই ধর্ম্মানুরাগী হইয়া উঠেন। যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি বিদ্যাশিক্ষার্থ কলিকাতায় আসিয়া, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ও তাঁহার অনুবর্ত্তীদের প্রভাবাধীন হন। স্কুলের ছুটি উপলক্ষে তিনি যখন দেশে যাইতেন, তখন আমি তাঁহার নিকট ব্রাহ্মসমাজ ও কেশবচন্দ্রের কথা আগ্রহের সহিত শুনিতাম। ইহাতেই আমার ব্রাহ্মধর্ম্মে প্রথম দীক্ষা হইল। একবার তিনি ব্রহ্মবিদ্যালয়ের দু'খানা পরীক্ষার কাগজ আমাকে দেখাইলেন; তন্মধ্যে একখানা ইংরেজী ও অন্য খানা বাঙ্গালা ভাষায় মুদ্রিত। ইংরেজী কাগজখানার ব্রাহ্মধর্ম্মের দর্শন-সম্বন্ধীয় প্রশ্ন ছিল। তখন তাহা বুঝিবার শক্তি হয় নাই। কিন্তু ব্রাহ্ম ধর্ম্ম যে অন্যান্য বিষয়ের মত নিয়মিত শিক্ষার ও পরীক্ষা দিবার বিষয়, এই সত্য তখন হইতে হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল। পরবর্ত্তী সময়ে এই ধারণা জীবনকে বিশেষরূপে প্রভাবিত করে। বাঙ্গালা প্রশ্নের কাগজ খানার প্রথম প্রশ্ন ছিল—"তোমার জীবনের উদ্দেশ্য কি?" এই প্রশ্নের অর্থ জিজ্ঞাসা করাতে দাদা আমাকে বলিলেন, প্রত্যেক মানব-জীবনের সাধারণ উদ্দেশ্য ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হওয়া। কিন্তু এই সাধারণ উদ্দেশ্য ছাড়া, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বিশেষ বিশেষ কার্য্যসাধনের জন্য জন্ম গ্রহণ করে। সেই কার্য্য কি, তাহা দীর্ঘকালব্যাপী চিন্তা ও প্রার্থনা দ্বারা নির্ণয় করিতে হয়। এই উপদেশও আমার চিত্তে বদ্ধমূল হইয়া, পরবর্ত্তী জীবনকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করে।

১৮৭১ সালের শেষভাগে কলিকাতায় আসিয়া আমি সাক্ষাৎ ভাবে দাদার ও ব্রাহ্মসমাজের নেতাদের প্রভাবাধীন হইলাম। দেখিলাম, দাদা একটী উৎসাহী যুবকদলের অন্তর্ভুক্ত। সেই যুবকদলের নাম ছিল "শাখা-সঙ্গত"। স্বর্গীয় ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়, আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, রামকুমার বিদ্যারত্ন প্রভৃতি যুবকগণ উহার অন্যতম সভ্য ছিলেন। কিছুদিন পরে শ্রীযুক্ত (এখন ডাক্তার) পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায় সেই দলভুক্ত হন। ইঁহারা সমাজের সাপ্তাহিক উপাসনা, সঙ্গত, ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রভৃতি সমস্ত প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত রূপে যোগ দিতেন, সপ্তাহে একদিন ধর্ম্মালোচনার জন্য মিলিত হইতেন এবং সাধন বিষয়ে কতিপয় কঠোর নিয়ম স্থির করিয়া সেই সকল নিয়ম পালন করিতেন। এই "শাখা-সঙ্গতে" যোগ দিয়া আমি অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছিলাম। একদিন আমাদের মধ্যে এই কথা হইল যে, আমরা কেশবচন্দ্রের প্রভাব অনুভব করিতেছি বটে, কিন্তু সাক্ষাৎভাবে তাঁহার শিক্ষাধীন নই। এই স্থির হইল যে একদিন আমরা সকলে মিলিত হইয়া তাঁহার নিকট যাইব এবং তাঁহাকে অনুরোধ করিব যে, তিনি সাক্ষাৎ ভাবে আমাদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। "কলিকাতা স্কুল" যার নাম পরে হয় "এলবার্ট স্কুল", তাহা তখন বসিত মেডিকেল কলেজের দক্ষিণে নিমুখানসামার লেনে, যার নাম এখন হয়েছে হেডেন হস্‌পিটাল লেন। আমরা একদিন বৈকালে সেই স্কুল বাড়ীতে একত্র হইয়া, প্রথমে পরস্পরের প্রতি সাময়িক অন্যায় ব্যবহারের জন্য কাতরভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম এবং তৎপরে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উপাসনা ও কীর্ত্তন দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল করিয়া, কেশবচন্দ্রের সান্‌কিভাঙ্গাস্থিত বাড়ীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনি আমাদের প্রার্থনা শুনিয়া বলিলেন, "আমি সাক্ষাৎ ভাবে তোমাদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে পারি, কিন্তু তোমরা একটা বাসা করিয়া একত্র থাক, যাহাতে তোমাদের সকলকে আমি এককালে পাই। যাহারা

আপনকার অভিভাবকের অধীনে থাক, তাহারা সেই বাসায় থাকিতে না পারিলেও নির্দিষ্ট সময়ে আসিয়া সেখানে মিলিত হইবে।" কেশবচন্দ্র আমাদের শিক্ষার সাক্ষাৎ ভার গ্রহণ করাতে আমরা এতদূর আনন্দিত হইলাম যে, সেই রাত্রিতে ঘুমের ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া সমস্ত রাত্রি সংস্কৃত কলেজের বারাণ্ডায় উপাসনা ও কীর্ত্তন করিয়া রাত্রি কাটাইলাম। অনতিবিলম্বেই কেশবচন্দ্রের প্রস্তাবিত "ব্রাহ্মনিকেতন" স্থাপিত হইল। আমরা কিছুদিন কেশবচন্দ্রের সাক্ষাৎ শিক্ষার উপকারিতা পাইলাম। অবশেষে স্বর্গীয় প্রচারক অমৃতলাল বসু আমাদের স্থায়ী অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া আমাদের সঙ্গে বাস করেন এবং তাঁহার ঐকান্তিক স্নেহ ও জীবন্ত উপদেশের দ্বারা নিকেতনবাসী বহুসংখ্যক যুবকের প্রভূত উপকার সাধন করেন। দাদাও আমি ব্রাহ্মনিকেতনের পবিত্র সমীরণে বাস করিয়া অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছিলাম।

১৮৭১ সালে দাদা অন্যান্য বহুসংখ্যক যুবকের সঙ্গে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। আমাকেও তখন দীক্ষিত হইতে বলা হয়, কিন্তু আমার মন তখন নানা সন্দেহে আলোড়িত, সুতরাং দীক্ষার আগ্রহ সত্ত্বেও দীক্ষার্থীদিগের মধ্যে নিজ নাম দিলাম না, তাঁহাদের সঙ্গে বেদীর সম্মুখেও দাঁড়াইলাম না। দীক্ষার সময়ে মন্দিরের অন্য স্থানে একাকী দাঁড়াইয়া, দীক্ষিতদিগের প্রতি আচার্য্যের উপদেশের সমস্ত ভাব হৃদয়ের সহিত গ্রহণ করিলাম। ইহার পরে আমার বিশ্বাস অপেক্ষাকৃত সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও, আর কোন আচার্য্যের নিকট দীক্ষা-গ্রহণের আবশ্যকতা বোধ করি নাই।

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করাতে দাদার উপর আত্মীয়স্বজনের উৎপীড়ন হইতে লাগিল। একবার দেশে যাবার পর তাঁহারা তাঁহাকে বাড়ীতে আটক করিলেন এবং তাঁহার স্কুলে পড়া বন্ধ করিলেন। দাদা কলিকাতায় যাইবার সাধারণ পথে না যাইয়া, অন্য পথে হিংস্রজন্তুসঙ্কুল একটা পর্ব্বত পার হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। অধ্যয়নের ব্যাঘাত দেখিয়া তিনি ক্রমশঃ সাধারণ বিদ্যালয় ও মেডিকেল স্কুলের শিক্ষা পরিত্যাগপূর্ব্বক বাণিজ্য ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন এবং যথাসময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রণালী অনুসারে বরাহনগরনিবাসী চন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত বিবাহিত হইলেন।

ইহাতে আত্মীয়গণের বিরুদ্ধ ভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। ১৮৭৯ সালে জ্যেঠতাত মহাশয় কলিকাতায় আসিয়া পীড়িত ও মৃত্যু-শয্যাশায়ী হইলেন। অন্য আত্মীয়গণ এই অবসর লইয়া দাদাকে পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিতে ষড়যন্ত্র করিলেন। তাঁহারা জ্যেঠা মহাশয়ের নামে এই মর্ম্মে একটা দলীল লিখিলেন যে, তাঁহার পুত্রদের মধ্যে যদি কেহ তাঁহার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তবে তিনি তাঁহার সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিবেন না, এবং তাঁহার মধ্যম পুত্র তাঁহার নাবালক পুত্রদ্বয়ের অভিভাবক হইবেন। এই দলীল ব্যর্থ করিবার জন্য আমরা প্রথমে স্বর্গীয় ডাক্তার দুকড়ি ঘোষ এবং তৎপরে স্বর্গীয় ডাক্তার দুর্গাদাস গুপ্তকে দিয়া রোগীর অবস্থা পরীক্ষা করাইলাম। তাঁহারা উভয়ে বলিলেন যে, তাঁহার অবস্থা এমন যে, তাঁহার স্বাক্ষরিত কোন দলীল প্রমাণরূপে গণ্য হইতে পারে না। ডাক্তার গুপ্ত যেদিন তাঁহাকে দেখিলেন, সেদিনই দলীল স্বাক্ষরিত হইয়াছিল।

পরদিন প্রাতঃকালেই রোগীর মৃত্যু হইল। দলীল যে ব্যর্থ হইবে, তাহা ষড়যন্ত্রকারিগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। উহা বাহির হইলে দেখা গেল, উহা কম্পিত হস্তে অতি অস্পষ্ট ভাবে স্বাক্ষরিত। সম্ভবতঃ রোগী উহার মর্ম্ম জানিতেন না। তিনি উদারচেতা পুরুষ ছিলেন, ধর্ম্মমতের জন্য উৎপীড়নকে তিনি অন্যায় মনে করিতেন। তিনি বলিতেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুশাস্ত্র-সম্মত, তবে ব্রহ্মোপাসককেও কার্য্যে লোকাচার মানিয়া চলা উচিত।

দাদার জীবনে সাংসারিক অর্থে সম্পদ বিপদ, অনুকূল প্রতিকূল ঘটনা অনেক ঘটিয়াছে। সমুদায়ের মধ্যে তিনি সারাজীবন ধর্ম্মে বিশ্বাস ও অনুরাগ অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন। শেষ অবস্থাতেও তাঁহার নির্ভর টলে নাই, মনের প্রসন্নতা ম্লান হয় নাই। পরোপকার, বিশেষতঃ স্বাধীন ব্যবসায় শিক্ষা দিয়া মানুষকে জীবিকানির্ব্বাহে সাহায্য করা, তাঁহার জীবনব্যাপী ব্রত ছিল। মৃত্যুশয্যায়ও এই ব্রতের চিন্তা তিনি ছাড়েন নাই। আমি তাঁহার নিকট শিক্ষা, স্নেহ ও সাহায্যের জন্য চিরকৃতজ্ঞ। সেই কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপই এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিলাম।

শ্রীসীতানাথ দত্ত।

নববিধানে ধর্ম্মসমন্বয়*

"হে প্রেমস্বরূপ, অপার দয়া, ভাল হওয়া, ভাল করা পুরাতন হয়েছে; আপনার দলকে ভালবাসা পৃথিবীতে পুরাতন হয়েছে। তবে, নববিধানবাদী, এতে গৌরবের মুকুট আমি তোমার মস্তকে দিব না। ইহাই নূতন দেখিতেছি যে, পূর্ব্বদিকের প্রেম পশ্চিমে পাইবে। পূর্ব্বদিকের প্রেম পূর্ব্বদিক তো পাইবেই, পিতা। প্রেম তোমার নববিধান। সমস্ত পৃথিবীকে ভালবাসিতে পারা নববিধান। এইটী নূতন। নববিধানবাদীরা পৃথিবীতে দেখাইবেন যে, এমন প্রেমের দল কখনও হয় নাই। মত্ত হইলাম, নাচিলাম, গান করিলাম, দুবার পাঁচবার উৎসবে মাতিলাম, প্রেম করিলাম, ইহাতে হইবে না। সমস্ত পৃথিবীকে প্রেম করিতে হইবে। সাম্প্রদায়িক ভাব দূর কর। আর গালাগালির জন্য কুণ্ঠিত হওয়া হবে না। যার জন্য এসেছি,

* ৭ই মার্চ্চ, রবিবার, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনাকালে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ।

তা ভুলিয়া বাজে কাজ যেন না করি। সকল মহাপুরুষকে এক করা, সকল ধর্ম্মশাস্ত্র, সকল জাতি, সকল সম্প্রদায় এক করা, ইহা কবে হইবে? প্রেমের উৎসব কবে হইবে? আমাদের মধ্যে প্রেমের পরিবার আনিয়া দিতে পারিলে না? তুমি আমাদের ছোট ঠাকুর ঘরটিকে প্রেমের ঘর করিয়া দিতে পারিলে না? প্রেমের ঠাকুর, খুব মনে ভালবাসা এনে দাও। তোমার নববিধানের প্রেমে চারিদিকে লোক এক হবে। প্রেমে আমাদিগকে কাঁদাও। আমরা ছোট বিষয়ে আর কাঁদিব না, ভাবিব না। আমরা দুঃখ পাইব এই ভাবিয়া, পৃথিবী কেন ভাল হইল না, সম্প্রদায়-ভেদ কেন রহিল, এখনও কেন এত বিবাদ, এত অপ্রেম? দীনবন্ধু, তোমার প্রেমের পৃথিবী কোথায় রহিল? তোমার যে বড় সাধ, পৃথিবীর সব অপ্রেম কেটে যাবে, আর সকলে একপ্রাণ হয়ে, তোমায় ভালবাসিবে। তোমার রাজ্যে এমন বিরোধ কেন? তোমার মহাপুরুষেরা যে এক বৈকুণ্ঠবাসী, এক জাতি। কিন্তু এ কি বিপদ! হিন্দু মুসলমানে বৌদ্ধে এত বিরোধ কেন? ঠাকুর, সকলের মনে প্রেম সঞ্চার কর। পরস্পরের প্রতি ঘৃণা অপ্রেম চলে যাক। এমন সোণার মহাপুরুষেরা কেহ কাহাকেও মারিবেন না, তাঁদের দলের লোকেরা কেহ কাহাকেও মারিবেন না। এমন ধর্ম্মশাস্ত্র সব। কিছু বাদ যাবে না। শত্রুতা আর থাকিবে না। আমরা খুব ব্যাকুল হই, খুব কাঁদি, আর প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পূর্ণ মিলনের ব্যবস্থা করি। আমরা কটি ভাই সকল দেশের, সকল জাতির, সকল ধর্ম্মের মধ্যে মিলন স্থাপন করি। তব প্রেমের রাজ্য কি আশ্চর্য্য, যাহা আসিতেছে। এবার কারো কথা শুনিব না, কেবল ভালবাসিব, প্রেম সমস্ত জগতে বিস্তার করিব। ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা পৃথিবীতে শান্তিস্থাপনের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিবেন। হে কৃপাসিন্ধু, হে দয়াময়, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন জগতের কুশলের জন্য প্রাণ সমর্পণ করিয়া সকল সম্প্রদায়ের মিলন স্থাপন করিয়া কৃতার্থ হই।"

(কেশবচন্দ্রের "দৈনিক প্রার্থনা")

এই প্রার্থনা-পাঠের পর স্বতঃই এই প্রশ্ন মনে উঠে, এই নববিধান কি? যাহার দ্বারা অসাধ্য সাধন হইবে, তাহা কি? পৃথিবীর ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রাবলম্বী সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদ ও বিরোধ চলিয়া আসিতেছে। এই অমিল কিরূপে দূর হইবে? ধর্ম্মসকলের ভিতর সমন্বয় কি সম্ভবপর? সে সমন্বয়ের প্রকৃতি ও আকারই বা কিরূপ? নববিধান সমন্বয়ের সমাচার প্রচার করিয়াছেন। তাহার অর্থ কি পরিষ্কার হইয়াছে? নববিধান-প্রবর্ত্তক যিনি, তিনি ত অনেক রকমেই বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যা ও উক্তি সকল বহু পুস্তকের মধ্যে লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু আমরা এই সকল পুস্তকের স্থান বিশেষ যদি পড়ি, বা সমগ্র পুস্তক পড়িয়া নিজ বুদ্ধির দ্বারা বুঝিতে যাই, তাহা হইলে নববিধানের প্রকৃত অর্থ ধরিতে পারিব কি? না, পারা যায় না। কেবল মাত্র দিব্য আলোকের সাহায্যেই এই অপার্থিব ব্যাপার সম্যকরূপে দর্শন করিতে পারা যায়। কিন্তু, এই আলোক কেবল যে বিশিষ্ট কয়েকজন মাত্র লোকের ভিতর আসিয়াছিল বা আসিতে পারে, এ কথা নয়। যাঁহারা এই আলোকের সাহায্যে সত্য ধরিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন যে, সকল নরনারীই ব্রহ্মের সন্তান, সকলের মধ্যেই সেই দিব্যালোক প্রবেশ করিতে পারে। সুযোগ দিলে, হৃদয়-দ্বার খুলিয়া রাখিলে, অন্তরকে শুদ্ধ নির্ম্মল করিয়া রাখিলে, এই দিব্যালোক প্রাণ মধ্যে প্রবেশ করিয়া সকলই উদ্ভাসিত করিয়া দেয়। সেইজন্য এই আলোক লাভ করিয়াই, স্বর্গীয় ব্যাপার যে নববিধান, তাহাকে বুঝিতে হইবে। সকলের পক্ষেই ইহা সম্ভব এবং অবস্থা বিশেষে সহজলভ্য।

এই আলোকের মধ্য দিয়া নববিধান কিরূপে প্রকাশিত হইতেছে, তাহাই দর্শন করি।

বিশ্বমধ্যে যেখানে যাহা প্রকাশিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহা দর্শন করিলে প্রথমে এই সত্যই প্রতীয়মান হয় যে, বৈচিত্র্যের মধ্যে সামঞ্জস্য রহিয়াছে, বহুর মধ্যে এক প্রকাশবান হইতেছে। আকাশে কত গ্রহ তারা, পৃথিবীর বক্ষে পর্ব্বত নদী, বৃক্ষলতা, উর্ব্বরা অনুর্ব্বরা ভূমি, পশুপক্ষী, নরনারী বিরাজ করিতেছে। অলঙ্ঘ্য নিয়ম ও শাসনের মধ্যে পড়িয়া, সকলই আপন আপন স্থান গ্রহণ করিয়া, পরস্পরের সহিত অপূর্ব্ব মিলনে আবদ্ধ হইয়া, সংসারগতিতে অগ্রসর হইতেছে। Uniformity যাহা dead, তাহা নয়, কিন্তু unity in diversity, যাহা জীবন্ত, তাহাই বিশ্বের ধারা। কোটী কোটী নরনারী, আকারে গঠনে কত সাদৃশ্য, অথচ একটী কি ঠিক আর একটীর মত? কোন্ স্পর্শে এই এত সাদৃশ্যের মধ্যে ভিন্নতা, এত শ্রেণীর মধ্যে ব্যক্তিত্ব প্রস্ফুটিত হইয়াছে? অপর দিকে, এই বিচিত্রতার মধ্যে কি সাদৃশ্য, বহুর মধ্যে কি অপূর্ব্ব মিলন। ধন্য তিনি, যিনি এই সামঞ্জস্য ধরিতে পারিলেন, যাঁহার নিকটে এই বিশ্বরহস্য উদ্ঘাটিত হইয়া সেই নিত্য, বহুর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত একেরই মহিমার পরিচয় আনিয়া দিল।

বিশাল এই মানব-পরিবার। তাহার ইতিহাসই বা কত বড়। সেই ইতিহাসের মধ্যে তিন অধ্যায়—ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ। অতীত অধ্যায়ের মধ্যে কত পর্য্যায়ই না রচিত হইয়াছে। প্রতি ধর্ম্মের ঘটনাবলীর কতই না বিস্তৃত ক্ষেত্র। সেই ক্ষেত্রমধ্যে কতই না নায়কনায়িকা। সেই সকল নরনারীর জীবন-রঙ্গভূমিতে কতই না ঘটনা। সেই সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে যাইয়া মানুষ আপনাকে হারাইয়া বসে। কিন্তু সেই সকল ঘটনার মধ্যে কি কোন উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া আসিতেছে?

কত শাস্ত্রই না রচিত হইয়াছে, কত রকমের আচার ব্যবহারের চলন হইয়াছে, কত বিধি ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। বহির্দৃষ্টিতে দেখিলে ত মনে হয়, এক দেশের বা এক যুগের শাস্ত্রের সহিত বা বিধি নিয়মের সহিত অন্য দেশের বা যুগের শাস্ত্রের ও বিধি নিয়মের মিল নাই। আর, মানুষ সীমাবদ্ধ দৃষ্টি লইয়াই বিচরণ করে, অল্প বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়। সেই জন্য প্রত্যেকেই মনে করে, তাহার ধর্ম্ম ও শাস্ত্রই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জীবনের উন্নতির পথে সহায়তা দান করে, আর অন্যের যাহা কিছু সে সকলই নিকৃষ্ট ও অমঙ্গলকর। এই জন্যই একজন আর একজনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছে, নিজের যাহা কিছু আছে, তাহাই অন্যকে গ্রহণ করিতে বলিয়াছে, অন্যের যাহা আছে, তাহা অপসারিত করিয়া দিবার বা ধ্বংস করিয়া দিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে। কেবল যে নিজের আধিপত্য স্থাপন করিবার জন্যই এইরূপ করিয়াছে, তাহা নয়; কিন্তু পরের উপকার করিবার জন্যও ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, মঙ্গল করিতে যাইয়া অমঙ্গল করিয়া বসিয়াছে। ইহারই ফলে ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিবাদ আসিয়াছে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে অমিল ঘটিয়াছে, জগতে যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সেই ধর্ম্মের নামে কত রকমের অনাসৃষ্টির সৃজন করিয়াছে। আর, যে বিরোধের ভাব একবার আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহা দৃঢ়রূপে সমাজ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া একটা চিরন্তন ধারার অবতারণা করিয়া দিয়া বসিল।

কিন্তু, এই বিরোধ ত মানুষ চায় না। তাহার প্রাণমধ্যে শান্তির আকাঙ্ক্ষা অন্তর্নিহিত। একাকী সে পৃথিবীতে আগমন করিলেও বহুজনের মধ্যেই তাহার স্থান সে দর্শন করে। পরিবার ও সমাজ তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াই থাকে। জনমণ্ডলীর সহিত তাহার সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত। সে ত তাহা অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে পারে না। সেই জন্য অপর সকলের সহিত মিশিয়াই তাহাকে দিন কাটাইতে হইবে। বিসম্বাদের মধ্যে পড়িলে কি হইবে, তাহাকে মিলন খুঁজিয়া বাহির করিতেই হয়, তাহাই যে তাহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু বহু কারণে সে আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হয় না। বহু প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইয়া মিলনের ব্যাঘাত ঘটাইয়া দেয়। সে বুঝিয়াও বুঝিতে পারে না, ধরিয়াও হারাইয়া ফেলে। তবে, বাধা বিঘ্নের মধ্যেই তাহার জীবনের বিকাশের সম্ভাবনা নিহিত। চেষ্টার ভিতর দিয়াই তাহাকে বড় হইতে হইবে, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই তাহাকে গৌরবের উচ্চ পদবীতে আরোহণ করিতে হয়।

অন্য ক্ষেত্রে যে বিরোধ দেখা যায়, তাহা আলোচনা না করিয়া, কেবলমাত্র ধর্ম্মক্ষেত্রে যে বিসম্বাদ চলিয়া আসিতেছে, তাহারই বিষয়ে কিঞ্চিৎ অনুধাবন করা যাউক। বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে যে সদ্ভাবের অভাব লক্ষিত হইয়া আসিতেছে, সে বিষয়ে ত আর কোন সন্দেহ নাই। জীবনচরিতাখ্যায়িকার মধ্যে বা ইতিহাসের ভিতর কত স্থানেই না এই অমিলের কথা লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এই ধর্ম্মক্ষেত্রে যত ভিন্নতার জন্য কত অশান্তিরই সৃষ্টি হইয়াছে। অথচ, মানুষ ধর্ম্মের ভিতর দিয়াই শান্তি লাভ করিবে, এই আশাই পোষণ করে। সেইজন্য এই বিসদৃশ ভাব দূর করিবার জন্য মানুষের চিন্তা ও চেষ্টা নিয়োজিত হইয়াছে।

অতীতকালেও এই বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় মধ্যে বিরোধ দূর করিবার জন্য অনেক রকমেরই পরিকল্পনা করা হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ইহার চেষ্টা বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য। ধর্ম্মসমন্বয়ের পতাকা উত্তোলন করিয়া নববিধানই উচ্চৈঃস্বরে মিলনমন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। প্রশ্ন এই এখন, নববিধানে ধর্ম্মসমন্বয়ের অর্থ কি?

পূর্ব্বকালে হিন্দু সমাজের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতর অমিল ঘটিয়াছিল, হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের মধ্যে বিসম্বাদ উপস্থিত হইয়াছিল, খৃষ্টিয়ান ও ইসলামধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে যুদ্ধ চলিয়াছিল, খৃষ্টান জগতেও বিভিন্ন শাখা মধ্যে ঘোর অশান্তির ব্যাপার চলিয়াছিল। পরস্পর পরস্পরের সহিত বিবাদে নিযুক্ত থাকিয়া সমাজের, পৃথিবীর যথেষ্ট অপকার ঘটাইবার পর অন্ততঃ কখনও কখনও শুভবুদ্ধির উদ্রেক হইয়াছিল। বিবাদ মিটাইবার চেষ্টা হইয়াছিল। যে ভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়া মানুষ শান্তিস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিল, ইংরাজীতে তাহাকে toleration বলা হয়। এই পরমতসহিষ্ণুতা কিয়ৎ পরিমাণেও অন্ততঃ শুভফল আনয়ন করিয়াছিল। এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের মতকে ভাল বা ঠিক না বলিলেও, ভিন্ন বলিয়া তাহার সহিত বিবাদ করা ঠিক হয় না, ইহাই স্বীকৃত হইল। নববিধান এই পরমতসহিষ্ণুতাকে অস্বীকার করেন না, ইহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। প্রত্যেকজনকেই অপর জনকে স্বাধীনতা দিতে হইবে। যিনি যে মতই অবলম্বন করিয়া থাকুন না কেন, সহ্য করিতে হইবে, নিন্দাবাদ করিতে বিরত হইতে হইবে। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, ইহাই ত যথেষ্ট হইল। যিনি যাহা লইয়া আছেন, তিনি তাহা লইয়া থাকুন না কেন। কেহ কাহারও বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবেন না। তাহা হইলেই ত আর অশান্তি উঠিবে না, সকলেই মিলিত হইয়া বসবাস করিতে পারিবে। কিন্তু নববিধান tolerationকে যথেষ্ট মনে করেন না। এই পরমতসহিষ্ণুতার ভাব লইয়া আরও অগ্রসর হইতে হইবে, এই কথাই নববিধান বলিতেছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় যে, toleration পৃথিবীকে চিরদিনের জন্য শান্তি দিতে পারে নাই, সর্ব্বকালের জন্য মিলন সংগঠন করিয়া দিতে পারে নাই।

সেইজন্য কেহ কেহ এই tolerationএর পরও অন্যবিষয়ের অবতারণা করিলেন। তাঁহারা Eclecticismএর কথা বলিলেন। ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা বা প্রতিষ্ঠান হইতে কিছু কিছু

সংগ্রহ করিয়া একত্র সমাবেশপূর্ব্বক উপস্থাপিত করাকেই ইংরাজীতে eclecticism বলা হয়। ইহা পূর্ব্বকালে গ্রীকদের মধ্যে দেখা গিয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন দর্শনশাস্ত্রের মত বা বিজ্ঞানের নির্দ্দেশগুলির সমবায় করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। আবার খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যেও গ্রীকদিগের ঋষি প্লেটোর শিক্ষোপদেশের সহিত খৃষ্টিয়ান মতের মিল ঘটাইবার চেষ্টা হইয়াছিল। আর এই ভারতবর্ষেও এইরূপ মিলন সংগঠন করিবার চেষ্টা একাধিকবার হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে মহারাজাধিরাজ শ্রীহর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে এই মিলন ব্যাপার বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সে সময়ে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন এই তিন প্রধান সম্প্রদায় ভারত মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহাদিগের মধ্যে মতের অমিলত ছিলই, হয়ত বা কখনও কখনও এই অমিল ভীষণ আকার ধারণ করিয়া প্রকটবান হইত। বিশাল সাম্রাজ্যের সম্রাট শ্রীহর্ষবর্দ্ধন প্রজাদিগের প্রতি সহৃদয়তার পরিচয় জ্ঞাপন করিবার জন্য, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন আনিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। সকল ধর্ম্মের মধ্যেই সত্য আছে, এই ধারণা লইয়া সকলের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাবান হইয়াছিলেন। সাম্রাজ্য মধ্যে বিশেষতঃ কান্যকুব্জ সহরে যে বিশাল ধর্ম্মসভা তিনি আহ্বান করিয়াছিলেন, সে সভার কার্য্যপ্রণালীর অঙ্গরূপে তিনি বুদ্ধদেবের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন, হিন্দু দেবদেবীগণের প্রতি অঞ্জলি দান করিলেন। বৌদ্ধ শ্রমণ, ভিক্ষুক, ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য হিন্দুযাজক, সকলকেই তিনি প্রীত করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। ধনরত্ন বিতরণ করিলেন। কিন্তু ইতিহাস-পাঠে, আমরা জানিতে পারি, তাঁহার সেই সভার শেষ পর্য্যায়ে ভীষণ ঘটনা ঘটিয়াছিল। যে বিহার তিনি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহার বিপক্ষাবলম্বী ব্যক্তিগণ অগ্নিসংযোগ করিয়া ভস্মীভূত করিয়া দিয়াছিল। আর, এমন কি সেই পরম দয়ালু সম্রাটের জীবননাশেরও চেষ্টা হইয়াছিল। (ক্রমশঃ)

—•—

সংবাদ।

আশীর্ব্বাদ—কলিকাতার শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ সুশান্তকুমারের সহিত, টাঙ্গাইলের স্বর্গীয় শশিভূষণ তালুকদারের কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ীর শুভবিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া, ১লা বৈশাখ, শান্তিকুটীরে, ৮৪নং অপার সার্কুলার রোডে, আশীর্ব্বাদানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। ভগবান্ তাঁহার প্রিয় পুত্রকন্যাকে পবিত্র ব্রতের জন্য প্রস্তুত করিয়া লউন।

সেবা—গত ২৯শে মার্চ্চ, ভাই প্রিয়নাথ ঝাড়গ্রাম গিয়া, শ্রীমান্ বিধানভূষণ মল্লিকের গৃহে ও জনৈক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের রুগ্ন বন্ধুর গৃহে উপাসনাদি করেন। তত্রত্য বালিকাবিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগকে নীতিশিক্ষা দেন এবং স্থানীয় এস, ডি, ও, মুনসেফ প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারীদিগের সঙ্গে দেখা করিয়া ধর্ম্মপ্রসঙ্গাদি করেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির—ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলী সাধারণ সভায় শ্রীমান্ সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়কে স্বর্গীয় প্রিন্সিপাল রাজেন্দ্রনাথ সেনের স্থানে "প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ট্রাষ্টের" (শান্তিকুটীর) এবং নববিধান আশ্রম ট্রাষ্টের ট্রাষ্টীপদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ—ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের গত বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মজুমদার ইহার যুগ্ম সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। ইঁহারা নূতনভাবে শৃঙ্খলার সহিত কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন। দয়াময় শ্রীহরি তাঁহাদের পরিশ্রম সার্থক করুন।

মুঙ্গেরের সংবাদ—মুঙ্গের নববিধান ব্রহ্মমন্দিরের ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যপদে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ মনোনীত হইয়াছেন:—

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার বসু, শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ, শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র আইচ, শ্রীমতী মণিকা মহলানবিশ, শ্রীমতী নির্ভরপ্রিয়া ঘোষ, শ্রীযুক্ত শশিকুমার চাটার্জ্জি, ডাঃ সত্যানন্দ রায়, ডাঃ অনুকূলচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত তারাভূষণ বানার্জ্জি, দীননাথ শিক্ষাতীর্থের প্রধান শিক্ষক, শ্রীযুক্ত সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়—সম্পাদক, ভাই অখিলচন্দ্র রায় ও ডাঃ শশিভূষণ দাস গুপ্ত—সহঃ সম্পাদক।

আদ্যশ্রাদ্ধ—গত ২১শে চৈত্র, অমরাগড়ী বিধানকুটীরে, স্বর্গগত ভাই ফকিরদাস রায়ের সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া শশিমুখী দেবীর আদ্যশ্রাদ্ধ পুত্রকন্যাগণ কর্ত্তৃক যথারীতি সুগম্ভীরভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন, ভাই অক্ষয়কুমার লধ শ্লোকাদি অনুষ্ঠানের পাঠাংশ সম্পন্ন করেন এবং ভাই অখিলচন্দ্র রায় সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করিয়া প্রার্থনা করেন। পুত্র শ্রীমান্ সত্যানন্দ রায় প্রধান শোককারীর প্রার্থনা পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত দীননাথ সরকার সঙ্গীত করেন। উপাসনার পূর্ব্বে সমাধিমন্দিরে পতিদেবতার পার্শ্বে সতীর পবিত্র চিতাভস্ম রক্ষিত হয়। এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় অনেকে এবং কলিকাতা হইতে গিয়া বন্ধুবান্ধবগণ যোগদান করিয়া পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধার্পণ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে নিম্নলিখিত দান ঘোষণা করা হইয়াছে:—

কলিকাতা নববিধান প্রচারাশ্রম ৫৲, শান্তিকুটীরে সঙ্গীতসত্র ৫৲, স্থানীয় কয়েকটী প্রতিষ্ঠানে ২০৲, হাওড়া জেলার ফকিরদাস হাই স্কুলের সংস্রবে শশিমুখী বিজ্ঞানমন্দির-নির্ম্মাণার্থে ১০০০৲, অমরাগড়ী বালিকাবিদ্যালয়টীকে শশিমুখী গোলাপসুন্দরী বালিকাবিদ্যালয় নাম দিয়া উহার গৃহনির্ম্মাণার্থে ৫০০৲, দীন দরিদ্রের সেবার্থে ৫০৲ টাকা। এতদ্ব্যতীত শয্যা এক প্রস্থ, তোষক ৪টী, জলপাত্র, অন্নপাত্র ও বাটী ৪ সেট।

অন্ত বালীগঞ্জে কাঁকুলিয়া রোডে, "প্রিয়ভবনে", স্বর্গীয় হরগোপাল সরকারের কনিষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় হিরণগোপাল সরকারের আদ্যশ্রাদ্ধে অধ্যাপক খড়্গসিংহ ঘোষ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে নববিধান সমাজে ১০৲ ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ১০৲ টাকা দান ঘোষণা করা হইয়াছে।

বিধানজননী তাঁহার প্রিয় সন্তানদিগকে প্রেমবক্ষে স্থান দান করুন এবং শোকার্ত্ত পরিবারে ও আত্মজনগণের প্রাণে শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ২৬শে মার্চ্চ, দোলপূর্ণিমার দিনে, স্বর্গীয় ডাঃ উপেন্দ্রনাথ বসুর প্রথম সাম্বৎসরিক উপলক্ষে, জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রনাথ বসুর আবাসে ৩১ বেচু ডাক্তারের গলীতে, প্রাতে শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত এবং সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদয়াল রায় উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে সন্তানগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ২৲, ভবানীপুর সম্মিলন সমাজে ২০, নববিধান সমাজে ২৲, নববিধান প্রচার আশ্রমে ২৲ ও অনাথ আশ্রমে ২৲ দান করিয়াছেন।

গত ১০ই এপ্রিল, (২৭শে চৈত্র) ২৮নং লিটনরোডে, ডাক্তার সত্যেন্দ্রনাথ সেনের গৃহে, তাঁহাদের মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। পাটনা হইতে জ্যেষ্ঠ জামাতা শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসাদ মজুমদারের প্রেরিত প্রার্থনা উপাসনা মধ্যে পঠিত হয়।

গত ১২ই এপ্রিল (২৯শে চৈত্র), ঐ গৃহে, স্বর্গীয় অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে, প্রাতে ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ উপাসনা করেন এবং সন্ধ্যায় ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে ইন্‌ষ্টিটিউটের কর্তৃপক্ষীয়গণের উদ্যোগে স্মৃতিসভা হয়। রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রথম সঙ্গীতের পর ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ প্রার্থনা করিলে, আর একটী সঙ্গীত হইয়া সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চাটার্জি, শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত, ময়ূরভঞ্জের মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী, অধ্যাপক মন্মথনাথ বসু এবং সভাপতি প্রভৃতি দেবচরিত্র, আদর্শ অধ্যাপক, জনপ্রিয়, মধুর বক্তা, ধর্ম্মপ্রাণ বিনয়েন্দ্রনাথের নানা সদ্‌গুণাবলী উল্লেখ করিয়া স্বর্গীয় আত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলী দান করেন।

—:—

(প্রেরিত)

স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে লিখিত পত্র

শ্রীচরণকমলেষু—

প্রণামান্তে নিবেদন এই যে—আচার্য্যদেব, আমি আপনার নিকট যদিও অপরিচিত, তবুও আপনি আমার অপরিচিত নন, আমার হৃদয়-মন্দিরে যে সব মহাত্মাদের আসন পেতে রেখেছি, সেই সব মহাত্মাদের মধ্যে আপনিও একজন। পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ লোকের মত আমিও আপনাকে করি শ্রদ্ধা, আপনার বাণীকে করি বিশ্বাস।

আমি মূর্খ, তত্ত্বজ্ঞানহীন, আমার দৃষ্টি বাইরের পৃথিবীতেই নিবদ্ধ। আত্মদৃষ্টিতে আধ্যাত্মিকরাজ্য অবলোকন করবার মত নেই তপস্যা, আপনার মত মহামানবের চরণ ধরবারও নেই যোগ্য, একথা বিনয়ের নয়, মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করা গভীর সত্য।

তবু আজ আপনার নিকট থেকে কয়েকটী প্রশ্ন সমাধানের জন্য আপনার দ্বারে উপস্থিত। এ প্রশ্নগুলো সমাধান করে, আমার এই অভাবময় জীবনের একটা দিক পূর্ণ করতে কুণ্ঠিত না হলে, চিরদিন আপনার কৃতজ্ঞতা-পাশে থাকব বন্দী, নিজকে মনে করব ধন্য।

আমি ব্রহ্মানন্দের কয়েকটি পুস্তক পাঠ করেছি, ব্রহ্মানন্দকে শুধু একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি বা একজন বড় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বলে আমার প্রাণ পায় না তৃপ্তি, পায় না আনন্দ। আমার দৃষ্টিতে ব্রহ্মানন্দ, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দরসপানে মগ্ন একজন শ্রেষ্ঠ সাধক। আমি তাঁর সাধনার ধারাতে খুঁজে পেয়েছি, চির শান্তির পথের পাথেয়, তাঁর হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত বাণীতে দেখতে পেয়েছি, সর্ব্বধর্ম্মের সর্ব্বসত্যের সমন্বয়ের ইঙ্গিত। আমার বিশ্বাস, তিনি যে আলোকের দিয়েছেন সন্ধান, তা তাঁর প্রতিভায় হয়নি আবিষ্কৃত, হয়েছে ধর্ম্মজীবনের গভীর সাধনার মধ্যে প্রকাশিত। ব্রহ্মানন্দ নিজেও তাঁর জীবনবেদের এক স্থানে বলেছেন যে, "নিজ বুদ্ধিতে কখনও আমি সত্য লাভ করি নাই; বিবিধ শাস্ত্র মন্থন করিয়া এক একটি সিদ্ধান্ত করা আমার ব্যবসায় নয়; এ শিক্ষা আমার নয়। ঘোর অন্ধকার মধ্যে বিদ্যুৎ-প্রকাশ যেমন, তেমনই আমাতে সত্য প্রকাশ হয়।" সেই ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন সম্বন্ধে বিশ্বধর্ম্মসম্মিলনীর অভিভাষণে আপনি আপনার যে ধারণাকে করেছেন প্রকাশ, তা সহজ হৃদয়ে আমি গ্রহণ করতে হয়েছি অক্ষম। কারণ আপনার মতে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন কোন ধর্ম্মই করেন নি আস্বাদ, শুধু সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠাংশ সংগ্রহ করে তিনি নবধর্ম্ম করেছেন প্রবর্ত্তিত। আপনার এ ধারণার প্রত্যুত্তর আমার ভাষায় দেবার মত ধৃষ্টতা আমার নেই, ব্রহ্মানন্দের ভাষাতেই বলি, "This is not the sense in which the New Dispensation holds its Eclecticism. We mean not the *collection* of truth, but *unification* of truth. The New Dispensation believes in the unity of all truths. And this unity is not a philosophical *attempt*, but a spiritual fact." ব্রহ্মানন্দ যে নববিধানে Eclecticismএর এই নবরূপ দিয়েছেন, এটা কি অর্থহীন?

রামকৃষ্ণদেব সাধক ছিলেন, ভক্ত ছিলেন, তাঁকে এ হিসেবে যতটুকু শ্রদ্ধা জানাবার প্রয়োজন, ততটুকু জানাতে কোন দিনই কেউ কুণ্ঠিত হবেন না,—অবশ্য যাঁর মনুষ্যত্ব-বোধ আছে। তাই বলে তিনি যা ছিলেন না, সে কথাই তাঁর সম্বন্ধে প্রয়োগ করলে, কি তাঁর মহত্ব ম্লান হয় না? আমার বিশ্বাস, ব্রহ্মানন্দকে ধর্ম্ম

করে রামকৃষ্ণদেবের সম্বন্ধে বলাতে, রামকৃষ্ণদেবকেও করা হয়েছে খর্ব্ব; এই আমার সহজ বুদ্ধির সিদ্ধান্ত, দার্শনিকের দৃষ্টিতে বা থিওরিতে (theory)এর স্থান কোথায়, তা আমার অজ্ঞাত।

ব্রহ্মানন্দ সাধনবিহীন হয়ে একমাত্র প্রতিভার দ্বারাই কি ঘোষণা করে গিয়েছেন, সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের বাণী! পবিত্রাত্মার প্রেরণা কি তাঁর মধ্যে ছিল না? বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করে, চিন্তা করে, বুদ্ধির আশ্রয় লয়েই কি তিনি ধর্ম্ম সমন্বয় করতে হয়েছিলেন উৎসুক! যেমন ভাবে চেষ্টা করে ছিলেন সম্রাট আকবর! তিনি যে নববিধানকে বলেছেন, "It is the harmony of all scriptures and prophets and dispensations. It is not an isolated creed, but the science which binds and explains and harmonises all religions. It gives to history a meaning, to the action of Providence a consistency, to quarrelling churches a common bond, and to successive dispensations a continuity. It shows by marvellous synthesis how the different rainbow colours are one in the light of heaven. The New Dispensation is the sweet music of diverse instrument. It is the precious necklace in which are strung together the rubies and pearls of all ages and climes. It is the celestial court where around enthroned Divinity shine the lights of all heavenly saints and prophets. It is the wonderful solvent, which fuses all dispensations into a new chemical compound. It is the mighty absorbent, which absorbs all that is true and good and beautiful in the objective world. Before the flag of the New Dispensation bow ye nations, and proclaim the Fatherhood of God and the Brotherhood of man. In blessed eucharist let us eat and assimilate all the saints and prophets of the world. Thus shall we put on the new man, and each of us will say, 'The Lord Jesus is my will. Socrates my head, Chaitanya my heart, the Hindu Rishi my soul, and the philanthropic Howard my right hand'. And thus transformed we shall bear witness unto the New Gospel. Let many sided truth, incarnate in saints and prophets, come down from heaven and dwell in you, that you may have that blessed harmony of character in which is eternal life and salvation." এগুলো শুধু তাঁর মুখের কথাই ছিল না, এই ছিল তাঁর সারা জীবনের সাধনা। এ কেহই করতে পারবে না অস্বীকার,—যতদিন পর্য্যন্ত তাঁর পুস্তকগুলো পৃথিবীতে থাকবে জীবিত। তাঁর জন্মই হয়েছিল সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের বাণী ঘোষণা করবার জন্য; আজ ছাই দিয়ে আগুন ঢাকবার মত তাঁর সাধনার আলোককে ঢাকবার যতই প্রচেষ্টা করা হোক না কেন, তাতে কিছুই হবে না, একদিন এ মহা সত্যকে জগৎ স্বীকার করবেই করবে। দিন আগত।

"যত মত, তত পথ" বলে আজ যে গগনভেদী চীৎকার শুনা যাচ্ছে, তাতে কি মানুষে মানুষে ভ্রাতৃভাব স্থাপন হবে? যুগের পর যুগে ধর্ম্মের নামে মানুষ মানুষকে যে করেছে হত্যা, পৃথিবীর বুকে জ্বালিয়েছে হিংসার সর্ব্বগ্রাসী আগুন, রচনা করেছে সৃষ্টি-বিনাশী প্রলয়ের চিতা, মানুষকে মানুষ সহজভাবে ভাই বলে আলিঙ্গন করবার হারিয়েছে শক্তি, "যত মত, তত পথ" এর বাণীতে মানুষ যদি তার হৃদয়কে করে আচ্ছন্ন, তবে কি পৃথিবীর বুক থেকে সেই হিংসা বিরোধ হবে প্রশমিত? সংসারে যারা সকল রকম সংকীর্ণতা ও হীনতাকেই করে আছে জীবনের আদর্শ, যাদের ধর্ম্মজীবনের তীর্থ অপবিত্র স্থানে হীন কর্ম্মে যাদের শাস্ত্রের বচন অশ্লীল বাক্যে পরিপূর্ণ, সেই হীনপন্থীদিগের দৃষ্টি "যত মত, তত পথ" কি করে টেনে নেবে সত্যের আলোকে? পৃথিবীতে এমন কত যে বামমার্গীরূপ হীনপন্থী আছে, তা'কে জানে? আমার ধারণা, "যত মত, তত পথ" মানুষে মানুষে বিরোধের ভাবকেই করবে প্রবল; কারণ "যত মত, তত পথ" সকলকে একের পতাকাতলে আনতে অক্ষম।

"Fatherhood of God and Brotherhood of man." বা

"একজাতি এক ভগবান
এক দেশ এক মন প্রাণ"—

বোধ যেখানে কাণায় কাণায় বিচ্ছেদেরই সুর বাজে, সেখানে জাগা কি করে সম্ভব! আর এ বাণী যদি মানবজীবনে আজও হয় ব্যর্থ, তবে পৃথিবীতে শান্তি নামবে কোন পথে!

জীবনের অনেক দিক থেকে অভাব, এ অভাব পূর্ণ করবার ভার আপনাদের মত মহামানবদেরই হস্তে। অনুগ্রহ করে, আজ আপনার নিকটে যা নিবেদন করলেম, তাঁর একটি মীমাংসা করে বাধিত করবেন। এ পত্রের উত্তর পেলে শুধু আমিই হব না উপকৃত; যাঁরা আমারই মত ব্রহ্মানন্দকে করেন শ্রদ্ধা, তাঁরাও পাবেন তৃপ্তি, পাবেন আনন্দ, হবেন উপকৃত। কারণ সবাই চায় সত্যকে জানতে, এইখানেই মানবের মানবত্বের পরিপূর্ণ সার্থকতা। ইতি—

৮নং রামমোহন রায় রোড, কলিকাতা
২৯.৩.১৯৩৭।

বিনীত
সমরেন্দ্র দত্ত রায়

Edited on behalf of the Apostolic Durber New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭২ ভাগ। ৮ম সংখ্যা।
১৬ই বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪৪ সাল, ১৮৫৯ শক, ১০৭ ব্রাহ্মাব্দ
29th. April, 1937
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা

হে কালাতীত, বিশ্বনিয়ন্তা, নিত্য অপরিবর্ত্তনীয়রূপে চিরবিরাজমান থাকিয়া, দেশকালের নানা পরিবর্ত্তনকে নিয়মিত করিয়া, বিশ্বকে নব নব বেশে সজ্জিত করিতেছ। আমরা অবিরাম কালস্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছি; ইহার অর্থ এই যে, আমরা প্রতিমুহূর্ত্তে নিত্য নূতনত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছি কিনা, নিত্য নবজন্ম লাভ করিতেছি কিনা, তুমি তাহা দেখতে চাও। এক পুরাতন পুরুষ নিরঞ্জন তুমি; কিন্তু তুমি নিত্য নূতনরূপে আমাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করিতেছ। দিন যায়, ক্ষণ যায়, এক একটা বৎসর যায়, তাহার মধ্যে আমরা নিত্য নব জীবনের পথে অগ্রসর হইতেছি কিনা, তাহাই দেখিবার বিষয়। ভক্ত ব্রহ্মানন্দ জন্মদিনের প্রার্থনায় বলিলেন, "এক এক বৎসর যাইতেছে, কালের ঘণ্টা বাজিতেছে। কেউ বলে, বয়স বাড়িতেছে; কেউ বলে, বয়স কমিতেছে। তুমি বৃদ্ধিও মান না, হ্রাসও মান না। সাধুতার বৃদ্ধিই তুমি চাও। মৃত্যুর দিকে যাইতেছি কি না, আমরা ভাবিব না। স্বর্গের দিকে যাইতেছি কি না, তাহাই আমাদিগকে ভাবিতে দাও। জীবনের নৌকায় চড়িয়া অনন্তকালসমুদ্রের উপর দিয়া যাইতেছি। এক ঘাট ছাড়িয়া আর এক ঘাটে চলিলাম; বর্ষ হইতে বর্ষান্তরে, লোক হইতে লোকান্তরে, অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে চলিলাম; এক জন্ম শেষ হইল, আর এক জন্মে চলিলাম। আজ ভিন্ন বৎসর, ভিন্ন জন্ম, ভিন্ন জীবন। আশীর্ব্বাদ কর, আমরা এই জীবন থাকিতে থাকিতে এমন জীবন সঞ্চয় করি, যে জীবনের ক্ষয় নাই।" তুমি তোমার অপার করুণায় অক্ষয় অনন্ত জীবনের অধিকারী আমাদিগকে করিয়াছ। জড়রাজ্যে ভাঙ্গা গড়া, উত্থান পতন, সুখ দুঃখ, বিষাদ আনন্দ, জীবন মৃত্যু অনিবার্য্য; কিন্তু আত্মরাজ্যে নিত্য গঠন, নিত্য উন্নতি, নিত্য নবজীবন। তোমার বিচিত্ররূপের প্রকাশ দেখিবার জন্যই এখানে রেখেছ। সকল অবস্থার মধ্যে তোমার নব নব রূপ দেখিয়া, তোমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া, তোমার পদাশ্রয়ে মাথা রাখিয়া, আশা ও উৎসাহশীল অন্তরে সকল অবস্থাকে জয় করিয়া, নব নব আশীর্ব্বাদে হৃদয় মনকে পূর্ণ করিয়া, "সম্মুখেতে স্বর্গরাজ্য" এই লক্ষ্যের দিকে বিশ্বাসের উজ্জ্বল আলোকে চলিতে পারি, এই তোমার চরণে বিশেষ ভিক্ষা। পুরাতন জড়কে ধরিয়া আর যেন মৃত্যুর দিকে না যাই; নিত্য নূতন তোমাকে ধরিয়া নবজীবনের পথে, অনন্ত উন্নতির পথে অগ্রসর হই, আজ এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

কোন্ দিকে গতি

বৎসর আসে, বৎসর চলিয়া যায়; এই আসা ও যাওয়ার ভিতর দিয়া আমাদের জীবনের গতি। আমরা চলেছি কোথায়? "অনন্তের সাথে, অনন্তের পথে, চলেছি অনন্ত দেশে।" সীমার ভিতর থেকে অসীমের দিকে গতি। অনন্তকালই আমাদিগকে চলিতে হইবে। এ চলার পথ কখনও শেষ হইবে না। "অনন্তের টানে, অনন্তের পানে, ধায় প্রাণনদী বাধা নাহি মানে" এই হবে জীবনের অবস্থা। আছি আমরা জড়ের দেশে, যাব আমরা অনন্ত দেশে, এই যদি জীবনের নিয়তি হয়, তবে জীবনের পথটাকে অবাধ করিয়া নিতে না পারিলে, পদে পদে যে পদস্খলন হইবে, তাতে আর সন্দেহ কি?

জড়ের দেশে কত বাধা বিঘ্ন, কত উত্থান পতন, কত অবস্থার বিপর্য্যয়; নানা ঘাত প্রতিঘাতের ভিতরে জীবনের পথকে সুগম করিয়া রাখা বড়ই দুষ্কর। আমি যেতে চাই সম্মুখের দিকে, কে যেন আমাকে পেছন হইতে টেনে ধরিয়া রাখে। চলিতে চাইলেও চলিতে পারি না, দুর্ব্বল অবশ প্রাণ কত অবস্থায় বসিয়া পড়ে। এ হেন অবস্থায় আমাদের উপায় কি? বিধাতা আমাদিগকে এখানে এনেছেন, কিন্তু এখানে রাখিবেন না; এই দুর্গম সংসারমরু অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে যাইতেই হইবে। সংসারমরুতাপে দগ্ধবিদগ্ধ হইয়া মৃত্যুর অধীন হওয়া এ জীবনের লক্ষ্য নয়। লক্ষ্য অনন্ত জীবন, অনন্ত উন্নতি, অমৃত লোক।

মর দেশে আসিয়া অমৃতত্বলাভ জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও মহা সৌভাগ্য। অমৃতের সন্তান হইয়া এসেছি এলোকে, লীলাময়ের লীলা দেখতে দেখতে চলিয়া যাইব। কিছুই আমাদের ধরিয়া রাখিতে পারিবে না; এসেছি দেখিতে, দেখে চলে যাব। বিশ্বজগৎ অনন্তের লীলায় পূর্ণ; দেশকালে তাঁহার লীলা, অন্তরে বাহিরে তাঁহার লীলা, অণুপরমাণুতে তাঁহার লীলা। এই লীলার জন্যই জগতের সৃষ্টি, মানবাত্মার সৃষ্টি। তাঁহার সৃষ্টিলীলা দেখে কে? তিনি তো নিজে মুগ্ধ হয়েই আছেন। আর একজন মুগ্ধ হয়ে দেখবে ও তাঁর হবে, এই মনে করিয়াই, আপনার বক্ষ হইতে মানবসন্তানকে সৃজন করিলেন। মানব-সন্তান তাঁর ভাবের ভাবুক হবে, তাঁর অনুগত হবে, অনুদিন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থেকে তাঁর রূপমাধুরী দেখবে, তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করবে, এই তাঁর মনের সাধ।

জগতে আমরা যত ভাঙ্গা গড়া দেখি, যত উত্থান পতন দেখি, যত রোগ শোক তাপ, আপদ বিপদ, দুঃখ দারিদ্র্য, বিরহ বিচ্ছেদ দেখি, আবার যত সুখ সম্পদ, আরাম আরোগ্য, হর্ষ মিলনের মধুময় ভাব অনুভব করি, এই সকলের প্রকৃত তত্ত্ব কি? এই সব অনন্তলীলা-ময়ের লীলা নয় কি? সৃষ্টির অর্থই তাঁর লীলা, সৃষ্টির মধ্যে যাহা, সবই তাঁর লীলা। দেশ কালের মধ্যে তাঁর এই লীলাখেলা অবিরাম চলিয়াছে। আমরা অবিশ্বাসী হইয়া বলি, এটা সুখ, এটা দুঃখ, এটা জীবন, এটা মরণ, এটা বিচ্ছেদ, এটা মিলন, এইরূপে আমরা পরস্পর বিপরীত কত কিছু কল্পনা করি। কিন্তু ভক্তেরা বলেন, সুখ দুঃখ, জীবন মরণ কথার কথা; এসব তাঁর লীলা—তাঁর আনন্দ। লীলাকে ভক্তেরা আনন্দ বলেন। আনন্দ হইতে সৃজন, আনন্দে রক্ষণ, আনন্দেই গমন।

আমাদের জীবনের মাপকাঠি এই লীলা—আনন্দ—উন্নতি। জীবনের যে অংশ এই লীলাহীন, আনন্দবিহীন—উন্নতিবিহীন, তাহা জীবন নহে। বৎসরের পর বৎসর আসে, আর চলিয়া যায়; আমরা কি ভাবি, আমরা আছি কোথায়? আমরা কি জীবন যাপন করিতেছি, না, মৃত্যুর অন্ধকারে আছি? জীবনের অর্থই যদি আনন্দ হয়, উন্নতি হয়, তাঁর লীলা হয়, তবে এ জীবনে তার পরিচয় কি? বৎসর এল, কত তাঁর লীলা দেখাল, কত তাঁর পরিচয় দিয়ে গেল। যাবার সময় বলে গেল, ভগবানের পরিচয় এত দিয়ে গেলাম, ধরে রাখ, জীবনে পূরে রাখ। সুখ এল তাঁর পরিচয় নিয়ে, দুঃখ বিপদ এল তাঁর পরিচয় নিয়ে, জন্ম এল তাঁর পরিচয় নিয়ে, মৃত্যু এল তাঁর পরিচয় নিয়ে; এইরূপে নিত্য নূতন পরিচয়, নিত্য নূতন লীলা, নিত্য নূতন আশীর্ব্বাদ, নিত্য নূতন বিশ্বাস, নিত্য নূতন প্রেমভক্তি, নিত্য নূতন জীবন। জড়ের দেশে কত ভাঙ্গন, আর আত্মার দেশে নিত্য গঠন। এই নিত্য গঠন, নিত্য বৃদ্ধি, নিত্য উন্নতি জীবনের লক্ষণ ও পরিচয়।

এক একটী বৎসর যখন যায়, তখন ভাবি, বয়স বেড়ে চলিল, মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইল। কিন্তু স্বর্গরাজ্যের দিকে কতকটা অগ্রসর হইলাম, বিশ্বাস প্রেম ভক্তি কতকটা বাড়িল, ভগবানের পরিচয় কতকটা পেলাম, কতকটা তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হইল, এসব কথা ভাবি

কই? এই সব ভাবিনা বলিয়াই তো জীবনের এই দুরবস্থা। অনন্ত ভগবান এই নববর্ষে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন এ জীবন নিত্য নবীভূত হইয়া, তাঁহার লীলারসমাধুরী সম্ভোগ করিতে করিতে নব বলে বলীয়ান্ হইয়া, জীবনের সকল বাধা বিঘ্ন তাঁহার কৃপাবলে দলিয়া, সম্মুখের দিকে, অনন্ত উন্নতির দিকে, স্বর্গরাজ্যের দিকে প্রতিপদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতে পারি।

—•—

ধর্ম্মতত্ত্ব

প্রার্থনা

ছোট শিশু যাই জন্মিল, অমনি কাঁদিতে লাগিল। যদি কোন শিশু না কাঁদে, মা তাহাকে কাঁদাইতে শেখান। প্রার্থনাই ধর্ম্মশিশুর ক্রন্দন। ধর্ম্মজীবনের আরম্ভে জগন্মাতা শ্রীকেশবকে বলিলেন, "প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর।" শ্রীকেশবশিশুর ধর্ম্ম-জীবনের প্রথম শিক্ষা প্রার্থনা। অর্থাৎ সরল শিশুর মত মার কাছে ক্রন্দন। এই প্রার্থনা হইতেই তিনি যাহা কিছু পাইবার, সব পাইলেন; যাহা হইবার, তাহা হইলেন। এই জন্ম বলিলেন, "প্রার্থনা বিমল রাখিবে! যাহা কিছু পাইবার, সকলই তাহাতে পাইবে।" এই জন্ম প্রার্থনা সম্বন্ধে "প্রবঞ্চনা" ত্যাগ করিতে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন। প্রার্থনায় বহু ভাষা বা মুখের কথা বা পরকে উপদেশ দেবার জন্ম প্রার্থনা—মন একদিকে, কথা আর একদিকে—আত্মার অভাববিহীন প্রার্থনা প্রবঞ্চনা। চাহিবা মাত্র দিবার করারে মা প্রার্থনা করান। প্রার্থনার ফল বা আত্ম-প্রসাদ, যাহা হাতে হাতে না মেলে, সে প্রার্থনা প্রবঞ্চনা। তাই প্রার্থনা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

উপাসনা

উপাসনার যৌগিক অর্থ—"কাছে বসা"। জীবন্ত ঈশ্বরের সান্নিধ্য উপলব্ধি না করিয়া যে উপাসনা, সে উপাসনা প্রকৃত উপাসনা নয়। সম্মুখে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ না করিয়া যে তাঁহাকে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন বা আরাধনা করে, সে আপনাকে আপনি প্রবঞ্চনা করে। প্রবঞ্চনার উপাসনা নিষ্ফল বাক্যবিন্যাসমাত্র। মুক্ত আকাশতলে বা সমুদ্রের উপকূলে বসিবা মাত্র যেমন গায়ে বাতাস লাগে, অগ্নিকুণ্ডের নিকট বসিবা মাত্র যেমন অগ্নির উত্তাপ অনুভব হয়, তেমনি যদি উপাসনাকালে স্বরূপ-প্রভাবের উত্তাপ প্রাণে জীবনে উপলব্ধ না হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবে, জীবন্ত ঈশ্বরের কাছে বসা হয় নাই। শূন্য উপাসনাকে প্রবঞ্চনা জানিয়া ত্যাগ করিতে হইবে।

—•—

সাধুতাই ধর্ম্ম

সাধুতাই ধর্ম্ম, সাধুতাই মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ। সাধুতার দ্বারাই মানুষ ভগবানের সাদৃশ্য লাভ করে।

ভগবদ্ভক্তি, মানব-প্রেম এবং নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক চরিত্র—অর্থাৎ জীবনে ন্যায়, সত্য ও পবিত্রতার অনুসরণ—স্বর্গে এবং পৃথিবীতে ইহার অপেক্ষা উচ্চ ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। যিনি যে পরিমাণে এই ধর্ম্ম সাধন করিবেন, পৃথিবীতে থাকিতে থাকিতেই তিনি সেই পরিমাণে স্বর্গ সম্ভোগ করিবেন।

ধর্ম্মসম্বন্ধে কতকগুলি বুদ্ধিগত শুষ্ক মত ধর্ম্ম নহে, ক্রিয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠানও ধর্ম্ম নহে। ধন মান কিম্বা অন্য কোনরূপ সাংসারিক উন্নতিও ধর্ম্মের পুরস্কার নহে। নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক চরিত্রই ধর্ম্ম এবং এইরূপ চরিত্রই ধর্ম্মের একমাত্র পুরস্কার।

নানা প্রকার কুসংস্কার ও উপধর্ম্ম এই মহা সত্যকে আচ্ছন্ন করিয়াছে; কিন্তু যতদিন এই সত্যকে আমরা অন্তরে উপলব্ধি না করিব, ততদিন সমগ্র হৃদয় মনের সহিত আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছাপালনে যত্নবান হইব না।

বিবেক আমাদের অন্তরে ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রকাশ করে, এই ইচ্ছার অনুসরণের নামই যোগ। ঈশ্বরের ইচ্ছা-পালন অর্থাৎ তাঁহার বাধ্যতা ব্যতীত যোগের অন্য কোন অর্থ নাই।

ধর্ম্মবিশ্বাস বিবেককে সৃষ্টি করে না। যাঁহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস নাই, তাঁহাদেরও অন্তরে বিবেক বাস করে, তাঁহাদেরও ন্যায় অন্যায়ের জ্ঞান আছে। কিন্তু বিবেক যে ব্রহ্মবাণী, বিবেক যে ধর্ম্মরাজ ও পবিত্রস্বরূপ ঈশ্বরের আদেশ, এ কথা না মানিলে বলিতে হয় যে, ইহা মানুষেরই একটী প্রবৃত্তি বা সংস্কার মাত্র। ইহাতে বিবেকের গৌরব কত লঘু হইয়া যায়! মানুষের জীবনের উপরে ইহার প্রভাব কত ক্ষীণ হইয়া যায়! বিবেক অনুজ্ঞারূপী—সকল প্রকার পাপ ও মলিনতা পরিহার করিবার জন্য বিবেক আমাদিগকে অনুক্ষণ প্রভুর ন্যায় আদেশ করে। বিবেক যদি আমাদেরই অন্তরের একটী সংস্কার বা প্রবৃত্তি হইত, আমাদেরই মনের একটী কল্পনা বা খেয়াল হইত—তবে কি আমাদের উপরে তাহার অধিকার এমন প্রবল হইত, না তাহা আমাদের এমন দৃঢ়তার সহিত শাসন করিতে পারিত? এই কথা চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে, বিবেক আমাদের খেয়াল বা কল্পনা নহে, আমাদেরই অন্তরের একটী সংস্কার বা প্রবৃত্তি নহে, কিন্তু ইহা পবিত্রস্বরূপ জীবন্ত ঈশ্বরের অগ্নিময়ী বাণী—বিবেকের ভিতর দিয়া স্বয়ং ভগবান আমাদিগকে ধর্ম্মজীবনে অনুপ্রাণিত করেন। আমি যে বাঁচিয়া আছি, এ কথাও যেমন সত্য, আমি যে বিবেক বা ধর্ম্মবিধির অধীন, এ কথাও তেমনি সত্য। বুদ্ধির কথা যেমন সত্য, বিবেকের কথা তেমনি সত্য। দুই-এ দুই-এ চার হয়, কিম্বা একটী ত্রিভুজের তিনটী কোণ একত্রে দুই সমকোণের সঙ্গে সমান—ইহা পৃথিবীতে যেমন সত্য,

ধ্রুব নক্ষত্রে যদি বুদ্ধিমান্ প্রাণী থাকে, তাহারও কাছে ইহা তেমনি সত্য। ঠিক সেইরূপ প্রতিহিংসা অপেক্ষা যে ক্ষমা শ্রেষ্ঠ, ঘৃণা বিদ্বেষ অপেক্ষা যে প্রেম শ্রেষ্ঠ, কপটতা অপেক্ষা যে সরল ব্যবহার শ্রেষ্ঠ—তাহা শুধু পৃথিবীতেই সত্য নয়, কিন্তু ধ্রুব নক্ষত্রে যদি বিবেকসম্পন্ন জীব থাকে, তাহার নিকটেও এ কথা সমান সত্য।

যদি আমরা বিবেকের বাণীকে তুচ্ছ করিয়া আপনাদিগকে স্বেচ্ছাচারের স্রোতে ঢালিয়া দিই, তাহা হইলে আমরা নিজেই নিজেদের সর্ব্বনাশ করি। ইহাতে আমরা জীবনের শ্রেষ্ঠ কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হই, এবং লজ্জা, অশান্তি ও আত্ম-গ্লানিতে দগ্ধ হই। ধর্ম্মবিধির অনুসরণেই আমাদের জীবন পূর্ণতা লাভ করে, আমাদের প্রকৃতির মধ্য দিয়াই ভগবান আমাদিগকে সুখী করেন।

আমরা ধন সম্পত্তি উপার্জ্জন করিতেই ব্যস্ত থাকি। ধন-সম্পত্তি উপার্জ্জনকে আমরা যত প্রয়োজন বলিয়া মনে করি, জ্ঞানের অনুশীলন বা বিবেকের অনুসরণকে তত প্রয়োজন বলিয়া মনে করি না। কিন্তু বাহির হইতে যাহা আমরা সংগ্রহ করি, আমাদের সুখ শান্তি তাহার উপরে নির্ভর করে না; আমরা চেষ্টা করিয়া যে চরিত্র গঠন করি, তাহারই উপরে আমাদের সুখ শান্তি নির্ভর করে। আমাদের সুখ শান্তির মূলে বাহিরের কোন সামগ্রী নয়, কিন্তু আমাদের হৃদয়ের অবস্থা—আমাদের অন্তরের প্রেম ভক্তি ও পবিত্রতা।

আমরা পূজা করি চরিত্রের, আমরা ভক্তি করি সাধুতাকে। ঐশ্বর্য্য, প্রতাপ ও পদমর্য্যাদাকে আমরা ভক্তি করি না, আমরা বিদ্যাবুদ্ধিরও পূজা করি না। একজন লোক যদি স্বার্থপর, অহঙ্কারী ও ক্রূরপ্রকৃতি হয়, যদি মানুষের প্রতি তার বিশ্বাস ও সদ্ভাব না থাকে—তবে সে ব্যক্তি যতই ঐশ্বর্য্যশালী, উচ্চপদস্থ ও প্রতাপান্বিত হোক না কেন, আমরা তাহাকে ভক্তি করিতে পারি না। যদি তাহার বিনয়, ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা না থাকে, যদি সে ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারী, প্রবঞ্চক ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়, তবে তাহার বুদ্ধি যতই সূক্ষ্ম হোক না কেন, এবং নানা শাস্ত্রে তাহার পাণ্ডিত্য যতই গভীর হোক না কেন, আমরা তাহাকে ধিক্কার না দিয়া থাকিতে পারি না।

আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে পরলোক সম্বন্ধে অনেক প্রকার কল্পনা জল্পনা আছে। একটী কল্পনা এই যে, মৃত্যুর পরে আত্মা স্বর্গে গিয়া নানা প্রকার সুখসেব্য বস্তু সম্ভোগ করে। এইরূপে তিন পোয়া পুণ্য ক্ষয় হইলে, সেই আত্মা আবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে, এবং আবার পাপ পুণ্যের অনুষ্ঠান করে। এ কথা একেবারেই সত্য নহে। ইহার অপেক্ষা জঘন্য কুসংস্কার আর কিছুই নাই। যাগ যজ্ঞ করিলে যেরূপ পুণ্যসঞ্চয় হয়, স্বর্গে গিয়া বিলাস-সম্ভোগ তাহার পুরস্কার কি না জানি না, এবং সেই সকল বিলাস-সম্ভোগে সে পুণ্যের ক্ষয় হয় কিনা, তাহাও বলিতে পারি না; কিন্তু প্রেম, ভক্তি ও পবিত্রতা যদি ধর্ম্ম হয়, তবে তাহার পুরস্কার কোন ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বস্তু নয়। প্রেম, ভক্তি ও পবিত্রতার একমাত্র পুরস্কার আরও প্রেম, আরও ভক্তি এবং আরও পবিত্রতা—ইহাদের ক্ষয় নাই, কিন্তু অনন্ত জীবনে এইগুলির ক্রমাগত উন্নতি হইবে, এবং দিন দিন আমাদের আত্মাকে ভগবানের অভিমুখে অগ্রসর করিবে, আমাদের আত্মাকে তাঁহারই সাদৃশ্য দান করিবে।

প্রশ্ন হইতে পারে, এই বিশ্বাসেরই বা প্রমাণ কি?

ভগবান, পরলোক ও অনন্ত জীবন সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সত্যের ছায়া মাত্র। কিন্তু যাঁহারা বলেন যে, ঈশ্বর নাই, পরলোক মিথ্যা, অনন্ত জীবন স্বপ্নমাত্র—তাঁহাদের অপেক্ষা আমাদের ধারণা অনন্ত গুণে অধিক সত্য।

ভগবান আমাদের চিন্তা, কল্পনা, ভক্তি ও বিশ্বাসের উচ্চতম আদর্শ; এবং ধর্ম্মরাজ্যে যে আদর্শ যে পরিমাণে অধিক উচ্চ, সেই আদর্শ সেই পরিমাণে অধিক সত্য। যে কারণে আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না যে, মা কালী ছাগরক্তের লোভে ডাকাতীর সাহায্য করিবেন, বা মিথ্যা মোকর্দ্দমায় আমাকে জিতাইয়া দিবেন, সেই কারণেই আমরা একথাও বিশ্বাস করিতে পারি না যে, স্বর্গে ইন্দ্রিয়-সুখ সম্ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয়ে মানবাত্মা আবার পৃথিবীতে জন্মলাভ করিবে।

পৃথিবীতে আমাদের শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য প্রচুর পরিমাণে বায়ুরাশি সঞ্চিত রহিয়াছে, তাহা চেষ্টা দ্বারা অর্জ্জন করিতে হয় না—মনে হয়, স্বর্গের আনন্দ শান্তিও সেইরূপ নিশ্চেষ্টভাবে সম্ভোগ করিবার বস্তু নহে এবং সেইরূপ সহজলভ্যও নহে। পরলোকের জীবন নিশ্চয়ই কর্ম্মময় ও উদ্যমপূর্ণ, সে জীবন নিশ্চয়ই উদ্ভিদ্ জীবনের মত কর্ম্মহীন ও নিশ্চেষ্ট নহে। পরলোকে আমাদের জ্ঞানের নির্ম্মলতা, সত্য এবং ন্যায়ের প্রতি অনুরাগ, এবং মানবের প্রতি সদ্ভাব ও সহানুভূতি দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে। যে উন্নত জীবনের জন্য ভগবান মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন, বর্ত্তমান জীবনে কখন কখন জ্যোতির্ম্ময় শুভ মুহূর্ত্তে আমরা তাহার আভাস পাই; কিন্তু এই অবস্থা বিদ্যুৎপ্রকাশের মত ক্ষণিক—পর মুহূর্ত্তেই যে অন্ধকার, সেই অন্ধকার। পরলোকে এই অবস্থা ক্রমে আরও গভীর ও স্থায়ী হইবে। বর্ত্তমানে আমাদের চক্ষু এত মলিন যে, সৃষ্টির সৌন্দর্য্য আমরা ভাল করিয়া উপভোগ করিতে পারি না; কিন্তু পরলোকে আমাদের চক্ষুর মলিনতা ক্রমে দূর হইবে, ও তখন জগতের শোভা সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমরা বিহ্বল ও আত্ম-হারা হইব। এখনও আমরা অজস্রধারে ভগবানের করুণা সম্ভোগ করিতেছি বটে, তবে হৃদয়ের অসাড়তা বশতঃ তাহার জন্য উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা দিতে পারি না; কিন্তু পরলোকে হৃদয়ের এই অসাড়তা ক্রমে দূর হইবে ও আমাদের প্রতি তাঁহার করুণা স্মরণ করিয়া, তাঁহাকে উচ্ছ্বসিত ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা দান করিয়া আমরা কৃতার্থ হইব।

স্বর্গের আনন্দ চাও? স্বর্গীয় চরিত্র হোক, সে আনন্দ

আজই পাবে। ভগবানকে জান, তাঁর আদেশ পালন কর, তাঁকে হৃদয়ে স্থান দাও, তাঁর মধ্যে বাস কর—আজই অনন্ত জীবন আরম্ভ হইবে। স্বর্গ—প্রেম ও পবিত্রতার রাজ্য। এই পৃথিবীতেই মানুষকে ভালবাস, জীবনকে নির্ম্মল কর—এইখানেই স্বর্গের আরম্ভ অনুভব করিবে। যতখানি প্রেম, যতখানি পুণ্য,—ততখানি স্বর্গ। মানুষের নিকট হইতে তার পুরস্কার না পাইতে পার, কিন্তু ভগবান্ তোমাকে পুরস্কার দিবেন। পরেও দিবেন, চিরদিন দিবেন, অনন্তকাল ধরিয়া দিবেন—কিন্তু আজই দিবেন, এখনই দিবেন, এই মুহূর্ত্তেই দিবেন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

—•—

সংসারে ব্রহ্ম-সাধন

১। অপ্রিতম পরব্রহ্মকে লাভ কর।

যে অপ্রতিম পরব্রহ্মের উপাসনা গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আমাদের নিত্য অনুষ্ঠান আয়োজন হয়, হে অমৃতের পুত্রগণ! "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"—উত্থান কর, জাগ্রত হও এবং উৎকৃষ্ট আচার্য্যের সন্নিধানে গিয়া সেই পরব্রহ্মের জ্ঞানলাভ কর। ঋষিদিগের উচ্চারিত এই মহা জাগরণ মন্ত্রের দ্বারা অপ্রতিম পরমাত্মার পূজা করিবার জন্য আমি তারস্বরে সকলকে আহ্বান করিতেছি। যে নিত্য জাগ্রত মঙ্গল-বিধাতা নিয়তই আমাদের মঙ্গলবিধান করিতেছেন এবং আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার বিপদ আপদ হইতে নিয়তই রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাকে মাত্র বুদ্ধিতে জানিলে চলিবে না, তাঁহাকে অন্তরে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে হইবে। শ্রদ্ধা ভক্তির ভিতর দিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতে হইবে।

২। সংসারে ব্রহ্মসাধন সহজ পথ।

নানা ঘটনা-বিপর্য্যয়ে আমাদের দেশে এই একটা ভাব চলিয়া আসিতেছে যে, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে হইলে, তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে, সমস্ত সুখসম্পদ পরিত্যাগ করিতে হইবে, পিতা মাতা স্বামী স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রভৃতি আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া বনে জঙ্গলে ও গিরিগুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার ভিতর যে সত্য নাই, তাহা নহে; কিন্তু ইহা অপেক্ষা আর একটা বৃহত্তর সত্য আছে, যাহা সাধনা করিবার জন্য আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে বিশেষ উপদেশ লাভ করি। সেই বৃহত্তর সত্য এই যে যেমন দুঃখ বিপদের কশাঘাতের ভিতর দিয়া ভগবানকে জানিতে হইবে, সেইরূপ সুখ সম্পদের করুণারও ভিতর দিয়া তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে হইবে। অরণ্য পর্ব্বতের নীরবতার ভিতরেও যেমন তাঁহাকে আত্মা দ্বারা স্পর্শ করিবে, সেইরূপ গৃহ সংসারের সজন কোলাহল কলরবের ভিতরেও তাঁহারই করুণাময়ী মাতৃমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। সংসারধর্ম্ম বজায় রাখিয়া পরমাত্মার সহিত আত্মসমাধানের উপরেই ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম বিশেষ ঝোঁক দিয়া থাকেন। ভগবান যখন আমাদিগকে পিতামাতা ভাই ভগ্নী প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনে পরিবৃত গৃহ সংসার দিয়াছেন, তখন সেই গৃহ সংসারের ভিতরে থাকিয়াই তাঁহাকে লাভ করা যে তাঁহার অভিপ্রেত ও প্রকৃতিসিদ্ধ, তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন যে, ভগবান আমাদের নিশ্বাস প্রশ্বাস যেমন সহজ করিয়া দিয়াছেন, সেইরূপ গৃহ সংসারে থাকিয়া তাঁহাকে লাভ করাও প্রত্যেক মানবের অন্তরে সহজ সত্যরূপে নিহিত করিয়া দিয়াছেন। তাই এই সহজ সত্য ছাড়িয়া তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য শ্বাপদসঙ্কুল গহন অরণ্যে প্রবেশ করিবার অথবা অযথা তর্ক বিতর্কেরও গহন অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণের কোনই প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না।

৩। সীমাবদ্ধ হওয়াই দুঃখের কারণ।

ভগবানই একমাত্র পূর্ণস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ। আমরা তাঁহা হইতে বিনিঃসৃত এক একটা সীমাবদ্ধ বিস্ফুলিঙ্গ মাত্র। সুতরাং শরতের নির্ম্মল আকাশ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে বর্ষার প্রারম্ভে যেমন মসীবর্ণ ঘন মেঘজাল সুনীল আকাশকে আবৃত করিয়া ফেলে, সেইরূপ দুঃখ বিপদের ঘন মেঘজাল যে আমাদের অন্তরকে সময়ে সময়ে সমাচ্ছন্ন করিবে, পাপতাপের জ্বালা যন্ত্রণার অসহ্য উত্তাপে সময়ে সময়ে আমরা যে মুহ্যমান হইয়া পড়িব, তাহা কিছু মাত্র আশ্চর্য্য নহে। সীমাবদ্ধ হইবার কারণেই, আমরা পূর্ণ পুরুষ ভগবান নহি বলিয়াই, এইরূপ দুঃখ বিপদ পাপ তাপের মধ্যে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছি। একথা জিজ্ঞাসা করা বৃথা যে, আমরা কেন সীমাবদ্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলাম। এই প্রশ্নের উপর শতবিধ কূট তর্ক বিতর্ক উপস্থিত করিতে পারিলেও, উহার চরম সিদ্ধান্তে মানব কোন কালে উপস্থিত হইতে পারিবে না। একমাত্র ভগবানই এই প্রশ্নের শেষ পরিসমাপ্তি।

৪। মঙ্গলময় সর্ব্বদাই আমাদের নিকটে।

সংসারে দুঃখ বিপদ আছে বলিয়া মঙ্গলময় বিধাতার করুণার কথা ও মঙ্গলভাব ভুলিলে চলিবে না। মাতৃগর্ভে অবস্থান অবধি আমরণ যাঁহার করুণা প্রতিপদে উপভোগ করিবার অবসর পাই, যাঁহার মঙ্গল হস্তের লিখন প্রতি পত্রে, প্রতি পুষ্পে, বায়ুর প্রতি হিল্লোলে, স্রোতস্বতীর প্রতি জলবিন্দুতে দৃষ্ট হয়, সময়ে সময়ে দুঃখ বিপদের তাড়নায় বা পাপতাপের যন্ত্রণায় তাঁহার স্নেহময় মঙ্গলভাব ভুলিলে চলিবে না। প্রত্যক্ষ কর, সমস্ত দুঃখ বিপদের মধ্যে তিনি তোমার সম্মুখে পিতৃমূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান। তোমার দৃষ্টিকে অন্তরে ফিরাইয়া উপলব্ধি কর, সমস্ত পাপ তাপ জ্বালা যন্ত্রণার মধ্যে তিনি করুণাময়ী মাতৃমূর্ত্তিতে অবস্থিতি করিয়া তোমার মনে প্রাণে নিরন্ত শান্তিবারি সেচন করিতেছেন। ইহা স্থির জেনো যে, সেই পরমপিতামাতা পরমেশ্বর দুঃখ বিপদ পাপ

তাপ সমস্তই তোমার মঙ্গলসাধনেরই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। দুঃখ বিপদই বল, বা সুখ সম্পদই বল, এ সমস্তই তাঁহারই স্নেহের দানস্বরূপে গ্রহণ করিতে হইবে—কিছুই অবজ্ঞা উপেক্ষার বিষয় নহে। ইহা সুনিশ্চিত যে, এই বিশ্বজগৎ যাঁহার সৃষ্টি, তিনিই যখন তোমাকেও সৃষ্টি করিয়াছেন, এই অনুপম সুন্দর জগতে তোমার আসিবার মূল কারণ যখন তিনিই, তখন তিনি কখনই তোমার প্রকৃত বিনাশের কারণ হইতে পারেন না—তিনি তোমা হইতে দূরে থাকিতে পারেন না, মুহূর্ত্তেরও জন্য তিনি তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। সংসারের সকলেই যদি তোমাকে পরিত্যাগ করে, তথাপি তুমি তাঁহার অনিমেষ মঙ্গল দৃষ্টি হইতে মুহূর্ত্তেরও জন্য বিচ্যুত থাকিতে পারিবে না। অন্তরের নিভৃততম প্রদেশে গিয়া আলোচনা কর—দেখিবে যে, অতীতে কতবার বিপদ সাগরে ডুবিতে ডুবিতে বা পাপ তাপের দারুণ যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতে হইতে কাতর প্রাণে সেই বিপদকাণ্ডারী ও পাপনিসূদন ভগবানকে যখনই রক্ষা করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছ, তখনই তিনি তোমার বিপদজাল মুহূর্ত্তের মধ্যে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া এবং তোমার পাপদগ্ধ প্রাণে অমৃতময় শান্তিবারি সেচন করিয়া তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন। লক্ষকোটি যুগযুগান্তর ধরিয়া জগতের লক্ষকোটি জীব তাঁহারই আনন্দের কণামাত্র লাভ করিয়া আনন্দসাগরে অবগাহন করিয়াছে ও করিতেছে এবং তাঁহারই জ্ঞানের ও তেজের কণামাত্র লাভ করিয়া জগতের উন্নতি ও মঙ্গল-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে ও হইতেছে। ইহাই তো আমাদিগকে তাঁহার পিতৃভাব ও মাতৃভাব প্রত্যক্ষ করাইয়া দেয়। মাতৃগর্ভে অবস্থান কালে তিনি যেমন অন্নপান দিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, সেইরূপ ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি আজীবন তিনি আমাদিগকে তাঁহার অক্ষয় প্রেমের রক্ষাকবচে নিত্যই রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার মৃতসঞ্জীবনী প্রেমধারায় আমাদের দেহ, মন ও আত্মা দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছেন। তাঁহারই অমৃতরস পান করিয়া এবং তাঁহারই শক্তিতে শক্তিমান হইয়া, তাঁহারই ইচ্ছাতে আমরা আপনার উপর নির্ভর করিতে পারিলেও, তিনি কখনই আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না—করিতে পারেন না।

৫। সংশয় পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার উপাসনায় নিরত হও।

চক্ষের সম্মুখে সামান্য কুটাকাঠি আসিয়া আড়াল করিলে যেমন সমস্ত বিশ্বজগৎ অন্তরালে পড়িয়া যায়, সংসারের ছোট খাটো ক্ষণিক সুখ দুঃখকে মনের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া ঈশ্বরকে সেই প্রকার অন্তরালে ফেলিও না। সংসারের সকল কর্ম্মেই, জগতের প্রত্যেক ঘটনাতেই তাঁহার মঙ্গল হস্ত প্রত্যক্ষ কর, প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাকে প্রীতি কর, তাঁহার চরণে সমুদয় হৃদয়মন অর্পণ কর এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য ব্যপদেশে নিজের ও পরিবারের, দেশের ও জগতের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও মঙ্গলসাধক কার্য্যসমূহে আত্মনিয়োগ কর। ইহাই তাঁহার উপাসনা। তাঁহার উপাসনার জন্য বাহ্যাড়ম্বরের ঘনঘটার প্রয়োজন নাই, কোন প্রকার বাহিরের উপকরণের অপেক্ষা নাই। অন্তরের একান্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি এবং তাঁহার ইচ্ছার অনুসরণে শুভকর্ম্ম-সম্পাদনই তাঁহার উপাসনার শ্রেষ্ঠতম উপকরণ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই সত্যটী স্পষ্টতম ভাষায় সুব্যক্ত করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজমন্ত্ররূপে সন্নিবদ্ধ করিয়া আমাদিগকে উপহার দিয়াছেন—'তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব'—তাঁহাকে প্রীতি করিয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনই তাঁহার উপাসনা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পূর্ব্বে উপাসনার মূলতত্ত্ব এমন সংহত আকারে আর কেহ প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া জানি না।

৬। তাঁহার রাজ্যে অমঙ্গলের স্থান নাই—মৃত্যুও নাই।

তাঁহার রাজ্যে অমঙ্গলের স্থান নাই। সমস্ত অমঙ্গলের ভিতরেই তাঁহার মঙ্গলভাব অনুস্যূত হইয়া থাকে। প্রতি নিমেষের প্রতি ঘটনায়, গাছের প্রতি পাতায়, কুসুমের সুগন্ধে, আমাদের অন্তরের সদ্ভাবে এবং সর্ব্বাপেক্ষা আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবের সেই বিশ্বপতি ও বিশ্বনিয়ন্তা পরমপুরুষকে জানিবার অধিকারদানে তাঁহার মঙ্গলভাবের পরিচয় অবিনশ্বর অক্ষরে মুদ্রিত দেখা যায়। তাঁহার রাজ্যে মৃত্যু ও বিনাশ বলিয়া কোন কিছুই নাই। তিনি প্রাণস্বরূপ। তিনি সমস্ত প্রাণের মূলাধার। তাই আমরা কি বাহিরের প্রকৃতিরাজ্যে, কি আমাদের অন্তরের অধ্যাত্মরাজ্যে—কোথাও প্রকৃত মৃত্যু বা বিনাশ দেখিতে পাই না। বহিঃপ্রকৃতিতে যেমন মৃত্যু বা বিনাশের নামে পরিবর্ত্তনেরই চিরন্তন লীলাখেলা দেখিতে পাই, সেইরূপ আমাদের অন্তঃপ্রকৃতিতেও প্রতিপদে প্রতিমুহূর্ত্তে মৃত্যুর নামে পরিবর্ত্তনেরই বিচিত্রলীলার পরিচয় প্রাপ্ত হই। এই পরিবর্ত্তনসূত্রেই মানবজীবনের পশুত্ব ঘুচিয়া যায় এবং মানুষ আপনাকে দেবত্বের পদে উন্নীত করিতে সক্ষম হয়। জগতের ইতিহাস আমাদিগকে এই সত্যেরই সাক্ষ্য প্রদান করে।

৭। তাঁহাতে আত্মসমর্পণই রক্ষার উপায়।

ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যদি কখনও দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইতে থাকি, যদি কখনও অমঙ্গলকে ডাকিয়া আনি, যদি কখনও মৃত্যু বা বিনাশের অভিমুখে ধাবিত হই, তবে সেই দুঃখবিনাশন কলুষহরণ পরমেশ্বরের চরণে শরণ লইলেই আমরা নিশ্চয়ই রক্ষা পাইব—আমাদের সকল দুঃখতাপ জ্বালা যন্ত্রণা মুহূর্ত্তের মধ্যে অন্তর্হিত হইবে এবং আমাদের অন্তরে শান্তিসুধা শতধারে বর্ষিত হইবে। তাঁহার আদেশ-পালনেই আমাদের সুখ, আমাদের জীবন। তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধাচরণেই আমাদের দুঃখ, আমাদের মৃত্যু। তিনি আমাদের অন্তরে তাঁহার আদেশপালনের শুভবুদ্ধি নিয়তই

প্রেরণ করিতেছেন। সেই অনুশাসন অবহেলা করিবার ফলেই আমরা দুঃখ পাই এবং মঙ্গলময়ের প্রতি সংশয় পোষণ করিতে থাকি। এই সংশয় হৃদয় হইতে দূর করিয়া দাও। ভগবানের প্রতি একান্ত নির্ভরশীল হইয়া, তাঁহারই প্রেরিত শুভবুদ্ধি যে পথ প্রদর্শন করিবে, সেই পথ ধরিয়া চল—কঠোর আঘাতে তোমাকে জীর্ণশীর্ণ হইতে হইবে না, বিষদিগ্ধ বায়ুতে তোমাকে কঙ্কালসার হইতে হইবে না। যাঁহার জ্ঞানের, যাঁহার বলের কণামাত্র লাভ করিয়া সাধু সজ্জন সংসারের দুঃখ বিপদ দূরীকরণের আশ্চর্য্য বল ধারণ করেন, সকল জ্ঞানের ও সকল বলের উৎস সেই পরম পুরুষের চরণস্পর্শ লাভ করিলে তোমার দুঃখ বিপদ শোকতাপ সকলই বিদূরিত হইবে। সেই আত্মদা বলদা পরমেশ্বরের চরণ বন্দনা করিয়া জীবনকে ধন্য কর।

৮। প্রার্থনা।

হে মঙ্গলবিধাতা! আমাদের মস্তকে তোমার আশীর্ব্বাদ শতধারে বর্ষণ কর, যাহাতে আমরা আমাদের শরীর মন ও আত্মাকে বুদ্ধি ও বলে, জ্ঞানে ও ধর্ম্মে সমুন্নত করিতে পারি; যাহাতে আমরা অর্থে ও মানে, যশে ও কীর্ত্তিতে, জ্ঞানে ও ধর্ম্মে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নততম আসন অধিকার করিতে পারি। আমাদিগকে শক্তি সামর্থ্য দাও, যাহাতে আমরা অসহায়ের সহায় ও দুর্ব্বলের বল হইতে পারি; অনাথ ও আতুর যাহারা, তাহাদের অভাব সকল মোচন করিয়া তাহাদের দেহে বল ও মনে সুখ শান্তি বিধান করিতে পারি। বিপদ আপদ যখন আমাদিগকে ঘিরিয়া ফেলে, আমরা যখন রোগশোকের অন্ধকূপে নিমগ্ন হইয়া শক্তিহীন অবস্থায় নিপতিত হই, তখন, হে দুঃখবিনাশন ভগবান! তুমিই আমাদিগের বর্ম্মচর্ম্ম হইয়া আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করিও; আমাদের বিপদ আপদ, আমাদের রোগ শোক, আমাদের সর্ব্ববিধ জ্বালাযন্ত্রণা সমস্তই বিদূরিত করিয়া, আমাদের প্রাণে শান্তিবারি ঢালিয়া দিও। তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ কর নাই, জননীরূপে নিয়তই রক্ষা করিতেছ, ইহা অন্তরে বুঝিবার শক্তি ও বুদ্ধি আমাদিগকে প্রদান কর। আমরা যেন তোমাকে পরিত্যাগ না করি—তুমি আমাদের কর্ত্তৃক সর্ব্বদা অপরিত্যক্ত থাক। সুখ আসিলে তাহাও যেমন তোমার দান বলিয়া গ্রহণ করি, দুঃখ আসিলে তাহাও যেন তোমার দান বলিয়া নতমস্তকে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত না হই। দুঃখের ভারে আমরা যেন আপনাদিগকে চূর্ণবিচূর্ণ হইতে না দিই। তোমার প্রীতিসাধনের উদ্দেশ্যে আমরা যেন সর্ব্বদাই জনহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করি; স্বার্থের বশীভূত হইয়া কোন প্রকার অমঙ্গল চিন্তাকে অন্তরে যেন স্থান না দিই বা কোন প্রকার অমঙ্গল কার্য্যে যেন হস্তক্ষেপ না করি। আমাদের চিন্তা ও কার্য্যকে যেন সর্ব্বদাই বিমল ও পরিশুদ্ধ রাখি। প্রতিদিন প্রভাতে আমরা যেন আমাদের জীবন তোমার চরণে সমর্পণ করিয়া দিই এবং তোমার শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ মূর্ত্তি অন্তরে ধারণ করিয়া তোমারই প্রদর্শিত পথে বিচরণ করি। হে মঙ্গলময় পরমেশ্বর! আমাদের মস্তকে আশীর্ব্বাদ দাও, যাহাতে তোমার প্রতি আমাদের আস্থা দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে থাকে, তোমার প্রতি আমাদের সকল আশা ভরসা অবিচলিতভাবে রক্ষা করিতে পারি, এবং আমাদের ছোট বড় সকল কার্য্যে ও সকল অবস্থাতে তোমার সহিত আমাদের আত্মাকে একাত্মযোগে যুক্ত রাখিতে পারি। আমাদের এই প্রার্থনা সর্ব্বতোভাবে সফল কর। আমরা তোমাকে ভক্তিভরে প্রণিপাত করি।

শ্রীবাণী চট্টোপাধ্যায় (সঙ্গীত-ভারতী)।

প্রার্থনা

(১০ই এপ্রিল স্বর্গীয়া মঙ্গলা দেবীর ও ১২ই এপ্রিল স্বর্গীয় বিনয়েন্দ্রনাথের স্মৃতিতর্পণ উপলক্ষে)

ঠাকুর! বৎসরের পরে তোমার বিধানে এদিন আসিল। তোমার নববিধানে কি সবই নূতন হইয়া যায়? দেখিতেছি যে, আমাদের মাতা ও ভ্রাতা তোমারই বিধানে নিত্য নূতন হইতেছেন। কাশী বৃন্দাবন কখন পুরাতন হয় না। আমাদের এই মাতৃমিলন ও ভ্রাতৃমিলনের তীর্থে ক্রমশঃ সব নূতন হইয়া যাইতেছে। এই প্রয়াগ-তীর্থ কেবল দুইটী স্রোত আত্মার মিলনেই শেষ হইল না। হিমালয় হইতে আরও স্রোত আসিয়া পড়িল। তোমার নবীন বিধানে যে দুই মাতৃ-আত্মা বঙ্গের অনুগঙ্গভূমি কাঞ্চনপল্লীবাসী পরিবার হইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের দিনও এত অদূরবর্ত্তী স্রোতের মত মিলিত হইয়া পড়িল। তাহার পর তুমি কি দেখাইলে? দুইটী ভ্রাতৃ-আত্মা ও জামাতৃ-আত্মাও অদূর স্রোতের মত মাতৃ-স্রোতে মিলিয়া গিয়াছেন। তোমার বিধানে এইরূপ মিলনই বুঝি আরও উচ্চতর ও নবীনতর নববিধান। আমাদের নববিধান এখনও হয় নাই। ঐ মিলন ব্যতীত পূর্ণ হইবে না। ঠাকুর! তুমি ঐ নববিধান শিখাও। আমরা এখনও শিখি নাই, তাই আমাদের নিকট এখনও এত অপূর্ণ। পাখী কই উড়িল? পিঞ্জরের পাখী একলাই পড়ে থাকে। আকাশে উড়িলে তবে অনেক পাখীর সঙ্গে মিলে যায়। সে টুকু যে এখনও হয় নাই। তোমার নববিধানে নবশিশু বলিয়াছিলেন যে, "ছোট পাখী 'আমি' উড়িয়া গিয়াছে। কোথায় তাহা জানিনা না।" আমাদের "আমি" না উড়িলে যে নববিধানের মিলন হইবে না। আজ তুমি দেখাইতেছ যে, মাতৃ-আত্মা "ভবসুন্দরী" ও মাতৃ-আত্মা "মঙ্গলা" এবং ভ্রাতৃ-আত্মা "বিনয়" ও "রাজন" এবং জামাতৃ-আত্মা "বিনয়কুমার" সকলে প্রায় এক অব্যবহিত ও অদূর স্রোতের মত এক তীর্থে মিলিয়া গিয়াছেন। পঞ্চ স্রোত আসিয়া এক মহা সিন্ধুজলে মিশিয়া গিয়াছেন। আত্মার পঞ্জাব ভূমিতে পঞ্চ

স্রোত মিলিত। ঠাকুর! আজ এই তীর্থে আসিয়া এই নববিধান শিখি ও ইঁহাদের "বোধিক্রম" বেষ্টন করিয়া মুক্তি লাভ করি। নিরঞ্জনার নিরঞ্জন আসিয়াছেন। জীবনে এই তীর্থ পূর্ণ কর। তোমার নিকট আজ এই ভিক্ষা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

—•—

নববিধানে ধর্ম্মসমন্বয়*

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আবার পরে, ষষ্ঠ দশ শতাব্দীতে পরমপ্রতাপশালী, গৌরবান্বিত সম্রাট্ আকবরের সময়েও ঐরূপ eclectic ধর্ম্মপ্রচারের জন্য চেষ্টা হইয়াছিল। তাঁহার রাজ্যমধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাসম্প্রদায়ের মধ্যে মনোমালিন্য ও অশান্তি দর্শন করিয়া তাঁহার প্রাণ ব্যথিত হইয়াছিল। বিরোধ দূর করিয়া শান্তি স্থাপন করিবার জন্য তিনি উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন। বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন ও আলোচনা জটিল রাজকার্য্য আলোচনার মধ্যে সম্রাটের প্রাণ মন আকর্ষণ করিত। তিনি সেই আলোচনার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন, স্বয়ং বহু সময়ে সেই আলোচনায় যোগদান করিতেন। হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র সকল অনুবাদের জন্য তিনি পারসিক পণ্ডিতদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পরিশেষে সকলের গ্রহণ করিবার জন্য তিনি 'দিন ইলাহি' নামক এক নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। হিন্দু, জৈন, জোরোয়াস্তার, খৃষ্টিয়ান, সকল ধর্ম্মেরই প্রভাব সম্রাটের উপর পড়িয়াছিল। সকল ধর্ম্ম হইতেই সার সংকলন করিয়া সকলকে দিবার জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়াছিলেন। ইসলাম ধর্ম্মের প্রধান শিক্ষা, একেশ্বরবাদ ও মানবসমাজে ভ্রাতৃভাব, তিনি সমভাবেই ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু সে সবের সহিত অন্যান্য ধর্ম্মের প্রধান শিক্ষা ও অনুষ্ঠান মিলাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে ধর্ম্ম অতি অল্প কয়েকজন মাত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং তাঁহার মৃত্যুর সহিত ভারতবর্ষ হইতে তাহা লোপ পাইয়া গেল। প্রবল প্রতাপ ছিল যাঁর, বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন যিনি, প্রজাদিগের হিতার্থে যিনি আপনাকে বহু দিকে নিয়োজিত রাখিতে গিয়াছিলেন, এমন আকবর বাদশাহেরও এই ধর্ম্মপ্রচেষ্টা সফলতা লাভ করিতে পারিল না।

নববিধান কি এইরূপ একটা eclecticism? নববিধান এই eclecticismকে অস্বীকার করেন না। সার সত্য সংগ্রহের কথা তিনি বলিয়া থাকেন। পরমতসহিষ্ণু হইয়া চলিতে হইবে, এবং যেখানে যে সত্য পাওয়া যাইবে, তাহা গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা নববিধানের নির্দ্দেশ। কিন্তু এই বিধানকে একটী eclectic religion বলিয়া শেষ করা ঠিক হইবে না। ইহা eclectic হওয়া অপেক্ষা আরও কিছু হইবার প্রয়োজন আছে বলেন। নববিধানের সমালোচকগণ এই বিভিন্ন ধর্ম্ম হইতে সার সংগ্রহ করা ব্যাপারকে বিদ্রূপের সহিতই আলোচনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা নববিধানকে একটী ফুলের তোড়ার সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। কতকগুলি পুষ্প বৃক্ষ হইতে আহরণ করিয়া একত্রে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। দেখিতে সুন্দর বটে, কিন্তু স্থায়ী নহে, অল্পক্ষণ পরেই শুকাইয়া যাইবে, পুষ্পগুলি স্তবক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে, ঝরিয়া পড়িবে, সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, সকলই চলিয়া যাইবে। আবার কেহ কেহ বলেন যে, কতকগুলি ফল তুলিয়া লইয়া একটী শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডকে বৃক্ষস্বরূপ স্থাপন করিয়া তাহার উপর নিবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সকলই কৃত্রিম সজ্জা, শীঘ্রই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে, কিছুই স্থায়ী হইবে না।

কিন্তু নববিধান ত এইরূপ সাজান জিনিষ নয়। মানুষের দ্বারা সংগৃহীত পদার্থ নয়। নববিধান-প্রবর্ত্তক আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্র ত বহুবার পরিষ্কার করিয়া এ কথা বলিয়া গিয়াছেন, নববিধান তাঁহার হাতের গড়া জিনিষ নয়, তাঁহার কোন কৃতিত্বই নাই। ইহা ভগবানের প্রেরিত বিধান, ইহা তাঁহারই প্রচারিত সত্য। শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডের উপর নিবদ্ধ পুষ্পরাশি নয়, বা পুষ্পস্তবকও নয়। ইহা জীবন্ত পদার্থ, ইহা বাস্তব পদার্থ। ইহা নিত্য, চিরস্থায়ী সত্য। ইহার মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য ম্লান হইবার নয়। ইহা চিরদিনই উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। ধন্য তিনি, যিনি ইহা দর্শন করেন। ইহা উপলব্ধি করিবার জিনিষ, ইহা হৃদয়ে ধারণ করিয়া জীবনকে পুষ্ট ও পরিতৃপ্ত করিবার জিনিষ। ধন্য শ্রীকেশবচন্দ্র, তিনি ইহা দেখিলেন ও জগৎকে জানাইলেন। নিজ জীবনে উপলব্ধি করিয়া মহত্ত্ব ও গৌরবপ্রাপ্ত হইলেন, এবং সকলকে দেখিবার ও গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিয়া জীবনের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিলেন। আরও কেহ কেহ ইহা দেখিবার সুযোগ পাইলেন, কিন্তু ধরিয়াও যেন পূর্ণভাবে ধরিতে পারিলেন না। কিন্তু যাহা চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত, তাহা সকলের জন্যই প্রকাশিত, সকলেরই দর্শন করিবার সুযোগ আসিতেছে, সুযোগ ধরিতে পারিলেই জীবন ধন্য হয়।

এখন জিজ্ঞাসা এই, সে সত্য কি? নববিধানে ধর্ম্মসমন্বয়ের অর্থ কি? সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলিতে হয়, ইহা যৌগিক পদার্থ এবং এই যোগ বৈবিকভাবসম্পন্ন। ইংরাজীতে ইহাকে Organic Growth বলা চলে। উপমা দিতে হইলে, ইহা বলিতে পারা যায়, ইহা একটী প্রকাণ্ড মহামহীরুহস্বরূপ। সামান্য বীজ হইতে ইহা উদ্ভূত। সেই বীজ মধ্যেই সকলই নিহিত ছিল। সময়ে কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, ফুল, ফল, সকলই প্রকাশিত হইয়াছে। জীবন্ত ভাবেই সকলই গড়িয়া উঠিয়াছে।

---

* ৭ই মার্চ্চ, রবিবার, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনাকালে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেনের নিবেদনের সারাংশ।

ইহার শিকড় সকল দশদিকে প্রসারিত। কতদিক হইতেই ইহা রস গ্রহণ করিতেছে, জীবন ধারণ করিতেছে। কোথায় কোন রূপ যোগ বিচ্ছিন্ন হইলে, বৃক্ষের অঙ্গহানি হয়, সৌন্দর্য্য ম্লান হয়। ধর্ম্মও এইরূপ। কতদিকে ইহার মূল চলিয়া গিয়াছে, সব দিক হইতেই রস সংগ্রহ করিয়া পুষ্টিলাভ করিতেছে। বিধাতা যিনি এই বিধানকে প্রকাশ করিতেছেন, সেই প্রথম হইতেই তাঁহার মহান সংকল্পকে স্থির রাখিয়াছেন। যেখানে যাহা কিছু প্রকাশিত হইয়াছে, সে সবের মধ্যে নিগূঢ় সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন। বিশ্ব এক, পৃথিবী এক, ধর্ম্ম এক, সত্য এক, মানবপরিবারও এক, যেহেতু এই সবের বিধাতা এক। নববিধান সেজন্ম বলিলেন, উপরে একমেবাদ্বিতীয়ম্, পৃথিবীতেও একমেবা-দ্বিতীয়ম্; অর্থাৎ ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিরোধ নাই। সকল ধর্ম্মই সত্য, কেবল একথা নয়, সকল ধর্ম্ম লইয়া এক ধর্ম্ম মানুষের মঙ্গলের জন্ম পৃথিবীতে প্রকাশিত। সকল ধর্ম্মই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সকলে অচ্ছেদ্য মিলনে জড়িত হইয়া অপরূপ সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়া পৃথিবী মধ্যে দণ্ডায়মান। কোন একটীকে বাদ দিলে অঙ্গহানি হয়, সৌন্দর্য্য ম্লান হয়। ইহাই বিধাতার বিধান। বিজ্ঞান জানাইয়া দিতেছেন, সমস্ত পৃথিবী কিরূপে এক মহান্ সমষ্টি হইয়া রহিয়াছে। একই আকাশ পৃথিবী জুড়িয়া রহিয়াছে, একই বাতাস প্রবহমান হইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে, একই জলসত্তার নানা আকার ধারণ করিয়া পৃথিবীর মঙ্গল সাধন করিতেছে। সুদূর দক্ষিণ আফ্রিকা বা আমেরিকা হইতে বায়ু প্রধাবিত হইয়া, পথিমধ্যে বাষ্পরাশি সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসিয়া এই ভারতবর্ষের উপর জলধারা বর্ষণ করিতেছে, হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গকে তুষারমণ্ডিত করিতেছে। বিজ্ঞান-চর্চ্চার প্রসারের সহিত এই সকল বাহ্যজগতের সত্য মানুষ জ্ঞাত হইতেছে ও স্বীকার করিতেছে। তেমনই অধ্যাত্মরাজ্যেও ঐ মহান্ সত্য প্রকাশিত হইতেছে, মঙ্গলময় বিধাতার নবা-লোকে। তাঁহারই ইচ্ছা, ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের উপযোগী করিয়া যে সকল ধর্ম্মবিধান প্রেরিত হইয়াছে, সে সকলের মধ্যে গূঢ় সম্বন্ধ রক্ষা করা। সকল বিধানই একই বিধাতার দ্বারা নির্দ্দিষ্ট, কেবলমাত্র স্থান বিশেষের মঙ্গল করিবার জন্ম নয়, কিন্তু সমস্ত জগতের মঙ্গলের জন্মই প্রেরিত। ভারতবর্ষে হিন্দু বিধানের সহিত ইহুদী ও খৃষ্টিয়ান বিধান ও ইসলাম বিধানেরও অতি গূঢ় যোগ। এক অপরকে পুষ্টি বিধান করে ও সকলে মিলিত হইয়া পূর্ণ বিধানকে প্রকাশ করে; মানবমঙ্গলের জন্ম, মঙ্গলময় দেবতার ইহাই পরম করুণা।

বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীর সকল স্থানের মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান যেমন চলিয়া যাইতেছে, বাহ্যিক বিষয় লইয়া সকল ভাগই এক যোগসূত্রে আবদ্ধ হইতেছে, তেমনই অধ্যাত্মরাজ্যেও নর নারী এইরূপে আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া মহামিলনে একত্রিত হইবে। প্রতিব্যক্তিরই বিশেষত্ব আছে, তেমনই প্রতি ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের বিশেষত্ব থাকিবে। তথাপি, বাহ্যিক হিসাবে যেমন, আধ্যাত্মিক হিসাবেও তেমন পরস্পর পরস্পরের হইয়া, প্রেম-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ভ্রাতৃমণ্ডলী রচনা করিবে। বিজ্ঞানের সত্য চর্চ্চার দ্বারাই স্পষ্ট ও সহজ হইয়া ধরা পড়িতেছে। সেইরূপ, সাধনা ও তপস্যার ভিতর দিয়াই, ধর্ম্মে ধর্ম্মে কি যোগ আছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। সেইজন্য, নববিধানের সমন্বয় বাহিরের ব্যাপার নয়, সাজান ফুলের তোড়া নয়। কেবলমাত্র সত্যসংগ্রহের ব্যাপার নয়। ইহা জীবনের কথা। জীবন দিয়া, প্রেম-সাধনের ভিতর দিয়া, ভগবানের উপর নির্ভর ও বিশ্বাসের দ্বারাই, উপলব্ধি করিবার জিনিস। এই উপলব্ধি সকলের পক্ষেই সম্ভবপর। কেবলমাত্র নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর না করিয়া, কোনরূপ কূট তর্কের সাহায্য না লইয়া, সরল বিশ্বাস ও পবিত্র ভালবাসা লইয়া চলিতে পারিলে অসাধ্য সাধন হইবে। বর্ত্তমান যুগসমস্যা, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ, জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ, আর অন্য কোন্ উপায়ে দূর হইবে? জটিল সমস্যা, গভীর সাধনারও প্রয়োজন। একজন নিজের সাধনার ভিতর অপর জনের সাধনাকে প্রবিষ্ট করাইয়া লইতে পারিলে, জীবনের পুষ্টি ও বিকাশ লাভ হইবে। সেই বিকশিত জীবনে সকলের স্থান, কোন বিরোধ নাই, সকলেরই সহিত প্রেমের অচ্ছেদ্য মিলন, এবং সেই মিলনের ভিতরই স্বর্গের প্রতিষ্ঠা। একমেবাদ্বিতীয়ম্ মহান্ দেবতার মধ্যে এই বিশাল মানবপরিবারোদ্ভূত একমেবাদ্বিতীয়ম্ লইয়া আশ্রয় গ্রহণ করাই, মানবজীবনের সার্থকতা। আসুন, এই সমন্বয়ধর্ম্ম সাধন করিয়া আমরা আমাদের জীবনকে ধন্য করি।

—•—

জ্যেষ্ঠ শ্রীনাথ

ভক্ত শ্রীনাথ আর এ পৃথিবীতে নাই, তাঁহার বিবেক, বৈরাগ্য, বিশ্বাস ও প্রেম পুণ্যের বিস্তৃত জীবনী লিখিবার সাধ্য নাই; তাঁহার বিশ্বাসপূর্ণ জীবনের যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাতে আজ পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত বলিতেছি যে, নববিধানের উষাকালে যে আলোক প্রাপ্ত হইয়া নববিধানে প্রেরিতবর্গ, নববিশ্বাসের নবীনক্ষেত্রে হলাকর্ষণের জন্ম, শ্রীনববিধানাচার্য্য ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন, সেই আলোক ও সেই প্রেরণায় প্রণোদিত হইয়া ভক্ত শ্রীনাথ তাঁহাদের সমসাময়িকরূপে, বিশ্বাস, উদাম ও উৎসাহের প্রেরিতত্বে আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন. আমি দেখিয়াছি, তিনি উৎসাহপূর্ণ যুবক জীবন হইতে শিশুর সরলতা, ভক্তের ভক্তি ও প্রেমিকের প্রেম লইয়া চিরদিনই চলিয়া আসিয়াছেন। ব্রহ্মমন্দির তাঁহার শান্তিকুটীর, উপাসনা তাঁহার অন্নপান। উদ্যম উৎসাহ তাঁহার জীবন এবং উপাসনার তন্ময়ত্ব তাঁহার জীবনের সমনা।

নববিধানবিশ্বাসী ভক্ত শ্রীনাথ শ্রীব্রহ্মানন্দের সহিত কুচবিহার বিবাহ ব্যাপারে পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি এই বাগদান ব্যাপারে নববিধান সম্বন্ধে যে নবভাব ও নববিশ্বাসের আলোক লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহার ইতিহাস অন্যূন চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার গোলদিঘীতে বসিয়া আমার কাছে উৎসাহের সহিত বিবৃত করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন যে, বাগদানের সংগ্রামক্ষেত্রে যে স্বর্গের দৃশ্য দেখিলাম, সে দৃশ্য প্রত্যাদিষ্ট ও বিধাতার আজ্ঞা-প্রাপ্ত আচার্য্যজীবন ও বিধাতার নববিধানকে আমার ভিতর আরও ফুটাইয়া তুলিয়াছে। ব্রহ্মানন্দ বসিয়াছেন ও তাঁহার পার্শ্বে ব্রহ্মানন্দকন্যা ও কুচবিহারের নবীন রাজকুমার এবং তাঁহাদের অনতিদূরে নববিধানের প্রেরিত-বর্গ এবং আমি উপবিষ্ট। রাজসাহীর তাৎকালীন কমিসনার মিঃ ডালটন এবং কলিকাতা হইতে আগত খ্রীষ্টীয় মহিলা মিস্ পিগট আমাদিগের মধ্যে বর্ত্তমান। এই সমবেত মণ্ডলীর ভিতর হইতে বিধাতার নিয়োজিত কন্যা সুনীতি দেবী ও নিয়োজিত বিশ্বাসী রাজকুমার নৃপেন্দ্রনারায়ণের জন্য সময়োচিত প্রার্থনা উত্থিত এবং সকলের সহাস্য মুখে পূর্ণ শান্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। সকলের সেই নীরবতা ও শান্তভাবের যে স্বর্গীয় জ্যোতি প্রভাত-কমলের মত ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সে উজ্জ্বল নববিধান আমি কোন দিন ভুলিতে পারিব না। তরঙ্গ-সঙ্কুল সাগরগর্ভে মূল্যবান মণিমুক্তা নিহিত থাকে। কাঁটার গাছেও গোলাপ ফুটে। ভক্ত শ্রীনাথের এই সাক্ষ্য ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হউক।

ভক্ত শ্রীনাথের মহাপ্রস্থানে ব্রহ্মমন্দির একটী পুরাতন স্তম্ভ হারাইলেন! নববিধানমণ্ডলীর একটী সুদৃঢ় অস্থি খসিয়া গেল। ভ্রাতৃমণ্ডলী এক পুরাতন বিশ্বাসী ভ্রাতাকে হারাইলেন! তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী ভক্তিমান স্বামী এবং তাঁহার পুত্র কন্যা মাতৃপ্রকৃতি পিতাকে হারাইলেন!

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

—•—

বালকবালিকাদিগের নীতিবিদ্যালয়ের উৎসবের আয় ও ব্যয়

(জানুয়ারী, ১৯৩৬)

আয় :—

লেঃ কর্ণেল মণি দাস ৮৫৲, মহারাণী সুচারু দেবী ২০৲, শ্রীযুক্ত শিশির গুপ্ত ২০৲, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সেন ১০৲, শ্রীমতী প্রভাতবালা সেন ৭৲, শ্রীমতী ইন্দিরা রায় ৫৲, মিসেস বসন্তকুমার হালদার ৫৲, শ্রীমতী মল্লিকা বীর ৫৲, শ্রীমতী ঊষা মুখোপাধ্যায় ৫৲, শ্রীমতী গীতা মল্লিক ৫৲, শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী সেন ৫৲, মিসেস জ্যোতিলাল সেন ৫৲, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সেন ৫৲, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন ৫, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকুমার দাস ৫৲, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন ৫৲, ডাঃ সত্যানন্দ রায় ৫৲, শ্রীমতী চিত্রা গুপ্ত ৪, শ্রীমতী সরস্বতী সেন ৩৲, শ্রীমতী মায়া বসু ৩৲, শ্রীমতী সুজাতা লাহিড়ী ৩৲, শ্রীমতী মণিকা গুপ্ত ৩৲, শ্রীমতী সুষমা গঙ্গোপাধ্যায় ৩৲, শ্রীমতী সরযূ ঘোষ ৩৲, ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ ৩৲, মিঃ ও মিসেস কমলনারায়ণ ৩৲, শ্রীমতী মীরা গুপ্ত ২৲, শ্রীমতী শৈলজা রায় ২৲, শ্রীমতী মালতী সেন ২৲, শ্রীমতী সরলা দেবী ২৲, শ্রীমতী আশা মজুমদার ২৲, শ্রীমতী বিভা মুখোপাধ্যায় ২৲, শ্রীমতী হেমন্তবালা চট্টোপাধ্যায় ২৲, শ্রীমতী স্নেহলতা রায় ২৲, শ্রীমতী বিধাননন্দিনী মজুমদার ২৲, ডাঃ প্রবোধচন্দ্র রায় ২৲, শ্রীযুক্ত হরিসুন্দর দাস ২৲, শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ গুপ্ত ২৲, শ্রীযুক্ত বিজনকুমার সেন ২৲, শ্রীযুক্ত সুব্রত সেন ২৲, শ্রীমতী সুমতি সেহানবীশ ১, মিসেস জে, এন, বসু ১৲, শ্রীমতী সরলা মিত্র ১৲, শ্রীমতী সাবিত্রী সরকার ১৲, শ্রীযুক্ত বি, সেন ১৲, শ্রীযুক্ত দীনেশরঞ্জন দাস ১৲, শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস ১৲, ডাঃ বিমলচন্দ্র দাস ১৲, নববিধান ট্রাষ্ট (প্রশান্ত খাস্তগীর পুরস্কার) ৫৲, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সেন ৩০৵৫। মোট ৩০১৸৵৫ টাকা।

ব্যয়

বালিকাদিগের পুরস্কারের বই, খেলানা প্রভৃতি	৭০৲
বালকদিগের ঐ	৭০৴১৫
বালকবালিকাদিগের জলযোগ	৯২৲
ডাক টিকিট, খাম ইত্যাদি	৭।৵৯
কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলের জন্য	৩০৲
ঐ হলের গ্যালারী সাজান	৮৲
ইনষ্টিটিউট ও মন্দিরের দরোয়ানদের বক্‌সিস	৸০
চেয়ার ভাড়া	১২৲
অর্গান ব্যবহারের জন্য	২॥০
গাড়ী ভাড়া, কুলি, ষ্টেজের দ্রব্য প্রভৃতি	৩৷৴১৫
মোট	৩০১৸৵৫

শ্রীশকুন্তলা দেবী
বালিকাদিগের নীতিবিদ্যালয়ের সম্পাদিকা।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেন
বালকদিগের নীতিবিদ্যালয়ের সম্পাদক।

FIRST OF VAISAKH

THE GOVERNOR'S MESSAGE

The publication of a Bengali New Year supplement comes at an appropriate time in this the first year of provincial autonomy for Bengal. I trust that 1344 B. S. will prove auspicious in the history of this Province and, though before the year ends the time will have come for me to demit my office, I count it a privilege to be called to serve for these remaining months as Governor under the new constitutional order. A house divided against itself cannot stand. May we not hope that, in the new era that is opening, those called upon from time to time to guide the destinies of Bengal will, by co-operation with one another and by mutual trust and goodwill, be able to build up a better, richer and healthier Province than we have known? It is in this hope and belief that I wish the people of Bengal a very Happy New Year and many happy years to follow.

JOHN ANDERSON

April 6, 1937. *Governor of Bengal.*

From India's Greatest Poet and Scholar
RABINDRANATH TAGORE

Comes a New Year message containing sage advice, which we reprint below,

"Uttarayan"
Santiniketan. Bengal.

নূতন যুগের প্রত্যুষে কোন্ প্রবীণ বুদ্ধিমান
নিত্যই শুধু সূক্ষ্ম বিচার করে,
যাবার লগ্ন চলার চিন্তা নিঃশেষে করে দান
সংশয়ময় তলহীন গহ্বরে।
নির্ঝর যথা সংগ্রামে নামে দুর্গম পর্ব্বতে
অচেনার মাঝে ঝাঁপ দিয়ে পড়, দুঃসাহসের পথে;
বিঘ্নই তোর স্পর্দ্ধিত প্রাণ জাগায়ে তুলিবে যে রে,
জয় করে তবে জানিয়া লইবি অজানা অদৃষ্টেরে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১ বৈশাখ
১৩৪৪.

In the dawn of a new age
why waver, wisefool, in subtle disputes,
and miss your chance for starting
and empty your thoughts in a bottomless doubt?
Like a desperate torrent fighting an obdurate
mountain gorge
take a wild leap into your fate, dark and strange,
Win it for your own through a defiant courage
challenged by obstacles.

Rabindranath Tagore.

14th April, 1937.

—The Statesman Vaisakh supplement, April 14, 1937.

—o—

সংবাদ।

জন্মদিন—গত ৩০শে চৈত্র, সন্ধ্যার পর, ৩৬নং হ্যারিশন রোডে, ডাঃ জগন্মোহন দাসের গৃহে তাঁহার জন্মদিন উপলক্ষে, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা এবং জগন্মোহন বাবু প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচারাশ্রমে ২৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

অন্নপ্রাশন—গত ১৭ই এপ্রিল, ইছাপুরে, স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র সিংহের পৌত্রী, শ্রীমান্ বিজয়চন্দ্র সিংহের প্রথম শিশু কন্যার অন্নপ্রাশন উপলক্ষে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। ভগবান্ শিশুকে ও তাহার পিতামাতাকে আশীর্বাদ করুন।

নববর্ষ—নববর্ষোপলক্ষে, ১লা বৈশাখ, প্রাতে ৯টার সময়, ৭৮বি অপার সার্কুলার রোডে, কমলকুটীরস্থ নবদেবালয়ে এবং সন্ধ্যা ৬টার সময়, ৯৫নং কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীটে, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে বিশেষ উপাসনা হইয়াছে। কমলকুটীরে ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন, শ্রীমতী হেমলতা চন্দ, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ, শ্রীমতী মহারাণী সুচারু দেবী প্রার্থনা করেন। মন্দিরে ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ উপাসনা করেন।

নববিধান ট্রাষ্টের পক্ষ হইতে, নববর্ষোৎসব উপলক্ষে, ৯৫নং কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীটে, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে, গত ১৯শে এপ্রিল, সোমবার, সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায়, ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন "নববর্ষে নববৃন্দাবন" বিষয়ে উপাসনা করেন।

নববর্ষোৎসব উপলক্ষে, ১লা বৈশাখ প্রাতে অমরাগড়ী ব্রহ্মমন্দিরে

ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা করেন। কুমারী গীতা দাস সুললিত-স্বরে "আজি প্রণমি তোমারে চলিব নাথ সংসার কাজে" এই সঙ্গীতটী করিয়া সকলকে মোহিত করেন। সায়ংকালে পুর-মহিলারা ব্রহ্মমন্দির-প্রাঙ্গণে স্বহস্তে রন্ধনাদি করিয়া বালক ও যুবকদিগকে প্রীতিভোজন করান। সন্ধ্যার পরও সংক্ষেপে উপাসনা ও কীর্ত্তন হইয়াছিল।

উৎসব—গত ৩০শে চৈত্র, বাঁটরা ব্রাহ্মসমাজের এক-সপ্ততিতম সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে, সন্ধ্যায়, ৫৩নং কালীপ্রসাদ বানার্জি লেনে, ভাই অক্ষয়কুমার নধ উপাসনা করেন।

শিক্ষার উন্নতি—বাগনান ব্রহ্মানন্দাশ্রমের সংলগ্ন নিত্য-কালী বালিকাবিদ্যালয় শিক্ষাবিভাগের প্রধান ইন্‌স্পেক্ট্রেস মহোদয়ার আদেশে মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে এবং ইহার সুপরিচালনের জন্য নূতন বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এইজন্য অধিক অর্থসাহায্যের প্রয়োজন। সহৃদয় সহৃদয়া অর্থানুকূল্য দ্বারা বিদ্যালয়ের স্থায়িত্ব বিধান করেন, ইহাই প্রার্থনীয়।

বিশেষ উপাসনা—গত ৫ই এপ্রিল, অমরাগড়িতে রায় সাহেব ডাক্তার প্রবোধচন্দ্র রায়ের পিতৃমাতৃসমাধিমণ্ডপে ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক বিশেষ উপাসনা করেন এবং ভাই অখিলচন্দ্র রায় ও ডাঃ প্রবোধচন্দ্র রায় আকুল প্রার্থনা করেন।

পারলৌকিক—গত ১২ই এপ্রিল, চাওড়া দেউলটী গ্রামে ভ্রাতা সত্যচরণ সিংহের গৃহে, তাঁহার মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ অমল-কুমার সিংহের দ্বিতীয় শিশুকন্যার আমাশয় রোগে পরলোক-গমনে ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে গৃহস্বামী প্রচারভাণ্ডারে ১৲ ও ব্রহ্মানন্দাশ্রমে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

মঙ্গলপাড়ায় শ্রীমান্ মণীন্দ্রনাথ নন্দনের একটী শিশুকন্যা ইউরিসিপিলাস্ রোগে পরলোকগমন করে। শোকসন্তপ্ত পিতামাতার সান্ত্বনা ও পরলোকগত শিশু আত্মার কল্যাণার্থে, গত ১৩ই এপ্রিল, ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক তাঁহাদের গৃহে প্রার্থনাদি করেন।

মাসিক স্মৃতি—গত ৩০শে এপ্রিল, স্বর্গীয় শ্রীনাথ দত্তের স্বর্গারোহণের দ্বিতীয় মাসিক স্মৃতি উপলক্ষে, ৬৫।১ হ্যারিসন রোডে, ভাই অক্ষয়কুমার নধ উপাসনা করেন।

সাম্বৎসরিক—গত ২৬শে চৈত্র, অমরাগড়ীতে, রায় সাহেব ডঃ প্রবোধচন্দ্র রায়ের পিতৃদেব স্বর্গীয় যশোদাকুমার রায়ের সাম্বৎসরিকে সমাধিমন্দিরে ভ্রাতা প্রেমেন্দ্রনাথ রায় উপাসনা ও সেবক ভাই অখিলচন্দ্র রায় প্রার্থনা করেন। ঐ দিন অপরাহ্নে জয়পুর ফকিরদাস হাই স্কুলে শ্রদ্ধেয় নবীনচন্দ্র আইচের সভাপতিত্বে স্মৃতিসভায় ভ্রাতা প্রেমেন্দ্রনাথ রায় যশোদাবাবুর আত্মত্যাগের বিষয়, ভাই অখিলচন্দ্র রায় তাঁর সকলকে আত্মিক উপকারলাভের বিষয়ে বর্ণনা করেন এবং সভাপতিও কিছু উপদেশ দেন।

গত ২৪শে এপ্রিল, ঢাকায় অধ্যাপক পূর্ণেন্দুনাথ মজুমদারের গৃহে তদীয় পিতৃদেবের স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র নন্দী উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে স্থানীয় নব-বিধান ব্রাহ্মসমাজে ৩৲, কলিকাতা প্রচারাশ্রমে ২৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

গত ২৬শে এপ্রিল, প্রাতে, শান্তিকুটীরে স্বর্গীয়া সৌদামিনী দেবীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রদ্ধেয় ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য্য করেন। ভাই অখিলচন্দ্র রায় প্রার্থনা করেন। আশীষ হইতে সৌদামিনী দেবীর বিষয় পঠিত হয়। ঐ দিন রাত্রি ১০টার পর ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক সৌদামিনী দেবীর সমাধি-মন্দিরে উপাসনা করেন।

গত ২৭শে এপ্রিল, প্রাতে নববেবালয়ে স্বর্গীয় প্রেরিত অমৃতলাল বসুর স্বর্গারোহণ উপলক্ষে বিশেষ উপাসনার কার্য্য ভাই গোপালচন্দ্র গুহ করেন। ভাই প্রিয়নাথ প্রার্থনা করেন।

ঐ দিন প্রাতে ৯টায়, ৫১।১নং রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে "অমৃত-নিকেতনে", ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। ভাই অখিলচন্দ্র, শ্রীমতী ভক্তিমতী দেবী ও চিত্তবিনোদিনী দেবী প্রার্থনা করেন।

গত ২৮শে এপ্রিল, চাওড়া বাঁটরায়, ৫৩নং কালীপ্রসাদ বানার্জ্জি লেনে, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র, আকাশ-বিহারী বীর স্বর্গীয় বিনয়কুমার দাসের দ্বিতীয় সাম্বৎসরিকে অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ সেন উপাসনা করেন। বিধানযুবকী শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে কীর্ত্তন ও সঙ্গীত হয়। বিনয়কুমারের শ্বশুর শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসাদ মজুমদারের প্রেরিত প্রার্থনা পঠিত হয়। এই উপলক্ষে সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী শান্তিদামিনী প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

কোচবিহার-সংবাদ—গত ১লা বৈশাখ, প্রাতে কেশবাশ্রমে উপাসনা, সন্ধ্যায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা হইয়া উৎসবের জন্য প্রস্তুতি, ৪ঠা সন্ধ্যায় নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে আরতি হইয়া উৎসবারম্ভ, ৫ই (১৮ই এপ্রিল) দিনব্যাপী উৎসবে দুই বেলা উপাসনা, অপরাহ্নে পাঠ ও আলোচনা, ৬ই প্রাতে কেশবাশ্রমে সমাধিপার্শ্বে উপাসনা, সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়, ৭ই প্রাতে কেশবাশ্রম কুটীরে উপাসনা, সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত রমেশনারায়ণ চৌধুরীর বাসভবনে কীর্ত্তন ও উপাসনা, ৯ই মধ্যাহ্নে কেশবাশ্রমে আর্য্যনারীসমাজের উৎসব এবং ১০ই প্রাতে কেশবাশ্রমে উপাসনা হইয়া শান্তিবাচন হয়। প্রতিদিনের উপাসনা শ্রদ্ধেয় মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সম্পন্ন করেন এবং কলিকাতা হইতে বিধানযুবক শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তথায় গিয়া সঙ্গীতাদি করিয়া সকলকে তৃপ্ত করেন।

Edited on behalf of the Apostolic Durber New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priya-nath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha,

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭২ ভাগ। ৯ম সংখ্যা।
১লা জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ১৩৪৪ সাল, ১৮৫৯ শক, ১০৮ ব্রাহ্মাব্দ
15th. May, 1937
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা

হে পৃথিবীর, সদ্‌গতিদাতা! সৃষ্টির আদি যুগ হইতে তুমি সাক্ষাৎ ভাবে মানুষের জীবনে আপনার ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া, তাহাকে ক্রমাগত যে উচ্চ গতির পথে লইয়া চলিয়াছ, কোন্ বেদে, কোন্ বাইবেলে, কোন্ কোরাণে, কোন্ পুরাণে তাহার যথাযথ বর্ণনা সম্ভব হইয়াছে? স্বদেশে বিদেশে, অতীতে বর্ত্তমানে মানুষের জীবনে তোমার লীলা খেলা, তোমার স্বর্গের অভিনয় যাহা সত্যতঃ হইয়াছে, তোমার অযাচিত কৃপায় পৃথিবীর প্রচলিত ও মান্য বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রযোগে সে সকলই যথাসম্ভব আমাদের হস্তগত। পৃথিবীর সকল সাধু ভক্ত-দিগের সাধনা আমাদের সাধনা, সকল সাধু ভক্তদিগের পূজা বন্দনা, ধ্যান ধারণা, আমাদের পূজা বন্দনা, ধ্যান ধারণা, সকলের তপ জপ আমাদের তপ জপ। আমাদের সৌভাগ্যের সীমা কোথায়? এ কথা যখন ভাবি, তখন স্মরণ করি, আমাদের দায়িত্ব কত, আমাদের সাধনের পথ কত প্রমুক্ত, আমাদের সাধনক্ষেত্র কত প্রশস্ত, আমাদের সাধনের আয়োজন কত বিপুল ও বিচিত্র। কিন্তু আমরা যে কীটাণুকীট, আমাদের আয়ু অল্প, আমাদের শক্তি অল্প, আমাদের চিত্ত কত বিভ্রান্তি ও মোহে পূর্ণ। আমাদের বিশ্বাস ক্ষীণ, আমাদের হৃদয় শুষ্ক ও কঠিন, আমরা সাধন ভজনে বিমুখ। কেন আমাদের সম্মুখে এত বিপুল সাধনের আয়োজন? হে অদ্ভুতকর্ম্মা! তোমার বিধি ব্যবস্থার মধ্যে তো কোন ভুল ভ্রান্তি নাই, তোমার কোন কার্য্য তো নিরর্থক নয়। বুঝিয়াছি, তুমি কীটাণুকীট অসাধক জীবনকে আপনার কৃপা-বায়ুতে সঞ্জীবিত করিয়া, আপনার স্বর্গের বলে বলীয়ান্ করিয়া, তাহার উপর আপনার অনন্ত প্রেম পুণ্যের পুষ্পবৃষ্টি যথাপ্রয়োজন বর্ষণ করিয়া, সে জীবনে অসম্ভব সম্ভব করিবে। দেখাইবে, শক্তিশালী, জ্ঞানী, গুণী মানুষ আপনার চেষ্টা-সম্ভূত সাধনবলে যাহা না করিতে পারে, তুমি আপনার নিজ কৃপায়, আপনার নিজ পরিচালনে, আপনার নিজ শক্তিসঞ্চারে ক্ষুদ্র কীটাণুকীট জীবনে তাহা সম্ভব করিতে পার। যদি তাহাই হয়, তবে আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন নিজের দিকে চাহিয়া নিরাশ না হই। তোমাতে পুনঃ পুনঃ আত্মসমর্পণ করিয়া, পূর্ণ আত্মসমর্পণে পূর্ণ কৃতকার্য্যতা লাভ করি। বিপুল সাধনের আয়োজন স্বর্গের আশীর্ব্বাদ-রূপে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত, আমরা তোমারই গুণে সে আশীর্ব্বাদ জীবনে লাভ ও সম্ভোগ করিয়া ধন্য হইবই হইব। তুমি আমাদের সহায় হও, তব চরণে এই কাতর প্রার্থনা।

শান্তিঃ শান্তিঃ! শান্তিঃ!

উপাস্য এবং উপাসক।

পৃথিবীতে সৃষ্টির আদিকাল হইতে এ পর্য্যন্ত যতগুলি ধর্ম্মবিধান সমাগত হইয়াছে, যতগুলি ধর্ম্মমত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই সকল ধর্ম্মবিধানেই, সেই সকল ধর্ম্মমতেই কোন না কোন আকারে উপাসনা আছে। যেখানে উপাসনা আছে, সেখানে উপাস্য আছেন, উপাসক আছে। উপাসনা, উপাস্য ও উপাসক এই তিন মূলকে ভিত্তি করিয়াই, এই তিন লইয়াই সকল ধর্ম্মবৃক্ষ অঙ্কুরিত হইয়াছে, বিকশিত হইয়াছে; শাখা প্রশাখায়, পত্র পল্লবে, ফুল ফলে পরিণত হইয়াছে, ক্রমে প্রত্যেকেই প্রকাণ্ড বৃক্ষের আকার ধারণ করিয়াছে, যাহার ছায়াতলে সংসারতাপে তাপিত কোটী কোটী নরনারী আশ্রয়-স্থান পাইয়াছে, যাহার শীতল ছায়াতলে কত শোকার্ত্ত, দৈন্য দুঃখে প্রপীড়িত ব্যক্তিগণ শান্তি, সান্ত্বনা ও আরাম লাভ করিয়াছে, যাহার সুমিষ্ট ফল সেবন করিয়া কত দুরারোগ্য রোগগ্রস্ত ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করিয়াছে, সুস্থ সবল হইয়াছে, যাহার অমৃতরস-সেবনে কত লোক নব জীবন, দেব জীবন, অক্ষয় জীবন লাভ করিয়াছে, ইহলোকে পরলোকে ধর্ম্মের জয়গীতি গাহিয়াছে।

এখন প্রশ্ন এই, উপাসনা, উপাস্য ও উপাসক এই তিনটির মধ্যে কোনটিকে সর্ব্বাগ্রে আমরা পাইয়াছি? উপাসনাই অগ্রে, না উপাস্য অগ্রে, না উপাসক অগ্রে পাইয়াছি? আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই, উপাসনার ভিতর দিয়াই আমরা উপাস্যকে চিনি, জানি, বুঝি, গ্রহণ করি। উপাসনার যোগেই উপাস্যের পরিচয় পাই। উপাসনা-যোগেই আমি যে উপাসক, আমার এ লক্ষণ, এ স্বভাব, এ প্রকৃতির পরিচয় পাই; উপাসনা-যোগেই আমার ভিতর উপাসকের প্রকৃতি স্ফুরিত হয়। যাহারা উপাসনার আশ্রয় লয় নাই, উপাসনার কোন না কোন প্রণালী গ্রহণ করিয়া উপাস্যের সঙ্গস্পর্শ লাভ করে নাই, তাহারা অনেকে উপাসনার প্রয়োজনীয়তা পর্য্যন্ত স্বীকার করে না, উপাসনার ভাব তাহাদের প্রাণে জাগে না, তাহাদের প্রকৃতির অন্য লক্ষণের সঙ্গে উপাসকের যে একটা লক্ষণ তাহাদের মধ্যে আছে, তাঁহাও তাহারা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। ইহা স্বীকার্য্য যে, উপাসনার ভিতর দিয়াই আমরা উপাস্যকে চিনিতে পারি, উপাসনার ভিতর দিয়াই আমি যে উপাসক, তাহাও বুঝিতে পারি। এ ভাবে দেখিতে গেলে বলিতেই হয়, উপাসনাই অগ্রবর্ত্তী বিষয়, উপাসনাকেই আমরা প্রথমে আশ্রয় করিয়াছি। উপাস্য এবং উপাসকের পরিচয় উপাসনা হইতে। অতএব উপাস্য এবং উপাসক এ দুইই পরবর্ত্তী গণনার বিষয়। কিন্তু সত্য কথা এই, উপাস্য আছেন বলিয়াই উপাসনা। উপাস্য দেবতা না থাকিলে কাহাকে লইয়া উপাসনার কার্য্য চলিবে? যদি শুধু উপাস্যই থাকেন, উপাসক না থাকে, তাহা হইলেও উপাসনার কার্য্য সম্ভব হয় না; উপাস্যকে লইয়া কে উপাসনা করিবে? উপাস্য আছেন সর্ব্বাগ্রে, উপাস্যের অস্তিত্ব সর্ব্বাগ্রে। আদি উপাস্য দেবতা হইতে উপাসক মানবের অস্তিত্বে আগমন, উপাস্য এবং উপাসকের মিলনে উপাসনার কার্য্য। অতএব সর্ব্বাগ্রে উপাস্য তৎপর উপাসক, উপাস্য এবং উপাসকের মিলনে উপাসনা।

কোন্ গুরু, কোন্ আচার্য্য অগ্রসর হইয়া প্রথমে মানুষকে বলিল, তুমি উপাসনা কর? কোন উপদেষ্টা প্রথমে এই কল্যাণের পথ, সদ্‌গতির পথ মানুষকে প্রদর্শন করিল? ধর্ম্মের ইতিহাসপাঠে জানা যায়, প্রথমে কোন বিশেষ আচার্য্য বা গুরু প্রচারের পথে নামিয়া উপাসনার পরমবার্ত্তা লোকসমাজে প্রচার করেন নাই। মানুষের স্বভাবই প্রথমে ঈশ্বরকে খুঁজিয়াছে। কোন বিশেষ দেব-শক্তির সহায়তা ভিন্ন মানুষের চলে না। সংসারে, গৃহ পরিবারে দেবশক্তির সহায়তা চাই; তজ্জন্য উপাস্য দেবতাকে স্বভাবের পরিচালনায় মানুষ খুঁজিয়াছে। শুধু তাহাই কি? যাহারা সংসার করে নাই, গৃহী হয় নাই, পারিবারিক জীবন গ্রহণ করে নাই, যাঁহারা শুদ্ধ জ্ঞানের পথে, তত্ত্বান্বেষণের পথে সন্ন্যাসীর ন্যায় চলিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রকৃতির যাঁহারা, তাঁহারা আপনার স্বভাবের জাগরণে সহজে বুঝিয়াছেন, এই পৃথিবীর অতীত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যিনি ঈশ্বর, তাঁহার সঙ্গ ভিন্ন, তাঁহার সঙ্গে যোগ ও মিলন সাধন ভিন্ন মানবাত্মার তৃপ্তি লাভ হয় না, শান্তি আনন্দ সম্ভোগ সম্ভব হয় না। গূঢ় ভাবে দেখিতে গেলে, মনুষ্যপ্রকৃতি পরম প্রকৃতিকে চায়, মানবাত্মা পরমাত্মাকে চায়; মনুষ্য জীবনের শুভ অবস্থায়, অন্য কাহারও উপদেশ ভিন্নও মানুষ অতি অশিক্ষিত অবস্থায়ও, ঊর্দ্ধগতি লাভ করিবার জন্য, ঊর্দ্ধ লোকে যাইবার জন্য ঈশ্বরকে চায়।

বৈষ্ণব সাধুগণ বলেন, মানুষের আত্মা চিৎস্বরূপ ঈশ্বরের কণামাত্র। তাই তাঁহারা বলেন, জীব চিৎকণ।

মহান্ ঈশ্বরের কণাস্বরূপ জীব। বিদেশীয় ধর্ম্মগ্রন্থে আছে, "Man is made after the image of God." ঈশ্বরের ছাঁচে মানুষ গঠিত। ক্ষুদ্র চুম্বক লৌহ যেমন চুম্বক লৌহের খনির দিকে স্বভাবের টানে গতি করে, তেমনই জীবও স্বভাবের টানে মহান্ ঈশ্বরের দিকে অগ্রগতি লাভ করে। তাই ধর্ম্মের বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হইয়াছে, "Those, who have no law, have law in their hearts" বাহিরে যাহাদের লিখিত ধর্ম্মগ্রন্থ নাই, তাহাদের হৃদয়ের উচ্চ উচ্ছ্বাসজনিত বিধি ব্যবস্থাই তাহাদের জীবন-পরিচালনের বিধি ব্যবস্থা। মানুষ আপনার স্বভাবের টানে ঈশ্বরকে পাইতে চায়, এই পথ সর্ব্বসাধারণের পক্ষে প্রমুক্ত থাকে, এই উদ্দেশ্যেই উপাসনার ব্যবস্থা মানব-সমাজে ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

মানুষের প্রাণ স্বভাবের টানেই ঈশ্বরকে চায়; কিন্তু মানুষ বলে, শুভপথে অনেক বিঘ্ন, অনেক কণ্টক। ধর্ম্মের পথে, ঈশ্বরকে চাওয়া ও পাওয়ার পথে বিঘ্ন ও কণ্টকের সীমা নাই। যতই বিঘ্ন বাধা উপস্থিত হইয়াছে, এপথে ঈশ্বরের সহায়তা, ঈশ্বর হইতে বল, বুদ্ধি, জ্ঞান, স্নেহ, করুণা ততই মানুষ লাভ করিয়াছে। ঈশ্বর সাক্ষাৎ ভাবে মানুষের কত আপনার, কত আত্মীয় হইতে পারেন, কত তাঁহার সঙ্গে মানুষের সত্য নিত্য অচ্ছেদ্য অনন্তকালের সম্পর্ক বিদ্যমান, তাহা মানুষ এই একমাত্র উপাসনার ভিতর দিয়া উপাসকভাবে ঈশ্বরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ ও ধারণ করিতে যাইয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছে; কত বিবিধ মধুর স্বর্গের সম্পর্কে সংবদ্ধ হইয়া মানুষ ধন্য হইয়াছে। স্বদেশে বিদেশে বিভিন্ন যুগে কেবল উপাসনা-যোগে ঈশ্বরকে মানুষ কত ভাবেই চিনিয়াছে, জানিয়াছে, কত বিচিত্রভাবে, বিচিত্র সম্পর্কে মানুষ তাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধ হইয়াছে। ঈশ্বর কত ভাবেই আপনাকে মানুষের জীবনে প্রকাশ করিয়াছেন, পৃথিবীতে স্বর্গের লীলা, স্বর্গের অভিনয় প্রকট করিয়াছেন, সকলই বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্ররূপে বিভিন্ন নামে পরিচিত ও গৃহীত হইয়াছে। আমরা এই নবযুগে নববিধানের পবিত্র ধর্ম্মক্ষেত্রে পৃথিবীর প্রচলিত সকল ধর্ম্মশাস্ত্রকে আপনাদের নিজস্ব ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে স্বর্গ হইতেই অধিকার লাভ করিয়াছি। বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ ও চর্চ্চা করিয়া, বিভিন্ন মহাপুরুষের ভাবে তাহা সাধন করিয়া, তাহা হইতে পবিত্রাত্মা-যোগে নব নব শিক্ষা ও আলোক লাভ করিয়া আমরা ধন্য। যদিও আমাদের সাধনা অতি সামান্য, যদিও আমাদের ধর্ম্ম-সঞ্চয় অতি অকিঞ্চিৎকর, কিছুই নয় বলিলেই হয়, তথাপি ঈশ্বরের সাক্ষাৎ কৃপাজনিত আমাদের যে ভাগ্য, তাহার তুলনা হয় না। আমরা তাঁহার কৃপায় বুঝিতে পারিয়াছি, এই পুণ্যভূমি ভারতে উপাসনা-যোগে মানব-জীবনে উপাস্যরূপে ঈশ্বরের যেরূপ বিবিধ লীলা হইয়াছে, বিকাশ সম্ভবপর হইয়াছে, ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের এরূপ আর কোথাও হয় নাই।

ব্যাকুলতা

শরীরের স্বাভাবিক অবস্থা ক্ষুধা তৃষ্ণা, আত্মার স্বাভাবিক অবস্থা ব্যাকুলতা। ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকাতে শরীর রক্ষা পায় ও উহার পুষ্টিসাধন হয়; তেমনি ধর্ম্মের জন্য, ঈশ্বরের জন্য আত্মার ব্যাকুলতা না থাকিলে আত্মিক জীবন রক্ষা পায় না। এই ব্যাকুলতার জন্যই মানুষ ধর্ম্ম কর্ম্ম করে, কতই চেষ্টা করে, কতই সাধন করে। শারীরিক ক্ষুধার অবসান হয়, কিন্তু ধর্ম্মক্ষুধা বা ব্যাকুলতার অবসান নাই। যত পায়, আরও তত চায়। মানবাত্মার অনন্ত উন্নতি নিয়তি, সুতরাং অনন্ত উন্নতির মূল যে ব্যাকুলতা, তাহাও উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকে। এই জন্যই দেখি, সাধুভক্তদের ধর্ম্মজীবনে অবিশ্রান্ত সাধনা, প্রার্থনা ও উপাসনা। তাঁদের জীবনে ব্যাকুলতা ঝড়ের মত বহিয়া যায়। কিছুতেই এই ব্যাকুলতার তৃপ্তি নাই। অনন্ত ভগবান্ মানুষকে এই ব্যাকুলতা দিয়ে, অনন্তকাল তাঁহার সাধনার্থী করে রেখেছেন। ধন্য সেই আত্মা, যে আত্মা অনন্তের জন্য সদা ব্যাকুল!

মানবাত্মা কিসের প্রত্যাশী?

মানবাত্মা কি চায়? জড় রাজ্যের কিছুতেই আত্মার তৃপ্তি মানে না। জড় বস্তু আত্মাকে সুখী করিতে পারে না। জড়ের অতীত অজানা অচেনা কাহার সন্ধানে মানবাত্মা নিত্য ছুটিয়া চলে। সেই অজানা অচেনা বস্তু কি, তা বলিতে পারে না, তার পরিচয় বা সন্ধানও দিতে পারে না, তবুও সেই বস্তুকেই চায়। আকাশের চাঁদকে আঁখা ধরতে চায়, অসম্ভবকে সম্ভব করিতে চায়। তাই সান্ত দেশকালের মধ্যে থেকে অনন্তকে, সীমার মধ্যে থেকে অসীমকে ধরিতে চায়; সেই অসীমের জন্যই মানবাত্মা পাগলপারা। জড়ের মধ্যে থেকে জড়াতীত রাজ্যে, ইন্দ্রিয়গ্রামে থেকে ইন্দ্রিয়া-

তীত চিন্ময়রাজ্যে এই জন্ত আত্মার নিত্য গতিবিধি, নিত্য আসা যাওয়া, নিত্য সাধন ভজন। যাঁকে পূর্ণরূপে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, জানা যায় না, সেই অসীম অনন্তই যুগে যুগে মানবাত্মাকে পাগল করেছেন, ব্যাকুল করেছেন। অনন্তকাল এইরূপে মানবাত্মাকে পাগল করে, ব্যাকুল করে তাঁহারই সন্ধানে অনন্তকাল ছুটাইয়া নিয়া চলিবেন, এই তাঁর মঙ্গল বিধান।

শ্রীকেশবচন্দ্রের বেদবাণী

শ্রীকেশবচন্দ্র বলেন, "আমি বাণী শুনে বলি, বানিয়ে বলি না।" "যে দেখেছে, যে শুনেছে, যে ছুয়েছে, সে বলেছে, অবিশ্বাস করো না।" "Every inch of this man is real tremendously real." "এই লোকটীর প্রত্যেক বিন্দু খাটী, ভয়ঙ্কর খাটী।"

শ্রীকেশবের মা।

আমার মা বড্ড ভালরে বড্ড ভাল। আমার মাকে তোরা চিনলি না।

এই মা আমার সর্ব্বস্ব। মা আমার প্রাণ, মা আমার জ্ঞান, মা আমার ভক্তি দয়া, মা আমার পুণ্য শান্তি, মা আমার শ্রীসৌন্দর্য্য। মা আমার ইহলোক পরলোক। মা আমার সম্পদ সুহৃতা। বিষম রোগযন্ত্রণার মধ্যে মা আমার আনন্দসুধা।

আমার মা বড় সৌখীন মা। তোমরা মনে করিও না, আমার মা শুষ্ক মা; তোমরা কিছু কিছু দিয়ে মার ঘরখানি সাজিয়ে দিও, কিছু কিছু দিয়া তাঁহার পূজা করিও। মিছে মিছে অমনি কেবল কতকগুলি কথা দিয়ে মায়ের পূজা করিও না।

মা তোমাদিগকে বড় ভালবাসেন। তোমরা একটি ক্ষুদ্র ভক্তিফুল মার হাতে দিলে, মা আদর করিয়া তাহা স্বহস্তে স্বর্গে লইয়া গিয়া, দেবদেবী সকলকে ডাকিয়া তাহা দেখান।

এই আনন্দময়ী মাকে নিয়ে, ভাইগণ, তোমরা সুখী হও। এই মাকে ছাড়িয়া অন্ত সুখ অন্বেষণ করিও না। এই মা তাঁহার আপনার কোলে রাখিয়া তোমাদিগকে ইহপরলোকে চিরকাল সুখে রাখিবেন।

নবদেবালয়।

মা, তুমি এই ঘর অধিকার করেছ। এই দেবালয় তোমার ঘর, লক্ষ্মীর ঘর।

এই ঘরে দেশ দেশান্তর হইতে তোমার ভক্তেরা আসিয়া তোমার পূজা করিবেন।

এই দেবালয়ের দ্বারা এই বাড়ীর, পল্লীর কল্যাণ হইবে। এই সহরের কল্যাণ হইবে, ও সমস্ত দেশের ও পৃথিবীর কল্যাণ হইবে।

এই ঘরই আমার বৃন্দাবন, ইহা আমার কাশী ও মক্কা, ইহা আমার জেরুশালম; এই স্থান ছাড়িয়া আর কোথায় যাইব?

মা, আশীর্ব্বাদ কর, তোমার ভক্তেরা এই ঘরে আসিয়া, তোমার প্রেমমুখ দেখিয়া, যেন অদর্শন-যন্ত্রণা দূর করেন।

যুগধর্ম্মভাগবত

যখন ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, তখনই ভগবান্ অধর্ম্ম দূর করিবার জন্ত তাঁর বিধান পাঠান। যুগধর্ম্ম তাঁহারই নূতন বিধান। ইহা মানবের কল্পনা-প্রসূত নহে। বিধানের কথা শুনিলে আমার প্রাণে যেন বিদ্যুল্লহরী খেলা করে, সমস্ত হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয়। আমি বিধানের একজন অকিঞ্চন সাধক, তাই আমার সাধ হয় যে, আমি বিধানের জয় ঘোষণা করি। বিধানের জয় ঘোষণা করিতে গিয়া, আমার ভাষা যেন অগ্নিময় হইয়া উঠে। বিধানের মহাবাণী বলিতে গিয়া আমার ক্ষীণ কণ্ঠ যেন সহস্র কণ্ঠে পরিণত হয়। ঋষিদিগের যে কণ্ঠ হইতে চতুর্ব্বেদ রচিত হইল, বৈষ্ণবের যে ভক্তি হইতে ভাগবত প্রণীত হইল, সেইরূপ ব্রহ্মানন্দের শ্রীমুখ হইতে বজ্রের মহাশব্দে যুগধর্ম্ম নিনাদিত হইল। ভগবান যেমন এক ফুৎকারে প্রলয় সংঘটন করিতে পারেন, সেইরূপ ক্ষুদ্রকে দিয়া বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করিতে পারেন। তাঁহার কৃপাই আমার সহায় ও সম্বল।

যুগধর্ম্মের প্রথম কথা কি? বিশ্বাস। যে বিশ্বাস পাহাড়কে স্থানান্তরিত করিতে পারে, যে বিশ্বাস প্রস্তরকে অন্নজলে রূপান্তরিত করে, যে বিশ্বাস কালের অন্ধকার ভেদ করিয়া ভবিষ্যতের গৌরবময় উজ্জ্বল আলোক দর্শন করে, সেই বিশ্বাস।

বিশ্বাসের একধারা ভগবানের বক্ষ হইতে উৎপন্ন হইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে, আর এ ধারা মানবের বক্ষ ভেদ করিয়া শ্রীভগবানকে স্পর্শ করিয়াছে। ভগবানের প্রতি যেমন মানবের অনন্ত বিশ্বাসের প্রয়োজন, সেইরূপ নিজের প্রতিও নিজের অফুরন্ত বিশ্বাসের একান্ত প্রয়োজন।

হে অমৃতের পুত্রগণ, আপনারা যে কেহ এই যুগধর্ম্মভাগবতের অমৃতকাহিনী শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন, বিশ্বাসের দৃঢ় ভূমিতে দণ্ডায়মান হউন। এই যুগধর্ম্মভাগবত যাঁহারা প্রণয়ন করিলেন, তাঁহারা কে? অকিঞ্চন ও অপদার্থ মানুষ, ধূলিকণা হইতেও ক্ষুদ্র ও শক্তিহীন। কে তাঁহাদের প্রাণে বিশ্বাসের অমৃতধারা ঢালিয়া দিল, যে তাঁহাদের শ্রীমুখ হইতে নূতন বেদ রচিত হইল, যে তাঁহাদের লেখনী হইতে স্বর্গের দেবভাষা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইল।

ব্রাহ্মসমাজের প্রাচীন কীর্ত্তি কি আপনাদের স্মরণে আছে?

কেহ অর্থত্যাগ করিয়া, কেহ বিত্তত্যাগ করিয়া, কেহ আভিজাত্যের মান মর্য্যাদা পরিহার করিয়া, কেহ ধনীর সন্তান একদিনে ফকির হইয়া, কেহ পিতামাতার বুকভরা স্নেহের ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, কেহ আত্মীয় স্বজনের প্রীতিডোর ছেদন করিয়া অনাহার ও অনিদ্রার তীব্র যাতনা সহ্য করিয়া, ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন।

হে সাধকবংশ, ঈশ্বরের গৃহ রচনা করিবার জন্য কত বিশ্বাসীর শোণিতপাত হইয়াছে, তাহা কি আপনারা জানেন? কঠোর পাষাণকে কত নরনারীর অশ্রুজলে সিক্ত করিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার সন্ধান কি আপনারা রাখেন? প্রাচীন সমাজের নির্য্যাতন-শেলে আহত হইয়া কত ভক্তের শোণিতের রংএ ব্রহ্মমন্দিরের বেদী রঞ্জিত হইয়াছে, তাহার পরিচয় কি আপনারা পাইয়াছেন? সে এক অপূর্ব্ব ইতিহাস, সে এক অদ্ভুত যুগলীলা।

বঙ্গদেশে এমন নগর উপনগর ও গণ্ডগ্রাম অতি অল্পই ছিল এবং ভারতবর্ষে এমন প্রদেশও অল্পই ছিল, যথায় ব্রহ্মমন্দিরের শ্রীমুখ হইতে নবযুগের নূতন বার্ত্তা ঘোষিত না হইয়াছে। নবযুগের সেই অমৃতময় লহরী এখনও কর্ণে বাজিতেছে। কত মন্দির, কত সাধনকানন, কত আশ্রম, কত সঙ্গত সভা, কত নীতিবিদ্যালয়, কত নারীসঙ্ঘ, কত তপোভূমি দেশে প্রতিষ্ঠিত হইল!

সে সব কথা যখন মনে পড়ে, তখন মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়, উদ্দীপনার জ্বলন্ত উৎসাহে শরীর মন অগ্নিময় হয়। যখন হৃদয়-রঙ্গভূমিতে অদ্ভুতকর্ম্মা বিধাতার বিবিধ অভিনয়ের কথা স্মরণ করি, তখন আমি আশ্চর্য্য ও অবাক্ হইয়া যাই।

যে সকল ভাব, সত্য ও ধর্ম্মকে আজ আমরা নিজস্ব বলিয়া গ্রহণ করিতেছি, তাহা আমার ব্যক্তিগত সম্পদ নহে; তাহা যুগ যুগান্তরের এবং কাল কালান্তরের মধ্য দিয়া অসংখ্য জাতি ও সম্প্রদায়ের রূপ ধারণ করিতে করিতে এবং অবস্থার সংঘর্ষে তাহা রূপ পরিবর্ত্তন ও এক অন্যের সহিত মিলিত হইয়া তাহা পূর্ণ সত্যরূপে আমাদের নিকট প্রতিভাত হইয়াছে। আজ ঋষিদিগের যোগ, বৈষ্ণবের ভক্তি, ঈশার পুত্রত্ব, ইসলামের নিষ্ঠা, সক্রেটিসের আত্মজ্ঞান, শ্রীচৈতন্যদেবের প্রগল্‌ভা ভক্তি, শ্রীবুদ্ধদেবের নির্ব্বাণশান্তি মিলিত হইয়া ও নানকের শিষ্যভাব ঐক্যতানবাদনের মত মিলিত হইয়া, এক অঙ্গাঙ্গীভূত মহা সত্যরূপে আমাদের কর্ণে সুধা ঢালিয়া দিতেছে, স্বর্গের শঙ্খনিনাদ যেন ধরায় সপ্ত সুরের ঐক্যতানে বাজিয়া উঠিয়াছে। এই মহা সমন্বয় একদিন পৃথিবীর ধর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করিবে। নববিধানের মহামিলনের ভিতর সার্ব্বভৌমিক মহাধর্ম্ম জাগিয়া-উঠিবে। ইহাই নবযুগের পূর্ণ ধর্ম্ম। এই যুগধর্ম্ম বর্ত্তমান ধর্ম্মজগতে এক অভিনব সৃষ্টি। পৃথিবী অবিরাম গতিতে যেমন নূতনত্বের দিকে চলিয়াছে, ধর্ম্মও সেইরূপ নব নব রূপ ধারণ করিতেছে। কাহার সাধ্য, পৃথিবীর গতি রোধ করিতে পারে? ইহা অসম্ভব। প্রকৃতির স্বভাবই রূপ-পরিবর্ত্তন; মানবপ্রকৃতির স্বরূপও এই প্রকার। মানববংশ যুগ যুগান্তরের ভিতর দিয়া এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে বিচরণ করে। ভগবান যেমন সত্যস্বরূপ, মিলনও তাঁহার একটী স্বরূপ। এই মিলনের ভিতর দিয়া বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। মিলনই প্রকৃতির ধর্ম্ম। বেদের ব্রহ্মজ্ঞান বাইবেলের মহাবাণীর সহিত মিলিত হইয়া অপূর্ব্ব সাম্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। নরনারীর ভাব ও সাধনার সমন্বয়ে নূতন মনুষ্যত্ব পরিস্ফুটিত হইবে। বিচিত্রতার মধ্যে একত্বের সমাবেশ সাধনই মিলন, বৈষম্যের ভিতর সাম্যের প্রতিষ্ঠাই যথার্থ সমন্বয়।

যুগধর্ম্মের প্রত্যেক ঘটনায় প্রেমের বাণী ফুটিয়া উঠিয়াছে! প্রেমেই ইহার আরম্ভ, প্রেমেই ইহার পূর্ণতা। কত বংশ আসিবে, কত বংশ চলিয়া যাইবে, তথাপি ইহার প্রেমের লীলা শেষ হইবে না।

এ প্রেমে কি তোমার আমার আদর্শ লিখিত হইবে না? সেই অপার্থিব প্রেম, যে প্রেম সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বৃক্ষতলে গৃহ রচনা করে, যে প্রেমের স্পর্শ পাইয়া হিংস্র জীব হিংসা ভুলিয়া যায়, যে প্রেম সকলের কল্যাণ-কামনায় রত, সেই প্রেমের আদর্শ ইহাতে লিখিত হইবে। হে অমৃতের পুত্রগণ, তোমরা যে কেহ পার অগ্রসর হও, আপনার জীবনের লাল শোণিত দিয়া যুগধর্ম্মের পবিত্র অধ্যায় লিখিতে আরম্ভ কর। ঈশ্বর তোমাদের জীবনে মহিমান্বিত হউন।

শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীমতী শশিমুখী দেবীর সংক্ষিপ্ত জীবনী।

(ভাই অখিলচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক, ৪ঠা এপ্রিল, শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত)

আমাদের এই অমরাগড়ী নববিধান ব্রাহ্মসমাজের ভক্তিভাজন উপাচার্য্য স্বর্গীয় ফকিরদাস রায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী মাতা শশিমুখী দেবী, ১২৬৩ সালের ২৩শে অগ্রহায়ণ, নিকটবর্ত্তী জয়পুর গ্রামে শ্রীমৎ ঈশানচন্দ্র হাজরা মহাশয়ের ঔরসে, শ্রীমতী অমরা দেবীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। মাতা শশীমুখী দেবী তাঁহার পিতামাতার জ্যেষ্ঠা কন্যা। তাঁহার শৈশবকাহিনী তাঁহার গুরুজনদের নিকট যতটা জানিয়াছি, তিনি পিতামাতা, আত্মীয় ও প্রতিবাসীদের অত্যন্ত আদরের ছিলেন। শৈশব কাল হইতে তিনি শান্তশিষ্টা, বিনীতা এবং গুরুজনদের প্রতি অত্যন্ত ভক্তিপরায়ণা। তাঁর যেমন শারীরিক সৌন্দর্য্য, তেমনি

স্বভাবের মধুরতা, সহজেই সকলের মনকে আকর্ষণ করিতে পারিতেন। তিনি একটু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁর মেসো মহাশয় অমরাগড়ীনিবাসী পুণ্যশ্লোক দাতা ঈশ্বরচন্দ্র হাজরা ও তাঁর পত্নী শ্রীমতী নৃত্যময়ী দেবীর যত্নে তাঁদের নিকটে প্রতিপালিত হন। ঈশ্বরচন্দ্র হাজরা মহাশয়ের পুত্র কন্যা ছিল না, সুতরাং তাঁরা মাতা শশিমুখীকে কন্যা-নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করেন, ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে ভক্ত ফকিরদাসের সহিত তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ হয়। ভক্ত ফকিরদাসের মাতা শ্রীমতী জগন্মোহিনী দেবী, মাতা শশিমুখী দেবীর রূপ ও গুণের বিষয় অবগত হইয়া, ইঁহাকে বধূরূপে নিজগৃহে আনিবার জন্য খুব আগ্রহ প্রকাশ করিলে, অনতিবিলম্বেই বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়। বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইবার অল্পদিন মধ্যেই জগন্মোহিনী দেবীর হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় সমস্ত পরিবার শোকাচ্ছন্ন হইলেও, ভক্ত ফকিরদাসের পিতামহী রত্নেশ্বরী দেবী এই শুভবিবাহের আয়োজন করিয়া মহাসমারোহে শুভ বিবাহকার্য্য সুসম্পন্ন করাইলেন। বিবাহের সময় ভক্ত ফকিরদাস বিদ্যালয়ের ছাত্র ও ইঁহাদের উভয়ের বয়সের তারতম্য অতি অল্পই ছিল। যাহা হোক, মাতা শশীমুখী দেবী বাল্যকালে লেখা পড়া শিখেন নাই, সে সময় এদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন আদৌ ছিল না; তাহা হইলেও ভদ্রপরিবারের উপযুক্ত আচার ব্যবহার, গৃহকর্ম্ম, রন্ধনাদি খুব সুন্দররূপে শিক্ষা পাইয়াছিলেন।

ইঁহাদের প্রথমে উপর্য্যুপরি দুইটী কন্যা হয়। প্রথম কন্যা শ্রীমতী হেমপ্রভা ও দ্বিতীয়া শ্রীমতী সরোজিনী দেবী। ভক্ত ফকিরদাস কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে পাঠাবস্থায় নব ভক্ত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের আকর্ষণে পড়িয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং মাতা শশিমুখী দেবীও স্বামীর নিকট এই মহাধর্ম্মের উপদেশ পাইয়া এই ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। মাতা শশিমুখীর দীক্ষা সম্বন্ধে ভক্ত ফকিরদাস স্বহস্তে ইতিবৃত্তে লিখিয়াছেন, "এই অমরাগড়ীতে যুবকদিগের সম্মিলনে নিত্য উপাসনা, সংকীর্ত্তন, আলোচনার মহাধূম পড়িয়া গেল; রাত্রিদিন বিরাম নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইতিমধ্যে একদিবস রাত্রিতে তাঁহার পত্নী (শশিমুখী দেবী) অশ্রুজলে আপন অঞ্চল সিক্ত করিয়া পতির হস্তধারণপূর্ব্বক এমনি গভীরভাবে দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, তিনিও (ফকিরদাসও) অশ্রুসংবরণ করিতে না পারিয়া, ঐরূপ গভীর দুঃখ প্রকাশের কারণ কি, জিজ্ঞাসা করেন। ঐ প্রশ্নের উত্তরে শশিমুখী দেবী স্বামীকে বলিলেন, 'তুমি বাহিরে প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া যাহা করিতে হয় করিতেছ, ইহাতে আমার আনন্দ আছে বটে; কিন্তু আমার মত আশ্রিতা দুঃখিনীর উপায় কি করিলে? অচিরে উপায় স্থির করিয়া আমায় তোমার চিরসঙ্গিনী কর।' "

ভক্ত ফকিরদাস পত্নীর ঈদৃশ কাতরোক্তিতে মনে মনে আনন্দ অনুভব করিয়া, কোনপ্রকার ফলগণনায় প্রবৃত্ত না হইয়া বলিলেন, আগামী অমুকদিবসে তোমার নবধর্ম্মে দীক্ষার দিন অবধারিত হউক এবং দীক্ষাগ্রহণান্তে প্রতিদিন প্রাণ ভরিয়া উপাসনা করিতে আরম্ভ কর, দয়াময় শ্রীহরি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। আরো বলিলেন, "আজ অশ্রুজলে যেমন আমার হস্ত সিক্ত করিলে, তেমনি প্রত্যহ সেই শ্রীহরির পদকমল সিক্ত করিয়া কৃতার্থ হও।" ১২৮৭ সালের ৪ঠা ফাল্গুন দীক্ষাগ্রহণের দিন স্থির হইলে, মাতা শশিমুখী ঐ নির্দ্দিষ্ট দিন রাত্রিতে ভক্ত ফকিরদাসের নিকট পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই শুভ অনুষ্ঠানটী অতীব গম্ভীর এবং প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। ইঁহাদের পতি পত্নীর দুইখানি হৃদয়, দুইটী প্রাণ অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে, অকূলের কাণ্ডারী শ্রীহরির পদাশ্রয় সার করিয়া, তদবলম্বন জন্য ধাবিত হইতেছে! এই স্বর্গের দৃশ্য দেখিয়া, কাহার প্রাণ না বিগলিত হয়? ঐ সময় হইতেই প্রতি বুধবার ইঁহাদের পারিবারিক উপাসনার দিন নিরূপিত হয়। সেই হইতেই আমাদের মাতা আজীবন নিষ্ঠা ভক্তির সহিত প্রাতঃকালীন উপাসনা করিতেন, উপাসনা না করিয়া তিনি জল গ্রহণ করিতেন না।

এইরূপে তিনি স্বামীর যথার্থ সহধর্ম্মিণী হইবার জন্য প্রাণপণে সাধন ও সেবার ধর্ম্মকে জীবনে প্রতিষ্ঠা করিতে যত্নবতী হইলেন। ইঁহাদের দুইটী কন্যার পর একটী পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু শিশুটী মাত্র ৬দিন জীবিত থাকিয়া পিতামাতা ও আত্মীয়দিগকে শোকাহত করিয়া প্রস্থান করেন। ইঁহারা উভয়ে এই পুত্রের মৃত্যুতে একমাস শোকব্রত পালন করিয়া যথাবিধি পুত্রের শ্রাদ্ধাদি করেন। ভক্ত ফকিরদাসের প্রমত্ত ধর্ম্মানুরাগ মাতা শশিমুখীর অন্তরে ক্রমেই প্রবল হইতে থাকায়, তিনি কলিকাতায় মাঘোৎসবে যোগদানের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন। ১২৮৮ সালের মাঘ মাসে স্বীয় অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া, উৎসবে যাইবার জন্য প্রস্তুত হন। যথাসময়ে মাঘোৎসবে যোগদান করিয়া এবং কয়েকদিবস ভক্তিভাজনীয়া আচার্য্যপত্নী ও প্রচারকমহাশয়দিগের সহধর্ম্মিণী ও কন্যাগণের সহিত মিলিত হইয়া মাঘোৎসবসম্ভোগে কৃতার্থ হন। ১২৮৮ সালের ৬ই ফাল্গুন অমরাগড়ীতে যে কয়েকজনের যথাবিধি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া নববিধানমণ্ডলীভুক্ত হন, তন্মধ্যে আমাদের মাতাও অন্যতমা। তাঁর দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞা বাস্তবিকই এদেশের নারীজাতির একটী অমূল্য শিক্ষার বিষয়। বারশত বৎসর পূর্ব্বে মহাপুরুষ মোহম্মদের সাধ্বী পত্নী খাদিজা দেবী যেমন ঘোর পরীক্ষার সময় পতির ধর্ম্মকে গ্রহণ করিয়া, স্বামীকে সাহস দিয়া এবং মৃত্যু পণ করিয়া স্বামীকে সাহায্য করিয়া জগতে অতুলনীয় দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, আমাদের সাধ্বী মাতা শশিমুখী দেবীও এই ভীষণ পরীক্ষাসঙ্কুল স্থানে ভক্ত ফকিরদাসের প্রধানা সহায় হইয়া, নিজেকে এবং দেশকে ধন্য করিয়াছেন। ১২৮৯ সালের মাঘোৎসবে পুনরায় ইনি এবং ভ্রাতা প্রবোধচন্দ্রের পূজনীয়া মাতা গোলাপসুন্দরী দেবী যাত্রা করেন। এবারে ইঁহারা উভয়ে কয়েকদিন প্রাণভরে উৎসব সম্ভোগ

করেন। এই উৎসবের শান্তিবাচনের দিনে আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ দেব স্বহস্তে প্রসাদ বিতরণ জন্য বাটী মধ্যে প্রবেশ করায়, আচার্য্য-পত্নী ইঁহাদের লক্ষ্য করিয়া আচার্য্যদেবকে বলিয়াছিলেন, "অমরাগড়ীর বৌমাদিগকে উত্তমরূপে আশীর্ব্বাদ কর, যদ্দ্বারায় ইঁহারা তথায় মার নামের জয়গান করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন।" আচার্য্যদেব ইঁহাদের হস্তে প্রসাদ দিয়া সহাস্যবদনে সুমিষ্টবচনে কহিলেন, "এখনও কি আমার আশীর্ব্বাদ বাকী আছে? অমরাগড়ীতে মার বিধানের জয় হউক, আমি দেখিয়া সুখী হই।"

শ্রীমদাচার্য্যদেবের আশীর্ব্বাদ লইয়া ইঁহারা স্বদেশে আসিয়া, সাধন ভজন ও সংসারে নববিধানধর্ম্মস্থাপনের জন্য প্রাণপণে যত্নবতী হইলেন। কিছুদিন পরে ১২৯৩ সালে ইঁহাদের দ্বিতীয়া শিশুকন্যা সরোজিনী দেবী কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া মরণাপন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। সে সময়ের ঘটনা সম্বন্ধে ভক্ত ফকিরদাস লিখিয়াছেন, "স্থানীয় চিকিৎসকগণের চিকিৎসায় কিছু ফল না হওয়ায়, তাঁহারা পতি পত্নী উভয়ে দুইটী কন্যাকে লইয়া দ্বিতীয়ার (সরোজিনী দেবীর) চিকিৎসার্থে কলিকাতায় গমন করেন। * * এ সময় অর্থাদির অভাবে অল্পাহার প্রায় প্রতিদিন, মধ্যে মধ্যে অনাহারও গিয়াছে। একদিবস মহাবিপদ কালে ভাই আশুতোষ রায় তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। যিনি বিপন্নজনের উদ্ধারকর্ত্তা, তিনিই আশুতোষকে তাঁদের সঙ্গী করিয়া দিয়াছিলেন; নচেৎ তাঁরা পতি পত্নী জ্যেষ্ঠা ও রুগ্ন কন্যাসহ যেরূপ প্রাণসংশয় অবস্থায় পড়িয়াছিলেন, তাহাতে কি জানি কি হইত। কন্যার কঠিন পীড়া হেতু সম্পূর্ণ রিক্ত, উভয়ে অনেক সময় অভুক্ত, একদিন যিনি রাজবধূ, আজ তিনি পতি সঙ্গে পথের ভিখারিণীর ন্যায় মৃতপ্রায় কন্যাকে বক্ষে লইয়া স্থানান্তরে আশ্রয় পাইবার আশায় গভীর রজনীতে কলিকাতার রাজপথে চলিতেছেন।" এই সময়েই শ্রীমদাচার্য্য ব্রহ্মানন্দদেব নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া অমরলোকে যাত্রা করায়, সমস্ত মণ্ডলীসহ ইঁহারা অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হন। এই মহাশোকের দিনে ভক্তের প্রজ্বলিত চিতাপার্শ্বে ভক্ত ফকিরদাস মা বিধানজননীর দ্বারা আদিষ্ট হইয়া চির বৈরাগ্য-ব্রত-গ্রহণের সংকল্প করেন; তাঁর এই মহাব্রতগ্রহণের সহায়তা করিবার জন্য মাতা শশিমুখী দেবীও দৃঢ়ব্রত হয়েন। আচার্য্য দেবের স্বর্গারোহণের এক বৎসর পরে ভক্ত ফকিরদাস প্রচারব্রত গ্রহণ করেন। এই স্বর্গীয় ব্রতানুষ্ঠান সম্বন্ধে মাতা শশিমুখী দেবী কিরূপ পতির সহগামিনী হইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে ইতিবৃত্তে লিখিত হইয়াছে—"১২৯১ সালের ৭ই ফাল্গুন, ভক্ত ফকিরদাসের প্রচারব্রতগ্রহণের দিন নির্দ্দিষ্ট হইলে, ঐ দিন তিনি অন্যান্য দিনের ন্যায় প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, ধীরে ধীরে স্বীয় শয়নাগারে পত্নী শশিমুখী দেবীর নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, আজ রাজবাটী ত্যাগ করিয়া পর্ণকুটীরবাসিনী হইতে হইবে, রাজবধূত্ব পরিহার করিয়া পতি সঙ্গে ভিক্ষালব্ধ অন্নে জীবন-যাপনব্রত গ্রহণ করিতে হইবে।" ইতিপূর্ব্বে শশিমুখী দেবীকে তিনি কোন কথা বলেন নাই; কিন্তু আশ্চর্য্য, তখনই দেবী উত্তর দিলেন, "আমি জানি, আমার আশ্রয় এবং গতি আমার পতিতে; আমার স্বতন্ত্র কোন অভিপ্রায় আছে, ইহা মনে করিবার কোন প্রয়োজন নাই।" ঐরূপ সায় পাইয়া ভক্ত ফকির-দাস প্রথমে তাঁর পিতৃদেব সূর্য্যকুমার রায় মহাশয়ের আশীর্ব্বাদ ও গুরুজনদিগের আশীর্ব্বাদ লইয়া, তাঁহাদের বাসগৃহ অট্টালিকা পরিত্যাগ করিয়া পর্ণকুটীরবাসী হইবার জন্য যাত্রা করিলেন। তাঁরা বিদায়কালে গাহিলেন—"চল ভাই সবে মিলে যাই সে পিতার ভবনে; শুনেছি নাকি তাঁর বড় দয়া দুঃখী তাপী পাপী জনে।" মাতা শশিমুখী দেবীও কনিষ্ঠা কন্যা সরোজিনী দেবীকে কোলে লইয়া, জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমপ্রভার হস্ত ধারণ করিয়া পতির পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। সেদিনকার গৃহত্যাগের স্বর্গীয় দৃশ্য আজও এই অধম সন্তানের হৃদয়ে জল জল করিয়া জ্বলিতেছে। সে দিন মনে হইল, হরিভক্তিবিধানে চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে একদিন ঘোর নিশাকালে প্রাণাধিক শ্রীগৌরাঙ্গ হরিপ্রেমে পাগল হইয়া নবদ্বীপ আঁধার করিয়া, বৃদ্ধা শচীমাতাকে ও প্রেমের প্রতিমা সাধ্বী বিষ্ণু-প্রিয়াকে অকূল পাথারে ভাসাইয়া গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন। আজ এই নবভক্তিবিধানে প্রাণাধিক ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ও সাধ্বী সতী জগন্মোহিনী দেবীর পদানুসরণে আমাদের কাঙ্গাল ভক্ত ফকিরদাসের সহিত মা শশিমুখী দেবীও সন্ন্যাসিনীর ন্যায়, শ্বশুরের অট্টালিকা ছাড়িয়া পর্ণকুটীরবাসিনী হইয়া ভিক্ষান্নে জীবনযাপনের জন্য মহাযাত্রা করিলেন। সেই অবধি তাঁরা একটী সামান্য পর্ণকুটীরে বসবাস করিয়া জীবনে চির দারিদ্র্য-ব্রত পালন করিতে থাকেন। সেই দিন হইতে আমরাও নব-বিধানবিধাতা পরম সুন্দর শ্রীহরির এই ক্ষুদ্র লীলাক্ষেত্রে নব নব লীলা দেখিয়া কৃতার্থ হইতেছি।

(ক্রমশঃ)

—০—

দেবী মঙ্গলা ও ভ্রাতা বিনয়েন্দ্রনাথ

আজ পুরাতনবর্ষ ও নববর্ষ দুইয়ের সঙ্গম-তীর্থে আসিয়া যে দুই আত্মার আত্মিক মিলন ভূমিতে উপস্থিত হইলাম, সেই দুই আত্মা এক মহা নূতন তত্ত্ব সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। জননী দেবী মঙ্গলা ১০ই এপ্রিল, আর তাঁর সন্তান বিনয়েন্দ্রনাথ দশ বৎসর পূর্ব্বে ১২ই এপ্রিল সেই মহাযোগধামে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাদের নবীন যোগে মিলিত হইলেন। যিনি পরে আসিয়াছিলেন, তিনি বিধাতার বিধানে অগ্রেই প্রস্থান করিলেন।

যে যুগে দেবী মঙ্গলা মহা নিষ্ঠাবান হিন্দু পরিবার হইতে হিন্দু মতে বিবাহিতা হইয়াও, তাঁহার শ্বশুরালয়ে নববিধানের শঙ্খ বাজাইয়া ছিলেন, তাহা লিপিবদ্ধ হইবার যোগ্য। এ দিকে ভক্ত

স্বামী সেইরূপ নিষ্ঠাবান হিন্দু পরিবারভুক্ত হইয়াও ভক্ত ব্রহ্মানন্দের নবোন্মেষিত ধর্ম্মজীবনের মহাভাবের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। দেবী মঙ্গলা তাঁহার ভক্তিমান পিতার পরিবারে যে ভক্তির ভাব ও ধর্ম্মনিষ্ঠার মধ্যে বর্দ্ধিত ও গঠিত হইয়াছিলেন, সেই ভাব ভক্ত স্বামী মধুসূদনের নূতন ভাবের সহিত গঙ্গা যমুনার জলের মত মিলিয়া গেল। অবশ্য ইঁহারা ধর্ম্মজীবনের উষা-কালে তাঁহাদের হিন্দু আত্মীয় বন্ধুদিগের সমাজশাসন হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইতে পারেন নাই। তাঁহাদের সেই নব পরিবারজাত প্রথমা কন্যা দেবী সুমতির হিন্দু মতে হিন্দু পরিবারে বিবাহ দিয়াছিলেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে দেবী সুমতির সঙ্গে আমার বিবাহ হইয়াছিল। বৈষ্ণবভাবাপন্ন পিতামাতার ভক্তির ভাব, খ্রীষ্টীয় মিসনারিদিগের কালনাস্থ উচ্চ শ্রেণী ইংরাজি বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভে একেশ্বরবাদের ভাব এবং পিতামাতার ইসলামবাদী সাধু ভক্ত পির পেগম্বরের প্রতি ভক্তি থাকাতে ইসলামভক্তি আমার ভিতরে অস্ফুটাকারে প্রবেশ করিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিয়াও ব্রহ্মমন্দিরে ভক্ত ব্রহ্মানন্দের প্রাণস্পর্শী উপাসনা সম্ভোগ করিতাম। এই সমস্ত ভাবের ভিতর যখন ভক্ত মধুসূদন ও ভক্তিমতী মঙ্গলা দেবীর পতিষ্ঠিত পরিবারে প্রথম জামাতারূপে প্রবেশ করিলাম, তখন যেন একটা নূতন হাওয়ার মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। যে ভূমি আমার ভিতরে ক্রমশঃ প্রস্তুতির দিকে আসিতেছিল, তাহার ভিতরে উপ্ত বীজ ক্রমে অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে নববিধানপ্রচারক ভক্ত বলদেবনারায়ণের নিকট আমরা উভয়ে নবসংহিতানুসারে নববিধানে দীক্ষা গ্রহণ করিলাম। দেবী মঙ্গলা ও জননী দেবী ভবসুন্দরী উভয়েই নদীয়া জিলার অন্তর্গত কাঞ্চনপল্লীতে (কাঁচড়াপাড়া) উচ্চ শ্রেণীর বৈদ্যবংশে এবং ভক্তিপ্রধান বৈষ্ণব পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। বিধাতার অদ্ভুত কৌশলে উভয় জননীর ভিতর হইতে নূতন নববিধান-পরিবার নব প্রস্রবণের ধারার মত বাহির হইয়াছে।

দেবী মঙ্গলার প্রথম পুত্র ভাই বিনয়েন্দ্রনাথ তাঁহার শৈশব জীবন হইতে পিতামাতার সহিত ব্রহ্মমন্দিরে ব্রহ্মোপাসনার নীরবে বসিয়া থাকিতেন। যখন তাঁহার ষোল বৎসর বয়স এবং কেবল মাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তখন আমাদের আচার্য্যদেব মহা প্রস্থান করেন। তাহার পর ভক্ত প্রতাপচন্দ্রের জীবনের প্রভাব ও মহা শিক্ষা তাঁহার ভিতরে প্রবেশ করিতে থাকে। তিনি তাঁহার ছাত্রজীবনেই তৎকালীন কয়েকটী অল্পবয়স্ক বন্ধু লইয়া নিজেদের মধ্যে গোপনে একটী Prayer Meeting সংস্থাপন করেন এবং গোপনেই উপাসনা, আলোচনা এবং বক্তৃতাও করিতে থাকেন। ক্রমে নববিধান তাঁহার ভিতরে এরূপ ভাবে উৎকর্ষিত হইয়াছিল যে, তিনি যখন কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক, তখন ইউরোপস্থ জেনিভা নগরের Religious Conference হইতে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধিরূপে বক্তৃতার জন্য আহূত হইয়া, তথায় তাঁহার ওজস্বিনী ভাষার নববিধানের কথা বলিয়া আসিয়াছেন। তাহার পর আমেরিকানিবাসী উদার নৈতিক খৃষ্টবাদী মহামহোপাধ্যায় জে, টি সাণ্ডারল্যাণ্ড এবং আর আর উদার নৈতিক খৃষ্টবাদীর উৎসাহে ইংলণ্ড ও আমেরিকার অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়া নববিধান প্রচার করিয়া আসিয়াছেন। ভারতের অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়া এই নবতত্ত্ব ঘোষণা করিয়াছেন। বিধাতার দুর্ব্বোধ্য বিধান কে বুঝিবে? তাঁহার এই উন্মেষপূর্ণ কোরকজীবনেই তিনি সেই উচ্চতম অদৃশ্য নববিধানে প্রবেশ করিলেন। তবে একথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না যে, তিনি তাঁহার সেই জীবনের যে উচ্চ আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা যুবক কেন, বৃদ্ধেরও অনুকরণীয়। আমরা সে আদর্শ হইতে এখনও অনেক দূরে। বিধাতার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

প্রার্থনা

(বিনয়-তীর্থে ২৮শে এপ্রিল সাম্বৎসরিক দিনে)

ইচ্ছাময় ঠাকুর! আজ এই নূতন বৎসরে কোন্ নূতন তীর্থে আনিলে? তুমি কি তোমার নববিধানে সব নূতন করিতে এসেছ? ভাষ্যকার শাস্ত্রকার বৎসরের উপক্রমণিকাতে নূতন বৎসর বলিলেন। বৎসর অর্থে নূতন শিশু। আবার তাঁরা নববর্ষও বলিলেন। বর্ষ শব্দের অর্থ বর্ষণ করা। তুমি নব শিশু দিয়া নূতন করুণা বর্ষণ করিলে। আজ তীর্থে কি তুমি তাহাই দেখাতে আনিলে? পুরাতন বর্ষের শেষ দিনে মার উৎসব করিয়া, নব বর্ষে প্রবেশ করিয়া, নব শিশু আরও নূতন হইতে চাহিলেন; তাই বাহিরের আবরণটা ছেড়ে দিয়ে এক নূতন পাখী হয়ে অদৃশ্যে উড়িয়া গেলেন। এ পাখীত আমরা হতে পারলাম না। শ্রীব্রহ্মানন্দের পায়রা উড়েছিল। আমিটাও উড়ে গেল। নূতন শিশু বুঝি সেই সাধন করেছিলেন, এক বিশ্বপ্রেমে এমন কিছু সাধন করেছিলেন, যে এক অজ্ঞাত ইয়োরোপীয় মহিলার ব্যগ্রতাপূর্ণ প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্য প্রেমে পূর্ণ হইয়া, অদৃশ্য আকাশপথে তাঁহারই সঙ্গে এক মহাপ্রেমে আত্মাহুতি দিলেন। বিশ্বপ্রেমে মানুষ কোথায় উড়িয়া যায়, ইহা দেখাইবার জন্য তুমি এই অভিনয় আমাদের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানুষকে দেখাইয়া শিখাইলে। বৎসরের উপক্রমণিকায় তুমি এই শিক্ষা দিয়া আমাদিগকে তোমার দিকে অগ্রসর করিবে, তাই এ শিক্ষা আসিল, প্রেমিক শিশুর মহা বিশ্রামস্থান অদৃশ্য প্রকোষ্ঠে। তাই পাশ্চাত্য ঋষি বলিলেন, "Leave a greater part of your time to be free for your complete sabbath in

Him." তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও সহ সাধিকা শান্তিকেও পূর্ণ শান্তি শিক্ষা দিয়া গেলেন।

তোমার বিধানে তোমার প্রেমিক শিশুকে দিয়া আমাদিগকে স্বর্গের মত শিক্ষা বিধান করিলে। তোমার নববিধানে তুমি ধন্য। তোমার নূতন বৎসরে এই নূতন শিক্ষায় দীক্ষিত কর। আজ তোমার নিকট এই প্রার্থনা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

প্রেরিত ভাই অমৃতলাল বসু

(২৭শে এপ্রিল সাম্বৎসরিক স্মৃতি উপলক্ষে)

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে নববিধানের প্রেরিত ভক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় অমরধামে গিয়াছেন; এই দীর্ঘকালেও তাঁর জীবনের প্রভাব মণ্ডলীতে বিস্তার হইল না দেখিয়া প্রাণে বড় ব্যথা পাই। ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের বাহিরের সৌন্দর্য্য ও আলোকমালার পারিপাট্য তাঁকে স্মরণ করাইয়া দেয় সত্য, কিন্তু প্রাণারাম শ্রীহরির নামে সে মধুর আহ্বান ও সিংহবিক্রমে উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য, প্রেমে বিগলিত নয়নাশ্রু যেন শূন্যে মিশিয়া গিয়াছে। ভক্ত অমৃতলাল পবিত্রাত্মার প্রভাবে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা লইয়া, ভক্ত ব্রহ্মানন্দের সহচররূপে দেশ ও নগরকে হরিনামে মাতাইয়াছিলেন। সে সময় ব্রহ্মমন্দিরে বিশ্বাসিমণ্ডলীর সমাবেশ দেখিয়া প্রাণ পুলকে পূর্ণ হইত। নীতিতে শুদ্ধতাতে ভক্ত অমৃতলালের জীবনটী সর্ব্বদা উৎসাহপূর্ণ ছিল। সেই যে ব্রহ্মানন্দ একদিন অতি প্রত্যুষে ডাকিলেন, "অমৃতলাল, জাগো!" অমনি তিনি জাগিলেন; সেই জাগ্রত অবস্থা তিনি সারা জীবনটী দেখাইয়া গেলেন। ভক্ত অমৃতলাল মণ্ডলীর নরনারীকে বিশেষ ভাবে আপনার আত্মার অন্তরঙ্গ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তাই সপ্তাহ ব্যাপিয়া উৎসাহে মত্ত হইয়া এই কলিকাতা নগরের পল্লিতে পল্লিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভাই ভগিনীদের সংবাদ লইতেন। তাঁদের বাড়ীতে বাড়ীতে উপাসনা করিতেন, আলোচনা করিতেন; তাই তাঁর মধুময় আকর্ষণে পড়িয়া ব্যাকুল হইয়া তাঁরা ব্রহ্মমন্দিরে সমবেত হইতেন। মাতা যেমন সন্তানের অদর্শনে আকুল হইয়া পড়েন, ভক্ত অমৃতলাল সত্যই তেমনি ব্যাকুল হইয়া বাড়ী বাড়ী ছুটিতেন। তাঁর জড় শরীর পারে না, তথাপি উৎসাহে মত্ত হইয়া ছুটিতেন ও মত্ততার সহিত হরিগুণ কীর্ত্তন করিতেন। তাঁর সেই মধুমাখা উপাসনা, পরব্রহ্মের প্রত্যেক স্বরূপের উপলব্ধিতে ভক্তির উচ্ছ্বাস, আজও মনে হলে, এই শুষ্ক প্রাণ সরস হয়, হৃদয়টা পুলকে পূর্ণ হয়। জানি না, কি মধুর ডাকেই ভক্ত ব্রহ্মানন্দ অমৃতলালকে ডাকিয়াছিলেন; অমৃতলালও তাই ভগিনীদিগকে মধুস্বরে হুঙ্কাররবে ডাকিলেন, "তোরা আয়রে পুরবাসিগণ, আনন্দেতে করি সংকীর্ত্তন। তোদের ব্রহ্মধামে লয়ে যেতে এসেছেন পতিতপাবন। এসো ডঙ্কা মেরে ভবপারে সবে করিহে গমন।" ভক্ত তো জড় শরীরকে তুচ্ছ করে ডঙ্কা মেরে ঐ অমরধামে আজকার দিনেই গেলেন। তবে আমরাই বা কেন এখনো মোহ ঘুমে অচেতন হয়ে থাকবো? তাই মনে হয়, ভাই ভগিনীগণ! এসো সবাই আমরা জাগিয়া এই প্রাণারাম শ্রীহরির নামে মত্ত হইয়া ভক্তদলের মান রাখি। এখনও সময় আছে, পূর্ব্বের চেয়ে পার্থিব সুযোগ বিধাতা আমাদের অনেক দিয়েছেন, এ সুযোগের সদ্ব্যবহারে বিমুখ হইলে সত্যই আমাদিগকে ঘোরতর অপরাধী হইতে হইবে। পূর্ব্বতন ভক্তদল নববিধানের নূতন সুরে গেয়েছিলেন, "হইবে ভক্তের জয় নিশ্চয় নিশ্চয় রে অরো যে আসিছে কত আপনার জনরে।" তবে আমরাও সকলে এস সমস্বরে বলি, জয় মা আনন্দময়ীর জয়, নববিধানের জয়, ভক্তবৃন্দের জয়!

শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়।

বৈমানিক বিনয়কুমার দাস

হাওড়ায় মর্ম্মরমূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন

হাওড়া বেলিলিয়স পার্কে প্রসিদ্ধ বৈমানিক স্বর্গীয় বিনয়কুমার দাসের মর্ম্মরমূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন উপলক্ষে, গত রবিবার, (২রা মে) অপরাহ্ণে একটী জনসভা হয়। সন্তোষের মহারাজা সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বহু বিশিষ্ট নরনারী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ঐ সময় বৈমানিক শ্রীযুক্ত বীরেন রায়, বিমানচালনায় প্রথম দাস-রায় বৃত্তিপ্রাপ্তা শ্রীযুক্তা এম ব্যানার্জ্জির সহিত চলন্ত বিমান হইতে স্বর্গীয় দাসের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। সভাপতি পার্কে উপস্থিত হইলে হাওড়া সঙ্ঘের ব্যাণ্ডপার্টি তাঁহাকে সামরিক কায়দায় অভিবাদন করিয়া সভাস্থলে লইয়া যায়।

বৈদিক স্তোত্র সমাপনান্তে সভার কাজ আরম্ভ হয়। বিনয়কুমার দাস মেমোরিয়াল কমিটীর সম্পাদক ডাঃ জে চক্রবর্ত্তীর উদ্বোধন বক্তৃতার পর, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে প্রাপ্ত কতকগুলি পত্র পাঠ করা হয়। অতঃপর মিঃ এইচ কে মুখার্জ্জি ও ডাঃ এ আর ঘোষ স্বর্গীয় বিনয়কুমার দাসের গুণাবলীর উল্লেখ করিয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। সভাপতি বক্তৃতা-প্রসঙ্গে স্বর্গীয় দাসের কর্ম্মশক্তি, বাগ্মিতা ও সাহসের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, মৃত্যু অনিবার্য্য। স্বর্গীয় দাসের মত বীরের ন্যায় মৃত্যু সকলেরই কাম্য। অতঃপর সভাপতি স্বর্গীয় দাসের মর্ম্মর-নির্ম্মিত আবক্ষ প্রতিমূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করেন।

(২০শে বৈশাখের "আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত)

সমন্বয়-সঙ্গীত

অসীম আকাশতলে ভব-দেব দেউলে
মিল হে অমৃতসন্তান!
তুল জয়সঙ্গীত বিশ্বপিতার
ভুলে গিয়ে সব ব্যবধান।
গাহ জয় ধরমের আনন্দ আলোকের,
শুদ্ধ, পবিত্রের, সত্য, সুন্দরের,
গাহ জয় গায় জয় আদর্শ জীবনের,
হয়ে ভাই এক মন প্রাণ ॥
ওই হের অম্বরে রবি শশী গ্রহ তারা
তাঁরই পদ বন্দিছে চির দিবারাত্রি;
এসো হে ভুবনবাসী বন্দনা গাহিবারে,
গৃহ কোণ ছেড়ে এসো অসীমের যাত্রী।
এসো হে হিন্দু শিখ ইসলাম পারসীক,
পুলকে মগন হোক ধরণীর দশদিক,
এসো খ্রীষ্টান ভাই মিলনের গান গাই,
সত্যের তুলিয়া নিশান।

সমরেন্দ্র দত্ত-রায়।

—•—

বালকবালিকাদিগের নীতিবিদ্যালয়ের উৎসবের আয় ও ব্যয়

(জানুয়ারী, ১৯৩৭)

আয় :—

লেঃ কর্ণেল জ্যোতিলাল সেন ২৫৲, মহারাজকুমার ধ্রুবেন্দ্রচন্দ্র ভঞ্জদেও ২০৲, শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার গুপ্ত ২০৲, লেডি সিংহ ১০৲, নন্দগাঁওয়ের রাণী সাহেবা ১০৲, লেঃ কর্ণেল মণি দাস ১০৲, ডাঃ সত্যানন্দ রায় ১০৲, অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ সেন ১০৲, শ্রীযুক্ত অরুণ মুখোপাধ্যায় ১০৲, শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দেবী ৫৲, শ্রীমতী মৃণালিনী সেন ৫৲, শ্রীমতী উষা মুখোপাধ্যায় ৫৲, শ্রীমতী ব্রহ্মকুমারী রায় ৫৲, মিসেস সতীকুমার চট্টোপাধ্যায় ৫৲, শ্রীমতী মায়া বসু ৫৲, শ্রীমতী মল্লিকা বীর ৫৲, শ্রীমতী গীতা মল্লিক ৫৲, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন ৫৲, শ্রীযুক্ত সতীকুমার চট্টোপাধ্যায় ৫৲, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকুমার দাস ৫৲, শ্রীমতী সুশীলা সেন ৪৲, শ্রীমতী প্রভাতবালা সেন ৪৲, শ্রীমতী মণিকা গুপ্ত ৩৲, শ্রীমতী সরলা দাস ৩৲, শ্রীমতী সুজাতা লাহিড়ী ৩৲, শ্রীমতী সুষমা গঙ্গোপাধ্যায় ৩৲, মিঃ ও মিসেস কমলেন্দ্রনারায়ণ ৩৲, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সিংহ ৩৲, শ্রীমতী সুজাতা সেন ২৲, মিসেস খাস্তগীর ২৲, শ্রীমতী স্নেহলতা রায় ২৲, শ্রীমতী শৈলজা রায় ২৲, শ্রীমতী সরযূবালা রায় ২৲, শ্রীমতী মীরা গুপ্ত ২৲, শ্রীমতী প্রতিমা দাস ২৲, শ্রীমতী মণিকা মহলানবিশ ২৲, শ্রীমতী সুধা দাস ২৲, শ্রীমতী মালতী সেন ২৲, শ্রীমতী বিনয়নন্দিনী মজুমদার ২৲, লেঃ কর্ণেল করুণাকুমার চট্টোপাধ্যায় ২৲, শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী ২৲, শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ গুপ্ত ২৲, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ২৲, শ্রীযুক্ত বিজনকুমার সেন ২৲, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বসু ২৲, শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ লাহা ২৲, শ্রীযুক্ত হরিসুন্দর দাস ২৲, শ্রীযুক্ত এম, গুপ্ত ২৲, ডাক্তার প্রবোধচন্দ্র রায় ২৲, ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষ ২৲, শ্রীমতী প্রফুল্ল বানার্জি ১৲, শ্রীমতী সুমতি সেহানবীশ ১৲, শ্রীমতী কিরণময়ী সেন ১৲, শ্রীমতী চারুবালা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৲, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার রায় ১৲, শ্রীযুক্ত ধ্রুবরঞ্জন দাস ১৲, শ্রীমতী বিভা মুখোপাধ্যায় ১৲, শ্রীমতী প্রতিভা চক্রবর্ত্তী ১৲, শ্রীমতী কৃপা ঘোষ ১৲, শ্রীমতী প্রসূন রায় ১৲, শ্রীমতী প্রীতি দত্ত ১৲, শ্রীমতী সাবিত্রী সরকার ১৲, শ্রীমতী সরযূ ঘোষ ১৲, শ্রীযুক্ত ক্ষেপেন্দ্রনাথ মজুমদার ১৲, শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার খাস্তগীর ১৲, শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র রায় ১৲, শ্রীযুক্ত এস, রায় ১৲, শ্রীযুক্ত জ্যোতিকুমার আনন্দ ১৲, শ্রীযুক্ত দীনেশরঞ্জন দাস ১৲, শ্রীযুক্ত হিমাংশু বসু ১৲, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত কোঁয়ার ॥০, শ্রীযুক্ত অকিঞ্চন রায় ॥০, শ্রীযুক্ত সুধা রায় ॥০, শ্রীযুক্ত দেবানন্দ বসু ॥০, শ্রীমতী কে, মিত্র ॥০, শ্রীমতী সুনীতি ঘোষ ॥০, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সেন ৪॥০, নববিধান ট্রাষ্ট (প্রশান্ত খাস্তগীর পুরস্কার) ৫৲, মনোজিত ফণ্ডের সুদ ১॥০। মোট ২৮৪৲ টাকা।

ব্যয় :—

বালিকাদিগের পুরস্কারের বই, খেলানা প্রভৃতি	৭৮॥৶৫
বালকদিগের ঐ	৫৭॥১০
বালকবালিকাদিগের জলযোগ	৯০॥০
কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলের জন্য	১৯৲
ঐ হলের গ্যালারী সরান	৮৲
চেয়ার সালু প্রভৃতির ভাড়া	১২৲
ডাক টিকিট	৫।৶০
ইন্‌ষ্টিটিউট ও মন্দিরের দরোয়ানদের বক্‌সিস্	৬।০
ফিতা প্রভৃতি	৩৶১০
বিবিধ	৩৶১৫
মোট	২৮৪৲

শ্রীশকুন্তলা দেবী
বালিকাদিগের নীতিবিদ্যালয়ের সম্পাদিকা।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেন
বালকদিগের নীতিবিদ্যালয়ের সম্পাদক।

—•—

স্বর্গীয় অপূর্ব্বকৃষ্ণ পালের ট্রষ্ট ফণ্ড

স্বর্গীয় শ্রদ্ধাস্পদ অপূর্ব্বকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের উইল দত্ত ট্রষ্ট ফণ্ডের সংক্ষিপ্ত হিসাব ইতিপূর্ব্বে প্রথমবার ১৩৩২ সালে ১৬ই বৈশাখ, সমসাময়িক ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৯শে এপ্রিলে ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকায় আমি প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাহার পরে দ্বিতীয় বার ১৩৩৬ সালে ১লা জ্যৈষ্ঠ, সমসাময়িক ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ই মেতে উক্ত পত্রিকাতে প্রকাশ করিয়াছিলাম। উক্ত ফণ্ডের ৮৭০০৲ টাকা Government Promissory Notes মৌজুত আছে, যাহার সুদ হইতে দাতার অভিপ্রায় অনুসারে আমি যথাসাধ্য বিতরণ করিয়া আসিয়াছি। Government Promissory Notes এর উক্ত টাকা বাদ যে উদ্বৃত্ত টাকা আমার হস্তে ছিল, তাহার হিসাব ইতিপূর্ব্বে ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশ করিয়াছি এবং এখন আজ পর্য্যন্ত প্রকাশ করিতেছি।

১৩৩৬ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠের ধর্ম্মতত্ত্বে উল্লিখিত মৌজুত তহবিল ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারীতে ... ৪৭৯।৫

এই ৪৭৯৲ টাকার সুদ Bihar Bank Savings Bank এ ১৯২৯খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী হইতে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল পর্য্যন্ত ৮ বৎসর ৪ মাসে ... ১০০৲

মোট মৌজুত তহবিল ১লা মে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে বিহার ব্যাঙ্ক সেভিংস্ ব্যাঙ্কে ... ৫৭৯।৫

পাঁচশত উন-আশি টাকা চারি আনা পাঁচ পাই মাত্র।

বাঁকিপুর, পাটনা।
৬ই মে, ১৯৩৭।

শ্রীপরেশনাথ চট্টোপাধ্যায়।
স্বর্গীয় অপূর্ব্বকৃষ্ণ পালের উইলের এক্‌জেকিউটার সম্পাদক।

—:—

সংবাদ।

সম্রাটের রাজ্যাভিষেক—আমাদের প্রিয়তম সম্রাট ৬ষ্ঠ জর্জ্জের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে, গত ১২ই মে, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর পক্ষ হইতে, কমলকুটীরস্থ নবদেবা-দেবালয়ে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে ৭নং ময়ূরভঞ্জ রোডে, ময়ূরভঞ্জ রাজবাটী রাজবাগে শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্রনাথ রায় উপাসনা করেন, মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী ও শ্রীযুক্ত হরিসুন্দর দাস প্রার্থনা করেন। রাজাধিরাজ বিশ্বপতি ব্রিটিশরাজ ও ব্রিটিশ রাজ্যের কল্যাণ বিধান করুন।

নবগৃহে প্রবেশ—গত ৯ই মে, ৪০নং দিলখুসা ষ্ট্রীটে, ডাঃ ধর্ম্মানন্দনারায়ণের নবগৃহপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্রনাথ রায় উপাসনা করেন। ভগবান্ গৃহকে এবং গৃহের অধিবাসীদিগকে শুভাশীষ দান করুন।

শুভবিবাহ—গত ৩১শে বৈশাখ (১৪ই মে), শুক্রবার, সন্ধ্যা ৭টায়, হাওড়া-নিবাসী ৺ডাক্তার শরৎকুমার দাসের তৃতীয় পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ সুকুমারের সহিত, স্বর্গগত প্রেরিত ভাই দীননাথ মজুমদারের প্রপৌত্রী, শ্রীমান্ যোগীন্দ্রনাথ মজুমদারের জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী অরুণার শুভবিবাহ অনুষ্ঠান, কলিকাতায়, ৪৫নং বেনিয়াটোলা লেনে মিত্র ইন্‌ষ্টিটিউসন ভবনে নবসংহিতামতে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ শুভানুষ্ঠানে আচার্য্যের ও পুরোহিতের কাজ করেন। ভগবান্ নবদম্পতিকে স্বর্গের শুভাশীষ দান করুন।

দীক্ষা—গত ১১ই মে, কলিকাতায়, ৫৭।৯ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে, স্বর্গগত ভাই দীননাথ মজুমদারের প্রপৌত্রী, শ্রীমান্ যোগীন্দ্রনাথ মজুমদারের জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী অরুণা নবসংহিতানুসারে নববিধানে পবিত্র দীক্ষাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা ও দীক্ষাদান করেন।

গত ১২ই মে, ২৮নং নরসিংহ দত্ত রোডে, স্বর্গীয় ডাক্তার শরচ্চন্দ্র দাসের তৃতীয় পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ সুকুমার দাস নব-সংহিতামতে নববিধানে পবিত্র দীক্ষাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা ও দীক্ষাদান করেন।

ভগবান্ নবদীক্ষার্থীদিগকে শুভাশীষ দান করুন।

পরলোকগমন—আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, সিরাজগঞ্জের যোগনালা গ্রামের স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পুত্র, স্বর্গগত প্রচারক কালীশঙ্কর দাস কবিরাজ মহাশয়ের দৌহিত্র, কুচবিহার কলেজের বাঙ্গলার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী গলক্ষত রোগের চিকিৎসার্থ কুচবিহার হইতে কলিকাতায় নার্সিংহোমে গত ১লা মে প্রাতে আসিয়া, সেইদিনই অপরাহ্ণে অমরধামে চির সুস্থতার রাজ্যে চলিয়া গিয়াছেন। গত ১১ই মে, কুচবিহারে নিজবাসভবনে তাঁহার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান নব-সংহিতামতে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী উপাসনা করেন এবং শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র আইচ শাস্ত্রাদি পাঠ করেন। পুত্র শ্রীমান্ নিরুপম চক্রবর্ত্তী প্রধান শোককারীর প্রার্থনা করেন। অপরাহ্ণ ৫টার সময় দুইশত ভিখারীকে চাউল ও পয়সা বিতরণ করা হয়। কাঁসার থালা সহ একটী ভোজ্য একটী বিধবাকে দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কলিকাতা নব-বিধান ব্রাহ্মসমাজ ১৲, প্রচারাশ্রম ১৲, অনাথাশ্রম ১৲, কুচবিহার অনাথাশ্রম ১৲, সেবিকা ভাণ্ডারে ১৲ টাকা দান করা হইয়াছে। বিধানজননী তাঁহার প্রিয় সন্তানকে প্রেমবক্ষে স্থান দান করুন এবং শোকার্ত্ত পরিবারের ও আত্মীয়গণের প্রাণে শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে "আনন্দবাজার" পত্রিকা হইতে নিম্নোক্ত

অংশ উদ্ধৃত করা গেল :—

গত ১লা মে স্থানীয় ভিক্টোরিয়া কলেজের বঙ্গভাষার অধ্যাপক বিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ মহাশয় কলিকাতার নার্সিং হোমে মারা গিয়াছেন। বিমলবাবু একজন কৃতী সাহিত্যিক ছিলেন। প্রথমে তিনি এখানকার সুনীতি একাডেমি নামক বালিকা-বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসাবে প্রবেশ করিয়া, সেখান হইতে নিজ চেষ্টায় আই-এ, বি-এ ও এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাহার পর কেশিক্স বিদ্যালয়ে কিছুদিন সুনামের সহিত বাঙ্গলার শিক্ষক হিসাবে কাজ করিয়া রাজকুমারীদের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। সেখানকার কার্য্য শেষ হওয়ার পর, মাত্র কয়েক মাস পূর্ব্বে তিনি বাঙ্গলার অধ্যাপকরূপে কলেজে প্রবেশ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে তিনি গল রোগে ভুগিতেছিলেন। তারপর ডাক্তারগণ তাঁহার যক্ষ্মা রোগ বলিয়া সন্দেহ করেন। চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে উপস্থিত হইবার প্রায় ৫ঘণ্টা পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ ছিল। তিনি অনেক পুস্তক লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে 'বরাটে' প্রধান। তিনি স্ত্রী, এক পুত্র, চারি কন্যা ও বহু বন্ধু রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া তাঁহার স্মৃতির সম্মানার্থে সুনীতি একাডেমি ও মেকিন্স বিদ্যালয়ের ছুটী হইয়াছিল।

মাসিক স্মৃতি—গত ৩০শে বৈশাখ, ৬৫।১ হ্যারিশন রোডে, স্বর্গীয় শ্রীনাথ দত্তের স্মরণার্থ মাসিক উপাসনা ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষ সম্পাদন করেন।

সাম্বৎসরিক—গত ১৭ই বৈশাখ (৩০শে এপ্রিল), বালীগঞ্জে, ৬৷২বি একডালিয়া রোডে, সাধু অঘোরনাথের সহধর্ম্মিণীর সাম্বৎসরিক দিনে, পুত্রদের গৃহে, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করে। এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে ৩৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

গত ২৪শে বৈশাখ (৭ই মে), বেলগাছিয়া কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে, তত্রত্য রেসিডেন্ট সার্জ্জন ডাঃ বিবেকমোহন সেনের গৃহে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় বিজয়মোহন সেনের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। মাতৃদেবী প্রার্থনা করেন এবং এই উপলক্ষে "আচার্য্য কেশবচন্দ্র" পুস্তকের পুনর্মুদ্রণে ৫৲ দান করিয়াছেন।

গত ২৫শে বৈশাখ (৮ই মে), ১৬নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে, স্বর্গীয় রামেশ্বর দাসের মধ্যম পুত্র স্বর্গীয় স্বপ্রকাশচন্দ্র দাসের প্রথম সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

গত ২৮শে বৈশাখ (৯ই মে), আলীপুরে, ৩০নং নিউরোডে, কৃষ্ণনগর কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ স্বর্গীয় রাজেন্দ্রনাথ সেনের প্রথম সাম্বৎসরিক দিনে, ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ উপাসনা করেন। পাটনা হইতে ডাঃ পরেশনাথ চাটার্জ্জি এবং শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসাদ মজুমদারের প্রেরিত প্রার্থনাদি পঠিত হয়।

বিদায় অভ্যর্থনা—

শিলচরের "সুরমা" পত্রিকা আমাদের ভক্তিভাজন প্রেরিত ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছে :—

"শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন চল্লিশ বৎসরের উর্দ্ধকাল শিলচর সহরে নীরব কর্ম্মময় জীবন যাপন করিয়া, গত ২রা বৈশাখ স্বীয় জন্মভূমি ঢাকায় চলিয়া গিয়াছেন। তিনি ঢাকা পাঁচদোনার দেওয়ান বংশধর। তাঁহাকে বিদায় দেওয়া উপলক্ষে স্থানীয় ব্রাহ্মমন্দিরে একবিশেষ উপাসনা হয়। এখানে থাকাকালে তিনি ব্রাহ্মসমাজের সভা ও কতিপয় বৎসর সম্পাদকরূপে ইহার সেবা করিয়াছেন। তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গেও সভা ও সম্পাদক রূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার বিদায়ক্রমে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে রায় সাহেব দীননাথ দাসের সভাপতিত্বে এক সভা হয় ও তাঁহাকে একখানি অভিনন্দন দেওয়া হয়। অতঃপর দুর্গাশঙ্কর পাঠশালায় ৩০শে চৈত্র রেভারেণ্ড মিঃ রিজের সভাপতিত্বে এক মহতী সভা হয়। তাহাতে শিলচর বাসিগণের পক্ষ হইতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয় এবং যুবকসম্প্রদায়ের ও হরিসভার পক্ষ হইতে দুইখানি মান পত্র দেওয়া হয়।"

প্রেরিত পত্র

শ্রদ্ধাস্পদ ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

গত ১৬ই চৈত্র, ১৩৪৩ সালের ধর্ম্মতত্ত্বের সংবাদ-স্তম্ভে পাঠ করিলাম :—

"গত ২৭শে মার্চ্চ, সন্ধ্যায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে, নববিধান ট্রাষ্টের উদ্যোগে, গৌরাঙ্গ-উৎসব ও হোরিখেলা উপলক্ষে সংকীর্ত্তন ও উপাসনা হয়। ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন উপাসনা করেন।"

এখানে গৌরাঙ্গ-উৎসব ও হোরিখেলা দ্বারা আপনারা কি বুঝিয়াছেন ও কি করিয়াছেন, তাহা ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশ করিলে বাধিত হইব। নববিধানে নূতন নূতন পথ আবিষ্কার, বিশ্বাস, ভক্তি, প্রেম, পুণ্য, জ্ঞান, কর্ম্মের যোগে নব নব উন্মেষশালিনী আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তির পূত হাওয়ায় ব্রহ্মসন্তানগণ ব্রহ্মপাদপদ্মে মাথা রাখিতে শিখিবেন, ইহা কিছু বুঝিতে পারি। পূর্ব্বোক্ত হোরিখেলার মধ্যের নূতন আধ্যাত্মিকতা ধর্ম্মতত্ত্বে ব্যাখ্যা করিয়া সুখী করিবেন। আমার চিঠিখানা ধর্ম্মতত্ত্বে স্থান দিয়া বাধিত করিবেন।

স্নেহাকাঙ্ক্ষী সেবক
শ্রীউমাপ্রসন্ন ঘোষ।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭২ ভাগ। ১০ম সংখ্যা। ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, ১৩৪৪ সাল, ১৮৫৯ শক, ১০৮ ব্রাহ্মাব্দ 30th. May, 1937 অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা

"পিতা, শাক্যমুনি কোথায়? ঐ তাঁহার প্রশান্ত মূর্ত্তি তোমার ক্রোড়ে। ব্রহ্ম-ক্রোড় আকাশ হইতে আকাশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সেই ক্রোড়ে আমাদিগের প্রিয়, ভক্তি-ভাজন, বৈরাগ্যের অবতার শাক্য বসিয়া আছেন। শাক্যদেবের চিদাত্মাকে আজ আমাদিগের প্রাণের মধ্যে প্রবিষ্ট করি। তাঁহার স্বভাব চরিত্রকে আমরা হৃদয়ে গ্রহণ করি। তাঁহার গভীর আত্মার প্রাদুর্ভাবে আমরা গুরুতর হইলাম। আমাদিগের প্রাণের মধ্যে শাক্যপ্রাণ, আমাদের রক্তের মধ্যে শাক্যরক্ত, আমাদের ভাবের মধ্যে শাক্যভাব। আমরা শাক্যগত হইলাম, শাক্য বাঙ্গালী হইলেন। সকলের বক্ষে শাক্যমুনির আত্মা। আড়াই হাজার বৎসর উড়িতে উড়িতে শাক্য-পাখী আসিয়া আমাদিগের হৃদয়বৃক্ষের উপর বসিলেন। সংসারজয়ী মহাপুরুষ শাক্য আমাদিগের হৃদয়কে অধিকার করুন।

"মা, নির্ব্বাণরাজ্য আসিতেছে। তোমার সুপুত্র শাক্যসিংহকে পাঠাইয়াছ; তোমার শাক্য নির্ব্বাণের অবতার। যে শাক্যকে গ্রহণ করে, তাহার কাম ক্রোধ প্রভৃতি সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা নির্ব্বাণ হয়। যে কাম ক্রোধে অধীর হয়, যে সংসারাসক্তিতে অস্থির হয়, যে বিষয়লালসায় চঞ্চল হয়, সে শাক্যের শত্রু। হে ঈশ্বর, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে শাক্যের বন্ধু এবং শাক্যকে আমাদের বন্ধু করিয়া দেও। এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা সকল প্রকার সংসার-জ্বালা, পাপের জ্বালা নির্ব্বাণ করিতে পারি। হে নিষ্কলঙ্ক পুণ্যময় ঈশ্বর, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগের বৈরাগ্যবিহীন মস্তকের উপরে তোমার শ্রীচরণ স্থাপন কর; ঐ চরণ-স্পর্শে আমরা সকল লালসা ছাড়িয়া, সকল দুঃখের আগুন নির্ব্বাণ করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হইব, এই আশা করিয়া, ভাই ভগ্নী সকলে মিলিত হইয়া, ভক্তির সহিত তোমাকে বার বার প্রণাম করি।"

(শাক্য সমাগম)

শান্তিঃ শান্তিঃ! শান্তিঃ!

নির্ব্বাণগুরু শ্রীশাক্যদেব

১১ই জ্যৈষ্ঠ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি নির্ব্বাণগুরু শ্রীশাক্যদেবের স্মরণীয় দিন। এই দিনে তাঁহার জন্মলাভ, নির্ব্বাণলাভ ও পরিনির্ব্বাণলাভ। আড়াই হাজার

বৎসর কালের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া, নির্ব্বাণগুরু সংসারবিজয়ী শাক্যদেব এখনও নরনারীর হৃদয় অধিকার করিয়া আছেন। হিন্দুস্থান শাক্যদেবের তীক্ষ্ণ বৈরাগ্য-জ্যোতি সহ্য করিতে না পারিয়া, তাঁকে সশিষ্য তাড়াইয়া দিয়াছিল। কিন্তু বাহিরে তাড়াইলেও তিনি যাবার নয়, হিন্দুস্থানের অন্তর অধিকার তিনি রইলেন ও চিরদিন থাকিবেন।

তিনি এসেছিলেন, ভেদাভেদ দূর করিতে এবং নির্ব্বাণশান্তিজল ঢালিয়া বাসনার আগুন, ইচ্ছার আগুন, প্রবৃত্তির আগুন, সর্ব্ববিধ দুঃখশোকতাপের আগুন নির্ব্বাণ করিতে। তিনি বলিলেন, "আমি বেদ ব্রাহ্মণ মানিনা, জাতিভেদ মানি না।" এক নূতন বৌদ্ধ জাতি, নিশ্চিন্ত বৈরাগীর জাতি সৃষ্টি করিয়া দেখাইলেন, কেমনে নির্ব্বাণসুখ সম্ভোগ করিতে হয়। তিনি দুঃখতাপদগ্ধ নরনারীকে ডাকিয়া বলিতেছেন, "এস, আমার কাছে এস, আমি জরা ব্যাধি মৃত্যুর মহৌষধ পাইয়াছি; তোমাদের সকল জ্বালা নির্ব্বাণ হইবে।"

এই নির্ব্বাণলাভের জন্য তিনি কি গভীর সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বোধিদ্রুমতলে একান্ত সমাধি ও ধারণা দ্বারা মুক্তিলাভের এক সোপান হইতে উচ্চতর সোপানে অধিরোহণ করিতে লাগিলেন। কি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা লইয়া তিনি বসিলেন। তিনি বলিলেন, "ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু। অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥" —"এই আসনেই আমার শরীর শুষ্ক হইয়া যাক, ত্বক্ অস্থি মাংস প্রলয় প্রাপ্ত হউক, বহুকাল তপস্যায়ও দুর্লভ যে বোধি (শ্রেষ্ঠ জ্ঞান), তাহা না পাইয়া যেন আমার শরীর এই আসন হইতে চলিত না হয়।" বীরের মত স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া, কি বিশ্বাসবলে বলীয়ান হইয়া, পাপ ও বিষয়বাসনাকে নির্ম্মূল করিবার জন্য সমাধিস্থ হইলেন। দুষ্টমতি কাম তাঁহাকে আসন হইতে উঠাইবার জন্য, তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবার জন্য, চিত্তকে বিচলিত করিবার জন্য নানা কৌশল বিস্তার করিল। কিন্তু শাক্য তেজের সহিত বলিলেন, "প্রাপ্যাদ্য বোধি বিরজামিহ চাসনস্থঃ জিত্ব মার বিহতং সবলং সসৈন্যম্।"—"এই আসনে উপবিষ্ট হইয়া সেই নির্ম্মলজ্ঞান অস্ত্র লাভ করিয়া, হে মার, সসৈন্য ও বলবান্ হইলেও তোমাকে নিহত ও জয় করিব।" এইরূপে পাপের মূল কামকে উন্মূলিত করিয়া তিনি নিষ্কণ্টক হইলেন। ধ্যানের প্রথমাবস্থায় চিত্ত সমাধান করিয়া বৈরাগ্যসহকারে ও বিবেকবলে স্থূল হইতে অধ্যাত্ম জগতে উপস্থিত হইলেন। বৈরাগ্য নয়নে "সর্ব্বে অনিত্যা অধ্রুবাঃ সর্ব্বে অনিত্যা অধ্রুবাঃ অনিত্যং সুখমিতি" সংসারের অসারতা, সুখ দুঃখ ও জন্ম মৃত্যুর অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া, শারীরিকবিকারবর্জ্জিত ও বিশুদ্ধতনু হইয়া, বিবেকবলে জরামরণরহিত, সুখদুঃখের অতীত শাশ্বত শান্তি-সম্ভোগের উপযুক্ত হইলেন। দ্বিতীয়াবস্থায় অজর অমর সুখ দুঃখে অলিপ্ত একমাত্র সত্তার সহিত একত্বে সমাহিত হইয়া একাকার হইলেন, বহুত্ব হইতে একত্বে, ব্যষ্টি হইতে সমষ্টিতে উপস্থিত হইলেন; আর বস্তুান্তর-বোধ রহিল না। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্যকে সম্পূর্ণ জয় করিয়া চিত্ত সাম্যাবস্থায় উপস্থিত হইল। ধ্যানের তৃতীয়াবস্থায় নিরপেক্ষ অর্থাৎ সর্ব্বাবস্থায় উদাসীন হইয়া, জ্ঞান অজ্ঞান, ভাব অভাব, সুখ দুঃখের অতীত হইয়া, মধ্যমাবস্থায় স্থিত হইলেন। স্থাণুবৎ চিত্তকে এক অনন্তবোধিত্বায় সমর্পণ করিলেন, অন্তর আকাশবৎ বিস্ফারিত হইল, সব ক্ষুদ্রতা বদ্ধভাব তিরোহিত হইল। ধ্যানের চতুর্থাবস্থায় সুখ দুঃখের অতীত হইয়া, আমিত্বা-নুভব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গেল, নির্ম্মল সুখোদয় হইল। সমাধির এই চারি অবস্থা—বিবেক, একাভিভাব, উপেক্ষকতা, স্মৃতিবিশুদ্ধি বা আমিত্ব-লোপ। যাই তাঁহার আমিত্ব অন্তর্হিত হইল, অমনি মানবের দুর্গতি তাঁহার নেত্রপথে প্রকাশিত হইল। তখন বোধিসত্ত্ব-পরিশুদ্ধ অলৌকিক দিব্যচক্ষে প্রাণিগণকে দর্শন করিলেন। জগতের প্রতি প্রীতি সঞ্চারিত হইল।

"শাক্যমুনি চরিতে" লিখিত আছে, "'এবং খলু ভিক্ষবো বোধিসত্ত্বো রাত্র্যাং প্রথমে যামে বিদ্যাং সাক্ষাৎকরোতি তমোনিহন্তি স্ম আলোকমুৎপাদয়তি স্ম।' রাত্রি প্রথম যামে মহামুনি শাক্য বিদ্যা দর্শন করিলেন, অন্ধকার বিনাশ করিলেন, এবং আলোক উৎপাদন করিলেন। ঐ বিদ্যার দর্শনে আলোকিত হওয়াতে তাঁহার নাম বুদ্ধ হইল। ঐ বিদ্যা কি? উহাই ব্রহ্মবিদ্যা, উহাই পরম জ্ঞান, উহাই সার্ব্ব-ভৌমিক জ্ঞান, উহাই পরম পদার্থ, উহারই নাম পরমাত্মা। এখন তিনি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। বাসনা ও তৃষ্ণানলে নির্ব্বাণবারি সেচন করিলেন, তাঁহার সকল দুঃখ যন্ত্রণায়

অবসান হইল, নিত্য শান্তিরসের উদয় হইল। আমিত্ব বিলুপ্ত হওয়াতে এখন পরম জ্ঞানেই বিলীন হইয়া গেলেন। এখন তিনি নিত্য আনন্দধামে উপনীত হইলেন, জীবন্মুক্ত হইয়া দিব্য লাবণ্য ধারণ করিলেন। এতদিনে তাঁহার আশা পূর্ণ হইল, সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইল। মুখ সহাস্য হইল, চিত্ত প্রফুল্ল হইল।”

এইরূপে নির্ব্বাণসিদ্ধ হইয়া তিনি বলিলেন,

“ইহ তন্ময়ানুবুদ্ধং সর্ব্বপরপ্রবাদিভির্নদ প্রাপ্তম্।
অমৃতং লোকহিতার্থং জরামরণশোকদুঃখান্তম্ ॥”

“অন্যমতাবলম্বিগণ যাহা প্রাপ্ত হয় নাই, আমি এখানে লোকহিতার্থ সেই অমৃত পাইয়াছি, যাহাতে জরামরণ শোক দুঃখ বিনষ্ট হয়।”

“মৈত্রীবলেন করুণাবলেন মুদিতাবলেন জিত্বা পিতো মেহস্মিন্নমৃতমংশুঃ। ভিন্না ময়া হ্যবিদ্যা দীপ্তেন জ্ঞান-কঠিনবজ্রেণ।”—“আমি এই বোধিমূলে বসিয়া, প্রেমবলে, দয়াবলে, আনন্দবলে জয় করিয়া অমৃতরস পান করিয়াছি। আমি প্রদীপ্ত জ্ঞানাশনি দ্বারা অবিদ্যা ছেদন করিয়াছি।”

নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইয়াও “আমি করিয়াছি” যে বলিলেন, এ “আমি” আমিত্ববিহীন, অবিদ্যাবিমুক্ত, তমোহীন “আমি” “মুক্ত আমি”, “শুদ্ধ সত্ত্ব আমি”।

শাক্য সমুদায় জগৎ ও আত্মা উড়াইয়া দিয়া “ধর্ম্মাকাশ, চিদাকাশ, অনন্ত জ্ঞান” অবশেষ রাখিয়াছেন। “বুদ্ধং জ্ঞানমনন্তং হি আকাশবিপুলসমম্”। তিনি বজ্রকল্প হইয়া আস্ফানক ধ্যান করিলেন, যে ধ্যানে “কল্পং নো ন চ বিকল্পং ন চেঞ্জনা নাপি মন্যে প্রচারম্। আকাশধাতুস্ফুরণং ধ্যায়ন্তামাস্ফানকং ধ্যানম্ ॥”—“সংকল্প নাই, বিকল্প নাই, চাঞ্চল্য নাই, ইতস্ততঃ গতি নাই, আকাশমাত্র স্ফূর্ত্তি পায়।”

ভক্ত কেশবের কথায় বলি, “হে আত্মন্, হে মন, ফকির হও, গাছতলায় বস। আজ প্রিয়তম শাক্যমুনির উৎসব হইতেছে, আজ ভালরূপে বৈরাগ্যব্রত গ্রহণ কর, আজ রাজবেশ ছাড়িয়া ফকিরের কাপড় পর। ক্ষণকাল ঐ বৈরাগ্য-বৃক্ষতলে বস। মন, বসিয়াছ? ডাকি শাক্যমুনিকে। এস এস, শাক্যদেব, শীঘ্র এস, এই মনের ভিতর আবির্ভূত হও। মনের ভিতর শান্তি আসিতেছে, আর মনের মধ্যে কোন অসঙ্গত কামনা নাই, আর ইন্দ্রিয়াসক্তি নাই। ঢের কুপ্রবৃত্তি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, স্বর্গ হইতে জননী জল ঢালিয়া সে সমস্ত নির্ব্বাণ করিলেন। মার আজ্ঞাতে স্বর্গ হইতে ঝুপ্‌ঝাপ করিয়া বৃষ্টি আসিল। অনাসক্তির বৃষ্টি, বৈরাগ্যের বৃষ্টি, নির্ব্বাণ-বৃষ্টি। আজ হইতে আমরা নির্ব্বাণপন্থী হইলাম।”

—•—

ধর্ম্মতত্ত্ব

“প্রার্থনা” পাপরোগের ঔষধ

পাপ রোগ, প্রার্থনা তাহার ঔষধ। ঔষধ টাটকা হইলে এবং যথার্থ রোগ নিরূপণ করিয়া প্রয়োগ করিলে, রোগ নিশ্চয়ই নীরোগ হয়। অনিরূপিত ভাবে পুরাতন শক্তিবিহীন ঔষধ-প্রয়োগে রোগের উপশম হয় না। তেমনি যদি আত্মপরীক্ষার দ্বারায় আমাদের মনের রোগ নিরূপণ করিতে না পারি এবং মৌখিক অসার চর্ব্বিতচর্ব্বণ বাক্যবিন্যাসের দ্বারায় প্রার্থনা করি, তাহাতে কখনই আত্মার রোগ যায় না। তাই ঠিক কি জন্য প্রার্থনা করিতেছি, তাহা আত্মজ্ঞানে উপলব্ধি করিয়া, ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ নির্দ্দেশে ও তাঁহার জীবন্ত সন্নিধানে প্রাণগতভাবে ব্যাকুল অন্তরে যদি প্রার্থনা করি, তৎক্ষণাৎ হাতে হাতে প্রার্থনার ফল লাভ হয়। ইহা পরীক্ষিত সত্য।

দল-বল

দল যেখানে, বল সেখানে; একা যেখানে একমণ ভার তুলিতে না পারি, দুই তিনজন দলবদ্ধ হইলে অনায়াসে হয়ত দশমন ভার বহন করিতে পারি। এমনি দলের বল। বিজ্ঞান বলেন, এই সমগ্রবিশ্বস্থ চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র হইতে সমুদয় পদার্থ পরস্পরের সমযোগে ও সমবায়ে মহাশূন্যে সবলে চলিতেছে। এক মহাকর্ষণী শক্তি সকলকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। কেহ কাহার বিরুদ্ধাচারী না হইয়া, বরং প্রত্যেকে প্রত্যেকের নিয়োজিত কার্য্যসাধনে সহায়তা করিতেছে। ইহাই বিধাতার অলৌকিক বিধান। এরূপ পরস্পরের সমযোগ সাধন না হইলে, প্রত্যেকে নিয়োজিত কার্য্য করিতে পারিত কিনা এবং পরস্পরের সাহায্য ভিন্ন বিশ্বরক্ষা হইত কিনা, জানিনা। নববিধানে পরিবার ও দলসাধন এইরূপেই নিয়মিত। বিধাতার প্রেম ও শক্তিতে আমরা পরস্পরের সহিত বাঁধা। পরস্পরের সহায়তা করিবার জন্য নিয়োজিত। বিধাতার বলে এবং ভ্রাতৃত্বের সহায়তা ও সমযোগবলে আমরা প্রত্যেকের নির্দ্দিষ্ট ও নিয়োজিত কর্ত্তব্য সাধন করিব এবং কেহ কাহারও বিরোধী না হইয়া সমযোগবলদানে পরস্পরকে কর্ত্তব্যসাধনে বলদান করিব, ইহাই নববিধানের অভিপ্রায়। নববিধানে একা একা বা আমি আমি,

এই স্বতন্ত্রতা নাই। তাই শ্রীকেশব বলিলেন, "কবে সবার 'আমি' 'তুমি' হইবে, আমরা একজন হইব"।

প্রার্থনায় প্রবঞ্চনা

শ্রীনববিধানাচার্য্য কেশবচন্দ্র বলেন :—

১। যে প্রার্থনা করিয়া আদেশের জন্য অপেক্ষা করে না, সে প্রবঞ্চক।

২। যার উপরে ভিতরে সমান নয়, যে বহুভাষী হয়, মনটা সে সময় ঠিক রাখে না, সে প্রবঞ্চক।

৩। যে বহু ভাবার স্রোতে চলিয়া যায়, সে প্রবঞ্চক।

৪। সকালে প্রার্থনার সময় কি বলিয়াছে, বৈকালে মনে নাই; রবিবারে কি বলিয়াছে, মঙ্গলবারে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে আর বলিতে পারে না। সে প্রবঞ্চক।

৫। ধনমানের জন্য, সংসারের জন্য, কিম্বা চৌদ্দ আনা ধর্ম্ম আর দুই আনা সংসারের জন্য, অথবা সাড়ে পনর আনা পারত্রিক সম্পত্তি আর আধ আনা সংসারের জন্য যে কামনা করে, প্রার্থনা সম্বন্ধে সে প্রবঞ্চক।

নিজ নিয়তি

(২৭শে মে, প্রেরিতপ্রবর ভাই প্রতাপচন্দ্রের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে "আশীষ" হইতে উদ্ধৃত)

হে বিশ্বনিয়ন্তা, হে ত্রিকালদর্শী, সুদীর্ঘ জীবনের পরিণতি কালে তুমি আমার নিকট আর একবার আমার নির্দ্দিষ্ট নিয়তি প্রকাশ কর। তোমারই প্রেরণা পাইয়া এই ধর্ম্মজীবনে প্রবেশ করিয়াছি, বারম্বার সেই দিব্য আহ্বান বিশেষ বিশেষ অবস্থার মধ্যে শুনিয়াছি, তোমার দ্বারা মনোনীত ও লোকের দ্বারা নির্ব্বাচিত ও অভিষিক্ত হইয়াছি। কি করিতে সংসারে আসিয়াছি, তাহা বুঝিয়া সুসম্পন্ন করিবার দিকে অগ্রসর হইলাম, আরও অবিশ্রান্ত অগ্রসর হইব। তোমার সঙ্গে প্রত্যক্ষ অব্যবহিত নানা প্রকার যোগে একাকার হওয়া, যতদূর ইহ সংসারে প্রাপ্য নানা বিষয়ে তোমার সার ও নিগূঢ় তত্ত্ব লাভ করা, নৈতিক ও অধ্যাত্ম জীবন বিষয়ে মহাপ্রভু ঈশা-প্রদর্শিত আদর্শ মনুষ্যত্ব লাভ করা, নানা ধর্ম্মপ্রতিপাদ্য সত্যের মহান্ সমন্বয় ও মহান্ আদর্শ লাভ করা এবং লোকের অন্তরে মুদ্রিত করা, ইহাই আমার নিশ্চিত নিয়তি। এ নিয়তির সংক্ষিপ্ত পরিচয় কি? কয়জন লোকের অন্তঃকরণ হইতে ইহার সায় পাইলাম, জীবনের বিচিত্র অবস্থা মধ্যে কয়বার ইহার দিব্য উপলব্ধি ভোগ করিলাম? জানি, বর্ত্তমান জীবনে, কি এক জীবনে এ মহানিয়তি সম্পূর্ণ হইবার নয়, লোকলোকান্তর, জন্মজন্মান্তর, আমার নিয়তি আমার সঙ্গে যাইবে, আরও তোমার সন্নিহিত হইব, তোমার সদৃশ হইব; বিস্ময় হইতে মহত্তর বিস্ময়ে তোমার আরাধনা ধ্যান করিব, আরও কত নূতন সত্য, নবতর ভক্তি, গভীরতর পবিত্রতা উপার্জ্জন করিব, কি অজানিত অবস্থায় পরিণত হইব, তাহা আমি হস্তে লিখিতে, চিন্তায় ধরিতে, কল্পনাতে চিত্র করিতে পারি না, চাইও না। কেবল এ পর্য্যন্ত এই জানিয়াছি যে, আমি তোমার আত্মজ, তোমার বংশজ, তোমার পরমাশ্চর্য্য স্বভাবের অঙ্কুর ও অধিকারী। তবে নিয়তিমান লোকেরা সকলেই জীবদ্দশায় কতকদূর নিজ নিজ নিয়তির পরিচয় জীবনের কার্য্যে প্রদর্শন করিয়াছেন; আমি কি তাহা পারিয়াছি? লোকে যে কেহ কেহ আমার কার্য্য ও আদর্শ স্বীকার করেন, তাহা জানি, কিন্তু তাহা আমার পক্ষে সন্তোষকর নহে; আমি যে তাঁহাদের সঙ্গে একাকার হইতে চাই, ক্রমে ক্রমে কি তাহা হইতেছি? আমি নিজ নিয়তির আন্তরিক আকর্ষণে তোমার সন্তানদিগকে টানিতে চাই এবং সকলের সঙ্গে নূতন ধর্ম্মপ্রবাহে তোমাময় হইতে চাই। ইচ্ছামত ও সাধ্যমত নরনারীকে এই নিয়তির আকর্ষণে টানিয়া আমার সঙ্গে তাঁহাদিগকে তোমাময় করিতে পারিলাম না, এই ক্ষোভে আমি বার বার বিষণ্ণ ও আত্ম-সন্দিগ্ধ হই। কিন্তু তা বলিয়া যে এতদূর পর্য্যন্ত সার্থকতা বিধান করিলে, এত লোকের সঙ্গে একহৃদয় করিলে, তাহা কম কথা নয়, তাহা যেন অস্বীকার না করি। আমার অদৃষ্টে যা লিখিয়াছিলে, এ সংসারে বিশেষরূপে তাহা সিদ্ধ করিব, সে চেষ্টায় যেন কখনও পরিশ্রান্ত না হই, নিরাশ না হই। যাঁহাদিগকে সঙ্গী করিলে, যাহা কিছু উপায় অবলম্বন দিলে, তার প্রকৃত ব্যবহারে যেন অনলস হই। মহান্ নিয়তির কথঞ্চিৎ প্রমাণ ও পরিচয় ইহ জীবনেতেই দিয়া, যেন উচ্চতর লোকে উচ্চতর সিদ্ধিতে প্রবেশ করিতে পারি। নিজ নিয়তি বিষয়ে সকল সন্দেহ দূর কর, সকল ভয় ও অন্ধকার নিবারণ কর।

শাক্যসিংহের জন্মদিন

(রাগিণী ভৈরব মিশ্র—ঝাঁপতাল)

কপিলবস্তুধামে, মহামায়া দেবী কোলে,
জনমিল শিশু শাক্যবংশধর,
আনন্দিত হলেন পিতা শুদ্ধোদন নরেশ্বর।
পূর্ণচন্দ্র হাসে আকাশতলে,
ফুল ফল শোভে (বৃক্ষ) ডালে ডালে;
বৈশাখী পূর্ণিমা আহা কিবা মনোহর,
জ্যোৎস্না ঢালিয়া অমিয় মাখিয়া,
করিছে জন্মোৎসব প্রচার।

আসিল অশিতি নামে এক সাধু প্রবীর,
দরশিতে নরপতির নবরাজকুমার,
হেরি চমকিত মুনি মুদিল নয়ন,
বলিলেন "মুক্তি" দিতে জগতে শিশুর আগমন;
হইবে কুমার বুদ্ধ, নাম "তথাগত",
নির্ব্বাণশান্তি বিলাইবে ভরি দুই হাত,
প্রণমি এ শিশুচরণে বার বার।
শিশু বাড়ে দিন দিন শশিকলাসম,
সিদ্ধার্থ দিলেন নাম জ্যোতির্বিগণ,
আদরের ধন শিশু নয়নমোহন,
রাজপ্রাসাদের রাজকুমাররতন
যৌবনে হল পরিণয় যশোধরা দেবী সনে,
কল্যাণ রাজনন্দিনী রূপে গুণে অতুল।
বড় সুখে কাটে কাল শুদ্ধোদন ঘরে,
যশোধরা প্রসবিল পুত্র দশ বৎসর পরে,
রাহুল রাখিল নাম পিতামহ আদরে;
ভাবিলেন নরপতি শুদ্ধোদন—
ভাঙ্গিতে নারিবে পুত্র এ স্নেহবন্ধন,
এই ভাবি মহারাজা নির্ভয়-অন্তর।
জীবের দুঃখ জরা শোক করিতে সংহার,
নির্ব্বাণের তরে আত্মা ত্যজিলেন কুমার,
তপস্যায় সিদ্ধিলাভ হইল তাঁহার,
শান্তি মুক্তি বিলাইলেন দেশ দেশান্তর।
সপ্তাহ ভিতরে সেই পত্নী পুত্র ছাড়ি,
অশ্রুজলে ভাসাইয়ে কপিলবস্তু নগরী,
ত্যজি রাজ্য পরিজন, সিদ্ধার্থ করেন গমন,
গহ্বরে বিপিনে করেন সাধন কঠোর।
এক রাজ্য ছাড়ি শাক্যসিংহ মহামতি,
সসাগরা পৃথিবীর হলেন অধিপতি,
শান্তিরাজ্যে দেখ আজ খুলিয়া নয়ন,
আসীন গৌতম মুনি নির্ব্বাণ-সিংহাসন;
যশোধরা দেবী বামে রাহুল শিশুকোলে,
এস গাহ (সবে মিলে) জয় জয় শাক্য মহাবীর।

(সেবিকা মহারাণী সুনীতি দেবী কর্ত্তৃক রচিত)

সংগতের প্রয়োজনীয়তা কি?

যে ধর্ম্মমণ্ডলীতে প্রত্যেকের সুগভীর প্রাণের যোগ, সমবিশ্বাস ও ধর্ম্মতৃষ্ণা আছে, তাকেই বলে প্রকৃত সংগত বা ধর্ম্মমণ্ডলী; আর যে মণ্ডলী পৃথিবীর দুঃখে দুঃখ ও আনন্দে আনন্দ প্রকাশ করে, ধর্ম্মসাধনা করে, সেখানেই ধর্ম্মমণ্ডলীর শ্রেষ্ঠ কাজ। কারণ সংসারের সহস্র কাজে আমরা যখন ব্যস্ত, যখন বাহিরের অনন্ত কোলাহল এসে ভিতরের শান্ত সমাধিস্থিত চিত্তকে করে চঞ্চল, যখন বন্ধু-বিরহে আমরা হই উন্মাদ, যখন আমাদের আনন্দের স্রোত যায় শুকিয়ে, তখন কে আমাদের বুকে জাগাবে আশার সংগীত, কে শুনাবে "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত"—জাগো অজ্ঞানশয্যা ছেড়ে, উত্থান কর, দেখো, কোন দুঃখই থাকবে না? পরিবারে যখন দুঃখ আসে, তখন দেখেছি, সবাই তো হয়ে যায় দিশে হারা; মনে হয়, পৃথিবীর সব কিছুই দুঃখের, চন্দ্র, সূর্য্য, আলো, অন্ধকার সবই। এই যে দুঃখের মোহ, তাকে ঘুচাবার সন্ধান দিতে পারে কে, সে কোন শক্তি? আমি বলব, তা পারে একমাত্র সংগত বা ধর্ম্মমণ্ডলী, বিশ্বদেবতাকে করায়ে স্মরণ। শুধু তাই নয়, ধর্ম্মমণ্ডলী বা সংগতের জোরেই একদিন ব্রাহ্মসমাজ তাঁর সার্ব্বভৌমিক আদর্শের বেদী সেই তমসাবৃত ভারতের, তথা বাংলার বুকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিল। ভেবে দেখুন, সেই মহর্ষির ধর্ম্মমণ্ডলী, রাত বারোটা, একটা হয়ে যাচ্ছে, মণ্ডলীর কারোরই সেই দিকে নেই খেয়াল, ভিতর থেকে আহারের ডাক পড়ছে, মহর্ষি বলছেন, ঘড়ি ভুল। মণ্ডলীর প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের কি গভীর যোগ, কি অটল বিশ্বাস, কি নিরবচ্ছিন্ন প্রেম ও প্রীতি, ভাবতেও আনন্দ জাগে। প্রত্যেক বন্ধুর প্রাণের সঙ্গে প্রাণের এমন নিরবচ্ছিন্ন যোগ ছিল বলেই, সেই যুগে বাংলাকে ধর্ম্মের বন্যায় এমন করে প্লাবিত করতে সক্ষম হয়েছিল ব্রাহ্মসমাজ। জননী যেমন ক্ষুধিত সন্তানকে সস্নেহে অন্ন দিয়ে ক্ষুধা নিবারণ করেন, তেমনি ব্রাহ্মসমাজকে ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মমণ্ডলী বা সংগত, জননীর মতই তার আত্ম-বিকাশের বস্তু বা আত্মার খোরাক বিতরণ করেছেন।

রাত্রির শেষ মুহূর্ত্তে পূর্ব্বাশার ক্ষীণ আলোরেখাই যেমন প্রভাতের আগমন-বার্ত্তা ঘোষণা করে, তেমনি জাতি বা দেশের জাগরণের পূর্ব্ব লক্ষণই হোল মণ্ডলীগঠন। আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতের সত্যদ্রষ্টা ঋষি বুদ্ধ এ বাণীকে মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেছিলেন; বুঝেছিলেন, জাতির ধর্ম্মজ্ঞান যেমন থাকা প্রয়োজন, তেমনি তার পশ্চাতে শক্তি না থাকলে, সম্মিলিত শক্তি না থাকলে, সে ধর্ম্ম টেকান অসম্ভব। তাই তিনি মানুষকে উপদেশ দিয়েছেন—"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি" জ্ঞানের আশ্রয়, "ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি" ধর্ম্মের আশ্রয় ও "সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি" সঙ্ঘের আশ্রয় লও; সংঘমণ্ডলীর আশ্রয়ে মানুষ এলে পর তার জীবনে যে কত উচ্চ আদর্শ ও কর্ম্মের প্রেরণা জাগে, তার শেষ নেই। ধর্ম্মের, জ্ঞানের, আত্মোন্নতির, সামাজিক উন্নতির যত কিছু প্রেরণা, সবার মূল উৎসই হোল এই মণ্ডলী বা সংগত; কারণ ইংরাজীতে যাহাকে culture বলে, সংগতই হোল তার কেন্দ্রস্থল।

এখানেই আমাদের জীবনকে করতে হবে প্রস্তুত, জ্ঞানে, প্রেমে পূর্ণ করতে হবে সমাজকে; এখানেই আমরা আত্মপর ভুলে বলতে শিখব, "বসুধৈব কুটুম্বকম্"। যুগে যুগে এ মণ্ডলী থেকেই বিশ্বমানব পেয়েছে কল্যাণকর কর্ম্মের প্রেরণা, এ উৎসধারা

আমাদিগকেও উৎসাহিত করবে কল্যাণকর কর্ম্মে। বুদ্ধদেব মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করে শত খণ্ড ভারতকে মুক্তির যে মন্ত্র শুনিয়েছেন, "সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি," ইহাই হোক আমাদের মূলমন্ত্র। বালুরাশির কণায় কণায় বিচ্ছেদের মত মানবকেও বৃহত্তর মানবজাতি বলে না, ভাবতে শিখি। জীবনের বরণাধারা শত বাধা বিঘ্নকে উপেক্ষা করে মিলনের মহাসাগরে ছুটে যেতে যদি না পারে, তবে কি পৃথিবীতে মানুষ হয়ে আসার কোন সার্থকতা আছে? দেশের একটি প্রবাদ আছে যে, আড়াই হাত মলে কখনও সাত হাত সাফল্য হয় না, আবার সাত হাত হলেও আড়াই হাত হওয়ার নেই সম্ভাবনা; তেমনি আমরা আমাদের পরিবারের মধ্যেই যতক্ষণ থাকি ব্যাপ্ত, ততক্ষণ বিশ্বমানবের চিন্তায় একচুল পরিমাণ সময়ও তো দিতে পারি নে; কারণ তখন যে "অয়ং বন্ধুরয়ং নেতি" এ ভাবই থাকে আমাদের মধ্যে প্রবল, কাজে কিছু করে উঠতে পারিনে। আমাদের চিত্ত এ ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্তি একমাত্র সংগতের দ্বারাই পেতে পারে, এই আমার ধ্রুব বিশ্বাস।

তবে যেখানে দিনের আলো, সেখানেই রাতের অন্ধকার; তেমনি আমাদের যে কল্পনা নিয়ে সংগতের হবে সৃষ্টি, সেখানে সবার প্রাণের সঙ্গে সবার সুগভীর যোগ যদি না ঘটে, যদি সেই মণ্ডলীর সকলের চিত্তে প্রীতির নির্ম্মল আনন্দ উৎসারিত না হয়, তবে কল্যাণচিন্তার স্রোত এক মুহূর্ত্তে মরুতে হয়ে যাবে বিলীন, এত ধ্রুব সত্য। আমাদের প্রত্যেকের কর্ম্মে বাক্যে থাকা চাই উদারতা, এই উদারতাই যেখানে সংকীর্ণতার গণ্ডীতে হয়েছে শুষ্ক, সেখানেই যত বিরোধ, যত অনাসৃষ্টি। ফুল ফুটাই কি ফুলের পরিপূর্ণ সার্থকতা? তাতো নয়, যতক্ষণ তার গন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে না পড়েছে, মধুকর তার অতিথি না হয়েছে, ততক্ষণ সে যে অপূর্ণ; সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হবে বিলাসী, আর গন্ধ ও সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হবে প্রেমিক, গুণী। তেমনি মনুষ্যত্বের বিকাশের পথে সংগতের বা ধর্ম্মমণ্ডলীর খুবই দরকার, তবে মণ্ডলী গঠন করাই তার পূর্ণতা নয়, লোককে জানালেই হবে না যে, আমাদের ধর্ম্মমণ্ডলী আছে। জীবনের সঙ্গে কর্ম্মের গভীর যোগ রেখে আমাদের একাজে দিতে হবে হাত; সত্যি কাযের কাজ যদি হয়, তবে লোক আপনা থেকেই হবে আকৃষ্ট। মধুর খোঁজ ভ্রমরকে বলে দিতে হয় না, কোন ফুলে আছে, সে তা জানে; ধর্ম্মের ঢোল বাতাসেই বাজে, তাকে বাজাতে হয় হয় না। তেমনি আমাদের জীবন যেদিন লোক জড় করতে পারবে, সেদিনই হবে ধর্ম্মমণ্ডলীর বা সংগতের পরিপূর্ণ সার্থকতা।

শ্রীসমরেন্দ্র দত্ত-রায়।

আমার দেখা আর্য্যনারী

যাজ্ঞবল্ক্যপত্নী মৈত্রেয়ী, শ্রীরামচন্দ্রপত্নী সীতা দেবী, শ্রীচৈতন্য-দেবের পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া, মহামতি শাক্যমুনির পত্নী যশোধরা, আরও কত সাধ্বীগণের চরিত্র ও গুণাবলী আলোচনা করেছি, পড়েছি ও শুনেছি; কিন্তু এঁদের তো চক্ষে দেখিনি।

আমার দেখা আর্য্যনারী এই মহা সৌভাগ্যবতী শুদ্ধসত্ত্ব গুণশালিনী মোহিনী দেবীর সঙ্গে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে আমার প্রথম চেনা হয়। আর কতদিনের কথা সে। তখন আমরা খুব ছোট, বিধান-প্রেরিত ভাই স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের শান্তি-কুটীরের বড় হলে প্রকাণ্ড পিয়ানোতে আমাদের সব গান শেখাতেন। স্নানান্তে প্রতি প্রাতে কমলকুটীরে উপাসনায় যেতেন ও শ্রীআচার্য্যদেবের দৈনিক প্রার্থনা লিখিতেন। যাবার পথে ধপধপে খালি পা, তুষারশুভ্রপবিত্রবস্ত্রপরিহিতা কুমারী অপ্সরী ধরাতে অবতীর্ণ অনুভব করতাম। মোহিনী দেবীর অমর জীবন বলে কখনও শেষ করতে পারব না। সে জীবন সুরধুনীর শীতলহরীর মত।

মোহিনী দেবী চট্টগ্রামনিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগীর মহাশয়ের বিদুষী কন্যারত্ন ছিলেন। পিতা অন্নদাচরণ শিক্ষার নিমিত্ত শৈশব হইতেই ভারতাশ্রমে শ্রীআচার্য্যদেবের হস্তে কন্যাকে সমর্পণ করেছিলেন। তদবধি এখানেই থাকতেন এবং সেই ভারতাশ্রম হইতেই প্রেরিত ভাই প্রতাপচন্দ্র ও তাঁহার পত্নীকে পিতামাতার ন্যায় ভক্তি করিতেন ও তাঁহাদের প্রিয় হইয়া অধিক সময় তাঁহাদের নিকটে থাকিতেন। অনেকে জানিত, ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের কন্যা। ভক্তের প্রভাবে ও শ্রীআচার্য্য-দেবের পরিবারে ও শিক্ষাধীনে থেকে মোহিনী দেবী আশ্চর্য্য পুণ্য-ময় চরিত্র প্রাপ্ত হতে লাগলেন। ভাই প্রতাপচন্দ্রও ধর্ম্মশিক্ষা ও জ্ঞানশিক্ষা দিতে মোহিনী দেবীকে কম যত্ন করেন নি।

শ্রীআচার্য্যদেবের প্রথমা কন্যা মহারাণী সুনীতি দেবীকে ভাই প্রতাপচন্দ্রের শান্তিকুটীরে থাকাকালীন কিছু দিন পড়াইতেন। মোহিনী দেবীকে শ্রীআচার্য্যদেব তাঁর জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূরূপে বরণ করে নিলেন। সে এই ধরণীতে অপূর্ব্ব কাহিনী! বধূ হয়ে বাড়ীতে এসে মোহিনী দেবী নিজ স্বার্থ, সুখ, আমিত্ব সব বিসর্জ্জন দিয়ে, ভক্ত-পরিবারের সেবাতে কি প্রকারে জীবনাতিপাত করেছিলেন, তা স্বচক্ষে দেখেছি, সব মনে আছে; কিন্তু পাঠক পাঠিকার কাছে মাদৃশ অজ্ঞান অভাজনের প্রকাশ করবার সাধ্য নাই।

বাড়ীর ছোট বড় সবাইকে আপন করলেন। কেহ বুঝতে পারত না যে, মোহিনী দেবী এতবড় বিদ্যাবতী মহিলা। অথচ নববিধানে সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ে শ্রীআচার্য্যদেব যে আর্য্যনারী গঠন করতে অভিলাষ করেছিলেন, তাঁহার বধূ মোহিনী তাহার আদর্শ হয়েছিলেন।

স্বামী পুত্র কন্যা শ্বশুর শ্বশ্রূ দেবর ননন্দা আত্মীয় অনাত্মীয় পল্লীবাসী দাসদাসী পরিচিত অপরিচিত দরিদ্র ভিখারী সকলের সেবা করেছেন। আপনাকে ভুলে সকলকে ভালবাসতেন। গৃহধর্ম্ম, দেবালয়ে নিয়মিত উপাসনা, সন্তানপালন ইত্যাদি প্রতিদিনের নিত্য কর্ম্ম সকলতার সহিত সম্পন্ন করেও, মোহিনী দেবী সর্ব্বসাধারণের জন্য বহু হিতকর কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতেন। সমাজের পরিচারিকা নামক পত্রিকার সম্পাদনকার্য্যও স্বহস্তে সাধন করতেন। আমার মনে হয়, পত্রিকা-সম্পাদন করা মেয়েদের ভেতর মোহিনী দেবীই প্রথম করেছিলেন। মেঘনাদবধ অভিনয় তিনি নিজ হাতে লিখে, তার প্রত্যেকটী গান পর্য্যন্ত কি সুন্দর করে রচনা করেছিলেন; তার অভিনয় মেয়েরা মিলে করেছিলেন। আরও ছোট বড় অনেক কাব্য ও সাহিত্য ইংরাজীতে বাংলাতে মোহিনী দেবী রচনা করতেন।

অল্প বয়সেই জীবনের কর্ম্ম সমাপন করে, মোহিনী দেবী স্বামী পুত্র কন্যা আর সকল আত্মীয় স্বজনগণকে কাঁদাইয়া স্বর্গারোহণ করলেন। তিনি ৩টী পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া গিয়াছিলেন। সাধ্বী সতী মোহিনী দেবী শোক পান নাই। যখন জ্যেষ্ঠ পুত্র মাত্র এক বৎসরের, সেই সময় শ্রীআচার্য্যদেবের স্বর্গারোহণ হয়। সেই সময় থেকে বধূমাতা মোহিনী দেবী আপনার সমস্ত ভুলে গিয়ে শ্বশ্রূমাতা ও দেবর ননদগুলিকে চির জীবন সকল প্রকারে যত্ন ও সেবা করে গিয়েছেন। শ্বশ্রূমাতার এই নিদারুণ শোকের সময় ভক্তি, ভালবাসা ও যত্নের সহিত প্রত্যেক কার্য্যটী করিতেন। নিজের ছেলেদের সময়মতভাবে কোন অযত্ন হলেও, অন্য সকলের জন্য একান্ত যত্নের প্রয়াসী ছিলেন। শ্বশ্রূমাতার মন একেবারে মুগ্ধ করে দিয়েছিলেন। বধূমাতা না হলে তাঁর খাওয়া দাওয়া পৃথকভাবে দেখা শুনা ব্যবস্থাদি করা আর কেহই পারিত না।

মাঘোৎসব, আর্য্যনারীসভা, বনভোজন, উদ্যানসম্মিলন, দেবালয়ে রাত্রিজাগরণ, মঙ্গলবাড়ী, শান্তিকুটীর ও কমলকুটীরের কমলসরোবরের চারিদিক ঘুরিয়া সেই নূতন বিধানের আর্য্যনারী-গণের নগরসংকীর্ত্তন, সকল কার্য্যে মোহিনী দেবীর কার্য্যতৎপরতা সর্ব্বপ্রথম ছিল। মেয়েদের সংকীর্ত্তনে তিনিই খোল বাজাতেন। হারমোনিয়ম, পিয়ানো এবং অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রও বাজাতেন। সুগায়িকা ছিলেন। সকল সভাতে, মেয়েদের উৎসব ইত্যাদিতে মোহিনী দেবী গান গাহিতেন। সঙ্গীত-প্রচারক প্রেমদাস যখন নূতন নূতন সঙ্গীত রচনা করতেন, সেই সময় মহিলাগণের আর্য্য-নারী সভাতে মোহিনী দেবী সর্ব্বাগ্রে ঠিক সুরলয়তানে গাহিতেন, আর সব মেয়েরা তাঁহার নিকট শিখিয়া লইতেন। এই যুগে এমন সর্ব্বগুণসম্পন্না আর্য্যনারী যদি চখে দেখলাম, তবে আমরা যেন ভগবানের কৃপায় এই সুন্দর পবিত্র জীবন জীবনে গ্রহণ করিতে যত্নশীলা হই।

সেবিকা—হেমলতা চন্দ

ব্রাহ্মসমাজ দৃশ্য ও অদৃশ্য

আজ আমরা একটী নূতন বিষয়ের অবতারণায় প্রবৃত্ত হইতেছি। যাহা দেখিতেছি, শুনিতেছি এবং যাহা জানিতেছি, তাহা নির্ভয়ে বলিতে সঙ্কুচিত হইব কেন? এক সময়ে আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী নেতৃবর্গ গাহিয়াছিলেন, "যাহা দেখেছি নিজনয়নে, শুনেছি আপনার কাণে, বলিব নির্ভয়ে তাহা বাজায়ে ভেরী"। তাঁহাদের অনুসরণ করতঃ আজ এ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। আমরা সকলেই সত্য সত্যই দৃশ্য ব্রাহ্মসমাজ প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছি, ইহাতে সন্দেহ মাত্রও নাই। আমরা নিজেও দীর্ঘ জীবন লাভ করতঃ ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি না হউক, উন্নতি, বিস্তৃতি ও এখন স্থগিতগতি দেখিতে পাইতেছি, ইহাতে সন্দেহ মাত্রও নাই; কিন্তু এই দৃশ্য ব্রাহ্মসমাজের গণ্ডীর বাহিরে বিধাতার বিধানে আর এক অভিনব ও অতিকায় ব্রাহ্মসমাজ দিনে দিনে গড়িয়া উঠিতেছে, ইহা আমরা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছি। জানি না, আমার সমবিশ্বাসী ভাই ভগ্নীগণ কে কে এ বিষয় প্রত্যক্ষ করিতেছেন। অনেক দিন পূর্ব্বে কক্স-বাজারে সমুদ্রতীরবর্ত্তী পর্ব্বতোপরি দাঁড়াইয়া দূরবীণের সাহায্যে বঙ্গোপসাগরের বহু দূরে সমুদ্রগর্ভে দেখিয়াছিলাম যে, প্রকৃতির লীলায় একটি দ্বীপ ক্রমশঃ জাগিয়া উঠিতেছে। সেখানকার বহু ব্যক্তিই ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছেন যে, এমন সময় আসিতেছে, যখন উহাই স্থলে পরিণত হইয়া লোকের বসবাসের যোগ্য হইয়া উঠিবে। আমরা অন্তর্দৃষ্টিতে এখন পরিষ্কারভাবেই দেখিতে পাইতেছি যে, বিধাতার অনতিক্রমণীয় বিধানে, বিশাল মহাসমুদ্রসদৃশ হিন্দুজাতি বা সমাজের বক্ষে, দিন দিন এক অভিনব ব্রাহ্মসমাজ গড়িয়া উঠিতেছে। ইহা শুধু আমার কথা বা কল্পনা, কি অনুমান নহে। বহুকাল পূর্ব্বে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার "Our Faith and our Experience" নামক বক্তৃতায়, কলিকাতা টাউনহলে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন যে, "তোমরা আমাদিগের এই অতি সামান্য ক্ষুদ্র ব্রাহ্মসমাজটি দেখিতেছ, যাহার ভিতরে আমরা মুষ্টিমেয় ব্যক্তি এবং অর্দ্ধ ডজন মাত্র মহিলা স্থান লাভ করিয়াছি; কিন্তু ইহার চারিদিক আবেষ্টন-পূর্ব্বক আর এক অদৃশ্য ব্রাহ্মসমাজ রহিয়াছে।" দীর্ঘকাল পরে আজ আমরা কেশবচন্দ্রের এই উক্তির সত্যতা উপলব্ধিকরতঃ, সে কথার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি। কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মের সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে, "যিনি ঈশ্বরের একত্বে, মানবাত্মার স্থায়িত্বে ও দায়িত্বে এবং বিধাতার পিতৃত্বে বিশ্বাস করেন, তিনিই ব্রাহ্ম"। আমরা ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দিকে তাকাইয়া বলিতে সাহসী হইতেছি যে, বঙ্গদেশে শুধু নহে, এই ভারতের প্রায় যাবতীয় শিক্ষিতবর্গ মাত্রেই আমাদের পূর্ব্বোক্ত তিনটী কথা স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। সর্ব্বত্রই শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সহিত কথাবার্ত্তায় তাঁহারা মন্তব্য প্রকাশ করিয়া

থাকেন যে, "আমরা সকলেই মনে মনে ব্রাহ্ম।" (We are Brahmo at heart.) খোসা ও বীজের ন্যায় ব্রাহ্মসমাজেরও দুই দিক রহিয়াছে। একটি দৃশ্য বা সামাজিক দিক ও অন্যটি অদৃশ্য—আত্মার দিক। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় হইতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ভক্ত কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার পরবর্ত্তিগণ সকলেই এই দুই দিকই প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন এবং আমরাও এই উভয় দিকের অস্তিত্বই প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছি। প্রতি ধর্ম্মেরই এই দুই দিক রহিয়াছে। আবরণ ও শস্য। যে তণ্ডুল মানব-দেহে জীবনী-শক্তি প্রদান করিয়া থাকে, উহাও খোসায় আবৃত। নারিকেলের মধ্যবর্ত্তী সুমিষ্ট শাঁস ও সুস্বাদু সুশীতল পানীয় জল বাহিরের কঠিন আবরণেই আবৃত রহিয়াছে। একটির সঙ্গে অন্যটির অপরিহার্য্য সম্বন্ধ। আমরা সকল ধর্ম্মেই দেখিতে পাইতেছি যে, ধর্ম্মের শাঁস বা সার ভাগ বাহিরের আচার, ব্যবহার, ক্রিয়া, কর্ম্ম ও অনুষ্ঠান এবং কতকগুলি দৃঢ় মত ও বিশ্বাসের কঠিন আবরণে আবৃত রহিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মেরও মূল বা সার মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় দেখাইয়া গিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ আবার তত্তাবৎ অদৃশ্য শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার সহবর্ত্তী ও পরবর্ত্তিগণ সকলেই সাধনবলে আয়ত্ত করতঃ সর্ব্বত্র তাহা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। বাহ্য অঙ্গের বিষয় অতি সুস্পষ্টরূপেই পরিদৃষ্ট হইতেছে। "নর নারী সাধারণের সমান অধিকার", "মানবশরীর ব্রহ্মমন্দির, এখানে তিনি অধিষ্ঠান করিতেছেন", "প্রতি মানবের ভিতরেই ব্রহ্ম রহিয়াছেন" সুতরাং সকলেই পবিত্র। কেহ কাহারও সংস্পর্শে অশুচি হইতে পারে না। "যার আছে ভক্তি, পাবে মুক্তি, নাহি কোন জাতবিচার।" আমাদের ধর্ম্মের এই বাহ্য অঙ্গে যে সকল কথা মুদ্রিত রহিয়াছে—ভারতের সর্ব্বত্রই হিন্দু-জাতি সে সকল দেখিতেছেন ও ঐ আদর্শ ধরিয়া পরিবর্ত্তিত হইতেছেন।

এই যে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজ "নরনারীর সাধারণের সমান অধিকার" ঘোষণা করিয়াছিলেন, ইহা এখন প্রতি কার্য্যেই ফুটিয়া উঠিতেছে। ইহাই এখন প্রতিকার্য্যে দেখাইবার জন্য কত চেষ্টা, কত আন্দোলন ও কত সভা, সমিতি প্রতিদিন সংঘটিত হইতেছে। রাজা রামমোহন রায় ঐ সেই পুরাতন মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রের মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, "কন্যাকেও পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিবেক এবং পুত্রের ন্যায় শিক্ষা প্রদান করতঃ বসন ভূষণে সজ্জিত করিয়া বিদ্বান্ বরকে প্রদান করিবেক।" মহানির্ব্বাণতন্ত্রের এ নির্দেশ আজ দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, প্রতি পরিবারেই গৃহীত হইয়াছে। জাতিভেদের নিগড় ছিন্ন হইতে চলিয়াছে। "ছুৎমার্গ পরিহার কর" বলিয়া চারিদিক হইতে চীৎকার উঠিয়াছে। উন্নতির বিজয়ভেরী বাজাইয়া, বিজয়-নিশান উঠাইয়া, দলে দলে নরনারীনির্ব্বিশেষে চারিদিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। মধুকর যেমন মধু আহরণের নিমিত্ত ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়, তেমনি ভাবে দলে দলে নরনারী জ্ঞানোপার্জ্জনের নিমিত্ত জগতের নানাদিকে ছুটিয়া যাইতেছে। যাবতীয় বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করতঃ, যাবতীয় গণ্ডীর বেষ্টন বিলুপ্ত করিয়া, তাহাদের চতুর্দ্দিক হইতে, "forward forward" আগে চল, আগে চল বলিয়া নিয়ত ধ্বনি উঠিতেছে; লোকচক্ষুর অগোচরে কে যেন বসিয়া থাকিয়া কি যেন এক অদৃশ্য "চক্র" ঘুরাইতেছেন, তাহারই ফলে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃষ্টিয়ান-নির্ব্বিশেষে সকলেই ঘুরিতে ঘুরিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠিতেছে। মানবের ইচ্ছার উপরে বিধাতার ইচ্ছা রহিয়াছে, ইহা অনুভব করিয়াই ভক্ত গাহিয়া গিয়াছেন যে, "ইচ্ছা অনুসারে যখন কর্ম্ম হয় না সবাকার, তখন ইচ্ছা পরে আছে ইচ্ছা, সন্দেহ কি আছে তার"। এই দৈব শক্তিতেই দিন দিন নানা অলৌকিক ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইতেছে। এ যুগে যে সব আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাই যথাকালে যাবতীয় লোকসমাজে পরিগৃহীত হইবে।

শ্রীমহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বিশ্বাস ও প্রেরণা

(ঢাকার সঙ্গতসভার অধিবেশনে নববিধানের মনীষিগণের লেখার অনুসরণে লিখিত)

বিশ্বাস ও প্রেরণা উভয়ই জীবনে অদ্ভুত পদার্থ। বিশ্বাসীর নিকট ঈশ্বর ও অনন্ত জীবন জীবনে প্রত্যক্ষ সত্য। "Faith is direct vision" (True Faith). যে ব্যক্তি বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিতে শিখেছে, সেই বিশ্বাসী হয়। যে ব্যক্তি বিশ্বাসের ভূমিতে দাঁড়াইতে আরম্ভ করিতে পারে নাই, বিশ্বাসের দর্শন তাহার নিকট সুদূর ভবিষ্যতের জিনিষ। যে ব্যক্তি বিশ্বাসের ভূমিতে দাঁড়ান কাহাকে বলে, তাহা অনুভব করে নাই, তাহাকে যুক্তি তর্ক দ্বারা বিশ্বাস বুঝান যায় না। বিশ্বাস জিনিষটা ভিতর হইতে অতি সহজ সরল ভাবে জন্মে।

"Faith is a new creation" (True Faith—Keshub). Hysteria রোগীকে অনেক সময় দেখা যায় যে, সে যাহা বিশ্বাস করে, তাহা যতই অদ্ভুত হউক না কেন, তাহা হইতে তাহাকে কিছুতেই বিচলিত করা যায় না। ঈশ্বর ও অনন্ত জীবনে বিশ্বাস যাহার জন্মেছে, তাহাকে কোনও যুক্তি তর্ক দ্বারা বিচলিত করা যায় না। তাহার মনন ব্যাপারটাই ঐ বিশ্বাসের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে যুক্ত হইয়া গিয়াছে। যদিও তুলনাটী সত্যের দিক দিয়া ঠিক হল না, তবু বিশ্বাসের প্রকৃতিটা আমরা এই তুলনায় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম; এইরূপ বিশ্বাসই নববিধানের জীবন। এবং এরূপ বিশ্বাসের বীজ যে হৃদয়ে স্থান পায় নাই এবং যিনি

এইরূপ বিশ্বাসকেই নববিধানের বীজমন্ত্র ও চালক বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হন নাই, তাঁহার পক্ষে নববিধানের গঠন-প্রণালীর মধ্যে হস্তক্ষেপ করার সময় এখনও আসে নাই। বিশ্বাস মানুষের জীবনকে সজীব রাখে, অনুপ্রাণিত করে, জাগাইয়া তোলে, এবং প্রাণকে উচ্ছ্বসিত করিয়া কর্ম্মে উৎসর্গ করে। বুদ্ধি ইহার নাগাল পায় না, বুদ্ধি শুধু অবাক হইয়া চাহিয়া থাকে। এই বিশ্বাসের পথ সকলের নিকট উন্মুক্ত। ধনী, নির্ধন, সাধু, পাপী, সুখী, দুঃখী, মানী, অমানী, রাজা, প্রজা, সকলের নিকট ইহার দ্বার উন্মুক্ত। যে ইহার হাতে আত্মসমর্পণ করিতে চাহে, সেই ইহাকে পায়। একবার বিশ্বাসী হ'ব বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও। অমনি বিশ্বাসের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া বিশ্বাস তোমাকে বরণ করিয়া নিবে। ইহাকে সন্দেহ করিও না, যুক্তি তর্ক দ্বারা ইহার দ্বার কণ্টকাকীর্ণ করিও না। সরল সহজ ভাবে ইহার নিকট আত্মসমর্পণ কর, বিশ্বাস অমনি তোমাকে বরণ করিয়া নিবে। এই বিশ্বাসের ভূমিতেই নববিধান প্রতিষ্ঠিত। ভাই, বলিতে চাও কি, যে বিশ্বাসী হওয়ার উপযুক্ত সাধন ও পুণ্য আমাতে নাই? আমি কেমনে বিশ্বাসী হ'ব? ভাই, ভগবানের নিকট দাঁড়াইয়া কেহই নিজকে সাধক বা পুণ্যবান বলিতে পারে না। পুণ্যশ্লোক ব্রহ্মতনয় ঈশা, শিষ্য-বর্গ দ্বারা যখন "তুমি Good" এইরূপে অভিহিত হয়েছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, "Don't call me 'Good', my Father in Heaven alone is 'Good'." তাই বলি, ভাই, পাপীও যদি একবার ব্যাকুল হয়ে মায়ের নাম উচ্চারণ করে, বিশ্বাস চায়, তখনই মা নিজে দ্বার খুলে এসে সামনে দাঁড়ান। তিনি আমাদের পুণ্য, পাপ বিচার করেন না। ব্যাকুল হয়ে সরলমনে যখনই তাঁহাকে চাওয়া যায়, তখনই তিনি দেখা দিয়ে আমাদিগকে বিশ্বাসের ভূমিতে দাঁড় করান। আমরা পূর্ণ ব্যাকুলতার অভাবে সে ভূমি হইতে বারে বারে স্খলিত হয়ে পড়ি বটে, কিন্তু মা আমাদিগকে কখনও ছাড়েন না। তিনি ব্যাকুলাত্মার নিকট বারে বারেই দেখা দেন।

"একবার ব্যাকুল অন্তরে, দয়াল বলে ডাক্‌লে তাঁরে,
সেই অনাথের নাথ দীনবন্ধু দেখা দিবেন তোমায়।"
"আমি সহজে মিলিত হই পাপীর সনে,
যদি ডাকে সে একবার আমায় কাতর প্রাণে॥"
"অহঙ্কারী পাপী যারা, ওরে আমার দেখা পায় না তারা,
দীনজনের বন্ধু (ভগ্নহৃদয়বাসী) আমি, সকলে জানে॥"

তাই পবিত্রাত্মাকে বিশ্বাস কর; সকল ভাইয়ের মধ্যে পবিত্রাত্মা বাস করেন, সেই পবিত্রাত্মার নিকট appeal কর। দেখবে, মণ্ডলীর সকল কার্য্য সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হবে, কোন ভোটাভুটী, যুক্তি তর্ক, propaganda দরকার হবে না; সকল কার্য্য পবিত্রাত্মার আলোকে সম্পন্ন হইয়া যাইবে। একবার বিশ্বাস করিয়া আরম্ভ কর, পবিত্রাত্মা স্বয়ং সমস্ত gap পূর্ণ করিয়া দিবেন। মানুষ অনন্তের সন্তান এবং অনন্তের অধিকারী; তাহার সমস্ত আশা ভগবান স্বয়ং পূর্ণ করিয়া দিবেন। যাহারা নিজেদের গৌরব চাহিল, পবিত্রাত্মার আলোকের জন্য অপেক্ষা করিতে পারিল না, তাহারা পবিত্রাত্মার সাক্ষাৎ পাইল না। আমরা জ্ঞানে মানে কে কত বড়, তাহার প্রমাণ করিতে যাহারা ব্যস্ত হইল, তাহারা পবিত্রাত্মার সাক্ষাৎ পাইল না। যাহারা meek অর্থাৎ শিষ্ট, নম্র শান্ত ও বিনীত দীনাত্মা, তাহারাই মাত্র পবিত্রাত্মার দর্শন পাইল। সমাজবক্ষে যখন পাণ্ডিত্যাভিমানী, ধনাভিমানী ও মানাভিমানীর সংখ্যা অধিক হয়, তখনই বিশ্বাসীকে অধঃকরণ করিয়া পাণ্ডিত্যের জয়ধ্বজা-বহনের চেষ্টা হয়, এবং তখনই demagoguegণ তাহাদের সুযোগ অনুসন্ধান করিয়া propaganda করিয়া, তাহাদের অভিমানের জয়ধ্বজা majority of votes দ্বারা উড়াইয়া, ধর্ম্মকে intellectualismএ পরিণত করে। ধর্ম্ম intellectualismএর কঠোর আঘাতে ম্লান হইয়া যায়। বিশ্বাস ও প্রেরণার দিন অতীতে চলিয়া গিয়াছে, কিম্বা prophet দের তাহা একচেটিয়া, এইরূপ যাহারা মনে করে, তাহারাও ভ্রান্ত; অথবা যাহারা মনে করে যে, বুদ্ধি-ক্রিয়াই (intellectualism) আলোক বা সত্য দৃষ্টি বা দর্শন, তাহারাও ভ্রান্ত। বিশ্বাসের অভাবই বাস্তব তমঃ। সংশয়বাদ, অজ্ঞেয়তাবাদ, সর্ব্বাশুভবাদ বা দুঃখবাদ ও বিশ্বনিন্দাবাদ প্রভৃতি যত ব্যাধিগ্রস্ত প্রকৃতি ও মত, সমস্তই শুধু বুদ্ধিক্রিয়া বা বুদ্ধি-বাদ হইতে উৎপন্ন। ক্রমোন্নতির পথে এরূপ বিশ্বাসশূন্য বুদ্ধিক্রিয়াই উন্নতির বাধা। ইহাই তমঃ। আর বিশ্বাসের উন্মেষই এই পথে গতি বা শক্তি, বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব বা বিধি; এই বিশ্বাসই চালকশক্তি ও নূতনসৃষ্টিকারকশক্তি।

"Faith is a new creation"—(কেশব) রজোগুণ ও সত্বগুণমণ্ডিত ক্রমোন্নতির পথে মানবেতিহাসের জীবন্ত অভিব্যক্তিতে বিশ্বাসই পথপ্রদর্শক হইয়া, সমস্ত সন্দেহবাদিতা, অবিশ্বাস, অলসতা, অন্ধতা ও কুসংস্কার, মায়া ও মোহ, অন্তঃ-সারশূন্য দম্ভ, আত্মগর্ব্ব, আগম, পুরাণ ও দেশাচারকে পরাস্ত করিয়া, ভগবানের নিত্য নূতন গৌরব ও মহিমাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। বিশ্বাস বুদ্ধিক্রিয়ার অন্ধকূপে পড়িয়া হাবুডুবু খায় না। বিশ্বাস স্বর্গের মুক্ত হাওয়ায় বিচরণ করে, এবং সেখানে অলৌকিক দৃশ্য সকল তাহার মনের আকাশে চারিদিক হইতে ফুটিয়া উঠে। কত কি স্বর্গীয় বাণী তাহার কর্ণকুহরকে নিনাদিত করে, এবং স্বর্গীয় আলোক ও স্বর্গের বাণীর সাহায্যে মানবসমাজকে সকল প্রকার বাধা, বিঘ্ন ও বিরুদ্ধাচার উল্লঙ্ঘন করিয়া অনন্ত উন্নতির দিকে প্রধাবিত করে।

(১) Faith in nature (বিজ্ঞান ও প্রকৃতিতে বিশ্বাস), (Nature never deceives the heart that trusts her.)
(২) Faith in humanity (মানবসমষ্টিতে বিশ্বাস), (Man will not betray the trust that may be reposed

in him.), (৩) Faith in one's ownself (নিজকে বিশ্বাস) এবং সর্ব্বোপরি (৪) ভগবানে বিশ্বাস; এই চারি প্রকার বিশ্বাসের সাহায্যে ভগবানকে ভূতলে অবতীর্ণ দেখা যায় ও তাঁহার দর্শন পাওয়া যায়। এবং অনন্ত জীবন (eternal life) দৃষ্টিপথে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হয়। (১) "মানুষকে বিশ্বাস করিতে হইবে", (২) "নিজ নিজ হৃদয়ালোককে বিশ্বাস করিতে হইবে" এবং (৩) সর্ব্বোপরি ভগবানকে বিশ্বাস করিতে হইবে।" এই তিন ধর্ম্মমণ্ডলীগঠনের মূল ভিত্তি। এখানে ভোটাভুটির কারবার নাই।

পূর্ব্বকালে বিশ্বাসকে শুধু ধর্ম্মেরই ভিত্তি বলিয়া গৃহীত হয়েছিল, কিন্তু এখন বিশ্বাসের ভূমি অনেক বিস্তৃত হয়েছে। বিশ্বাস এখন মানবসমাজের সকল বিষয়ে, ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, শিক্ষা, সামাজিক ব্যবস্থা, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি জীবনসমস্যার সকল বিষয়ে ইহার আধিপত্য স্থাপন করিতে প্রয়াসী হয়েছে। বিশ্বাসই সকলের ভিত্তি বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। বিজ্ঞান বিশ্বাসকে অধঃকরণ করিতেছে, কিংবা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতেছে, এইরূপ যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত এবং তাঁহাদের মত সংকীর্ণ ও অদূরদর্শিতার পরিচায়ক। এই বিজ্ঞানের ভূমিতে যাঁহারা বিচরণ করেন, তাঁহাদের মধ্যেও যাঁহারা বিশ্বাসী, তাঁহারাই অগ্রগামী এবং তাঁহাদের নিকটই বিজ্ঞানের গূঢ়তত্ত্ব সকল প্রকাশিত হয়; যখন বিজ্ঞানবিৎ তাঁহার ক্ষুদ্র intellectual lightকে অতিক্রম করিয়া universal light এর পরিচয় পান এবং তাহার মধ্যে নিজের বুদ্ধির আলোককে ডুবাইয়া দিতে পারেন, তখনই প্রকৃতি তাঁহার নিকট তাহার সমস্ত গুহ্যতত্ত্বের আবরণ উন্মোচন করিয়া ধরে। আলোক-বিজ্ঞান বা দৃষ্টিবিজ্ঞানের সহিত দৃষ্টিশক্তির যে সম্বন্ধ, বিজ্ঞান বা scienceএর সঙ্গেও বিশ্বাসের সেই সম্বন্ধ। বিশ্বাসই বিজ্ঞানের দৃষ্টিশক্তি। বিজ্ঞান যখন বিশ্বাসের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখনই তাহার গৌরবজনক আবিষ্কার সকল সম্ভব হয়েছে। যতক্ষণ বিজ্ঞান শুধু বুদ্ধির ক্ষীণালোকে বিষয় সকলের ভাগ করা, স্থান নির্দ্দেশ করা, জাতিকুল ঠিক করা, classification বা শ্রেণীবিভাগ করা, বিভিন্ন শ্রেণীতে স্থাপন প্রভৃতি বিষয় নিয়া ব্যস্ত থাকে, ততক্ষণ কোনও মহৎ ব্যাপার সম্পন্ন হয় না। যখন বিজ্ঞান বুদ্ধির ক্ষীণালোক অতিক্রম করিয়া, ভূমার মধ্যে বিচরণ করিতে শিখে, এবং মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় ভূমার মধ্যে নিজের অভিলষিত, অভীপ্সিত বিষয় খোঁজ করেছে, তখনই সে অভীপ্সিত বিষয় লাভ করিয়া জয়ধ্বনি করিতে পারিয়াছে।

সত্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইলে দেখা যায়, বিজ্ঞান ও বিশ্বাসের মধ্যে কোনও প্রকৃত বিরোধ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই। কিন্তু অনাত্মবাদ বা জড়বাদ অর্থাৎ জড়ই সব, এইরূপ বাদ এবং সাংসারিকতা বা ঐহিকবাদ অর্থাৎ ইহলোকই সব, আধ্যাত্মিক কিছু নাই, এরূপ বাদ ও বিশ্বাসের সঙ্গে মৌলিক বিরোধ আছে। বিশ্বাস অতীন্দ্রিয় বিষয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগে যুক্ত। আর জড়বাদ ও ঐহিকবাদ প্রত্যক্ষ প্রামাণ্য বা ইন্দ্রিয়জ বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত বা আবদ্ধ। বিশ্বাস মানুষকে নিজের ক্ষুদ্রতা অতিক্রম করিয়া, নিজের বাহিরে, আদর্শের জগতে ভূমার মধ্যে বিচরণ করিতে দেয়।

প্রকৃত বিজ্ঞানবিদ্‌ও শুধু নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধির মধ্যে বিচরণ করেন না। তিনি নিজেকে অতিক্রম করিয়া ভূমার আবেষ্টনের মধ্যে বিচরণ করেন, অনন্ত রহস্যের সঙ্গে যোগযুক্ত হইয়া তাঁহাতেই মগ্ন থাকেন। এবং সেই অনন্ত রহস্যরাজ্য হইতে নিজের প্রাণের আশা ও সমগ্র জীবনব্যাপী তপস্যার ফললাভের জন্য, ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায়, তিতিক্ষা এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত বিশ্বাসের পক্ষপুটে আবৃত থাকিয়া উড়িতে থাকেন এবং শুভ মুহূর্ত্তে তাঁহার আশা অনির্ব্বচনীয়রূপে পূর্ণ হয়।

এতক্ষণ আমরা বিশ্বাসকে গৌরবান্বিত ও মহিমান্বিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এক্ষণ আমরা বিশ্বাস জিনিষটা কি? ইহার ভিতরকার তত্ত্ব কি? ইহার মৌলিক ধর্ম্ম, মূল উপাদান ও প্রকৃতি কি? তাহা একটু বিশেষ করে বুঝিতে চেষ্টা করিব। এতক্ষণ আমরা বিশ্বাস কথাটা সাধারণ, ব্যাপক ও উদারভাবে ব্যবহার করিয়াছি। বিশ্বাসের নানাত্ব ও বৈচিত্র্য এবং অভিব্যক্তির নানা দিক দিয়া ইহাকে বিবেচনা করিয়াছি। ইহা দ্বারা এই লাভ হয়েছে যে, ইহার মূলতত্ত্বের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। বিশ্বাসের নানারূপের দিক এবং বিভিন্ন বিষয়ে ইহার প্রকাশ, আমাদের বিবেচনার বিষয় হয়েছে। বিজ্ঞানে বিশ্বাস ও ধর্ম্মে বিশ্বাস এই দুই রকম বিশ্বাসই আমাদের দৃষ্টিপথে পড়েছে। ধর্ম্মের জন্য জীবন মন সমর্পণ করিয়া বিশ্বাসের উজ্জ্বল স্বরূপ প্রকাশ এবং বিজ্ঞানের সত্যানুসন্ধানে জীবনকে তুচ্ছ করিয়া জীবন দান করিয়া বিশ্বাসের মহিমা প্রকাশ, এই দুইয়ের সঙ্গেই আমরা সুপরিচিত হয়েছি।

রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের জন্য জীবনদানও অনেক অবগত। এ সকল হইতে আমরা বিশ্বাসের স্বরূপ সম্বন্ধে একটা তত্ত্ব এই অবগত হই যে—আত্মার সমস্ত উন্মেষণা, ব্যাকুলতা, সামর্থ্য শক্তি ও প্রসার দ্বারা কোনও বস্তু বা বিষয় আয়ত্ত করিতে চেষ্টা বিশ্বাসের দান। এবং আমরা অবগত হই যে, প্রকৃত বিশ্বাস যে দিকেই প্রধাবিত হউক না, উহার উৎস এক ভূমাতেই স্থিত। এই স্থানে আসিয়া আমাদিগকে বিশ্বাসের দুইটা দিক বিবেচনা করিতে হইতেছে। (১) স্বানুভববাদ বা অহংবাদ, (২) বাহ্যবিষয়তা বা জ্ঞেয়বিষয়বাদ অর্থাৎ এক কথায় নিজের ও নিজের বাহিরের যে জ্ঞান (ego বাদ ও non-ego বাদ)।

(ক্রমশঃ)

শ্রীউমাপ্রসন্ন ঘোষ।

একেশ্বরবিশ্বাসী বীর মোহম্মদ

(মোহম্মদের জন্মোৎসবের স্মৃতি উপলক্ষে)

"মুখে ব্রহ্মবিশ্বাস ও সর্ব্বাঙ্গ ব্রহ্মতেজে পরিপূর্ণ। সেই মহাপুরুষ কে? এই ব্যক্তিদল তাঁহাকে দেখিবে বলিয়া বসিয়া আছে। তিনি ব্রহ্মাস্ত্র হস্তে ধরিয়া প্রতিকূলদলের কাফেরদিগের শত্রুতা খণ্ড খণ্ড করিতেছেন। একবার তাঁহাকে দেখাও। দেখিতে গম্ভীর। কেবল মারকাটশব্দ। ঈশ্বরের শত্রু থাকিবে না। পর্ব্বত প্রান্তর এক ব্রহ্মের নামে প্রতিধ্বনি করিতেছে। সমুদ্র বলিতেছে, আমাদের আল্লা এক। এই কথা বার বার প্রতিধ্বনিত হইতেছে। মোহম্মদ-দর্শনে আমরা অভিলাষী, হে মহাপ্রভু, তোমার যোদ্ধা সন্তানকে দেখাও। তিলার্দ্ধ অবিশ্বাসকে তিনি স্থান দেন না। সদাই যুদ্ধ সাজে সজ্জিত। সৈন্য সামন্ত লইয়া দিবারাত্র ব্যস্ত। প্রকাণ্ড বীরপুরুষ মোহম্মদ।

"হে বীর, তোমার কি এক ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই সহ্য হয় না? কেহ যদি বলে, দুই ঈশ্বর, তোমার প্রাণে বুঝি শেল বিদ্ধ হয়। ঈশ্বর তোমাকে বিশ্বাসী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। ঈশ্বর যখন তোমাকে গঠন করেন, তখন তোমার রক্তের ভিতর তিনি ব্রহ্মনাম প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন। জননীর গর্ভে যখন ছিলে, তখন তিনি তোমায় একেশ্বরমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছেন। ঠিক বটে। যাই পৃথিবীতে বাহির হইলে, ঘোর পৌত্তলিকতার অন্ধকার মধ্যে জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় প্রকাশ পাইলে। ওহে মোহম্মদ, প্রভু তোমাকে যে কর্ম্মের জন্য মনোনীত করিলেন, তুমি তাহা স্পষ্টই বুঝিয়াছিলে। মনের ভিতর সংগ্রাম হইল না। তুমি পৃথিবীর দলের সহিত মিলিবার লোক নহ। তুমি সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ শত্রুর সম্মুখে দাঁড়াইলে। তুমি পৌত্তলিকদিগের হাতে পড়িবে, তাহা হইলে তোমার জন্ম বৃথা।"

("মোহম্মদ-সমাগম"—শ্রীকেশব)

সংবাদ।

শুভবিবাহ—গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ (২৫শে মে), চট্টগ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রভূষণ দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ বিনয়শেখরের সহিত, গিরিধিপ্রবাসী শ্রীযুক্ত সুধাংশুবিকাশ রায়ের কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী কমলার শুভ পরিণয়, কলিকাতায় ১৬, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে (Social Service League) ভবনে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত শুভানুষ্ঠানে আচার্য্য ও পুরোহিতের কাজ করিয়াছেন। ভগবান্ নবদম্পতিকে শুভাশীষ দান করুন।

দীক্ষা—গত ১৬ই জ্যৈষ্ঠ (৩০শে মে), বালীগঞ্জে, ৪৩নং ফার্ণ রোডে, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ সুশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় নবসংহিতামতে পবিত্র দীক্ষাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ উপাসনা ও দীক্ষা দান করেন। ভগবান্ নবদীক্ষিতকে শুভাশীষ দান করুন।

বিশেষ উপাসনা—গত ২২শে বৈশাখ, প্রত্যূষে, মাণিকতলা স্পারের নূতন বাসায় ডাঃ অনুকূলচন্দ্র মিত্রের পারিবারিক কল্যাণের জন্য ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা ও অনুকূলবাবু প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে ১৲ টাকা দান প্রদত্ত হয়।

সাম্বৎসরিক—গত ১লা জ্যৈষ্ঠ (১৫ই মে), ২০নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীটে, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মুখার্জির গৃহে, তাঁহাদের মধ্যম ভ্রাতা স্বর্গীয় মেজর সত্যেন্দ্রনাথ মুখার্জির এবং খুল্লপিতামহ স্বর্গীয় সার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জির সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে নরেন্দ্রবাবু ৩০৲ এবং শ্রীমান্ অমিয়কুমার মুখার্জি পিতৃস্মৃতিতে প্রচার-ভাণ্ডারে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৪০বি হরিশ মুখার্জি রোডস্থ ভবনে, স্বর্গীয় কালীকুমার বসুর সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে পুত্র শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বসু ২৲, শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বসু ২৲, কন্যা শ্রীমতী সুনীতি ঘোষ ১৲, শ্রীমতী প্রফুল্লবালা দাস ২৲ টাকা প্রচার-ভাণ্ডারে দান করিয়াছেন।

গত ২৪শে মে, আলিপুরে ২২নং নিউরোডে, স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির কনিষ্ঠা কন্যা স্বর্গীয়া বিনীতার সাম্বৎসরিক দিনে, ডাঃ সত্যানন্দ রায় উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচার-ভাণ্ডারে ২৲, প্রেমাশ্রমে ৩৲ দান করা হইয়াছে।

গত ২৭শে মে (১৩ই জ্যৈষ্ঠ), শান্তিকুটীরে, ৮৪নং অপার সার্কুলার রোডে, প্রেরিত-প্রবর স্বর্গগত ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সাম্বৎসরিক দিনে, অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ সেন উপাসনা এবং ভাই গোপালচন্দ্র গুহ প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যায় ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে, তত্রত্য কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের উদ্যোগে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের সভাপতিত্বে স্মৃতিসভা হয়। ময়ূরভঞ্জের মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী, অধ্যাপক মন্মথনাথ বসু, অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত পরিমল ঘোষ (সেক্রেটারী), ভাই গোপালচন্দ্র গুহ প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

গত ২৯শে মে, (১৫ই জ্যৈষ্ঠ), কলুটোলায় কৃষ্ণভবনে, ব্রহ্মানন্দানুজ স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী সেনের সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন।

পুরীর সংবাদ—গত ২৫শে ও ২৬শে মে, পুরীতে, ইউনিভার্সেল চার্চ্চের উদ্যানস্থিত বৃক্ষতলে শ্রীবুদ্ধদেবের স্মরণার্থে উপাসনাদি হয়; ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। ২৭শে মে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জন্মদিন ও প্রেরিত-প্রবর প্রতাপচন্দ্রের স্বর্গদিনও উদ্‌যাপন করা হয়। অদ্য ছাত্রগণ প্রেমেন্দ্র স্মৃতিতীর্থ পরিদর্শন করে, তাহাদিগকে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও মহাপুরুষগণের ছবি ও সাধু বাক্য আদি দেখান হয় এবং ছেলেরা সঙ্গীত করে, ভাই প্রিয়নাথ কিছু উপদেশ দিয়া প্রার্থনা করেন।

প্রেরিত পত্র

শ্রদ্ধাস্পদ ধর্ম্মতত্ত্ব-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

সবিনয় নিবেদন,

এই পত্র সহ মুঙ্গের ও জামালপুর ব্রাহ্মসমাজের আয় ব্যয়ের হিসাব পাঠাইতেছি, অনুগ্রহ করিয়া ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশ করিলে বাধিত হইব। হিসাব প্রকাশ করিতে বিলম্ব হইল, কারণ সহকারী সম্পাদক শ্রদ্ধেয় ভাই অখিলচন্দ্র রায়ের দ্বারা যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে, তাঁহার নিকট হইতে সে ব্যয়ের বিবরণ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। সুতরাং এই হিসাব অগত্যা অসম্পূর্ণ রহিল। আশা করা যায় যে, সহকারী সম্পাদক মহাশয় অচিরে ঐ সকল ব্যয়ের বিবরণ ছাপাইয়া বাধিত করিবেন।

ল্যাংডেল,
দার্জ্জিলিং
২৪শে মে, ১৯৩৭।

বিনীত
শ্রীপ্রশান্তকুমার সেন
মুঙ্গের ও জামালপুর ব্রাহ্মসমাজের
কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক।

মুঙ্গের ও জামালপুরের আয় ও ব্যয়ের বিবরণ

(১লা জুলাই, ১৯২৮ হইতে ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৩৭)

ভাগলপুরনিবাসী ডাঃ প্রেমসুন্দর বসুর ৩০শে জুন, ১৯২৮ সনের চিঠি অনুযায়ী তাঁহার হস্তে মজুত মোট ৩৭২৷৶০ পাইয়াছি।

তন্মধ্যে (১) ২৭৭৲ টাকা মুঙ্গের মন্দির ফণ্ডের এবং (২) ৯৫৷৶০ জামালপুর মন্দির ও স্বর্গগত দ্বারকানাথ বাগচি ফণ্ডের।

(১) মুঙ্গের ফণ্ডের হিসাব।

জমা

১লা জুলাই, ১৯২৮—ডাক্তার প্রেমসুন্দর বসুর নিকট হইতে প্রাপ্ত ... ... ২৭৭৲

মোট জমা ... ২৭৭৲

খরচ

১৫।১২।২৮	শ্রদ্ধেয় ভাই অখিলচন্দ্র রায়কে পাঠান হইয়াছে	২০৲
১৪।১।২৯ ...	ঐ	২৫৲
২১।১২।২৯	ঐ	৩২৲
	মণি অর্ডার কমিশন	।৶
১২।৩।৩০	ঐ	২২।৴
	মণি অর্ডার কমিশন	।০
৮।১২।৩০	ঐ	৩০৲
	মণি অর্ডার কমিশন	।৶
১২।১।৩৩	শ্রদ্ধেয় ভাই অখিলচন্দ্র রায়	১০৲
১১।৪।৩৩	ঐ	১৮৴০
	মণি অর্ডার কমিশন	।০
২৩।১২।৩৩	ঐ	৬৲
	মণি অর্ডার কমিশন	৶
১২।২।৩৪	ঐ	৩০৲
	মণি অর্ডার কমিশন	।৶
২৯।৭।৩৪	ঐ [বারিপদা]	১১৲
৮।৮।৩৪	ঐ	২০৲
	মণি অর্ডার কমিশন	।০
২৭।৮।৩৪	ঐ	২০৲
	মণি অর্ডার কমিশন	।০
২৭।২।৩৫	ঐ	১০৲
	মণি অর্ডার কমিশন	৴
১১।৩।৩৫	ঐ	৬৲
	মণি অর্ডার কমিশন	৶
	মোট খরচ ...	২৬১৸৶
	হস্তে মজুত—	১৫৶
		২৭৭৲

(২) জামালপুর মন্দির ও ৺দ্বারকানাথ বাগচি ফাণ্ড।

জমা

১।৭।১৯২৮—ডাক্তার প্রেমসুন্দর বসুর নিকট হইতে প্রাপ্ত ৯৫।৶০
৫।৫।৩৪—শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস চাটার্জির নিকট হইতে প্রাপ্ত ২৬৲

মোট জমা ... ১২১।৶

খরচ

১৫।১২।২৮	শ্রদ্ধেয় ভাই অখিলচন্দ্র রায়কে পাঠান হইয়াছে বাগচি মহাশয়ের সমাধি জন্য	২০৲
১৮।৩।২৯	মকর্দ্দমা খরচ—মান সুট নং ১৪৭।২৮, উকীল বাবু অনুপমচন্দ্র রায়কে পাঠান হইয়াছে	৪৪৸৴
	মণি অর্ডার কমিশন	৷০
৭।৮।২৯	ব্রহ্মমন্দিরের জমীর খাজনা; সন ১৩৩৬ ফসলি—উকীল বাবু অনুপমচন্দ্র রায়কে পাঠান হইয়াছে	৮৸০
	মণি অর্ডার কমিশন	৴
৫।৬।৩৩	শ্রদ্ধেয় ভাই অখিলচন্দ্র রায়কে পাঠান হইয়াছে	২১।৶
	মণি অর্ডার কমিশন	।০
	মোট খরচ ...	৯৫৷৴
	হস্তে মজুত ...	২৬৵
		১২১।৶

শ্রীপ্রশান্তকুমার সেন

পাটনা, ২৪শে জানুয়ারী, ১৯৩৭।

Edited on behalf of the Apostolic Durber New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭২ ভাগ। ১১শ সংখ্যা।
১লা আষাঢ়, মঙ্গলবার, ১৩৪৪ সাল, ১৮৫৯ শক, ১০৮ ব্রাহ্মাব্দ
15th. June, 1937
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা

হে ইহকাল পরকালের একমাত্র অদ্বিতীয় সহায় এবং সম্বল! হে সর্ব্বকালের একমাত্র আশ্রয়, অবলম্বন এবং অনন্ত জীবনপথের একমাত্র কাণ্ডারী! পৃথিবীতে আনিয়া আমাকে এমন অবস্থায় স্থাপন করিয়াছিলে, কেবল চাই সহায়তা, কেবল চাই স্নেহ মমতা; তাই পৃথিবীর মাতা পিতার সঙ্গে এমন মধুর সম্বন্ধে সম্বদ্ধ করিলে, তাই পৃথিবীর ভাই, ভগ্নী, আরও কত গুরুজন, প্রিয়জনের সঙ্গে পরম আত্মীয়তার সম্বন্ধে সম্বদ্ধ করিলে। কিন্তু তুমি জানিতে, আমি জানিতাম না, পৃথিবীর পরমাত্মীয়েরাও তেমন জানিতেন না, পৃথিবীর পিতা মাতা হইতে আরম্ভ করিয়া যে কোন আত্মীয়, যে কোন গুরুজন প্রিয়জন, কেহই আমার পরকালের তো যথেষ্ট সহায় নহেনই, ইহকালের পক্ষেও আমার যথেষ্ট সহায়, সম্বল, সঙ্গী, আশ্রয় এবং অবলম্বন নহেন। ইঁহাদের স্নেহ মমতা, ইঁহাদের সঙ্গ সহায়তা সীমায় আবদ্ধ, অতি অল্প সীমায় তাহার শেষ। কিন্তু আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে চাই ক্রমাগত অনন্তের স্পর্শ, অনন্তের উত্তাপ, অনন্তের জাগরণ, অনন্তের শিক্ষা দীক্ষা, অনন্তের স্নেহ মমতা, অনন্তের সঙ্গ সহায়তা। তুমি অনন্ত, তোমাকে চাই আমার চিরকালের, অনন্তকালের সম্বলরূপে। পৃথিবীর গুরুজন প্রিয়জনের সঙ্গে সম্পর্কও তোমারই মঙ্গল ব্যবস্থা। তাহাতো আমার জীবনের পক্ষে যথেষ্ট নহে। তোমার সঙ্গে যে আমার নিত্য সত্য অকাট্য অচ্ছেদ্য অনন্ত জীবনের, অনন্ত কালের সম্পর্ক, তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। জীবনের মূলে এ সম্পর্ক রহিয়াছে, কিন্তু প্রথমে সে সম্পর্ক অপ্রকাশিত, অস্ফুট, অনাবিষ্কৃত। সে সম্পর্ক তোমার কৃপা-যোগে আমাদের সাধন-সাপেক্ষ। তোমার সঙ্গে সেই গূঢ় অপ্রকাশিত সম্পর্ক, ভারতের ঋষিগণ আমার জন্য, আমাদেরই জন্য একভাবে সাধন করিলেন, প্রকাশ করিলেন, প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ভারতের ভক্তগণ আমার জন্য, আমাদেরই জন্য সেই অপ্রকাশিত সম্পর্ক বিশিষ্ট বিচিত্র মধুরভাবে সাধন করিলেন, প্রকাশ করিলেন, প্রতিষ্ঠিত করিলেন। শ্রীঈশা আমার জন্য, আমাদেরই জন্য সেই অপ্রকাশিত সম্পর্ক পিতৃভাবে সাধন করলেন; শ্রীমহম্মদ আমার জন্য, আমাদেরই জন্য, "লায় এলাহ এল্লেল্লাহ"—এক ঈশ্বর ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই, তিনিই একমাত্র উপাস্য, বিশ্বাসের অটল ভূমিতে এই সম্পর্ক সাধন করিলেন; আর পৃথিবীর জানিত অজানিত কত সাধু ভক্ত, যোগী ঋষি আত্মা আমার জন্য, আমাদের জন্য তোমার সঙ্গে কত মধুর

স্বর্গের সম্পর্ক সাধন করিলেন। যদি নববিধানে সকল জীবনের সাধিত নিত্য সত্য স্বর্গের সম্পর্কের অধিকারী আমরা হইলাম, তবে তুমি আমাদের দুর্ব্বল মস্তকে বিশেষ শুভাশীর্ব্বাদ বর্ষণ কর, আমরা যেন তোমার কৃপা-বলে তাঁহাদের সাধনলব্ধ তোমার সঙ্গে সকল সম্পর্ক সাধন করিয়া, বিবিধ স্বর্গের সম্পর্কে তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ হইয়া, সম্বন্ধ থাকিয়া ধন্য হইতে পারি, তাঁহাদিগকে ধন্য করিতে পারি, তুমি কৃপা করিয়া আমাদের এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ! শান্তিঃ!

—•—

উপাস্য ও উপাসকের মধ্যে সম্পর্ক

সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি প্রাকৃতিক অতিমানুষিক বা অমানুষিক শক্তিগুলিকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করা যখন প্রাচীন ভারতের একদল বিশিষ্ট চিন্তাশীল ব্যক্তির অতৃপ্তির কারণ হইল, তখন তাঁহারা চিন্তা করিতে লাগিলেন, চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি তো বিশেষ নিয়মের অধীন, এই নিয়মের নিয়ন্তা অবশ্য একজন আছেন; প্রাকৃতিক যে কোন বস্তুকে দেবতা-জ্ঞানে পূজা করা হইতেছে, ইহারা সকলই বিশেষ বিশেষ নিয়মের অধীন হইয়া কার্য্য করিতেছে, অতএব এ সকলের একজন নিয়ন্তা অবশ্য আছেন। সেই নিয়ন্তা কে? সেই নিয়ন্তাকে জানিবার অভিপ্রায়ে সেই অল্পসংখ্যক চিন্তাশীল ব্যক্তি জ্ঞান-পথের পথিক হইয়া, এ বিষয়ে গভীর ধ্যান চিন্তনে আপনাদিগকে নিয়োগ করিলেন। ক্রমে জগতের আদি কারণ, জগতের স্রষ্টা, পাতা ও সর্ব্বনিয়ন্তা যিনি, তাঁহার দিব্য স্ফুরণ কাহার কাহার অন্তরে সম্ভব হইতে লাগিল। "যে চায়, সে পায়"। অনন্ত অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরের সঙ্গে অতি সীমাবদ্ধ কীটাণুকীট মানুষের সম্বন্ধস্থাপনের মূলে, অনন্ত, অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরকে মানুষের জানিবার, বুঝিবার, চিনিবার ও গ্রহণ করিবার মূলে এই মৌলিক দিব্য দেব, বিধি বর্ত্তমান—"যে চায়, সে পায়"। তাই মানুষ ব্যাকুলাত্মা হইয়া, তৃষিত হইয়া যখন তাঁহাকে জানিতে চাহিল, সেই দিব্যবিধি অনুসারে, অনন্ত ভূমা মহান্ ঈশ্বর জগতের আদিকারণ ও সর্ব্বনিয়ন্তা যিনি, তিনি ক্ষুদ্র মানবাত্মাতে প্রকাশিত হইলেন। সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বর গোড়াতে নিয়ম করিয়াছেন, "ক্ষুদ্র মানুষ আমাকে চাহিলে পাইবে।" এই সহজ সরল সার্ব্বভৌমিক মূল নিয়মটীতে যদি আমাদের বিশ্বাস-স্থাপন হয়, এই সরল সহজ সার্ব্ব-ভৌমিক মূল নিয়মটী যদি আমাদের নিকট পরীক্ষিত সত্য হয়, তবে আমরা পৃথিবীর কুটিল তর্ক যুক্তি ও মানবীয় সহস্র প্রকার প্রতিকূল অনুকূল শাস্ত্রবাদ, মতবাদের চাপ ও দায় হইতে মুক্ত হইয়া, দৃঢ় ও অমোঘ বিশ্বাসের পথে, সরল সত্যের পথে নিশ্চিন্তে অগ্রসর হইতে পারি। সেই ভারতের প্রাচীন ঋষিযুগে বিশেষ বিশেষ আত্মা তাঁহাকে চাহিলেন এবং তাঁহাদের অন্তরে ঈশ্বর তাঁহাদের জীবনের প্রয়োজন ও সময়ের প্রয়োজনে যেরূপ ভাবে প্রকাশিত হইবার, প্রকাশিত হইলেন। সেই সকল আত্মার মধ্য হইতে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি জগতের সম্মুখে ধ্বনি করিলেন, "শৃণ্বন্তু সর্ব্বে অমৃতস্য পুত্রা বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্।"—"হে অমৃতের পুত্রগণ, তোমরা শ্রবণ কর, আমি জগতের আদিকারণ সর্ব্বনিয়ন্তা মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি।" এই তো প্রথমে ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ।

মানুষ প্রথমে সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি আকাশ ইত্যাদিকে দেবতাজ্ঞানে, উপাস্যজ্ঞানে পূজা করিতে আরম্ভ করিয়া-ছিল; কিন্তু মানুষের প্রাণে গূঢ়ভাবে অনন্তের পিপাসা রহিয়াছে। অনন্তই ক্ষুদ্রাকারবিশিষ্ট কীটাণুবৎ মানবাত্মার উপাস্য; সাকার, সসীম যাহা কিছু, যতই কেন বৃহৎ, যতই কেন শক্তি ঐশ্বর্য্যের আধার হউক না কেন, তাহা মানবাত্মার গূঢ় পিপাসা মিটাইতে পারে না, সর্ব্বথা তৃপ্তি দান করিতে পারে না, সকল অভাব পূরণ করিতে পারে না। তাই তৃষিত, পিপাসু ঋষি যুগের বিশিষ্ট আত্মার নিকট প্রকৃত উপাস্য যিনি, তিনি আপনার মৌলিকস্বরূপ অনন্ত স্বরূপে প্রকাশিত হইলেন। উপাস্যরূপে এই অনন্তস্বরূপের প্রকাশে চিরদিনের জন্য এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হইল, সসীম, আকারবিশিষ্ট যাহা কিছু, তাহা বাহ্যতঃ যতই মহিমাময় হউক না কেন, তাহা মানবাত্মার উপাস্য দেবতা নয়। ক্রমে ঈশ্বরের অনন্তস্বরূপেই যে মানবাত্মার তৃপ্তি, মানবাত্মার শান্তি, আরাম এবং আনন্দ, ইহা প্রমাণিত হইল, ঋষিজীবনের ব্রহ্মজ্ঞানে, ব্রহ্মধ্যানে, ব্রহ্মধারণায়, বিশিষ্ট ব্রহ্মপরিচয়ে। তখন ঋষিপ্রাণ হইতে ধ্বনি উঠিল, "ভূমৈব সুখম্"—ভূমাতেই সুখ, ভূমাতেই পূর্ণ তৃপ্তি। এইরূপে উপনিষদের যুগে ঋষিজীবনে মানবাত্মার প্রকৃত উপাস্য অনন্ত ভূমা ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক

সংস্থাপিত হইতে আরম্ভ হইল। ঋষিযুগের প্রথম স্তরে ঋষি-জীবনের ধ্যান ধারণায় ঈশ্বরের সত্তার বিশিষ্ট পরিচয়। তিনি সৎস্বরূপ, মৃন্ময় নহেন, চিন্ময়; তিনি ক্ষয়শীল, বা হ্রাসবৃদ্ধিসম্পন্ন কোন বস্তুর ন্যায় নহেন, তিনি অক্ষয়; তিনি সীমাতে, দেশেতে, কালেতে আবদ্ধ নহেন, তিনি অসীম অনন্ত। প্রথমে তাঁহার প্রকাশ ব্যক্তিরূপে নহে, সত্তারূপে। সেই সত্তারই কত আকর্ষণ? সেই সত্তার মধ্যেই তো ঈশ্বরের সকল স্বরূপ, সকল বিভূতি, সকল গুণ নিহিত। তাই সত্তার এত আকর্ষণ, সত্তাতে এত আনন্দ, সত্তাতে এত মধু, সত্তাতে এত মিষ্টতা! ঋষিগণ ব্রহ্মসত্তার আকর্ষণে যতই আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন, তাঁহাদের ধ্যান ধারণার মাত্রা ততই বাড়িতে লাগিল। ব্রহ্মের অনন্ত সত্তার ভিতরে কত কিছু সামগ্রী, কত কিছু রত্ন লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহারা ধ্যানের ভিতর দিয়া আবিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বাহিরে জড়ীয় কোন আকার নাই, অথচ সেই নিরাকার সচ্চিৎ আনন্দময় সত্তার মধ্যে কত বিচিত্র রত্নখনি লুক্কায়িত। ঋষিগণ দেখিলেন, ব্রহ্ম-সত্তার গভীর হইতে সুগভীরে ডুবিয়া, গভীর জমাট ধ্যান ধারণা ভিন্ন, সে সকল রত্ন আবিষ্কারের উপায় নাই; তাই তাঁহারা সাধারণ জনকোলাহলময় লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া, নির্জ্জন গিরিগুহা, কেহ বা নির্জ্জন বনভূমিকে ধ্যান তপস্যার স্থান মনোনীত করিলেন। সময়ে নৈমিষারণ্যনামক বনভূমি ঋষিদিগের যোগ তপস্যা, ধ্যান ধারণার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিল। তাঁহারা ক্রমে দেখিলেন, তাঁহাদের অন্তরে প্রকাশিত ব্রহ্মসত্তা জ্যোতির্ম্ময় সত্তা, ক্রমে ব্রহ্মসত্তার জ্যোতি তাঁহাদের অন্তরে এমন ভাবে বিকীর্ণ হইতে লাগিল, তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, এই জ্যোতিই আদি জ্যোতি। বাহিরের সূর্য্যের জ্যোতি এই জ্যোতির ছায়ামাত্র। তাঁহারা দেখিলেন, বাহিরের সূর্য্য চন্দ্র মানবাত্মাতে জ্যোতি দান করেনা, ব্রহ্মজ্যোতিই মানবাত্মাতে জ্যোতি দান করে। তাই তাঁহারা গাহিলেন, "ন তত্র সূর্য্যোভাতি, ন চন্দ্রতারকম্" —সূর্য্য চন্দ্র মানবাত্মাতে আলোক দান করে না। "তমেব-ভান্তম্ অনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।"—ঈশ্বরের দীপ্তিতেই সকল দীপ্তিমান, তাঁহার দিব্য প্রকাশেই সকল প্রকাশিত। তাঁহারা ক্রমে ধ্যান-যোগে দেখিলেন, এই ব্রহ্মসত্তা সুধু জ্যোতির্ম্ময় সত্তা নহে, প্রাণময় সত্তা, ব্রহ্মই প্রাণরূপে সর্ব্বত্র বিরাজমান, ব্রহ্মপ্রাণে সকলেই প্রাণী। তাই ঋষিগণ ধ্বনি করিলেন, ব্রহ্ম যিনি, তিনি 'প্রাণস্য প্রাণম্।' তিনি প্রাণরূপে সর্ব্বত্র বিরাজমান, তাঁহার প্রাণে বিশ্বের সকলেই প্রাণী। ক্রমে ঋষিগণ উপলব্ধি করিলেন, ব্রহ্ম যিনি, তিনি সুধু জ্যোতি দান করেন না, শুভ বুদ্ধি অন্তরে দান করেন, জ্ঞান দান করেন, মানবজীবনকে শুভ পথে, ধর্ম্মের পথে, মঙ্গলের পথে পরিচালন করেন। তাই তাঁহারা গাহিলেন, "ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ"। আবার তাঁহারা গাহিলেন, "মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ।" সেই জ্যোতি-র্ম্ময় দেবতা আমাদের অন্তরে শুভবুদ্ধি প্রদান করেন, সেই মহান্ ঈশ্বর আবার সকলের মধ্যে সুনির্ম্মল শান্তি সংস্থাপন জন্য ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনা মানবপ্রাণে দান করেন। ক্রমে সম্পর্ক বাড়িয়া গেল। সেই মহান্ ঈশ্বর হইলেন আমাদের অন্তরে শুভবুদ্ধিদাতা, তিনি হইলেন আমাদের সদ্গুরু, তিনি হইলেন মানবসমাজে শান্তিসংস্থাপন ও শান্তিরক্ষা জন্য সত্য ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনা-দাতা। ক্রমে তিনি অন্তরতর ও অন্তরতম হইয়া আত্মাতে পরমাত্মারূপে প্রকাশিত হইলেন। এইরূপে সত্তা হইতে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। ক্রমে পুত্র হইতে, বিত্ত হইতে এবং আর আর সকল হইতে প্রিয়তমরূপে ঋষি-জীবনে প্রকাশিত হইলেন। ঋষিযুগে তাঁহার সঙ্গে সম্পর্ক প্রধানতঃ জ্ঞানপ্রধান, ভাবপ্রধান তত নহে।

ধর্ম্মতত্ত্ব

শূদ্রের দান অগ্রহণীয়

হিন্দু ব্রাহ্মণগণ বলেন, শূদ্রের দান গ্রহণ করিতে নাই। ইহার মর্ম্ম অনেকে বুঝেন না। হিন্দু ব্রাহ্মণগণও যাঁহারা শূদ্রের দান গ্রহণ করিতে নাই বলেন, তাঁহারাও ইহার মর্ম্ম বুঝেন কিনা জানি না। নববিধান বলেন, যে ব্যক্তি অহংকৃত হইয়া দান করিবেন এবং ঈশ্বর-প্রীতিকাম হইয়া দান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ না মনে করিবেন, তাঁহার দান গ্রহণ করিবে না। আমাদের মনে হয়, শূদ্রের দান গ্রহণ করিতে নাই, ইহার মর্ম্ম তাই। বাস্তবিক যিনি দান করিয়া নিজকে ধন্য না মনে করেন, কিম্বা অহংকৃত হইয়া যিনি যাহা কিছু দেন, তিনি যথার্থ শূদ্র। প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র বলে, প্রকৃত দান দাতা এবং গ্রহীতা উভয়কেই ধন্য করে। এই জন্য শ্রীকেশবচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "চাঁদার খাতা পাঠাইয়া দানসংগ্রহপ্রথা বন্ধ হওয়া উচিত।" যাঁহারা দান

করিবেন, তাঁহারা অযাচিতভাবে পরিত্রাণার্থী হইয়া প্রচার-ভাণ্ডারে আপনারা দানের অর্থ পাঠাইয়া দিবেন। কারণ যিনি দান করেন, স্বয়ং ঈশ্বরকে তাহা প্রদান করেন।

সমযোগে সাধন

সমযোগে সাধন নববিধানের বিশেষ সাধন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে একা একা ব্যক্তিগত সাধনেরই প্রাধান্য ছিল। পরিবারগত, দলগত সাধন নববিধানের বিশেষ সাধন। ব্যবসায়, বাণিজ্যে এখন যেমন যৌথ কারবারের প্রাধান্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ধর্ম্মের কারবারেও নববিধানে যৌথ প্রথা প্রবর্ত্তিত। তাই যেমন পরিবার-গত, দলগত সাধন বিনা নববিধান সাধন হয় না, তেমনি নববিধান-প্রবর্ত্তক শ্রীকেশবচন্দ্রের সহিত সমযোগ-সাধন বিনাও নব-বিধান সাধন হইবার নয়। এই জন্যই শ্রীকেশবচন্দ্র বলিলেন, "যদি আমার সহিত সমযোগী, সমবিশ্বাসী, সমভক্ত না থাকে, তাহা হইলে ইহারা কিসে আছে?" এই কথাটির নিগূঢ় তাৎপর্য্য আমাদের হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করা উচিত। তাহা হইলে শ্রীকেশবচন্দ্রকে আমরা কি ভাবে গ্রহণ করিব কিম্বা তাঁহার সহিত আমাদের কি সম্বন্ধ, তাহাও আমরা উপলব্ধি করিতে পারিব এবং পরিবারগত, দলগত সাধন কি উপায়ে সফল হইবে, তাহাও বুঝিতে পারিব। শ্রীকেশবচন্দ্রকে গুরু, নেতা বা আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে আমরা সহজেই প্রলুব্ধ হই; কিন্তু তিনি যে আমাদিগকে তাঁর সহিত সমযোগী, সমভক্ত, সমবিশ্বাসী করিতে চান। তাঁহার সহিত সমযোগসাধনায় এবং পরস্পরের সহিত সমযোগে আমরা সমুন্নতি লাভ করিব। এইরূপে নববিধান-জীবনে ক্রমশঃ অগ্রসর হইব, ইহাই বিধাতার বিধান। হারমোনিয়ামের সহিত সমতানে ঐক্যতান বাদন যেমন, শ্রীকেশবচন্দ্রের সমযোগে পরিবার ও দলগত সাধন তেমন।

বিশ্বাস ও প্রেরণা

(ঢাকায় সঙ্গতসভার অধিবেশনে নববিধানের মনীষিগণের লেখার অনুসরণে লিখিত)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রশ্ন এই, আমাদের নিজের অনুভূতি কি বাহ্য বিষয়-সম্বন্ধে জ্ঞানের সম্যক প্রমাণ? যে বিষয়ে জ্ঞানলাভ হচ্ছে, তাহা যে সত্য, খাঁটী, আসল ও অকৃত্রিম এবং উদার ও মহৎ, আমার বিশ্বাস বা অনুভূতি একাই কি তাহার সম্যক প্রমাণ? এখানে অবশ্য আমরা "না" বলতে বাধ্য।

বিশ্বাস আত্মার একটা প্রসার বা শক্তি বিশেষ, এইরূপে দেখিলে ইহা একাই সংবস্তুর কোনও মানদণ্ড বা প্রমাণ নহে; বিশ্বাসকে মনীষিগণ স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ, স্বানুভূতি, আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ, অনন্ত ও অপরোক্ষ দৃষ্টি বা অলৌকিক দর্শন বলে ব্যাখ্যা করেছেন সত্য; কিন্তু প্রত্যক্ষ দর্শনেও illusion বা মিথ্যা, ভ্রম, ভ্রান্তি, মায়া বা অবিদ্যা থাকতে পারে।

সত্যের একটি মাত্র পরখ বা পরীক্ষা বা নিকষ আছে—সে হয়েছে—সার্ব্বভৌমিক, সার্ব্বজনীন, সর্ব্বগত বা সর্ব্বব্যাপী ও বিশ্বজনীন বা সর্ব্বপ্রসারী অভিজ্ঞতার সঙ্গে ঐক্য বা সমন্বয়। আমি আমার বিশ্বাসকে তখনই সত্য বলে জানব, যখন আমি দেখব যে, ইহা বিশ্বজনীন ও সর্ব্বপ্রসারী অভিজ্ঞতার সঙ্গে ঠিক খাপ খায়, উহাকে কোনও দিক দিয়াই প্রতিবাদ করে না। যে অভিজ্ঞতা যুগযুগান্তর ধরে মানবমনে ক্রমোন্নতির সূত্রে প্রকাশ পাইয়া আসিতেছে, তাহার সঙ্গে যে বিশ্বাস ঠিক খাপ খায়, সেই বিশ্বাসকে সত্য বলে গ্রহণ করা যায়। আর যাহা সেরূপ ঠিক খাপ খায় না, যে বিশ্বাসকে ঐরূপ সমন্বয়সূত্রে বাঁধা যায় না, তাহা যতই প্রাণের ব্যাকুলতা ও আবেগপূর্ণ হউক না কেন, এরূপ বিশ্বাসকে সত্য বলে গ্রহণ করা যায় না। ইহাকে মিথ্যা, ভ্রান্তি, মোহ ও কুসংস্কারের মধ্যে পরিগণিত হইতে হইবে।

কিন্তু এখানেও একটা বিষয় অবধারণ করিতে হইবে। যদিও বিশ্বাসটি ভুল ও মিথ্যা হতে পারে, তবু আত্মার যে দৃষ্টি, তাহা সত্য। রজ্জুতে সর্পভ্রম হইতে পারে; কিন্তু যিনি দেখিলেন, তিনি চক্ষুষ্মান। তাঁহার দৃষ্টিশক্তি আছে, তাহা মানতে হবে। যিনি অন্ধ, তাঁহার কোনও রকম দৃষ্টিভ্রমও হয় না, তিনি সত্য মিথ্যা কিছুই দেখেন না। যিনি বিশ্বাসী, তিনি চক্ষুষ্মান ও দৃষ্টি-মান; কিন্তু যিনি বিশ্বাসী নন, তিনি অধ্যাত্মদৃষ্টিবিহীন বা অন্ধ, তিনি সত্য মিথ্যা কিছুই অবগত নহেন। বিশ্বাসী fanatic হতে পারেন, কারণ তাঁহার বিশ্বাসে ভ্রান্তি থাকতে পারে; কিন্তু তিনি দৃষ্টিশক্তিমান। তিনি অন্ধ নহেন, সম্যক দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসীর ভ্রান্তি দূর হয়ে যাবে, যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হলেও, নিকটবর্ত্তী হইয়া ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলেই সেই ভ্রম কাটিয়া যায়; কিন্তু অবিশ্বাসী আধ্যাত্মিক দৃষ্টিশক্তির অভাবে অন্ধদের মধ্যে গণ্য হন।

আমরা এতক্ষণ বিশ্বাসটাকে একটা আত্মার প্রসার বা শক্তি উল্লেখ করেছি, যাহা নিজের বাহিরের আবেষ্টনের মধ্যে বিচরণ করিতে পারে এবং সেখান হইতে সত্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ। বিশ্বাস যদি আত্মারই একটী গুণ, তবে প্রশ্ন এই হচ্ছে, বিশ্বাস কি জ্ঞানের বিরোধী? না, ইহা জ্ঞানেরই একটা function বা ক্রিয়ামাত্র কিংবা ইহা একটী জ্ঞান হইতে উচ্চ আত্মার বৃত্তি, যাহা জ্ঞানের বিরোধী নহে? ইহার সঙ্গে মানসিক অনুভূতি ও ইচ্ছার কি সম্পর্ক? এই সকল সম্পর্কের মীমাংসা করিতে যাইয়া চারিটী বিভিন্ন মতের সৃষ্টি হয়েছে, চারিজন মনীষী ব্যক্তির নামে এই চারিটী মতের ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১ম। Sir willium Hamiltonএর মত:—তাঁহার মতে, যিনি অতীন্দ্রিয় বা স্বয়ম্ভূ, তিনি কখনও জ্ঞান কিংবা চৈতন্যের

গ্রাহ্য বস্তু হতে পারেন না। কারণ আমাদের সমস্ত চৈতন্য ও জ্ঞান আপেক্ষিক, বা সকলের সঙ্গে সম্বন্ধ-সাপেক্ষতা নিয়মের দ্বারা সীমাবদ্ধ; অতএব যিনি অতীন্দ্রিয় ও স্বয়ম্ভূ, তিনি কেবল বিশ্বাসেরই বিষয় হতে পারেন, এবং এই বিশ্বাস আপ্তবাক্যের সাক্ষ্যের উপরই নির্ভর করে। এই মতের বিরুদ্ধে বক্তব্য এই যে, সমস্ত চৈতন্য ও জ্ঞানের নিরপেক্ষ ভাবে যে অতীন্দ্রিয় বস্তু, তাহার সঙ্গে আমাদের কোনও প্রয়োজন-বোধ, স্বার্থ কি সম্বন্ধের কারণই অনুভূত হয় না। এবং তাহাতে বিশ্বাস কি অবিশ্বাস, কোনটারই কোনও দরকার থাকে না। আর আপ্তবাক্য দ্বারা এরূপ বিশ্বাস গ্রহণ করারও কোনও অর্থ থাকে না। কারণ আপ্তবাক্য এরূপ বিষয় সম্বন্ধে আমাদের অনুভূতির নিকট বাস্তবিক কিছুই প্রকাশ করে না। কারণ এমতে পূর্ব্বেই সিদ্ধান্ত করে নেওয়া গেছে যে, এরূপ বিশ্বাস আমাদের চৈতন্য ও জ্ঞানের এবং অনুভূতির সম্পূর্ণ বাহিরে।

২য়। Tertullainএর মত:—বিশ্বাসের বিষয়টি যুক্তি-বিরুদ্ধ বা অলৌকিক বা যুক্তি বিচারের বাহিরে এবং এই জন্যই ইহাতে বিশ্বাস করি। ঐহিক বা বৈষয়িক বুদ্ধি বিচারকে চৈতন্য ও জ্ঞানের আসনে বসাইয়া, যাঁহারা অতিন্দ্রীয় সত্য লাভ করিতে চান, তাঁহাদের বিরুদ্ধে এ মত ঠিক ও যথার্থ উত্তর। কিন্তু যথার্থ জ্ঞানবিচারে ইহার স্থান অতি লঘু।

৩য়। Anselm's মত:—"I believe in order that I may understand." "আমি পূর্ব্বে আপ্তবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, পরে জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বুঝিব ও আয়ত্ত করিব।" এখানে জ্ঞান ও বিশ্বাসের সঙ্গে কোনও প্রতি-দ্বন্দ্বিতা এবং এই ভাবের মধ্যে মনোবিজ্ঞানের বিরোধীও কিছু পাওয়া যায় না। এই মতের অনুবর্ত্তী হইয়া কোনও প্রসঙ্গ বা প্রস্তাব গ্রহণ করিতে বিশেষ আপত্তির কারণ থাকে না। যদি সেই প্রসঙ্গ বা মতের মধ্যে অন্তর্জাতি ভাবে বা প্রকৃতিগত ভাবে কোনও অসামঞ্জস্য না থাকে। এবং এই মতের অনুবর্ত্তী হইয়া যদিও আমরা কোনও বিষয়ের পূর্ণ অন্তর্নিহিত সারতত্ত্ব প্রথমেই ধারণা করিতে নাও পারি, তবু উহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া চলিলে কোনও গুরুতর দোষ হয় না। কারণ সত্যের অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে, অসামঞ্জস্য অসত্য যাহা কিছু, তাহা পরিত্যক্ত হইবে। উন্নততর প্রজ্ঞা বা প্রেরণা-বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন ও শ্রদ্ধাবান হওয়া আমাদের সকলেরই অনুভূতি বা অভিজ্ঞতার সঙ্গে সহজ পরিচয় রয়েছে। এবং এইরূপ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাই উন্নতির মূল ও সোপান। যুবকগণের ও বালকগণের শিক্ষার জন্য এই বিধি বা নিয়মই একমাত্র গ্রহণীয় উপায় এবং আমরা সকলেই এই নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া আমাদের চিন্তা ও বিশ্বাসকে উন্নতির দিকে অগ্রসর করাইতেছি।

কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাস কি এইরূপ উন্নততর প্রজ্ঞা বা আপ্তবাক্য-পূর্ণ গ্রন্থে বা প্রেরিত প্রত্যাদিষ্ট পুরুষে শ্রদ্ধা দ্বারাই পর্য্যবসিত হয়? এরূপ শ্রদ্ধাই প্রকৃত বিশ্বাসের প্রকৃতি ও একমাত্র অভিব্যক্তি কি? সুক্ষ্মরূপে অনুধাবন করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, শুধু নির্দ্দিষ্ট মত বা সিদ্ধান্তে সায় দিয়া অগ্রসর হওয়াই প্রকৃত বিশ্বাসের প্রকৃতি নহে। প্রকৃত বিশ্বাস সকল রকম dogmas বা স্থির সিদ্ধান্তকে অতিক্রম করিয়া, মুক্ত আধ্যাত্মিক আকাশে বিচরণ করিতে ভালবাসে; এবং বস্তু ও ব্যক্তির সঙ্গে অব্যবহিত সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য প্রয়াসী হয়। সৎবস্তুকে অন্য-নিরপেক্ষ হইয়া অন্বেষণ করে এবং তাহার সহিত যোগ-স্থাপনই প্রকৃত বিশ্বাসের প্রকৃতি। প্রশ্ন হইতে পারে "অন্য" কি সৎ বস্তুর বাহিরে? যদি বাহিরে না হয়, তবে অন্যের সঙ্গে এক যোগে চলিলে দোষ কি? উত্তর:—জীবনপথে অগ্রসর হতে প্রথমে এবং পরেও ইহা একটা প্রকৃষ্ট উপায়, সন্দেহ নাই। কিন্তু সৎবস্তুকে দূরে রেখে অন্যের সঙ্গে চলিতে বিপথে যাইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু সৎবস্তুর আশ্রয় নিয়ে, অন্য সকলকে নিজের মধ্যে আয়ত্ত করিতে প্রয়াসের কোন বিপদ নাই। সৎবস্তুই সমস্তের মানদণ্ড, অতএব তাহার সঙ্গে যোগাশ্রয়ে সকলকে শ্রদ্ধার সহিত হৃদয়ে স্থান দিলে, আর মোহগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। এবং আত্মার এই মুক্ত হাওয়ায় direct vision লাভের আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক।

৪র্থ। Kantএর মত—Kantএর মতে "ঈশ্বর" "মুক্তাবস্থা" "স্বাধীনতা" ও "অনন্তজীবন" এ সব কতকগুলি ব্যবহারিক জ্ঞানের সহজগম্য, স্বতঃসিদ্ধ ও স্বতঃপ্রমাণসিদ্ধ সিদ্ধান্ত। এবং বিশ্বাসের পক্ষপুটে আরোহণ করিয়াই আমরা এ সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সূত্রে যুক্ত হইয়া এই সকল সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করি। ব্যবহারিক জ্ঞান বা সহজ জ্ঞান এই বিশ্বাসের সঙ্গী ও সহায়। বিশ্বাসই ব্যবহারিক জ্ঞানকে অনন্তে বিচরণ করিবার শক্তি দেয়। এবং এই শক্তির পক্ষপুটে রক্ষিত হইয়াই ব্যবহারিক জ্ঞান ভূমার সঙ্গে যোগ স্থাপন করে। আমরা যে শ্বাস প্রশ্বাস ছাড়ি, আমরা যে খাদ্য দ্রব্য হজম করি এবং আমাদের শরীরে যে রক্তপ্রবাহ চলিতেছে, এ সকল যেমন, আমরা যে জীবিত, তাহার স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ, সেইরূপ ব্যবহারিক জ্ঞানের চালনা ও প্রয়োগ হইতে আমরা, ঈশ্বর যে আছেন, অনন্ত জীবন যে সত্য এবং আত্মা যে স্বাধীন, এই সব উপলব্ধির স্বতঃ-সিদ্ধ প্রমাণ পাই। ব্যবহারিক জ্ঞান বিশ্বাসের পক্ষপুটে আরোহণ করিয়া, ঈশ্বর, স্বাধীনতা ও অনন্তজীবন প্রভৃতির সঙ্গে আমাদের আত্মাকে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আনয়ন করে।

ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, বিশ্বাস জ্ঞানের বিরোধী নহে, কিংবা জ্ঞান হইতে একটা স্বতন্ত্র জিনিষও নহে। ব্যবহারিক জ্ঞানের প্রত্যেক কার্য্যে নিয়োগ বা চালনা বিশ্বাসের যোগে আমাদিগকে অতীন্দ্রিয় সত্য সকলের সঙ্গে যুক্ত করে। Kant একজন অধ্যাত্মবিদ্যাবিদ্ বা তত্ত্ববিদ্যাবিদ্, তিনি জ্ঞানের সাধক। তিনি মনকে বিশ্লেষণ করিয়া প্রজ্ঞা, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়জ্ঞান এই

তিনভাগে বিভক্ত করিতেছেন। এবং তাঁহার নিকট ঈশ্বর, স্বাধীনতা ও অনন্ত জীবন, মনের এই সব বিভিন্ন বিভাগের কোনও না কোনওটার নিয়োগের অপরিহার্য্য ফল। কিন্তু যখন অধ্যাত্ম বিজ্ঞান ছাড়িয়া আমরা একজন খাঁটি, সাচ্চা, অকৃত্রিম, নিষ্ঠাবান, বিশ্বাসীর সংসর্গ পাই ও তাঁহার আত্মার অনুভূতির সঙ্গে হৃদয় মিলাইতে পারি, তখন আমাদের অন্যান্য বিদ্যার যে অভাব ও হীনতা এবং অক্ষমতা ও পরিমিততা, তাহা সহজেই অনুভব করি।

St. Paul's Definition of faiths—"Faith is the evidence of things not seen and the substance of things hoped for."—"বিশ্বাস অদৃশ্য পদার্থের প্রমাণ স্বরূপ এবং প্রত্যাশিত বিষয়ের সারাংশ।"

St. Paul এখানে মনের কোনও বিভাগ করিতেছেন না। প্রজ্ঞা, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়জ্ঞান অর্থাৎ মানসিক অনুভূতি, ভাবুকতা ও ইচ্ছাবৃত্তি বা শক্তি প্রভৃতি কোনও রকম বিশ্লেষণ করিতেছেন না। তিনি কোনও ব্যবহারিক জ্ঞানের স্বভাবসিদ্ধ বিষয়ের অবতারণা করিতেছেন না। তিনি বস্তু ও তাহার স্বরূপের সঙ্গে যোগযুক্ত হইয়া, সে সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন। তিনি যোগযুক্ত হইয়া যেরূপ দেখিতেছেন ও অনুভব করিতেছেন, তাহাই সহজে প্রকাশ করিতেছেন। সে সৎ বস্তু বাহ্য চক্ষে দেখিবার বিষয় নয় বটে, কিন্তু তাহা সর্ব্বদা প্রত্যাশা করিতেছেন। প্রত্যাশা করিতেছেন, একথা যদিও সত্য, কিন্তু তাহার সারাংশ সর্ব্বদাই তাঁহার অধিকারভুক্ত। ("Knock and it shall be opened into you.") যদিও দেখা যায় না, তবু যোগীর নিকট উক্ত সত্য বস্তু সকলের প্রমাণ আপন আপন মধ্যেই বর্ত্তমান। অর্থাৎ বস্তু সকলের মধ্যেই বর্ত্তমান প্রকাশ পায়। যেমন খুব ঘনিষ্ঠ পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হলে তাঁহার উপস্থিতি কোনও যুক্তি প্রমাণ দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে হয় না, সে ব্যক্তির উপস্থিতির মধ্যেই সমস্ত প্রমাণ নিহিত, সেইরূপ যোগীর নিকট প্রকাশিত আধ্যাত্মিক সত্য সকলের প্রমাণ ঐ সকলের মধ্যেই বর্ত্তমান থাকে। এই ব্যাখ্যা দ্বারা প্রকৃত বিশ্বাসের অনুপম বা অনন্যসাধারণ স্বভাব বা অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে। এই ব্যাখ্যা আমাদিগকে আদর্শ বা পূর্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দিতেছে। কেবল বর্ত্তমানে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের সঙ্গে নহে, এই বিশ্বাস আমাদিগকে বর্ত্তমানের অতীত ও ক্ষুদ্র বুদ্ধির অতীত স্থানে ভূমার মধ্যে নিয়া যাইতেছে, এবং তৎসঙ্গে ইহা আমাদিগকে Direct vision বা সাক্ষাৎ ও প্রত্যক্ষ দর্শনের সজীব, জীবন্ত, উজ্জ্বল, সুস্পষ্ট ভাব ও তীক্ষ্ণতা এবং আবেগ ও উদ্দাম সবই প্রদান করে।

এই বিশ্বাস সার্ব্বজনীন, কিন্তু ইহার প্রকাশ ও চালনার জন্য উপযুক্ত সাধন ও উপযুক্ত আবেষ্টনের দরকার। ইহা বুদ্ধি কিংবা ইন্দ্রিয়জ্ঞানের মত আত্মার কেবল একটী গুণ বিশেষ নহে, ইহা আত্মার একটা চরমোৎকর্ষ বা অনুরাগ বিশেষ; বিশ্বাসের পূর্ণতা ও আত্মার পূর্ণ বিকাশ ওতপ্রোত ভাবে মিলিত। ইহা আশা, বিশ্বপ্রেম ও উদারতার ন্যায় আত্মারই অনুরাগ বিশেষ। এবং লুথারের মতে মুক্তি ও পরিত্রাণের একমাত্র অপরিহার্য্য উপাদান। এই বিশ্বাসের উপাদানেই আত্মার জন্ম। এখানে আমরা আধ্যাত্মিক অনুভূতির বা অভিজ্ঞতার একটা সরল, সোজা ইঙ্গিত দেখিতে পাইতেছি। ইহার একটা বিজ্ঞানসঙ্গত ব্যাখ্যা কি সম্ভব? বিজ্ঞান শুধু এ বিষয়ে একটা বিশ্বাস করার ভূমি দেখাতে পারেন। বেশী দূর যাওয়া বা ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ার ক্ষমতা তাহার নাই। আত্মার মনের মত কোনও ভাগ নাই। মনকে যেমন বিশ্লেষণ করিয়া বুদ্ধি বা জ্ঞান, ইচ্ছাশক্তি ও ভাবুকতা প্রভৃতি ভাগে ভাগ করা যায়, আত্মার এরূপ কোনও ভাগ নাই। আত্মার শুধু জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক। ইহা জীবন্ত, বর্দ্ধনশীল ও উন্নতিশীল। "Every concrete experience is a process of self-conservation—is a life (word)." "প্রত্যেক মূর্ত্ত বা বাস্তব অভিজ্ঞতাই জীবন রক্ষা বা জীবিত আশা।"

আত্মা সম্বন্ধে cognition বা পদার্থের জ্ঞান, feeling বা মানসিক অনুভূতি, বা conation বা ইচ্ছাশক্তি প্রভৃতি বিভাগ করা চলে না। ইহা একটি অবিভাজ্য জীবনীশক্তি। ইহাকে আমরা আমাদের বুদ্ধি দ্বারা ধরিতে যাইয়া পূর্ব্বোক্তরূপ বিকারযুক্ত বা ত্রুটিযুক্ত অসম্পূর্ণ বিশ্লেষণ করিয়া থাকি। বাস্তবিক আত্মা আমাদের বুদ্ধি ও বিশ্লেষণের অগম্য। আত্মিক জীবন একটি ধারাবাহিক, উচ্ছ্বাসময়, উন্নতিশীল, বেগময় স্রোতঃস্বরূপ, যাহা স্বাধীনভাবে প্রবলবেগে গন্তব্য পথ ধরিয়া চলিতে থাকে এবং মানুষের ক্ষুদ্র বুদ্ধির পথকে সর্ব্বদাই অতিক্রম করিয়া ভূমার মধ্যে বা আদর্শের মধ্যে বিচরণ করে। এই অনন্ত উন্নতিশীল আদর্শের মধ্যে বিচরণ করাই প্রকৃত বিশ্বাসের কার্য্য। এই বিশ্বাসের দুটী দিক।

১ম। self-conservation অর্থাৎ যে জ্ঞান লাভ হয়েছে, তাহা ব্যবস্থাবদ্ধ বা শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া হজম বা পরিপাক করা ও দখল বা ভোগ করা।

২য়। Self-expansion :—নূতন জীবনের জন্য, নূতন আদর্শের জন্য, নিজের বাহিরে ভূমার বা আদর্শের মধ্যে বিচরণ ও তাহা দ্বারা আত্মার অনন্তকালব্যাপী, অনন্ত প্রসারণ বা অনন্ত উন্নতি সাধন।

এই ১ম ভাগটীকে বিদ্যা বা জ্ঞান নামে অভিহিত করা যায় এবং ২য়টীকে প্রকৃত বিশ্বাস বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে। এখানে আমাদের জানা থাকা দরকার যে, আদর্শকে বা অনন্তকে কখনও শুধু জ্ঞান বা বিদ্যার দ্বারা আয়ত্তাধীন করা চলে না। এবং সেজন্য উহাকে কোনও রূপ সীমাবিশিষ্ট শেষ সিদ্ধান্তরূপে বর্ণনা করা যায় না।

এই অনন্ত বা আদর্শ, ইহা একটি গৌরবমণ্ডিত বিরাট, বিপুল, সৎ বস্তু, যাহা একটা প্রচুর পরিপূর্ণ, উচ্ছ্বাসময় বা আবেগময় জীবনপ্রবাহের বা বিশ্বাসের নিকটই প্রকাশিত হয়, বা মুক্ত হইয়া দাঁড়ায়; জীবন যতই পূর্ণতর ও পবিত্রতর হইবে, ততই বিশ্বাসও সতেজ, গভীর, উজ্জ্বল ও আবেগময় হইবে, এবং অনন্তের জ্ঞানও পূর্ণ হইতে পূর্ণতর হইবে।

ক্রমোন্নতির নিম্নস্তরে অর্থাৎ vegitable এবং animal kingdom এর মধ্যেও বিশ্বাসজাতীয় একটা জিনিষের প্রাধান্য অনুভূতির বিষয়। একটী চারা গাছকে যদি ছায়ায় বা অন্ধকারে পুতিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে দেখা যায় যে, গাছটী বৃদ্ধিপ্রাপ্তির সঙ্গে আলোর অভিমুখী হইয়া বৃদ্ধি পাইবার জন্য ব্যস্ত হয়। যেখান দিয়া ফাঁক পায়, সেখান দিয়াই সে তাহার কোমল, সবুজ, নবীন, তাজা লতাতন্তু, লতাপ্রতান ও আকর্ষণী সকল আলোর অভিমুখে বাড়াইয়া দেয়। সে যেন জানে, মুক্ত আলোতে, মুক্ত বাতাসে ও মুক্ত আকাশেই তাহার জীবন ও জীবনের সতেজতার বৃদ্ধি। সে যেন বিশ্বাসীর মত আলোকেই আঁকড়াইয়া ধরিবার জন্য ব্যস্ত। বিশ্বাসের জীবনই যথার্থ জীবন। এবং প্রকৃত বিশ্বাসই "Sees God and immortality."

আমরা এই বিশ্বাসকেই বরণ করিয়া লইয়াছি। আমরা বিশ্বাস করি, ভগবান সত্য; আমরা বিশ্বাস করি, পবিত্রাত্মা সত্য এবং প্রত্যেক মানব-হৃদয়ে পবিত্রাত্মার অবতরণ সত্য; আমরা বিশ্বাস করি, মানবাত্মা সত্য এবং প্রত্যেক মানবাত্মায় ভগবানের প্রেরণা সত্য; আমরা বিশ্বাস করি, ভগবান প্রকৃতিতে প্রকাশিত, ইহা সত্য; আমরা বিশ্বাস করি, আপ্তবাক্য সত্য; আমরা বিশ্বাস করি, ভগবান ধর্ম্মরক্ষার্থ যুগে যুগে বিশেষ বিশেষ প্রেরিত পুরুষদিগকে পাঠাইয়া ধর্ম্মের নূতন নূতন অভিব্যক্তির প্রকাশ করেন। আমরা নিজদিগকে বিশ্বাস করি, ভাইদিগকেও বিশ্বাস করি। আমরা এই বিশ্বাসের ভূমিতে দাঁড়াইতে স্বর্গ হইতে আদেশ পাইয়াছি।

বিশ্বাসী ভক্ত নববিধানপ্রচারক স্বর্গগত ভাই মহিমচন্দ্র সেন মহাশয় আমাদিগকে হাতে ধরিয়া ভগবানের আলোকে এই বিশ্বাসের পথে আনিয়াছেন। তিনি আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে বিশ্বাসের বীজমন্ত্র তাড়িতপ্রবাহের মত অনুপ্রাণিত করিয়া দিয়াছেন। আমরা কি আর এই বীজমন্ত্রকে ভুলিতে পারি? এই বীজমন্ত্রই আমাদের জপ, তপ, হোম সকলই হউক। ইহাকে আমরা নমস্কার করি। এই বীজমন্ত্রই আমাদিগকে ভগবানের সম্মুখীন করিবে। ইহাই আমাদিগকে সাধু মহাজনদের সঙ্গে যুক্ত করিবে। ইহাই আমাদিগের নিকট প্রকৃতির গুহ্যতত্ত্ব সকল খুলিয়া দিবে। ইহাই আমাদিগকে বন্ধুগণের সঙ্গে এক আত্মা এক প্রাণ করিবে। এবং ইহা হইতেই আমাদের মণ্ডলীর সকল constitution গড়িয়া উঠিবে। আমরা এই বিশ্বাসকে অভিবাদন করি।

আজকাল একটা কথা সভা সমিতিতে সর্ব্বদা হচ্ছে। সেটা হচ্ছে এই, "যত মত, তত পথ"। আমরা বলি, অনেক মত কিন্তু এক পথ অর্থাৎ প্রকৃত বিশ্বাসের পথ। সেই বিশ্বাসের পথ নবযুগে নববিধানের অনন্ত সামঞ্জস্যের পথ আবিষ্কার করেছে। আদিকাল হইতে যত মত চলিয়া আসিতেছে, এবং ভবিষ্যতে যতমত সৃষ্ট হইবে, সকলকে নববিধান সামঞ্জস্য করিয়া আত্মস্থ করিবে ও অনন্ত অভিব্যক্তির পক্ষপুটে আরোহণ করিয়া এক সরল সোজা সামঞ্জস্যের পথ ধরিয়া অনন্তে স্থান পাইবে। আমাদের "নববিশ্বাস" এই নব আদর্শের পথ অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে এক অনন্ত আদর্শের সামঞ্জস্যের ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে অধিকারী করিবে।

শ্রীউমাপ্রসন্ন ঘোষ।

—•—

যৌবনের স্বপ্ন

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় W. C. Bannarji নামে প্রসিদ্ধ; তাঁহার সংগৃহীত বংশাবলির তালিকায় দেখিলাম যে, আমাদের পূর্ব্ব পিতামহ ৺গুণানন্দ ছোট ঠাকুর মহাশয়, যাঁহার সন্তান বলিয়া আমরা এখনও পরিচিত, তাঁহাকে Seer and Prophet বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই বংশের কুলমর্য্যাদা বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ ছিল। স্বর্গীয় মথুরানাথ বাচস্পতি মহাশয়, যাঁহার পাণ্ডিত্যজ্ঞানের জন্য পূর্ব্ববঙ্গে তিনি বিখ্যাত ছিলেন, তিনি আমার প্রপিতামহ স্বর্গীয় গৌরহরি বন্দোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিবার জন্য চট্টগ্রাম হইতে আমাদের গৃহে উপস্থিত হইলেন। কোথায় চট্টগ্রাম, কোথায় হুগলি জেলার এক নগণ্যগ্রাম। শুনা যায়, এই বিবাহ অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল। বঙ্গের রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ভট্টনারায়ণের সন্তান বলিয়া যাঁহারা পরিচিত, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেক মনীষী ব্যক্তি এই বংশের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। মধ্যযুগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সহকর্ম্মী নিত্যানন্দও ভট্টনারায়ণের বংশকে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুগে রাজর্ষি রামমোহন এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও ভট্টনারায়ণের সন্তান বলিয়া পরিচিত। এই বংশের পূর্ব্বপিতামহদিগের ধর্ম্মভাব ও সাধনায় আকৃষ্ট হইয়া যে আমি ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছি, তাহা নহে। ইহা এক অদ্ভুত ঘটনা—ইহা এক স্বপ্নের ঘোর, নিদ্রায় মানুষ যে স্বপ্ন দেখে, ইহা তাহা নয়—ইহাতে স্বপ্নের ঘোর আছে, অথচ জাগরণের চৈতন্য আছে। ইহা বিধাতার এক অলৌকিক সত্তার স্পর্শ। ইহা শ্রীভগবানের বাণী। এই বাণীই জীবনপথের নেতা হইয়া, সকল প্রকার সুখ সুবিধাকে চূর্ণ করিয়া, জীবনের সংকল্পকে পূর্ণ করিল—স্বপ্ন জীবনে আকার গ্রহণ করিল।

একদিন কলিকাতার বাহিরে কোন একস্থানে উৎসব উপলক্ষে শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের শুভাগমন হইবে, শুনিলাম। আমি বিশেষ আগ্রহের সহিত তথায় গমন করিলাম। শ্রীআচার্য্যদেবের উপাসনায় যোগদান করিলাম, উপদেশ শ্রবণ করিলাম। আমি মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া উপদেশটী শুনিলাম। উপদেশ শুনিয়া আমার চক্ষু দিয়া অনবরত অশ্রুপাত হইতে লাগিল; যেন কোন্ এক অলৌকিক লোকে গিয়া স্বর্গের মহাবাণী মিষ্ট হইতে মিষ্টতর মধুরতর হইয়া আমার সর্ব্বশরীর ও মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। উপাসনা শেষ হইলে গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। আমি স্বপ্নের ঘোরে আচ্ছন্ন। ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, যখনই উপদেশের কথা মনে হয়, তখনই গঙ্গা যমুনার ন্যায় দুই চক্ষু দিয়া দুই ধারা বহিতে থাকে। এই স্বপ্নের ঘোরে আমার প্রায় ৫২ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। আহার নিদ্রার কথা ঘুণাক্ষরেও মনে স্থান পাইল না। এই স্বপ্নের ঘোরে আমি স্বর্গের বাণী শ্রবণ করিলাম।

বুঝিতে পারিলাম যে, আমার জন্মের পূর্ব্ব হইতে শ্রীভগবান আমার জন্য ব্রাহ্মসমাজে স্থান করিয়া রাখিয়াছেন। গভীর অন্ধকার ভেদ করিয়া যেমন বিদ্যুতের আলোকে পথ ঘাট দেখা যায়, সেইরূপ বাণীর দিব্য জ্যোতি'তে আমার গম্য পথ দেখিতে পাইলাম। যুক্তি তর্ক চিন্তা ও আলোচনা করিয়া যাহা ঠিক হইল না, তাহা এক মুহূর্ত্তে ঠিক হইল। পিতার বুক ভরা স্নেহ, ভাই ভগ্নীদের প্রীতির বন্ধন, আত্মীয় স্বজনদিগের বিলাপ ও ক্রন্দন সব যেন এক মুহূর্ত্তে চূর্ণ করিয়া, নিঃসম্বল ও নিরাশ্রয় হইয়া ব্রাহ্মসমাজের শরণাপন্ন হইলাম।

ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া দুটী মন্ত্র পাইলাম। একটী ঈশ্বরের পিতৃত্ব, অপরটী মানবের ভ্রাতৃত্ব। এই মন্ত্র সাধন করিবার জন্য প্রাণে অদম্য উৎসাহের আবির্ভাব হইল। মনে হইল, যাহারা অস্পৃশ্য ও ঘৃণ্য, তাহাদিগকে ভাই বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। একদিন একজন লোক যাইতেছে, তাহার মস্তকে ময়লার টব, পা দুটী কর্দ্দমাক্ত, আমি তাহারই পাদস্পর্শ করিয়া নমস্কার করিলাম। লোকটী নির্ব্বাক হইয়া আমার দিকে তাকাইয়া রহিল, আমি স্বস্থানে চলিয়া গেলাম। ভাবিতে লাগিলাম, এরূপ সাধনায় তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হইবে না; এমন কিছু করা চাই, যাহাতে তাহারা বুঝিতে পারে যে, আমরা যথার্থ তাহাদের ভাই বলিয়া প্রীতি করি।

একদিন আমাদের বাড়ীর মেথরকে নিমন্ত্রণ করিলাম, তাহার জন্য একটী নূতন কারপেটের আসন, একটি নূতন কাঁসার থালা, একটি নূতন কাঁসার গেলাস, একটী নূতন কাঁসার বাটি, একখানি নূতন বস্ত্র কেনা হইল। রাত্রিতে আসিয়া সে আমাদের বাড়ী আহার করিবে, এই প্রতীক্ষায় তাহার জন্য নানাবিধ মিষ্টান্ন লুচি তরকারী প্রস্তুত করিয়া রাখা হইল। রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় সে আসিল। তাহাকে বলা হইল যে, বারাণ্ডায় তোমার জন্য খাদ্য প্রস্তুত আছে, নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া খাইতে বস। সে একবার তীক্ষ্ণ ও তীব্র দৃষ্টিতে খাদ্য দ্রব্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিল, তারপর দ্রুতপদে 'আসি' বলিয়া চলিয়া গেল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকা গেল, শেষ নিরাশ হইয়া সব তুলিয়া রাখা হইল। তার পর দিন তাহার স্ত্রী কাজ করিতে আসিল, তাকে বলা হইল, তোমার স্বামী 'আসি' বলিয়া যে চলিয়া গেল, আর আসিল না কেন? তাহার স্ত্রী উত্তর করিল যে, বাবু সে কাঁপিতে কাঁপিতে আমাকে গিয়া বলিল যে, বাবুরা আমাকে যাদু করিবার জন্য ফাঁদ পাতিয়াছিল, আমি বুঝিতে পারিয়া চলিয়া আসিলাম। আমরা বলিলাম, এই সব নূতন কাপড়, থালা, গেলাস, বাটি, আসন তবে তুমি নিয়ে যাও; সে বলিল, না বাবু, আমি কেবল খাবার নেব, আর ওসব নেব না। তাহাকে তাহাই দেওয়া হইল। ভাবিতে লাগিলাম যে, সমাজ ভদ্রজাতির সহিত উহাদের এমন এক ভেদরেখা সৃষ্টি করিয়াছে যে, হঠাৎ ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া এরূপ ভাবে মেশামিশি করিলে, উহারা আমাদের ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না।

অবস্থাচক্রে বাঁকিপুরে যাইতে হইল। সেখানে শ্রদ্ধেয় ভাই ব্রজগোপাল, সাধু প্রকাশচন্দ্র ও মাতা অঘোরকামিনী দেবীর সেবার স্পর্শ পাইলাম। আমার মনে পূর্ব্ব ভ্রাতৃত্ব-সাধনার ভাব জাগ্রত হইল। আমাদের একটি ক্ষুদ্র সেবার দল গঠিত হইল। সহরে কলেরা বসন্ত প্লেগ হইলে, এই দল সকলের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইত। ভাই ব্রজগোপাল আমাদিগের নেতা, আমি তাঁহার সহকর্ম্মী। যাহারা পরিত্যক্ত নরনারী, তাহাদের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আমরা সেবা করিতাম, পথ্যাদি দিতাম এবং প্রয়োজন হইলে শ্মশানে গিয়া সৎকার করিতাম।

ক্রমে আমাদের সেবার ধারা দিক পরিবর্ত্তিত করিল। শরীরের সেবা, আত্মার সেবা যুগপৎ আমাদের শক্তি, সময় ও চেষ্টাকে অধিকার করিল। স্থানীয় কৃষকসম্প্রদায়, সবার সূত্র ধরিয়া যাহাদের সহিত আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহাদের লইয়া ধর্ম্মসভা গঠন করিলাম। মধ্যে মধ্যে সাধু প্রকাশচন্দ্র ও বিশ্বাসী বন্ধু বাবু ব্রহ্মদেব নারায়ণ আমাদের কর্ম্মে সহায়তা করিতেন। বক্তৃতা আলোচনা ধর্ম্মপ্রসঙ্গ প্রভৃতি দ্বারা গ্রামের এই সকল ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান উৎসবের আকার গ্রহণ করিত।

অনেক মহাপুরুষ দেখিয়াছি, কিন্তু মহানারীর কথা অল্পই শুনিয়াছি। বাঁকিপুরে মাতা অঘোরকামিনী দেবী সত্য সত্যই ব্রাহ্মসমাজে একজন মহানারী ছিলেন। তাঁহার সেবার মধ্য দিয়া বাঁকিপুর তীর্থে পরিণত হইল; দুঃখী গরীবের সেবা ব্যতীত, মাতা অঘোরকামিনী দেবী কন্যাদিগের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, বালিকাদের জন্য আশ্রম প্রতিষ্ঠা, নারীসমিতি প্রভৃতি বহুবিধ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া বাঁকিপুরের একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান, এই দিনে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান নির্ব্বিশেষে সকলকে ভাই বলিয়া আদর করা হইত। যৌবনে যে স্বপ্ন আমার হৃদয় মনকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, বাঁকিপুরে গিয়া তাহা বাস্তব জীবনে আকার গ্রহণ করিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীমতী শশিমুখী দেবীর সংক্ষিপ্ত জীবনী।

(ভাই অখিলচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক, ৪ঠা এপ্রিল, শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আমাদের পূজনীয়া মাতা শশিমুখী দেবী ভক্তপতির সহিত কুটীরবাসিনী হইয়া, বৈরাগিণীর জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। ভক্ত ফকিরদাসের পবিত্র প্রচারব্রতগ্রহণের পর এই পশ্চিম বঙ্গের প্রধান প্রচারক্ষেত্র অমরাগড়ীতে একটী দাসপরিবারের প্রতিষ্ঠা হইল; মাতা শশিমুখী দেবী এই পরিবারের প্রধান পরিচারিকা হইয়া, আমাদের ন্যায় অসহায় ভিখারী সন্তানদের প্রতিপালনের ভার লইলেন। ১২৯২ সালের ৮ই কার্ত্তিক কোজাগরা পূর্ণিমার রাত্রিতে, মাতা শশিমুখী দেবী একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুত্র সন্তান প্রসব করেন; এই সন্তানই বর্ত্তমানে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্র। কয়েক মাস পরে স্বর্গীয় নববিধানপ্রচারক ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ইহাকে বিধিপূর্ব্বক সুব্রতানন্দ নাম প্রদান করেন। ১২৯৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে অমরাগড়ী ব্রাহ্মসমাজের একজন দীক্ষিত ব্রাহ্ম ছোট হৃদয়নাথ রায়ের ক্ষয়রোগে মৃত্যু হওয়ায় এবং ঐ ব্যক্তি জীবিতকালে নিজের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রচলিত হিন্দু মতে প্রায়শ্চিত্ত না করায়, মৃত্যুর পর তাঁহার বৃদ্ধ পিতাকে জ্ঞাতিগণ পুত্রের শবদেহ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। বৃদ্ধ পিতা যখন কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া পুত্রের শবদেহ-পরিত্যাগের অভিপ্রায় ভক্ত ফকিরদাসের নিকট প্রকাশ করিলেন, তখনই ভক্তের ইঙ্গিতে স্থানীয় ব্রাহ্মবন্ধুগণ মৃতদেহ নবসংহিতানুসারে সৎকার করিলেন। হিন্দুমতে প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া ক্ষয়রোগগ্রস্ত শবদেহ-সৎকার এ দেশে প্রথম অনুষ্ঠান। সেই অছিলায় স্থানীয় হিন্দুগণ ক্ষেপিয়া উঠিয়া এখানকার ব্রাহ্মসমাজকে সমূলে নির্ম্মূল করিবার সংকল্প করিয়া, বিবিধ প্রকারে সভ্যদিগকে নির্য্যাতন করিতে লাগিলেন। একদিনকার একটী ভীষণ ঘটনায় মাতা শশিমুখী দেবীর অটল বিশ্বাসের বিষয় আজও মনে জাগিতেছে। ঐ দিবস প্রাতঃকালে ভক্ত ফকিরদাসের একজন নিকট জ্ঞাতি ভ্রাতা তাঁহার দলস্থ কয়েকজন গুণ্ডা প্রকৃতির লোক সঙ্গে লইয়া, ভক্ত ফকিরদাসের কুটীরের সদর দরজায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "এই বাড়ীতে আমার অংশ আছে, অতএব আমি আমার এই সব লোকজন লইয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া তোমাদের নিত্য উপাসনার বেদীর উপর পাঁঠা কাটিব, মদ খাইব ও যথেচ্ছ ব্যবহার করিব।" উক্ত ব্যক্তির ঐরূপ আচরণে অনেকেই তথায় উপস্থিত হইলেন। প্রথমতঃ ভক্ত ফকিরদাসের তৃতীয় সহোদর যশোদাকুমার ঐ দুর্দ্দান্ত ভ্রাতাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া শান্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। এমন কি ঐ ব্যক্তির পায়ে ধরিয়া বলিলেন, "বড়দাদা (ভক্ত ফকিরদাস) বাড়ীতে নাই, বড় বৌঠাকুরাণী (শশিমুখী দেবী) শিশুপুত্র ও কন্যাদ্বয়সহ এই বাড়ীতে আছেন, অতএব, আপনি বিরত হউন।" যশোদাবাবুর এইরূপ অনুনয় বিনয়ে উক্ত দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি ও তাঁহার সহচরবৃন্দ নিরস্ত না হওয়ায়, ভক্ত ফকিরদাসের কনিষ্ঠ সহোদর ভীমকায় নন্দকুমার ঐ বাটীর দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া সিংহবিক্রম প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "এই বাড়ীর মধ্যে বড় বৌঠাকুরাণী শিশু সন্তানদের লইয়া বাস করিতেছেন; অতএব আমাদের তিন ভ্রাতার প্রাণ থাকিতে, যে কেউ হউক, কাহাকেও এই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে দিব না। অতএব, আমি এই দ্বারে দাঁড়াইলাম, যাহার সাধ্য হয়, অগ্রসর হউক।" নন্দকুমারের উক্ত তেজঃপূর্ণ কথা শুনিয়া, উক্ত দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি ও তাঁহার সঙ্গিগণ ভয় পাইয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেলেন। ঐ দিনকার ঘটনার বিষয় মনে হলে আজও হৃদ্‌কম্প হয় এবং মাতা শশিমুখী দেবীর ধৈর্য্য ও বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত দেখিয়া প্রাণ পুলকে পূর্ণ হয়। ঐদিন মাতা শশিমুখী দেবী নির্ভীক ভাবেই কন্যাদ্বয় ও শিশুপুত্রসহ ঐ বাটীতে বাস করিতেছিলেন। মা বিপদভয়নিবারিণী জগজ্জননী উক্ত ঘটনার মধ্যে তাঁর জীবন্ত প্রকাশ দেখাইয়া, আশ্রিত দাসপরিবারকে রক্ষা করিলেন। ঐ সময় হইতে প্রায় দুই মাস কাল এখানকার মণ্ডলীর উপর স্থানীয় দুর্দ্দান্ত লোকেরা অতি কঠোর ভাবে নানাপ্রকার নির্য্যাতন করিয়াছিলেন।

ঐ দুইমাস কাল দরিদ্র ভক্তপরিবার ও মণ্ডলীর দীন উপাসকমণ্ডলীর উপর ভীষণ ভীষণ অত্যাচার হইতে থাকায়, প্রতিদিন রাত্রিতে উপাসকগণ ভক্ত ফকিরদাসের প্রাচীর-বেষ্টিত গৃহে সমবেত হইতেন। মাতা শশিমুখী দেবী সকল উপাসকের আহারাদির ব্যবস্থা করিতেন ও তত্ত্বাবধান করিতেন। ঐ বিষয়ে ইতিবৃত্তে লিখিত হইয়াছে, "আহা! একদিকে যেমন জীবন ও ধর্ম্মরক্ষার চিন্তা এবং নানাবিধ আশঙ্কা, তেমনি অপর দিকে হরিগুণকীর্ত্তন এবং বন্ধুসহবাস জন্য বিবিধ রসরঙ্গ। কি অদ্ভুত নির্ভীকতা এবং অসীম সাহসিকতা সহকারে ভক্ত ফকিরদাসের কনিষ্ঠ সহোদর ও মৃদঙ্গবাদক শ্রীমান্ হরলাল এ দুইজনে তাঁহাদের গুরুজনদের প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি সম্মান জন্য, স্ব স্ব কর্ত্তব্যসাধনে প্রাণ ঢালিয়া সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিতেন, তাহা চিন্তা করিলেও প্রাণ আনন্দে নৃত্য করে। প্রত্যেক রাত্রিতে পঁচিশ ত্রিশটী লোকের উদর পূর্ণ হইবে, দরিদ্র ভক্ত ফকিরদাসের আশ্রমে এরূপ আয়োজন তেমন কিছুই থাকিত না। দরিদ্র আশ্রমবাসীদিগের ভিক্ষালব্ধ অর্থে জীবনধারণ হইত বটে, তথাপি সেই আশ্রমে মায় অতুল করুণাগুণে খাদ্যের অভাব হইত না। ব্রাহ্মসমাজের পরিচিত দানশীল বন্ধু শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণচন্দ্র আশের কন্যা কোমলহৃদয়া বালিকা শ্রীমতী স্নেহলতা অমরাগড়ীর দরিদ্র ব্রহ্মসন্তানগণের বিপদকাহিনী পত্রিকা পাঠ করিয়া, তিনি বেথুন কলেজের সমপাঠিকাদিগের মধ্য হইতে

সংগ্রহ করিয়া, ২৬৷৵৹ টাকা ভক্ত ফকিরদাসের নিকট পাঠাইয়া দেন। তৎকালে আরো কোন কোন দাতার নিকট হইতে ভিক্ষা পাওয়া যায়। এইরূপে মার প্রদত্ত আকারে উদর পূর্ণ করিয়া, বন্ধুগণ ভক্তপরিবারকে ও মণ্ডলীর আশ্রিত ব্যক্তিগণের পরিজনদিগকে রক্ষার জন্য সমস্ত রাত্রি প্রহরীর কাজ করিতেন। এই সকল ঘটনার ভিতর দিয়া আমরা ভক্ত ও ভক্তপরিবারের বিশ্বাস ও ভক্তির বিশেষ পরিচয় পাইয়া ধন্য হইয়াছি।

১২৯৩ সালের অত্যাচার নিবারিত হইলে, ভক্ত ফকিরদাসের পূর্ব্বের অম্লশূলের পীড়া কঠিন আকার ধারণ করে। ঐ সম্বন্ধে ইতিবৃত্তে লিখিত হইয়াছে, "অনাহার অনিদ্রা অতিরিক্ত পরিশ্রমে উপাচার্য্যের (ভক্ত ফকিরদাসের) শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে……ক্ষুধামান্দ্য এবং ক্রমশঃ অরুচি অত্যন্ত প্রবল হইল… চলচ্ছক্তি খুব হ্রাস হইল। তাঁহার জীবনরক্ষা সম্বন্ধে অনেকেরই মনে সংশয় হইয়াছিল……কিন্তু বিধাতার এমনি করুণা যে, একদিন হঠাৎ দুগ্ধে অরুচি চলিয়া যায়। কয়েকদিন পরেই মার বিশেষ করুণায় একটী ঔষধ হস্তগত হইল। চিন্তা নাই, চেষ্টা নাই, শ্রীমতী শশিমুখী দেবী একটী দরিদ্রা স্ত্রীলোকের নিকট হইতে অম্লশূলের মহৌষধি প্রাপ্ত হন।" ভক্ত ফকিরদাস তাঁর সাধের জয়পুর ইংরাজী বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া সন্ধ্যার সময় বাটী প্রত্যাগমন মাত্র বেদনা উপস্থিত হয়। সে যে প্রকার ভয়ঙ্কর বেদনা, তাহাতে তাঁহার যাতনা দেখিলেও প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। চারি পাঁচটী খুব বলবান লোক অতিকষ্টে ধরিয়া রাখিতে পারিত না। এই অবস্থায় শশিমুখী দেবী সজলনয়নে ভক্ত ফকিরদাসকে বলিলেন, "একটী ঔষধ পাইয়াছি, তাহা কি ব্যবহার করা হইবে।" ভক্ত উত্তর দিলেন, "ঔষধ-গ্রহণে পৌত্তলিকতার সহিত কোন প্রকার সংস্রব থাকিবে না" ? তদুত্তরে দেবী বলিলেন, "না"। ঔষধ কেবল নাভিস্থলে বাঁধিয়া রাখিতে হইবে।" এই চমৎকার ঔষধ-ব্যবহারে ফকিরদাস প্রাণসংশয় পীড়া হইতে মার কৃপায় আরোগ্য লাভ করেন। মাতা শশিমুখী দেবী পতিদেবতার এই পীড়াতে নিজে অনাহার অনিদ্রা সকল প্রকার ক্লেশ সহ্য করিয়া সেবা করিতেন।

১২৯৪ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে মাতা শশিমুখী দেবীর তৃতীয় পুত্রের জন্ম হয়। শিশুটী ৪র্থ দিবসেই পীড়িত হইয়া তেরদিন জীবিত থাকিয়া প্রস্থান করে। ঐ অবস্থায় সন্তানের পীড়াদি কারণে তিনি অত্যন্ত দুর্ব্বল হন। তাহার উপর পুত্রশোক-শেল তাঁহার হৃদয়কে বিদ্ধ করায়, অচিরেই তিনি শয্যাশায়িনী হইলেন। দুই পার্শ্বে নিউমোনিয়া হওয়াতে তাঁহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। চিকিৎসকগণ বলিলেন, "এ পীড়াতে জীবন-রক্ষা কদাচিৎ হইয়া থাকে।" যাই হোক, রোগীর অবস্থা তদ্রূপ হইল, দেখিলে মনে হইত, যেন একটী মৃতদেহ পড়িয়া আছে। এইরূপে কঠিন পীড়াতে তিনমাসকাল শয্যাগত ছিলেন। মার কৃপায় তিনি একটু সুস্থ হইলে, তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী হেমপ্রভাও কঠিন জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া একেবারে মৃতবৎ হইয়া পড়েন। তাই ইতিবৃত্তে লিখিত হইয়াছে, "বিপদের অকূল সাগরে কে আর রক্ষাকর্ত্তা আছেন ? ভগবানের চরণাশ্রিত ক্ষুদ্র পরিবারটী অপার বিপদসাগরের উত্তাল তরঙ্গাঘাতে ভয়ঙ্কর রূপ আন্দোলিত হইতে লাগিল। অকূলের কাণ্ডারী শ্রীহরিই সকল বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন।"

(ক্রমশঃ)

মানবনামের সার্থকতা

আমরা পৃথিবীতে এসেছি মানুষ হয়ে কেন ? এ প্রশ্নটি যখন মনে জাগে, তখন ভয় হয় কাজের অনন্ত পথ দেখে ; যদি মানুষ হয়ে না আসতাম, তবে কাটাতে পারতাম জীবন বিলাসীর বিলাসপুরে, প্রাণমনকে ভাসাতে পারতাম স্রোতের জলের শেওলার মত, কিন্তু পারিনে। কে যেন কাণে কাণে বলে যায়, "কি ওচ্ছিস, তুই যে মানুষ, তোর জীবনে আর পশুর জীবনে পার্থক্য যে অনেক"। বুক কেঁপে উঠে, ভয়ে ভয়ে বলি, "তবে কি করতে হবে ?" কে যেন বলে, "মানুষ নামকে করতে হবে সার্থক।" এই যে মানুষ নামকে সার্থক করবার প্রেরণা সময় সময় আমাদের বুকে জাগে, এ মন্ত্রকে সব সময় ধরে রাখাতো সহজ ব্যাপার নয়। আমরা সংসারী, কি করে মানুষ নামকে আমাদের জীবনে সফল করে তুলব ? মানুষ নামটি সার্থক করবার জন্য করতে হয় সাধনা, করতে হয় জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে গভীর তপস্যা। এই সাধনার স্পৃহাই যে মানুষকে করেছে প্রকৃত মানুষ, করেছে জীবশ্রেষ্ঠ। তবে এ সাধনার পথে অগ্রসর হতে হলে, আমরা সংসারেই থাকি, আর বনচারীই হই, জীবনকে একটি নিয়মে করতে হবে শৃঙ্খলাবদ্ধ। উচ্ছৃঙ্খল জীবন মানবললাটে অভিশাপ-স্বরূপ। ধর্ম্ম কর্ম্ম আদর্শ যশ যাহাই জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে চাই না কেন, যদি জীবন কোন কিছু নিয়মে বন্দী হতে নারাজ হয়, তবে কিছুই হবে না, সে জীবন নিষ্ফল। মানুষ-নামকে সার্থক করতে হলে, মানুষকে সর্ব্বপ্রথমে বিশ্বদেবতার চরণপ্রান্তে করতে হবে প্রতিজ্ঞা, "আমি আমার জীবন তোমার আদেশ ও তোমার ধর্ম্ম-রাজ্যের সুকঠোর নিয়মের মধ্যেই করব অতিবাহিত", প্রার্থনা করতে হবে দুর্ব্বল চিত্তের জন্য শক্তি।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কল্যাণ ও অকল্যাণ ভাব দুই পাশা-পাশি আছে ; কল্যাণকর কর্ম্মে নিজকে নিয়োজিত রেখে, অকল্যাণ ভাবকে মন থেকে করতে হবে বিলীন। যদি সে পথে চলতে ভয় হয়, তবে আকুলচিত্তে শক্তিকে করতে হবে ভিক্ষা ; যদি তাঁকে ডাকবার আগ্রহ মনে না জাগে, যদি মন হয়ে যায় শুষ্ক, তবু নিরাশ হলে চলবে না। এক মিনিট দু'মিনিট করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে হবে আকুল প্রার্থনায় ; যতক্ষণ মন সরস না হবে,

বসে থাকতে হবে পূজার বেদীতে। এমনি করে জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তকে সার্থকতার দিকে নিয়ে যেতে হবে টেনে, শুনতে হবে সংসারের অনন্ত কোলাহলের মাঝে থেকেও শান্তম্ শিবম্ এর বাণী; তাঁর পরশ, তাঁর ইঙ্গিত অনুভব করে চলতে হবে সংসার-পথে। অনেক সময় আমরা সংসারে হৈ চৈ এ নিজকে ডুবিয়ে বিশ্ববিধাতার সঙ্গে হারিয়ে ফেলি প্রাণের যোগ, ভুলে যাই তাঁর প্রেমপ্রীতি, দেখতে পাইনে তাঁর মঙ্গল হস্ত আমাদের সংসারে; তখন আমাদের চিন্তাধারায় সংসারই হয়ে উঠে সব চেয়ে বড়, সংসারকে বুকের রক্ত খাইয়ে প্রবল করবার সাধক হই তখনি, ভুলে যাই সংসারের মধ্যেও যে তাঁরই প্রেমদৃষ্টি স্নেহ দৃষ্টি রয়েছে, তাই সংসারের বুকে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করতে হই অক্ষম। এই যে শক্তিহীনতা, এর মূল উৎসধারা হোল আমাদের অন্ধতা, একেও করতে হবে বিনাশ, আমাদের জ্ঞানদৃষ্টিতে তাঁর প্রেমদৃষ্টি স্নেহদৃষ্টিকে করে লক্ষ্য। এমন করে অন্তরে, বাহিরে, কর্ম্মে, বিজ্ঞানে, দুঃখে, সুখে, সর্ব্বত্র তাঁকে যে জীবন উপলব্ধি করতে পেরেছে, সেই মানবজীবনই সার্থক, এ না হয়ে পারে না। এ পথে হয়তো বা পার্থিব অনেক বস্তু হতেই জীবনকে করতে হবে বঞ্চিত, সংগ্রামের পর সংগ্রামে হয়তো বা জীবনকে করতে হবে বিসর্জ্জন। তবু সে পথকেই বরণ করতে হবে মানবের। দুর্গমের ভয়ে মানুষকে পিছপা হলে তো চলবে না? মানুষেরই যে করতে হবে দুর্গমকে সুগম। মানুষ এই সাধনা যুগের পর যুগ করেছে বলেই, আদিম যুগের মানুষ হয়ে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত সংগ্রাম করেছে বলেই বিংশ শতাব্দীর মানুষ কি জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, সব স্থানেই আজ এত উন্নত। ধর্ম্ম, কর্ম্ম, শিক্ষা, দীক্ষা সব কিছুকেই, নিয়মের সঙ্গে জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তে অনুসরণ করতে পারলে, মানুষ নাম মানুষের সার্থক না হয়ে পারে না। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন, মানুষ নামকে সার্থক করবার জন্য যদি দুর্গমকেও বরণ করতে হয়, তা যেন পারি, জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে।

শ্রীসমরেন্দ্র দত্ত-রায়।

শিশু কন্যা সুহাসিনী

আজ শিশুকন্যা সুহাসিনীর সপ্তত্রিংশ সাম্বৎসরিক দিনে তাঁহার জীবনের একটু কাহিনী লিখিতে আসিলাম। এই কন্যা কলিকাতায় ৩নং কৃষ্ণদাস পাল লেনে, তাঁহার মাতামহের বাস-ভবনে জন্মগ্রহণ করেন। যখন তাঁহার ২।৩ বৎসর বয়স, তখন তিনি সমস্তিপুরে দুরারোগ্য 'ইরিসিপ্লাস' রোগে আক্রান্ত হন। এই সময়ে আমাদের সমবিশ্বাসী ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ ডাঃ নবীনচন্দ্র দত্ত মহাশয় দারভাঙ্গায় মহারাজার হাসপাতালে প্রধান চিকিৎসক-রূপে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারই চিকিৎসায় শিশু সুহাসিনী আরোগ্যলাভ করেন। ডাঃ নবীনবাবু কন্যার সেই আক্রান্ত স্থানে যখন অস্ত্রপ্রয়োগ করেন, তখন সুহাসিনী নীরবে সেই অস্ত্রাঘাত সহ্য করিয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহার বয়োবৃদ্ধি সহকারে শরীরের অনেক স্থান হইতে বড় বড় স্ফোটক (ফোড়া) বাহির হইতে লাগিল। সেই সময়ে সমস্তিপুর রেলওয়ে হাসপাতালে ডাঃ নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ও ডাঃ ভবনাথ ভট্টাচার্য্য নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে এইরূপ অস্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা সেই সকল স্ফোটক সম্বন্ধে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমাগত তাঁহার শরীরে operation চলিতে লাগিল। কিন্তু তিনি চিকিৎসকের অস্ত্রপ্রয়োগ শান্তভাবেই সহ্য করিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেই তিনি বলিতেন, "ভাল আছি।" এই সময়ে এই শীশুপ্রকৃতি শিশু কন্যার ভিতরে উচ্চ বৈরাগ্যের ভাব আসিয়াছিল। এক সময়ে তাঁহার কাণে মাকড়ি পরিবার ইচ্ছা হইয়াছিল; তাই একদিন বলিয়াছিলেন—"বাবা! আমার জন্য এক পয়সার মাকড়ি কিনিয়া আনিও।" আমিও তাই করিলাম। এই মাকড়ি পাইয়া তাঁহার মুখে যে সরল আনন্দ ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা কোনদিন ভুলিতে পারিব না। যখন কাপড়ের প্রয়োজন হইত, তখন বলিতেন, "আমার জন্য খুব কম দামের কাপড় আনিও।" তখন তাঁহার এইরূপ ভাবে বুঝিয়াছিলাম যে, তিনি কেবল আমাদের অবস্থা বুঝিয়াছিলেন তাহা নহে, তাঁহার ভিতরে একটা স্বাভাবিক বৈরাগ্যেরও ভাব আসিয়াছিল। দশবৎসর বয়সে ভীষণ উদরি অর্থাৎ Dropsy রোগে আক্রান্ত হন। চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে কলিকাতায় ৪১নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে মাতামহ-ভবনে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। কলিকাতায় তাঁহাকে বড় বড় ডাক্তার এবং কবিরাজ দেখিয়াছিলেন। ক্রমে এই রোগ ভীষণাকার ধারণ করিল এবং ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ২রা জুন তারিখে, তিনি সেই মাতামহভবনে পৃথিবীর চক্ষু মুদ্রিত করি-লেন। এই রোগাক্রান্ত অবস্থায় যখন তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন, তখন জিজ্ঞাসা করিলেই বলিতেন, "আমি ভাল আছি।" যে রজনী প্রভাতে তিনি চিরদিনের জন্য নীরব হইলেন, সেইদিন তিনি একবার বলিলেন, "তোমরা অনেক করিয়াছ, আর করিতে হইবে না।" এই শিশুর ভিতরেও কোন অদ্ভুত বিধানে গুরুজনের প্রতি শেষ দিনে কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের ভাব আসিয়াছিল। শিশু যোগিনী বাঁকিপুর বালিকাবিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সময়ে যেরূপ মেধা ও প্রতিভা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীগণ না বলিয়া থাকিতে পারেন নাই। আজ তাঁহার সাম্বৎসরিক দিনে কেবল এই কথাই বলি, "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক।"

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

পরলোক

(রামপ্রসাদী সুর)

পরলোক ত নহে দূরে
অন্তরে বিরাজ করে,
আঁখি মেলে দেখ না জীব
পাবে শান্তি চিরতরে।
শ্রীকেশবের অমরবাণী
সবার সাথে ঘোরে ফেরে,
বাণী বলছে, জীব সাধন কর,
মুক্তি তোমার নহে দূরে।
ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে আমি
ফিরছি সদা দ্বারে দ্বারে,
একটী কণা ভিক্ষা পেলে
খাব আমি উদর পূরে।
তুমি আমি ত পর নহি
সবার জন্ম একই ঘরে,
একই সূত্রে সবাই গাঁথা,
একই ধর্ম্ম সাধন করে।
সবাই ব্রহ্মেতে তন্ময় হয়ে
থাকবে জীব এ সংসারে,
তাঁর মাভৈঃরবে পূর্ণ জগত
কাণ পেতে শোন নারে।

শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংবাদ।

জন্মদিন—গত ৯ই জুন, আমাদের বর্ত্তমান সম্রাটের শুভজন্মদিনস্মরণে, পুরী নববিধান নবশ্রীক্ষেত্রে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন।

জাতকর্ম্ম—গত ৪ঠা জুন, কলিকাতায়, ১নং ফেডারেশন ষ্ট্রীটে, অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ সেনের দৌহিত্র, শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাসের পৌত্র, শ্রীমান্ সন্তোষকুমার দাসের নবজাত শিশু পুত্রের শুভজাতকর্ম্মানুষ্ঠানে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। বিধানজননী নবজাত শিশুকে ও তাহার পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন। শিশুর মাতামহ এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

নামকরণ—গত ৪ঠা জুন, বাণীবন ব্রাহ্মপল্লীতে স্বর্গীয় ডাক্তার এককড়ি সিংহ রায়ের ভবনে, বাঁকিপুর রামমোহন রায় সেমিনারির শিক্ষক শ্রীমান্ বিজয়চন্দ্র কর্ম্মকারের প্রথম পুত্রের শুভনামকরণ অনুষ্ঠান নবসংহিতা অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন। শিশুর নাম "সুবীরচন্দ্র" রাখা হইয়াছে।

গত ১১ই জুন, ১১নং পদ্মনাথ লেনে, শ্রীমান্ হরিসুখ গুপ্তের শিশুপুত্রের শুভ অন্নপ্রাশন ও নামকরণ অনুষ্ঠানে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন এবং শিশুকে "আলোক" নাম প্রদান করেন।

গত ১৩ই জুন, কেশব একাডেমী স্কুল গৃহে, ১৪৮নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটে, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখার্জির দৌহিত্র, শ্রীযুক্ত ডাঃ হেমন্তকুমার চাটার্জির পৌত্র, শ্রীমান্ সতীকুমার চাটার্জির প্রথম শিশু পুত্রের শুভ অন্নপ্রাশন ও নামকরণ অনুষ্ঠানে ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন উপাসনা করেন এবং শিশুকে "অগ্নিতম" নাম প্রদান করেন।

মা বিধানজননী শিশুদিগকে ও তাহাদের পিতামাতাকে শুভাশীষ দান করুন।

মাসিক স্মৃতি—গত ৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ৬৫।১ হ্যারিসন রোডে শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পিতৃদেব স্বর্গীয় শ্রীনাথ দত্তের স্বর্গারোহণের মাসিকস্মৃতি উপলক্ষে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

সাম্বৎসরিক—গত ১৪ই জুন, ২০নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীটে, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মুখার্জির গৃহে, তাঁহাদের মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী মনোরমা চাটার্জি প্রচারভাণ্ডারে ২৲ এবং নরেন্দ্রবাবু প্রচারভাণ্ডারে ৫৲, ব্রহ্মমন্দিরে ৫৲, অনাথ আশ্রমে ৫৲ ও অন্ধ স্কুলে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ১৪ই জুন, ভবানীপুরে, ১৪০বি হরিশ মুখার্জি রোডে, ন্ বিভূতিভূষণ বসু ও শ্রীমান্ ডাঃ ধীরেন্দ্রভূষণ বসুর গৃহে, তাঁহাদের মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে দুই ভাই ২৲ করিয়া ৪৲ টাকা প্রচারভাণ্ডারে দান করিয়াছেন। অদ্য আসানসোলে, জ্যেষ্ঠ কন্যা শ্রীমতী সুহাসিনী গুহের গৃহেও মাতৃসাম্বৎসরিকে উপাসনা হয় এবং তিনি প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করেন।

গত ১৪ই জুন, সন্ধ্যায়, কলুটোলায়, কৃষ্ণভবনে, শ্রীযুক্ত গগণবিহারী সেনের কন্যা স্বর্গীয়া ইলা দেবীর প্রথম সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এ উপলক্ষে পিতৃদেব কন্যার স্মরণার্থ প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ১৫ই জুন, ভবানীপুরে ১৪০বি হরিশ মুখার্জি ষ্ট্রীটে, শ্রীমান্ বিভূতিভূষণ বসু ও শ্রীমান্ ডাঃ ধীরেন্দ্রভূষণ বসুর বড় ঠাকুরদা (জ্যেষ্ঠ পিতামহ) স্বর্গীয় দুর্গাদাস বসুর সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বসু ২৲ এবং শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বসু ২৲ প্রচারভাণ্ডারে দান করিয়াছেন।

দান—অপূর্ব্বকৃষ্ণ ট্রাষ্ট ফণ্ডের ট্রষ্টীগণ ভক্তিভাজন ভাই প্রতাপচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর পুনর্মুদ্রণের জন্য, জুন ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে, ঐ ফণ্ড হইতে ১০০৲ টাকা ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের "নববিধান পাবলিকেশন কমিটীর" হস্তে দান করিয়াছেন। পাঠকগণ শুনিয়া সুখী হইবেন যে, নববিধান পাবলিকেশন কমিটী প্রতাপচন্দ্রের Heart-Beats, Oriental Christ, Faith & Progress of the Brahmo Somaj ও খ্রীচরিত্র গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত করিয়াছেন। এখনও Aids to Moral Character, Tour Round the World, উপদেশ এবং Lectures (in India and Abroad) বাকী আছে।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭২ ভাগ। ১২শ সংখ্যা। } ১৬ই আষাঢ়, বুধবার, ১৩৪৪ সাল, ১৮৫৯ শক, ১০৮ ব্রাহ্মাব্দ
30th. June, 1937 { অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা

মা ভক্তবৎসলা, ভক্তচিত্তবিহারিণী, ভক্ত তোমার প্রিয়, তুমিও ভক্তজনপ্রিয়। ভক্ত তোমা ভিন্ন কিছুই জানেন না, তুমিও ভক্ত ভিন্ন কিছু জাননা। ভক্তদের নিকট তুমি ভক্তি-ডোরে বাঁধা। ভক্তের ধন জন যাহা কিছু থাকে, সর্ব্বস্ব দিয়ে ভক্তিরজ্জু কিনে, তা দিয়ে তোমাকে বেঁধে রাখেন। তুমিও এমনি করে ভক্তের ঘরে বাঁধা পড়ে থাকতে চাও। তুমি তো দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছ, দেখছ, কে তোমাকে ভালবাসে। তোমার একটি সন্তান যদি তোমাকে ভালবাসে, তাতে তোমার কত আনন্দ হয়। স্বর্গে কত আহ্লাদ করে সে আনন্দের সংবাদ দাও যে, পৃথিবীতে অমুক সন্তান আমাকে বড় ভালবাসে। আর যে সন্তান তোমাকে একটু খানিক ভালবেসেছে, সে তোমার প্রেমফাঁদে পড়েছে। তার সর্ব্বস্ব তুমি হরণ করে নিয়েছ। অনন্ত তুমি, নিত্য নব নব ভাবে, নব নব রূপে আত্মপ্রকাশ করে, চিরতরে তাকে মুগ্ধ করে রেখেছ। তার আর অন্য দিকে মন নাই; সে কেবল বলে, "চাই দয়ালের নাম চাই, প্রেম চাই, আর অভয় চরণ চাই। আমি সামান্য ধন নাহি চাই, অন্য কিছু নাহি চাই।" অনন্ত সুখের আধার, ভক্ত এই তোমাকে নিয়ে কত সুখে সুখী। "নাহি অন্ন গৃহবাস, ছিন্নকন্থা অন্নবাস, পথের কাঙ্গাল হরিদাস অকিঞ্চন দীন; তবু সে হাস্যমুখে, নাচে গায় মনের সুখে, হরিপদ ধরি বুকে প্রেমেতে হয় বিলীন।" মা ভক্তজননী, যুগে যুগে তুমি ভক্তদের এমনই করে মুগ্ধ করেছ; নূতন যুগে নববিধানেও কত ভক্তকে এই-রূপে তোমার প্রেমে পাগল করেছিলে। সুখের রত্ন তুমি, আনন্দের খনি তুমি; একমাত্র তোমাকে নিয়ে যে পরমসুখে সুখী হওয়া যায়, তার দৃষ্টান্ত কত দেখালে। এখনও আমরা তোমাকে ছেড়ে সংসারে সুখী হইতে চাই। মরীচিকা-ভ্রান্ত পথিকের মত সুখতৃষ্ণায় শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তুমি কৃপা কর, আর এমনই করে তোমাকে ছেড়ে সংসারে ঘুরিতে ফিরিতে দিও না। তোমার প্রেমফাঁদে সকলকে ধর। কে কোথায় আর পালাবে। অকিঞ্চন দাস করে চিরতরে রাখ চরণে; সুখী হই, ধন্য হই। এই ভিক্ষা তোমার চরণে চাই।

শান্তিঃ শান্তিঃ! শান্তিঃ!

—০—

হরি ভক্তের প্রিয় ধন।

ভক্ত কে? যাঁর আপনার বলতে কিছুই নাই, যিনি সর্ব্বস্ব ভগবানের চরণে সমর্পণ করিয়াছেন, যিনি হরিদাস, হরির ক্রীতদাস হয়ে একমাত্র হরির ইচ্ছাপালনেই তৎপর, যিনি নিষ্কাম হইয়া হরির চরণ-সেবায় অবিরাম নিরত। ভক্তি-যোগের এই লক্ষণ:—

"লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥"

"ফলাভিসন্ধানবিরহিত হইয়া, অব্যবধানে ভগবানের ভজনাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ কথিত হইয়া থাকে।"

ভক্ত নির্গুণ, ভক্তের কোন গুণ নাই। ভক্ত বলেন, "সভ গুণ তেরা মৈ নাহি কোহি। বিনু গুণ কিতা ভকতি না হোই।" "তোমারই সকল গুণ, আমি কেহ নই। তোমার গুণ না পাইলে ভক্তি হয় না।" ভক্ত যখন এইরূপে অকিঞ্চন দীন হন, তখনই সব দেবগুণের অধিকারী হন।

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণো
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥"

"যাঁহার ভগবানেতে অকিঞ্চনা ভক্তি আছে, সমুদায় দেবগুণ আসিয়া তাঁহাতে অধিবাস করে। হরিতে অভক্ত ব্যক্তির মহদ্গুণের সম্ভাবনা কোথায়? কেন না, মনোরথ-যোগে সে বাহিরে বাহিরে অসদ্বিষয়ে ধাবমান।"

ভগবান্ ছাড়া ভক্তের জীবন বৃথা, হরিছাড়া হরি-ভক্তের জীবন শূন্য। ভক্ত তাই সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া ভগবানকে লাভ করেন।

"ইষ্টং দত্তং তপো জপ্তং বৃত্তং যচ্চাত্মনঃ প্রিয়ম্।
দারান্ সুতান্ গৃহান্ প্রাণান্ পরস্মৈ চ নিবেদনম্॥"

"অভিলষিত, দান, তপ, জপ, চরিত্র, যাহা কিছু নিজের প্রিয়, স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, প্রাণ, সকলই পরমেশ্বরে অর্পণ করিবেক।" এই শরণাপত্তি-যোগে ভক্ত নিয়ত ভগবানে যুক্ত থাকেন। ভগবানও তখন বলেন,—

"যে দারাগারপুত্রাপ্তান্ প্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্।
হিত্বা মাং শরণং যাতা কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে॥"

"যাহারা স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, আত্মীয়, প্রাণ, বিত্ত, ইহলোক, পরলোক পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন হইয়াছে, আমি কিরূপে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারি?"

"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥"

"সাধুগণ আমার হৃদয়, আমি সাধুগণের হৃদয়, আমা ব্যতীত তাঁহারা কাহাকেও জানেন না, আমিও তাঁহাদিগের ব্যতীত কিছু জানিনা।"

নিষ্কাম হইয়া যাঁহারা হরির ভজনা করেন, তিনি তাঁহাদিগকে অর্থ বিত্তাদি সামান্য ধন দেন না, যাহা পাইয়া প্রার্থনার নিবৃত্তি হয় না; তিনি তাঁহাদিগকে এমন ধন দেন, যাহাতে সমুদায় অভিলাষের পরিসমাপ্তি হয়। সে ধন কি?

"স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতাম্—
ইচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্॥"

"সমুদায় কামনাপরিশূন্য হইয়া যাহারা তাঁহার ভজনা করে, তাহাদিগকে তিনি স্বয়ং সমুদায় অভিলাষের পরিসমাপ্তিকর নিজপাদপল্লব প্রদান করিয়া থাকেন।"

ভক্ত এইরূপে সামান্যধনের বিনিময়ে পরমধনের অধিকারী হন। তাই বলি, ভক্তের মত চতুর আর কে? আসল ধন, নিত্যধন তিনিই চিনেন; এবং সে ধনের অধিকারী হয়ে পরম সুখে সুখী হন।

—০—

ধর্ম্মতত্ত্ব

ভক্তের ঈশ্বরের নিত্য নূতনরূপ

সাকার দেবতার এক রূপ; কিন্তু আমার নিরাকার ঈশ্বরের অনন্ত রূপ, তাঁহার নিত্য নূতন রূপ। যিনি নিরাকার ঈশ্বরের ভক্ত, তাঁহার মন সর্ব্বদাই আশার সহিত প্রতীক্ষা করে, এবার কি রূপ প্রকাশিত হইবে, যাহা বেদে নাই, কোরাণে নাই। নিরাকারের নিত্যরূপ দেখিয়া ভক্তের মন একেবারে মুগ্ধ হয়। ভক্ত বলেন, সে দিন যে রূপ দেখিয়াছিলাম, মনে করিয়াছিলাম, তাহাই রূপের পরাকাষ্ঠা; কিন্তু আজ দেখি, তাহা অপেক্ষাও মনোহর রূপ। অনন্ত রূপরাশির রত্নাকর ঈশ্বর, এই ভাবে ভক্তের নিকট ক্রমাগত নিত্য নূতন রূপ প্রকাশ করিতেছেন। কেবল ভক্তের মন হরণ করিবার জন্যই তিনি নিত্য নূতন রূপ ধারণ করেন। ঈশ্বর কখন যে কি রূপ প্রকাশ করিবেন, তাহা ভক্ত জানেন। (কেশব)

ব্রহ্মের রূপের জাল

ভক্ত, তুমি মাকড়শা দেখিয়াছ? মাকড়শা আপনার জাল বিস্তার করিয়া বসিয়া থাকে, যখন মাছি কিম্বা অন্য কোন প্রাণী ঐ জালের মধ্যে পড়ে, প্রথমে গুণ্ গুণ্ শব্দ করে, এবং পলায়ন করিতে চেষ্টা করে; কিন্তু সর্ব্বশেষে মাকড়শা তাহাকে জড়াইয়া ধরে। আমরাও ব্রহ্মজালে পড়িয়াছি, কিন্তু এখনও আমাদের মনে অত্যন্ত তেজ, আমরা মনে করি, কোন মতেই আমরা এই জালে বদ্ধ থাকিব না, স্বাধীন ভাবে কেবলই আকাশে ঘুরিব; কেন জালে পড়িয়া মরিব? কিন্তু, হে ভক্ত, তুমি যতই কেন পলায়ন করিতে চেষ্টা কর না, তোমার মাকড়শা ঈশ্বর, সর্ব্বশেষে তোমাকে এমনই জালে জড়াইবেন যে, তুমি কোন মতে তাহা অতিক্রম করিতে পারিবে না। রূপের জাল ছেদন করে কাহার সাধ্য? মাকড়শার আক্রমণের পর যেমন বিরোধী কীটের মুখে আর গুণ্ গুণ্ শব্দ থাকে না, সেইরূপ ব্রহ্ম যখন আপনার রূপের জালে ভক্তকে সম্পূর্ণরূপে জড়াইয়া ধরেন, ভক্ত আর পলায়ন করিতে পারেন না। (কেশব)

—০—

চয়ন

(উপাসনা—worship)

(১) উপাসনা—ঈশ্বরের অভিমুখে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া কিছু পাইবার জন্য, শুনিবার জন্য, দেখিবার জন্য অপেক্ষা করা।

(২) উপাসনা—সত্য-গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা লইয়া ব্যগ্রতা-সহকারে এক অব্যক্ত অবস্থাতে নিজেকে স্থাপন করিয়া রাখা।

(৩) উপাসনা—ঐ পরমাত্মা হইতে মানবাত্মায় তাঁহার গুণ ক্ষরিত হইবার সুযোগের অবস্থা।

(৪) উপাসনা—ঈশ্বরকে মানবের আমিত্বজ্ঞানের ভিতরে সাক্ষাৎ উপলব্ধি এবং মানবের অস্থির চিন্তাকে সংযত করিয়া ঈশ্বরের অভিপ্রায় বুঝিবার সুযোগ প্রদান করা।

(৫) উপাসনা—উদ্গ্রীবভাবে ঈশ্বরের অব্যক্ত নীরব বাণী-শ্রবণের কর্ণস্বরূপ।

(৬) উপাসনা—ব্যাকুলভাবে নীরবে ব্রহ্মবাণী-শ্রবণ।

(৭) উপাসনা—সত্যলাভের ও সত্যে উপস্থিত হইবার এক সরল পথ।

(৮) উপাসনা—নূতন নূতন অভিব্যক্তির অনুসন্ধান।

(৯) উপাসনা—পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিবার এক প্রকৃষ্ট উপায়।

(১০) উপাসনা—মানবের ইচ্ছাকে এমন ভাবে প্রস্তুত করা, যেন উহা ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত এক যোগে স্থাপন করিতে সমর্থ।

(১১) উপাসনা—মানবের যত্নলব্ধ প্রক্রিয়া বিশেষ, যদ্দ্বারা সে তাহার স্রষ্টাকে উপলব্ধি করিতে পারে।

(১২) উপাসনা—মানবের এক প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য।

(১৩) উপাসনা—প্রতি আত্মাতে সাক্ষাৎ ভাবে স্বর্গীয় শক্তিলাভের প্রকৃষ্ট উপায়।

(১৪) উপাসনা—মানবের অন্তরের ভিতরে এক সুদৃঢ় প্রাচীর, যাহা ভেদ করিয়া পৃথিবীর প্রলোভন প্রবেশ করিতে অসমর্থ।

(১৫) উপাসনা—মানবাত্মার সদ্গুণাবলীর পরিপুষ্টির উৎকৃষ্ট প্রক্রিয়া।

(১৬) উপাসনা—চরিত্র-গঠনের এক মহৎ উপায়।

(১৭) উপাসনা—মানবের নানাবিধ সংসারের কুটিল চক্রে নিপতিত ও নিষ্পেষিত হইয়া ঈশ্বর হইতে দূরে অবস্থিত আত্মাকে ঈশ্বরের সহিত পুনর্মিলিত করার সহায়।

(১৮) প্রকৃত উপাসনায় মানব পরিবর্ত্তিত হয়।

(১৯) যিনি পরিবর্ত্তিত জীবন লইয়া উপাসনার স্থান হইতে চলিয়া আসেন, তাঁহার উপাসনা ও প্রার্থনা স্বর্গে গৃহীত হইয়াছে, ইহাই সপ্রমাণ করে।

(২০) শরীরের যেমন খাদ্য পানীয় নিত্য নিত্য প্রয়োজন, জ্ঞান স্পৃহার জন্য যেমন নূতন নূতন তত্ত্ব-সংগ্রহের প্রয়োজন, সেই রূপে আত্মার সঙ্গেও পরমাত্মার যোগ-স্থাপন একান্ত আবশ্যক।

শ্রীমহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

—০—

উপাসনায় আনন্দ

সৃষ্টিরহস্যের অফুরন্ত আনন্দের মধ্যে নিসর্গের শোভা যখন জাতিকে সকল দিক্ দিয়ে অনন্ত প্রেমের স্পর্শ অনুভব করতে শিখিয়েছিল—তখন বৈদিক ঋষির সমুচ্চকণ্ঠে ধ্বনি উঠেছিল—

অসতো মা সদ্গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মামৃতং গময়।

ওগো নিখিলের স্রষ্টা সত্যময়! আমাদের যা কিছু অসত্য, যা কিছু গ্লানি, যা কিছু নিন্দা, তা'কে তোমার সত্যেতে নিয়ে চল!

ঘোর ঘন তমসাচ্ছন্ন মর ধরণীর ভোগ-কূপ হতে তোমার পরম জ্যোতিতে, তোমার আলোকের দেশে নিয়ে চল!

জীবনের তোরণ দ্বার মৃত্যু থেকে তোমার আনন্দোৎসবে যোগ দিতে দাও—অমৃত থেকে বঞ্চিত না করে অমৃতেই নিয়ে চল!

মূঢ় মানব হয়তো সেদিন বিশ্বদেবের এ পরম পূজার বাণী—ব্রহ্মের উপাসনার এই একনিষ্ঠ সার্থকতা উপলব্ধি করে নি। যদি প্রত্যেকে প্রত্যেককে প্রশ্ন করে, এত আনন্দ, এত প্রেম, এত হাসির মধ্যে তুমি উহা পেয়েছ? আমার মনে হয়, নিছক উত্তর পাওয়া যাবে না। সুন্দর হতেও সুন্দরতম যে—মহৎ হতেও মহত্তম যে—প্রিয় হতেও প্রিয়তম যে—জাতির জীবনের

অন্তর হতেও অন্তরতম যে—তাঁকে ভালবাসার মন্ত্র—তাঁর উপাসনার বাণী—'অসতোমা সদ্গময়' ছাড়া আর কি হতে পারে?

হিমালয় থেকে গঙ্গা যেমন আপনার গতিতে নাচতে নাচতে, কত নদ নদী ঝরণাকে অনন্ত প্রেমে ভালবেসে এলো, সে ভালবাসার স্মৃতি কত দিক দিয়ে, কত ভাবে, কত মানবের, কত নৈসর্গিক শোভার অতুল পুষ্টি সাধন করলো—তেমনি ধারা এই আমাদের বেদগান—এই আমাদের ব্রহ্মের উপাসনা, জগতের সমস্ত জাতি, বর্ণ ও ধর্ম্মের ভেতর দিয়ে অনন্ত প্রেম, অগাধ স্নেহ, অসীম প্রীতি ঢেলে দিয়ে আসচে—কোন গোল নেই!

ভাবপ্রবণ জাতির এই দেশে যখন দুর্যোগের ঘনঘটা নেমে আসে—তখনই মাথা এদের নুয়ে পড়ে, ধর্ম্মের পায় দেবতার নামে। প্রকৃতি নিজে তাই অতুল শোভা নিয়ে সে দেবতাকে বন্দনা করে—সে ব্রহ্মের উপাসনা করে। মানুষের ভাষা যখন হারিয়ে যায়, তখন ভাব তার শতধা ছিন্ন হয়ে বিশ্বের প্রত্যেক অণুপরমাণুতে পরম প্রেমিককে অনুভব করে। তার উপনিষদ্ তাকে সন্ধান বলে দেয়—

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু,
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ।

সে আপনার সকল কিছু উজাড় করে তাঁকে ভালবাসে। তাই উপাসনা এত মধুর, এত আনন্দপ্রদ। ব্রহ্মের এ উপসনার যত মাধুর্য্য—তত আর কিছুতে নাই।

মধুব্রহ্ম। কল্যাণের বাণী—অমৃতের বাণী—আনন্দের বাণী—প্রেমের বাণী এ বন্দনায়।

কোন্ দেশে, কোন্ ধর্ম্মে, কোন্ জাতি এমন করে ভালবাসতে শিখেচে—এমন আপনার করে নিতে পেরেছে?

ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

কে কোথায় অন্তরতমকে এত বড় করেচে? সে এই আমাদের দেশ। সে এই আমাদের ধর্ম্মে! ব্রহ্মের অনুভূতি যার হয়নি—আনন্দ যে পায়নি—শোভায় পাগল যে হয়নি—রূপসাগরে যে ডুব দিতে পারেনি—তার জীবন মিথ্যা যাবে না, যেতে পারে না। আসতে হবে—উপাসনার জলদগম্ভীর মন্ত্রের ভিতর দিয়ে—ভাবুকতার বৈচিত্র্য নিয়ে—আধ্যাত্মিকতার অমৃতশক্তি নিয়ে তাকে আসতে হবে—তার সকল কলুষ দূরে যাবে।

নিষ্কলুষ ব্রহ্মের উপাসনায় ভোর হয়ে সে তখন কবির কথায় গেয়ে উঠবে—

"দাও আমাদের অভয়মন্ত্র
অশোক-মন্ত্র তব।
দাও আমাদের অমৃতমন্ত্র
দাও গো জীবন নব।"

নবজীবনের আনন্দ নিয়ে তার উপাসনা সফল হবে। পাশ্চাত্য ধর্ম্মের সূত্র বা যুক্তি—তাদের দর্শনরহস্যের দার্শনিক বিপ্লব—তাদের ধর্ম্মযুদ্ধ রক্তপাত—তাদের প্রতিষ্ঠার সহিত আমাদের ধর্ম্মের—আমাদের এ পরব্রহ্মের—আমাদের এ আনন্দময়ের তুলনা করা বাতুলতা। শাশ্বত সুন্দর ব্রহ্ম আমাদের। উপাসনা—উপাসনা ছাড়া সে পরম সুখ—সে ব্রহ্মানুভূতির অন্য পথ খুবই কম।

ঋষি যখন ভারতকে বেদের গানে যোগী ভারত—কবি যখন ভারতকে তাঁর কাব্যকলার ঝঙ্কারে ভাবুক ভারত—তাপস যখন তাঁর তপশ্চর্য্যায় ভারতকে তপস্বী ভারত করে গড়ে তুলেছিলেন—তখন তাঁরা প্রত্যেকেই একটা প্রেরণা, একটা দ্যোতনা পেয়েছিলেন—যার মূলে ছিল উপাসনার স্ফূর্ত্তি।

ঊষার হাসি, প্রভাতের আলো, মধ্যাহ্নের দীপ্তি, সায়াহ্নের রক্তিম ছবি, নিশীথে চন্দ্রমার আকাশগঙ্গা ভালবাসা, পাখীর গান, নদীর কলতান, পত্রের মর্ম্মর যখন এই ভারতের সবখানে অনন্ত মাধুর্য্যে ভরিয়ে দিয়েছিল—তখন ঋষি কবি দার্শনিক সকলেই বিশ্বসত্তার অনুভূতি পেয়ে রূপের ছবি এঁকেছিলেন—রূপের মন্ত্র গড়েছিলেন—রূপের প্রতীকে ডুবে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন—সেই থেকেই বুঝি তাঁর উপনিষদের জন্ম—সেই হতেই বুঝি তাঁর উপনিষদের বাণী বিশ্ব জয় করেছিল।

এই উপনিষদের বাণীই উপাসনা। এই উপনিষদের মন্ত্রই প্রেমের মন্ত্র। এই উপনিষদের ভাবই চারণগীতি। তাঁকে আপনার করে নিতে পারা যাবে কখন? তোমার উপনিষদ তোমায় বলে দেবে—ডুবে যাও—প্রেম-সাগরে ডুবে যাও—সে তোমার আপনার হবে। এ প্রেমে তো দু'দিনের মোহ নেই—এ প্রেম সুন্দর মধুর।

এ যে আনন্দময়, এ যে প্রেমময়, এ যে করুণাময় ব্রহ্ম, ভালবাসো, এঁকে প্রাণভরে নিখিলের সমস্ত সৌন্দর্য্য দিয়ে ভালবাসো।

উপাসনার প্রতি অক্ষরে মুক্তির প্রেরণা। জীবনের যাত্রাপথে যদি জয় নিতে চাও, তবে উপাসনা পাথেয় কর। তোমার অন্তরের সহজ সরল প্রেমে তাঁকে ভালবাস। উপাসনার অমৃত উৎসে স্নিগ্ধ হয়ে নাও—শুচি হয়ে নাও, সকল দুঃখ দূর হবে।

অহংকারে মত্ত হয়ে, বৃথা আভিজাত্য আত্মাভিমান নিয়ে, লোকের কাছে বড় হওয়া যায়, কিন্তু সেখানে যায় না। উদারতা চাই, সারল্য চাই, তপস্যা ত্যাগ সাধনা চাই। তোমার দেশ, তোমার ভারত বৈরাগী ভারত। তোমার জীবনের চরম শ্রেয়ই পরম পুরুষকে পাওয়া। ভোগের ভিতর ক্ষণিকের স্ফূর্ত্তি। পরম পুরুষের উপাসনায় আনন্দই নিছক আনন্দ—সত্যিকার আনন্দ।

মনে প্রাণে এক হয়ে, উপাসনার ভিতর দিয়া যা স্ফূর্ত্তি পাওয়া

যায়, তা' অফুরন্ত অনন্ত। ওগো অবিশ্বাসী, তোমার আর তো ভাবনা নেই। তুমি এস, সৃষ্টি-রহস্যের এই যে আনন্দ, একে ভোগ কর। পূর্ণব্রহ্মের অনন্ত প্রেম-সাগরে ডুবে যাও। উপাসনা তোমার পথ দেখাবে। উপাসনার স্ফূর্ত্তি, রসব্রহ্মের রসকল্লোলে তোমায় তৃপ্তি দেবে, মুক্তি দেবে।

শান্তিঃ। শান্তিঃ !! শান্তিঃ !!!

—০—

সাধুর হৃদয় নির্ম্মল আকাশ

(১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ)

পক্ষী আকাশের মধ্য দিয়া যাতায়াত করে, কিন্তু কে বলিতে পারে, আকাশের অমুক স্থান দিয়া পক্ষী চলিয়া গিয়াছে। পৃথিবীর পথে একটী জন্তু চলিয়া গেলে উহার পদচিহ্ন থাকে, সুতরাং লোকে বলিতে পারে, উহা এই পথে গিয়াছে। কিন্তু আকাশের মধ্য দিয়া দশ সহস্র পক্ষী চলিয়া গেলেও কেহ নির্দ্ধারণ করিতে পারে না, সেই আকাশ-পথে একটী পক্ষীও চলিয়া গিয়াছে। আকাশে কত পক্ষী চলিল, একা চলিল, দলবদ্ধ হইয়া চলিল, বৎসর বৎসর চলিতে লাগিল, কিন্তু দেখ, উহাতে একটী চিহ্নও নাই। কোটী বৎসরের বিচরণ একত্র সংগ্রহ করিলেও ইহা নির্দ্ধারিত হইবে না, কবে কতসংখ্যক পক্ষী আকাশ দিয়া চলিয়াছিল। আকাশে চিহ্ন থাকে না, আকাশ কখন চিহ্ন প্রদর্শন করে না। আকাশের প্রতিজ্ঞা এই, কখন চিহ্ন রাখিবে না। পৃথিবী আকাশের পথে ঘুরিতেছে, কিন্তু কেহ বলিতে পারে না, উহা ঐ পথে চলিয়াছে। অসংখ্য লোকমণ্ডলী আকাশ-পথে নিয়ত ভ্রমণ করিতেছে, উহার একটীও চিহ্ন রাখিয়া যাইতেছে না। নিম্নে সাধকের হৃদয়াকাশ এইরূপ। ব্রহ্মসাধক ব্রহ্মযোগে যোগী হইয়া বসিয়া আছেন, কত বিষাক্ত বাণ তাঁহার হৃদয়াকাশ দিয়া চলিয়া যাইতেছে, অথচ উহার একটী চিহ্নও সেখানে থাকিতেছে না। আকাশে কালী নিক্ষেপ করা হইল, কালী ভূতলে পড়িল, আকাশ যে সাদা, সেই সাদাই রহিয়া গেল। আকাশ সকল অবস্থায় সমান থাকে। দেখ, এই প্রকার মনুষ্যের মন নির্ম্মল হইলে, পাপ প্রলোভন দ্বারা উহা অচিহ্নিত থাকে, মন পূর্ব্বে যেমন নির্ম্মল ছিল, তেমনই অবস্থান করে।

পৃথিবীর যত প্রকারের পাপ প্রলোভন পরীক্ষা মনের ভিতর দিয়া নিয়ত চলিয়া যাইতেছে। কেবল এই দেখা চাই, মন পৃথিবীর পথে অথবা আকাশের পথে। নীচপ্রকৃতি পৃথিবীর এবং উচ্চ প্রকৃতি আকাশের পথের ন্যায়। পৃথিবীর পথে পশু চলিয়া গেলে যেমন উহার পদচিহ্ন থাকে, নীচপ্রকৃতি লোকের মনে পাপ প্রলোভন পরীক্ষা তেমনই চিহ্ন রাখিয়া যায়। উচ্চ প্রকৃতির সাধকের মনে কত সংসারের ভাবনা চিন্তা, কত প্রবলতর ঘটনা ঘুরিতেছে, এক একটী চিন্তাপূর্ণ জগৎ সাধুর চিন্তাকাশ দিয়া চলিয়া যাইতেছে; কিন্তু কেহ বলুক দেখি, চিন্তাকাশের কোন প্রকার ভাবান্তর হইয়াছে? দশ বৎসর যাবৎ কত বিপদ, কত পাপ প্রলোভন চলিয়া গেল, মন যেমন নির্ম্মল স্বচ্ছ পরিষ্কার ছিল, আজও তেমনই আছে। সাধকের কখন বিপদ, কখন সম্পদ হইল, কিন্তু তাঁহার চিত্ত ঠিক একই প্রকার রহিয়াছে। অনেকে সাধকের প্রাণ বিচলিত করিতে চেষ্টা করিল, আকাশপ্রকৃতি মনুষ্যের আত্মার কিছুই হইল না। তাঁহার মনের ভিতর দিয়া পাপ বিকার চলিয়া যাইতেছে, মনে কিঞ্চিন্মাত্র চিহ্নও থাকিতেছে না। সুখ দুঃখ সম্পদ বিপদ আসিল, উপর্য্যুপরি কত ঘটনা ঘটিল, মনের মধ্য দিয়া কত প্রলোভন চলিয়া গেল, মাধ্যস্থ আকাশের মতন অবিকৃত থাকিল। তাঁহাকে লোকে সাধুবাদ দিল, নিন্দা করিল, তাঁহার হৃদয়াকাশে নিন্দা সাধুবাদ কিছুরই দাগ রহিল না।

সাধারণ মনুষ্যের অবস্থা এরূপ নহে। তাহাদিগের প্রাণ মনের ভিতর দিয়া যাহা কিছু যায়, তাহার পদচিহ্ন রাখিয়া যায়। অমুক পশু এখান দিয়া গিয়াছে, তাহার পদচিহ্ন দেখিয়া অনায়াসে বলিতে পারা যায়। অমুক মানুষ গাড়ী ঘোড়া চড়িল, টাকা আনিয়া সংসার চালাইল, শোক দুঃখে ক্রন্দন করিল, দেখ, যাহা কিছু তাহার সম্বন্ধে ঘটিয়াছে, সমুদয়ের চিহ্ন আছে। ভগ্ন-হৃদয়, ব্যাধিগ্রস্ত, এক দিকে পাপ কলঙ্ক, আর এক দিকে অহংকার, অভিমান, অবিশ্বাস। যখন যাহা কিছু হৃদয়ের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহার সমস্ত ফল উহাতে আছে। এই পথ পৃথিবীর পথ। এ পথে পদচিহ্ন থাকে। আকাশের পথ দেখ, উহাতে পাপ, অপমান, নিন্দা চলিয়া গেল, উহাতে কিছুই রহিল না। অঙ্গুলি দ্বারা বড় বড় অক্ষরে মহাপাপ লিখিলে, সাধুর হৃদয়ে অঙ্কিত হইল না, পূর্ব্বের মত রহিল। অবিশ্বাসে মাথা ঘুরিল, মন অবসন্ন হইল, চতুর্দ্দিক মেঘে আচ্ছন্ন হইল, সাধক অসহায় হইলেন, কেহ আর তাঁহার সহায় রহিল না। বাহিরে বিপদের মেঘে আচ্ছন্ন করিল, কিন্তু প্রাণের মধ্যে নির্ম্মল ছবি। সেখানে একটী দাগও লাগে নাই। শত শত লোক এমনই বিপাকে ফেলিল, হয় ত প্রাণ পর্য্যন্ত লইতে উদ্যোগ করিল, অথচ তাঁহার সহাস্য ভাব। যদি পৃথিবীর পথ হইত, চিহ্ন থাকিত। এমন কি, একটী সামান্য প্রলোভন বা বিপদ যদি দুই মিনিটও সে পথে চলে, সূক্ষ্মরূপে দেখিলে দেখা যায়, সেখানে চিহ্ন আছে। সাধকের উপরে যদি কঠোর বিপদ প্রলোভন পাপ আক্রমণ আইসে, তাঁহার হৃদয়ে একটী দাগও হইবে না। আকাশের সঙ্গে এ প্রকার যুদ্ধ, পরিহাসের ব্যাপার। আকাশে অস্ত্রাঘাত করা উপহাস বিনা আর কিছুই নহে। সাধককে কোটি কোটি লোক আক্রমণ করিল, অস্ত্রাঘাত করিল, আকাশকে আক্রমণ করিয়া অস্ত্রাঘাত করার ন্যায় সকল নিষ্ফল হইল। আঘাতের পর দেখ, একটী দাগও নাই।

সাধককে আসক্তির বিষয় স্পর্শ করিল, অথচ কলঙ্কিত করিতে পারিল না। অন্য লোক যদি একটী পয়সাও স্পর্শ করে, সে কখনও লোভী না হইয়া পারে না। যে মন আকাশস্বরূপ, তাহাতে একটী পয়সা কেন, পৃথিবীর সমুদয় ঐশ্বর্য্য আনিয়া রাখিলে উহাকে কলঙ্কিত করিতে পারে না। সোণা লোহা একত্র করিয়া ধরিলে যদি সোণা লোহা অপেক্ষা লোভনীয় হয়, তবেই জানিলে সাধন শীর্ণ হইয়াছে।

তোমার জীবনকে সংসারের ভিতর দিয়া যাইতে দাও, উহাকে বারণ করিতে পার না। বিচিত্র জীবন, বিচিত্র ঘটনা সকল জীবনের চিহ্ন। তুমি যেরূপ ইচ্ছা কর, অবস্থা কখনও সেরূপ হইবে না। পাপপক্ষী মনের ভিতর দিয়া চলিয়া যাইবে, আমাদিগের এই পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত থাকা চাই যে, উহা একটী দাগও রাখিতে পারিবে না। হৃদয় প্রাণের অবস্থা এরূপ হওয়া আবশ্যক যে, প্রলোভন বিপদ সম্পদ কিছুই ভয়ের কারণ থাকিবে না। আমাদের ভয়ের বিষয় আর কিছুই নাই, কেবল কলঙ্ক। মনের ভিতরে এমন বিবেকের বল সঞ্চয় কর, এমন অগ্নি সর্ব্বদা প্রাণের ভিতরে প্রজ্বলিত রাখ যে, তোমার কিছুই হইবে না। বৈরাগ্য-অগ্নিতে পরীক্ষিত হইলে কিছুই স্পর্শ করিতে পারিবে না। টাকা স্পর্শ করিলে মন বিকৃত হয়, এ কথা যে বলে, সে মিথ্যাবাদী। ইহা নিশ্চয় সত্য, বৈরাগ্য-অগ্নিতে একবার বিশুদ্ধ হইলে, সাধক সংসার সম্বন্ধে মৃত হন। মৃত ব্যক্তিকে টাকা কড়ি স্পর্শ করিলে তাহার কি হইবে?

তোমাদের তেমন প্রবল সাধন নাই, তেমন অবলম্বনের বিষয় নাই, ইহাতে আসক্তি হইতে পারে। যদি তোমরা বিবেকের অনুগত হইয়া বৈরাগ্য সাধন কর, সহস্র লোকের কোপদৃষ্টিতে তোমাদের কিছুই করিবে না। স্তুতি নিন্দা উভয়েতেই তোমাদের মন অবিচলিত অকলঙ্কিত থাকিবে। মনের ভিতরে যখন জাগ্রত ঈশ্বর কথা কহেন, ঈশ্বরের কথা শুনিতে যখন শ্রোত্র উন্মুখ থাকে, ইহলোক ছাড়িয়া যখন বিবেকের রাজ্যে মনুষ্য বাস করে, তখন মনুষ্য আকাশপ্রকৃতি হয়। এখানে কেবল বিষয়াতীত বুদ্ধি, কঠোর বিবেক, কঠোর ন্যায়। এখানে আর মনুষ্যের স্তুতি নিন্দা অখ্যাতি সুখ্যাতি পাপ পুণ্য প্রলোভন কিছুই নাই। স্থির হইয়া অটল ভাবে ঈশ্বরের চরণ ধরিয়া পড়িয়া থাকিলে, বিবেকের রাজ্যে বাস করিলে, সে ব্যক্তি আর পৃথিবীতে বাস করে না। যে ব্যক্তি পৃথিবীর নয়, সে পথ পৃথিবীর পথ নয়, সেখানে পৃথিবীর চিন্তা আসিতে পারে না। সে স্থানে একটি দাগও হইতে পারে না। সে মন স্বচ্ছ কাচের ন্যায়, কিছুতেই উহাকে চিহ্নিত বা কলঙ্কিত করিতে পারে না। জিজ্ঞাসা করি, তোমাদের প্রাণ পৃথিবীতে কি আকাশে আছে? যদি তোমাদের প্রাণ আকাশস্থ হয়, মনুষ্যের সাধুবাদে তোমাদিগের কিছু হইবে না। যদি সকলে মিলিয়া তোমাদিগকে সমাজ হইতে দূর করিয়া দেয়, নানা প্রকারে দুঃখ দেয়, তথাপি তোমাদিগের কিছু হইবে না। এ সকল দ্বারা পৃথিবী তোমাদের কি করিবে? তোমাদিগকে লোকে উচ্চ পদ হইতে নীচে আনিবে, এই কি তোমাদিগের ভয়? খুব আকাশের ভিতরে ডুবিয়া গিয়া আকাশপ্রকৃতি হও, পৃথিবীর কথা সেখানে গিয়া পৌঁছিবে না। তখন মানুষের প্রশংসাতেও হাসিবে, নিন্দাতেও হাসিবে। তখন আর পরের ধর্ম্মে ধার্ম্মিক হওয়া গ্রাহ্য করিবে না। পৃথিবীর পাপ পুণ্য সেখানে প্রবেশ করিতে পারিবে না। এখানকার পাপ পুণ্য সে স্থানকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। তখন আর পৃথিবীর মতে ধার্ম্মিক হইবে না, কিন্তু বিবেকের মতে ধার্ম্মিক হইবে। আকাশের মধ্যে বাস করিলে, পৃথিবীর ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ পুণ্য এ সকলের অতীত হইবে। ধর্ম্ম তখন পুস্তকে বদ্ধ থাকিবে না, চিত্তাকাশে সমুদয় সত্য লাভ করিবে। তখন পৃথিবীর পাপ প্রলোভন, সুখ ঐশ্বর্য্য, মনুষ্যের নিন্দা স্তুতি এ সকলের ভয় আশা তোমার পক্ষে উপেক্ষার বিষয় হইবে। কিছুতেই ভয় ভাবনা হইবে না, কিছুতেই তোমার ক্ষতি করিতে পারিবে না। জিতেন্দ্রিয় পুরুষ হইলে, তাহার আবার ভয় ভাবনা কেন? সর্ব্বদা চিত্তাকাশে ঈশ্বরকে লইয়া বসিয়া থাক, সেইখানে তোমার ধর্ম্ম, সেইখানে তোমার মোক্ষ, সেইখানেই তোমার মুক্তি।

(আচার্য্যের উপদেশ, ৮ম খণ্ড)

—•—

সাম্প্রদায়িকতা

(ব্রহ্মমন্দিরে রবিবাসরীয় উপাসনার নিবেদনের সারাংশ)।

মানবসমাজে সাম্প্রদায়িকতারূপ মহাপাপ কিরূপে প্রবেশ করিল এবং নববিধান ইহার প্রতিকারকল্পে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, আমি আপনাদের নিকট তাহা নিবেদন করিতেছি। এই বিবৃতিদানে যদি কোনও অপরাধ হয়, আপনারা দয়া করিয়া তাহা ক্ষমা করিবেন।

ঈশ্বর আমাদিগের অতি নিকটতর বন্ধু, তাঁহা হইতে আমাদিগের এত আপনার আর কেহই নাই। তিনি আমাদিগের নিশ্বাসে প্রশ্বাসে, রক্তপ্রবাহে বর্ত্তমান; আমাদিগের আহারে বিহারে, সকল কর্ম্মে, সকল চিন্তায়, সকল মননে নিত্য বিদ্যমান। সেই অনিমেষ আঁখি হইতে আমরা মুহূর্ত্তের জন্যও দূরে থাকিতে পারি না। তাঁহা হইতে সহজ লভ্য আর আমাদের কেহই নাই, কিছুই নাই, কেননা তাঁহা কর্ত্তৃক আমরা সম্পূর্ণরূপে পরিবেষ্টিত হইয়া আছি। তিনি পিতা হইয়া পালন করিতেছেন, মাতা হইয়া বুকে রেখেছেন, গুরু হইয়া দীক্ষা দিতেছেন, শিক্ষক হইয়া শিক্ষা দিতেছেন, বন্ধু হইয়া উপদেশ দিতেছেন, সখা হইয়া আলিঙ্গন করিতেছেন; তবুও আমরা এত নিকটের বন্ধু, এত সহজ-

লতা ঈশ্বরকে পাইবার জন্য তাঁহার নিকটে না যাইয়া, পৃথিবীর গুরুর নিকটে, পেগাম্বরের নিকটে গমন করি। যিনি নিত্য কত কথা বলিতেছেন, কত উপদেশ দিতেছেন, কত শাস্ত্রের বার্ত্তা শুনাইতেছেন, তাঁহার কথা না শুনিয়া, শাস্ত্রের নিকটে তাঁহার সন্ধান করিতে যাইতেছি। ঈশ্বরকে পাইবার জন্য ঈশ্বরের নিকটে না যাইয়া, গুরুর নিকটে, পেগাম্বরের নিকটে গমন করাতে, মানুষ এক এক গুরুর শিষ্য হইয়া, এক এক প্রেরিতের অনুবর্ত্তী হইয়া, বিভিন্ন দলে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া যাইতেছেন। এইরূপে মানবসমাজ, শ্রীবুদ্ধের অনুবর্ত্তিগণ বৌদ্ধ, মুসার শিষ্যগণ ইহুদি, খৃষ্টদেবের শিষ্যগণ খৃষ্টান, মহম্মদের অনুবর্ত্তিগণ মুসলমান, গুরু নানকের শিষ্যগণ শিখ, শ্রীগৌরাঙ্গদেবের শিষ্যগণ বৈষ্ণব, এমনতর আরও শত শত সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া গেলেন।

প্রথমে আমরা ভাবিয়া দেখি, এই যে মহাপুরুষগণ, এই যে গুরু, পীর, পেগাম্বর ও অন্যান্য সাধু মহাজনগণ, ইঁহারা কেন পৃথিবীতে প্রেরিত হইলেন? স্রষ্টার কি অভিপ্রায় ইহাতে রহিয়াছে?

ধর্ম্মজগতে আমরা দুইটি স্তর দেখিতে পাই। এই দুইটি স্তরকে বর্ণনা করিতে উপযুক্ত ভাষার অভাব হেতু, যদি একটিকে বলি উচ্চস্তর, তাহা হইলে আর একটিকে বলিতে হয় নিম্নস্তর। ঈশ্বর অনন্ত। তাঁহার রূপেরও অন্ত নাই, এবং তাঁহার গুণেরও সীমা নাই। তাঁহার মধ্যে কত পিতৃস্নেহ, কত মাতৃস্নেহ, কত সখ্য ভাব, কত প্রভুত্ব, কত স্বামিত্ব, কত রাজবেশ, কত জ্ঞান, কত প্রেম, কত পুণ্য, কত পবিত্রতা, কত ন্যায়, কত ত্যাগ, কত সৌন্দর্য্য বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার কোনও অন্ত নাই, সীমা নাই। কতগুণে তিনি গুণী, কতরূপে তিনি রূপবান, কত জ্যোতিতে তিনি জ্যোতির্ম্ময়, কত বীর্য্যে তিনি বীর্য্যবান, কে তাহা বর্ণনা করিবে। অনন্ত ঈশ্বর আপনার রূপ ও গুণে আপনার মধ্যে আপনি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। এই যে তাঁহার স্বপ্রতিষ্ঠ ভাব, ইহাকে আমরা ধর্ম্মজগতে উচ্চস্তর বলিতে পারি। ধর্ম্মজগতের অন্যস্তর হচ্চে ঈশ্বরের স্বানুভূতি বা Self-realisationএর স্তর। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যেমন ঈশ্বর প্রেমময় পিতা। তাঁহার এই যে পিতৃস্নেহ, তিনি স্বয়ং কিরূপে অনুভব করিবেন? পিতার স্নেহ অনুভব করিবার জন্য সন্তানের প্রয়োজন। এই পিতৃস্নেহ হইতে তিনি ঈশাকে সৃষ্টি করিলেন। ঈশা পৃথিবীতে পিতৃস্নেহে বিগলিত হইয়া পৃথিবীতে পিতৃভক্তির আদর্শ দেখাইলেন। পিতার আদেশ পালন করিবার জন্য কিরূপে দেহপাত করিতে হয়, দেখাইলেন এবং জগতের শত শত নরনারীকে পিতৃভক্তি শিক্ষা দিলেন। ভক্ত রামপ্রসাদকে তিনি তাঁহার মাতৃস্নেহ হইতে সৃষ্টি করিলেন, তাই রামপ্রসাদ কেবল মা মা করে তাঁকে ডেকে গেলেন। তাঁহার প্রেম হইতে তিনি শ্রীবুদ্ধ ও শ্রীগৌরাঙ্গকে সৃষ্টি করিলেন। শ্রীবুদ্ধদেবে সর্ব্বজীবে প্রেম প্রদর্শন করিলেন ও শ্রীগৌরাঙ্গদেবে প্রেমে মত্ত হইয়া নৃত্য করিলেন। শ্রীরামচন্দ্রকে তিনি তাঁহার রাজশক্তি দিয়ে প্রেরণ করিলেন; প্রজাবাৎসল্য রাজার আদর্শ, তিনি দেখাইলেন। শ্রীকৃষ্ণকে তিনি তাঁহার অসাধারণ কর্ম্মশক্তি দিয়ে পাঠাইলেন, তিনি পৃথিবীতে নিষ্কাম কর্ম্মের আদর্শ দেখাইলেন। গাজীপুরে পাহাড়ী বাবা ও তৈলঙ্গস্বামীকে তিনি তাঁহার উদাসীন ভাব হইতে সৃষ্টি করিলেন, তাঁহারা সর্ব্বত্যাগী হইলেন। এইরূপে তিনি এব্রাহিম, দাউদ, কবীর, নানক, জনক, মুষা, মহম্মদ প্রত্যেককে তাঁহার এক একরূপ হইতে, এক এক গুণ হইতে সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার প্রত্যেকে তাঁহারা এক একরূপের, এক এক গুণের নিদর্শন রাখিয়া গেলেন। শুধু ভক্ত, সাধু, মহাজন কেন, আমাদের প্রতিজনকে তিনি তাঁহার অনন্তরূপ ও অনন্ত গুণ হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি ইচ্ছা করেন, আমরা প্রত্যেক তাঁহার ইচ্ছানুসারে পরিচালিত হইয়া, তাঁহার রূপের গুণের মহিমা পৃথিবীতে কীর্ত্তন করি।

মানুষ ঈশ্বর-প্রেরিত বিশেষ বিশেষ মহাজন ও সাধুজনকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। কেহ বা পুত্রকে পিতার আসনে বসাইতে গেলেন, কেহ বা ভৃত্যকে প্রভুর আসনে বসাইলেন, কেহ বা শিষ্যকে অভ্রান্ত গুরুর স্থান দান করিলেন। এইরূপে ক্রমে সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিল। এই যে সাধু, ভক্ত, যোগী, ত্যাগী, কর্ম্মী, সন্ন্যাসী, ইহাদিগের প্রত্যেকের ধর্ম্মজীবনের দুইটি দিগ আছে। একটী হচ্ছে আত্মিক দিগ, অর্থাৎ আত্মার সহিত পরমাত্মার যোগ, অপরটি হচ্ছে বাহ্যিক ক্রিয়া-কলাপ বা বিধি নিয়মের দিক্। এই যে বাহ্যিক ক্রিয়া-কলাপ বা বিধি নিয়ম, ইহা নির্ভর করে অনেকটা দেশ ও কালের উপর। ইংরাজীতে যাহাকে বলে Environment, এর উপর। দৃষ্টান্ত স্বরূপ—যেমন হজরত মহম্মদ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, আরবদেশের নির্জ্জলা মরুদেশে দুর্দ্দান্ত আরবজাতির মধ্যে। আরব দেশে অত্যন্ত জলাভাব, মনকে একাগ্র করিতে হইলে সাধারণ লোকের পক্ষে দেহ শীতল ও মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ করা প্রয়োজন। (যাঁহাদের মন দৈহিক প্রভাব হইতে মুক্ত, তাঁহাদের বিষয় বলা হইতেছে না।) কিন্তু আরব দেশে জলাভাব, একনা অল্প জলে হস্তপদ বদনমণ্ডল স্নিগ্ধ ও শীতল করা প্রয়োজন, একনা নমাজের পূর্ব্বে অজুর বিধি মহম্মদ প্রচলন করিলেন। কিন্তু মহম্মদের শিষ্যগণ এই সুজলা বঙ্গদেশেও নমাজের পূর্ব্বে স্নান না করিয়া অজু করিয়া থাকেন। মহম্মদের খাদ্য, পরিধেয় আরব দেশের আবহাওয়ার অনুযায়ী; কিন্তু মুসলমানগণ বঙ্গদেশেও আরব দেশের রীতি নীতি প্রতিপালন করেন। আরবি ছিল মহম্মদের ভাষা, মুসলমানগণ না বুঝিয়া বঙ্গদেশে আরবিতে নমাজ করেন। শ্রীচৈতন্যদেব সুজলা, সুফলা বঙ্গদেশে' বাঙ্গালী জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহার নিয়মাবলি জেরুজেলমের ইহুদি জাতিতে জন্ম শ্রীঈশা হইতে স্বতন্ত্র হইবে। ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। মুসার, শ্রীবুদ্ধের রীতি

নীতি যে ভিন্ন হইবে, এ বিষয় প্রশ্ন হইতে পারে না।

গুরুজনদিগের অনুবর্ত্তী ও শিষ্যগণ আপন আপন নেতা বা গুরুর রীতি নীতি লইয়া, মানবসমাজে নিত্য কলহ ও রক্তপাত করিতেছেন এবং ঈশ্বর হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া অপ্রেম, অশান্তি ও ভ্রাতৃবিরোধে মগ্ন হইতেছেন। ঈশ্বর নববিধানে বলিতেছেন, "মানব সন্তানগণ, আমি তোমাদের অতি নিকটে, আমাকে লাভ করিবার জন্য কোনও মহাজনের নিকটে, কি কোনও গুরুর নিকটে যাইবার প্রয়োজন নাই। তোমরা প্রত্যক্ষভাবে আমার নিকটে এস, আমি তোমাদিগকে আমার প্রতি সন্তানের সহিত পরিচিত করিয়া দিব এবং শাস্ত্রের সত্যবাণী তোমাদিগকে শুনাইব। আমার মধ্যে শ্রীবুদ্ধ, ঈশা, মুসা ইব্রাহিম, সক্রেটীস, জনক, নানক, মহম্মদ, শ্রীগৌরাঙ্গ, তৈলঙ্গস্বামী, পাহাড়ীবাবা, এমনতর কত শত শত সাধু মহাজনগণ আছেন। সমস্ত অতীত আমার মধ্যে আছে, সমস্ত বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎও আমার মধ্যে আছে। আমি তোমাদিগকে সকলের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিব, আমার গৃহে কোনও বিবাদ নাই। আমার এই নববৃন্দাবনে সকলে প্রেমে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছেন। মহম্মদ ও নানক গভীর ভাবাবেশে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতেছেন। আমাকে পাইবার জন্য কোনও নির্দ্দিষ্ট শাস্ত্রবিধির প্রয়োজন নাই। আমি প্রতি মুহূর্ত্তে কত বেদ বেদান্ত, কোরাণ পুরাণের কথা তোমাদিগকে শুনাইব। পৃথিবীকে আমি মিলনের স্বর্গরাজ্য করিব। বাহ্যিক বিধি নিয়মের জন্য বিবাদ না করিয়া আমার জন্য ব্যাকুল হও, আমার দেখা পাইবে।"

নববিধানের দেবতা এই সত্য সকল মানবকে শুনাইতেছেন। আমাদিগকে আমরা নানারূপে অক্ষম ভাবিতেছি; কেহ ভাবি, আমরা বৃদ্ধ হইয়াছি, আর কিছুই ভাল লাগে না। আমরা প্রত্যেকে ঈশ্বরের সন্তান, তাঁহার রূপ ও গুণ হইতে আমরা সৃষ্ট; যদি ঈশ্বর আমাদিগের পিতা নিত্য নূতন রহিয়াছেন, তাহা হইলে আমাদিগকে বৃদ্ধভাবা অন্যায়। কেহ কেহ ভাবি, আমাদের শক্তি কোথায়, বিদ্যা বুদ্ধি কোথায়, নববিধানের সত্য প্রচার করিতে? এ বিষয়ে শ্রীরামচন্দ্রের সাগরবন্ধনের একটী গল্প মনে হইল। যখন বীরপ্রবর হনুমান বড় বড় প্রস্তরখণ্ড আনিয়া সমুদ্রে ফেলিতেছিলেন, তখন ক্ষুদ্রশক্তি কাঠবিড়ালিরও ইচ্ছা হইল, প্রভুর কাজ কিছু করে। তখন কাঠবিড়ালি একবার সমুদ্রজলে ঝম্পপ্রদান ও একবার সমুদ্রতীরে বালুকারাশিতে গড়াগড়ি দিয়ে, বালি নিয়ে বন্ধনস্থানে যোগাইতে লাগিল। কাঠবিড়ালির কার্য্য দেখিয়া হনুমান হাস্য করিয়া বলিলেন, আমি এত বড় বড় প্রস্তর খণ্ড দিয়ে সমুদ্র বন্ধন করিতে পারিতেছি না, তোমার বালিকণা দিয়ে এ কি করিতেছ? উত্তরে কাঠবিড়ালি বলিল, তোমার বড় শক্তিতে তুমি বড় বড় প্রস্তরখণ্ড আনিতেছ, আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে আমিও প্রভুর কাজ করিতেছি। পরে দেখা গেল, হনুমানের আনীত বড় বড় প্রস্তর খণ্ডে সমুদ্র বন্ধন হইল না, প্রস্তরের মধ্যে ছিদ্র পথে জল প্রবেশ করিতে লাগিল; কিন্তু কাঠবিড়ালির আনীত বালিকণাতে সে সমস্ত ছিদ্র বন্ধ হইয়া সমুদ্রবন্ধনের কার্য্য শেষ হইল। আমাদের শক্তি ক্ষুদ্র হইতে পারে, এই ক্ষুদ্র শক্তিতে আমরা নিজের জীবনে নববিধান সাধন করিতে পারি, নিজের স্ত্রী পুত্রের নিকটে নববিধানের আদর্শ ধরিতে পারি, নিজের বন্ধুদের মধ্যে নববিধানের আদর্শের কথা বলিতে পারি। এইরূপে প্রভুর দেওয়া ক্ষুদ্র শক্তি প্রভুর কার্য্যে নিয়োগ করিয়া ধন্য হইতে পারি।

প্রভু পরমেশ্বর আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমরা প্রতিজনে তাঁহার দেওয়া শক্তি তাঁহার কাজে নিযুক্ত করিয়া ধন্য হই।

শ্রীজগন্মোহন দাস।

ব্রাহ্মসমাজ অগ্রসর হইতেছে না কেন?

অনেক সময়ে আমাদিগের মধ্যে এই প্রশ্ন উত্থিত হইতেছে যে, "ব্রাহ্মসমাজ অগ্রসর হইতেছে না কেন?" এ প্রশ্নের উত্তর কে দিবেন? ইহার উত্তর আমাদিগকে দিতে হইবে। এই পাটনা সহরে অল্পদিন হইল, আমাদিগের নববিধান সমাজের জনৈক প্রাচীন ব্রাহ্মের সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। তিনি এই আলোচনার প্রসঙ্গে বলিলেন যে, "আমাদের নিকট লোকে কিছু পায় না।" তাঁহার এ কথা খুবই সত্য। তাহার পর আর একদিন অত্রত্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জনৈক প্রাচীন বিশ্বাসীর সঙ্গে আলোচনা হইয়াছিল। তাহাতে তিনি বলিলেন যে, "আমাদের দেখিয়া কেহ আকৃষ্ট হয় না।" এই উভয় প্রাচীন সাধক ও বিশ্বাসীর ভাবের সমতা খুবই অনুভব করিলাম। আমিও একজন নববিধান ব্রাহ্মসমাজের অশীতিবর্ষাধিক বর্ষীয়ান ব্রাহ্ম। আমারও ভিতরে ব্রাহ্মসমাজের পশ্চাদ্বর্ত্তিতা সম্বন্ধে এই ভাবই চলিতেছে। আমরা এতদিনেও সে সাধনায় উপস্থিত হইতে পারি নাই, যাহা দেখিয়া সাধারণ জনমণ্ডলী আকৃষ্ট হয় এবং আমাদের কথা তাঁহাদের প্রাণকে স্পর্শ করে। আমরা তো দেখিয়াছি, এই ব্রাহ্মসমাজে একদিন যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। যখন আমাদিগের ভক্তিভাজন নববিধানাচার্য্য ভক্ত ব্রহ্মানন্দ দাঁড়াইয়াছিলেন এবং যখন তাঁহার সাধনা ও আধ্যাত্মিক জীবনের প্রভাব সমগ্র পৃথিবীকে আকর্ষণ করিয়াছিল, আমরা তো দেখিয়াছি, তাঁহার সেই প্রভাব ও আকর্ষণে কত শিক্ষিত যুবক আকৃষ্ট হইয়া এবং তাঁহাদের জীবিকা-নির্ব্বাহের উপযোগী ভবিষ্যৎ আশাপূর্ণ বৃত্তি ও কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া, তাঁহার সহিত এই নবধর্ম্মে নবোৎসাহে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা "কল্যকার জন্য চিন্তা করিও না" এই মহামন্ত্র লইয়া ত্যাগ ও বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। আমরা তো দেখিয়াছি, কত সময়

অনশন ও অর্দ্ধাশনে তাঁহাদের জীবন কাটিয়া গিয়াছে। আমরা তো দেখিয়াছি যে, কত উচ্চশ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিয়া এবং সামাজিক গৌরব ও পদমর্য্যাদা ভুলিয়া গিয়া, এই ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখন সে দিন কোথায়? এখন দেখিতেছি, কত আদিম ব্রাহ্মপরিবার হইতে ব্রাহ্মসন্তান পুনরায় হিন্দুপরিবারে ও হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিতেছেন। এখন দেখিতেছি যে, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ব্রাহ্মপরিবার হইতেও কেহ কেহ ধর্ম্মের প্রভাব ভুলিয়া গিয়া ও স্বার্থান্ধ হইয়া, হিন্দুমতে পুত্রকন্যাদের বিবাহ দিতেছেন। এখন সে প্রভাব ও সে বিশ্বাস কোথায় চলিয়া গেল! এখন বলিতেছি, এ জন্য আমরা দায়ী। আমরা সাধনায় এবং ধর্ম্মের পথে সে দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিতেছি না। এখন দেখিতেছি যে, একদিকে আমাদের পরিবারে নিত্য উপাসনার ব্যবস্থা নাই এবং অন্যদিকে আমাদিগের পুত্রকন্যাগণ কত উচ্ছৃঙ্খল অবস্থায় চারিদিকে বিচরণ করিতেছে। এই স্থানেই তো প্রমাণিত হইতেছে, সেই পূর্ব্ববর্ত্তী সাধকগণের জীবনের পথ ধরিতে পারি নাই। তাহার পর আমরা আরও কি দেখাইতেছি, তাহা ভাবিতে গেলে হৃদয় কম্পিত হয়। এখন আমাদিগের মধ্যে তাঁহাদের সেই যোগ, সেই বৈরাগ্য, সেই তপস্যা কোথায়? এখন আমরা ধন মান ও ঐশ্বর্য্যের মোহান্ধকারে প্রকৃত পথ হারাইয়া ফেলিতেছি। সেই যে শ্রীঈশা বলিয়া গিয়াছেন, "No man can serve two masters: God and Mommon." তিনি আরও বলিয়া গেলেন যে, "It is easy for a camel to pass through the hole of a needle than the rich man through the gate of heaven." হায়! একদিন শ্রীব্রহ্মানন্দ ও তাঁহার ধর্ম্মপথে সহচরগণ এই মহাব্রত পালন করিয়াছিলেন। এখন দেখিতেছি, আমাদিগের মধ্যে তাহার সম্পূর্ণ বৈপরীত্য আসিয়া পড়িয়াছে। এখন আমরা ধন, মান ও ঐশ্বর্য্যের দিকে নিয়ত ছুটিয়াছি। আমাদের পরিবারে এখন সে দৈনিক উপাসনার ব্যবস্থা নাই। এমন কি, মন্দিরে সাপ্তাহিক উপাসনায় উপস্থিত হইবার ভাবও কমিয়া যাইতেছে। আমরা একদিন দেখিয়াছি যে, আমাদিগের ব্রহ্মমন্দিরে সাপ্তাহিক উপাসনায় যোগ দিবার জন্য ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকাগণ কলিকাতার জলপ্লাবিত পথ অতিক্রম করিয়া উপাসনায় যোগদান করিয়াছেন। এখন শকটারোহণেও সে দৃশ্য সম্ভব হইতেছে না! তাই বলিতেছি, আমরা প্রস্তুত না হইলে আমাদিগের পুত্র কন্যাগণ প্রস্তুত হইবে না এবং আমাদের ধর্ম্মমত, আমাদের সাধনা ও বিশ্বাস এক না হইলে, লোকেও আমাদিগকে ও আমাদিগের ধর্ম্মকে গ্রহণ করিবেনা। মত ও বিশ্বাস একবস্তু নহে। উভয়ের মিলন না হইলে, কোনও ধর্ম্মসমাজই অগ্রসর হইবে না। মতে, গ্রন্থে এবং কথায় ধর্ম্ম প্রচারিত হয় না।

প্রত্যেক ধর্ম্ম এক সাধনা ও জীবনগত বস্তু। পাশ্চাত্য ঋষি সাধু ক্রিউমিস তাঁহার এক সাধক শিষ্যকে বলিয়াছিলেন, "They do not read the Bible much but they read us. Be a book." তিনি তাঁহার এই শিষ্যের লিখিত একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া এই কথা বলিয়া গিয়াছেন। আমরা আমাদের নববিধানে আসিয়া এই সত্য খুব বুঝিতেছি। উক্ত পাশ্চাত্য ঋষি তাঁহার সেই অনুগামী ভক্ত শিষ্যকে যাহা বলিলেন, আমরা সেই কথার মহাসত্য ভক্ত ব্রহ্মানন্দের বিবৃত "জীবনবেদে" অনুভব করিতেছি। তিনি আমাদিগকে পুস্তক ও গ্রন্থ দিবার জন্য আসেন নাই। ধর্ম্মের মহাসত্য দিবার জন্যই তাঁহার আগমন। তাঁহার ধর্ম্ম, বিশ্বাস, মতও গ্রন্থে আবদ্ধ নহে। জীবনের সঙ্গে আমাদের পথ ও ধর্ম্মমত এবং আমাদের কথা একসূত্রে মিলিত না হইলে, নববিধান কোনদিন প্রচারিত হইবে না।

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

—o—

শ্রীমতী শশিমুখী দেবীর সংক্ষিপ্ত জীবনী।

(ভাই অখিলচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক, ৪ঠা এপ্রিল, শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মা বিধানজননীর কৃপায় কিছুদিন অতিবাহিত হইল, ১২৯৬ সালের ১২ই কার্ত্তিক মাতা শশিমুখী দেবীর তৃতীয়া কন্যার জন্ম হয়। অল্প দিন পরেই আর একটী পরীক্ষা উপস্থিত। এত দিন বার্ষিক খাজানা দিয়া শ্রীযুক্ত শ্রীকণ্ঠনাথ রায়, মহিমচন্দ্র রায় প্রভৃতির কাছারী বাড়ী নামক বাটীতে ভক্ত ফকিরদাস সপরিবারে বাস করিতেছিলেন, উক্ত মালিকেরা (পূর্ব্বোক্ত অত্যাচারী ভ্রাতার প্ররোচনায়) হঠাৎ ভক্ত ফকিরদাসকে বলিলেন, এক মাসের মধ্যে এই বাড়ী ছাড়িয়া দিতে হবে।

১২৯৭ সালের বৈশাখ মাস, প্রচণ্ড রৌদ্র, গৃহনির্ম্মাণের কোন আয়োজন এ সময় অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হইলেও, স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের যে এক খণ্ড বাস্তুভূমি কিছুদিন পূর্ব্বে ভক্তের গৃহনির্ম্মাণ ফণ্ড হইতে ক্রয় করা হইয়াছিল, ঐ বাস্তুভূমিতেই গৃহ নির্ম্মাণ করা স্থির হইল। ঐ সম্বন্ধে ইতিবৃত্তে লিখিত হইয়াছে, "বৈশাখ মাস উপস্থিত, গৃহাদি প্রস্তুতির সময় নিতান্ত অল্প, তাহার উপর বন্ধু বিশেষের (ভ্রাতা ত্রৈলোক্যনাথ দাসের) প্রদত্ত একটী টাকা দান ভিন্ন আর কিছুই সম্বল ছিল না। আশ্রিতবৎসল বিধাতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, উপরি উক্ত মালিকদিগের নিষ্ঠুর আদেশে ভক্ত সম্মতি দিলেন।" যদিও ভক্তের সহোদরগণ ও পিতৃদেব স্নেহ ও শ্রদ্ধাবশতঃ ঐ নিষ্ঠুর আদেশ অমান্য করিতে বলিয়াছিলেন, যে হেতু তাঁহারাও ঐ বাটীর অন্যতম মালিক। যাহা হউক, স্থানীয় ও বিদেশীয় দাতাদিগের অনুকম্পায়, পর্ণকুটীর-নির্ম্মাণের আয়োজন অতি

অল্প সময়ের মধ্যেই হইয়াছিল। এ সেবককেই ঐ কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতে হয়। ১২৯৭ সালে আষাঢ় মাসে নূতন গৃহে প্রবেশের অনুষ্ঠান হয়। ভাড়াটিয়া বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া, মাতা শশিমুখী দেবী নিজের কুটীরে আগমন করিয়া, বিশ্বাস ও ভক্তির সহিত পতিসঙ্গে নিত্য নিত্য উপাসনা, বন্দনা ও গৃহকার্য্য সুন্দরভাবে সম্পন্ন করিতে থাকেন। ঐ নূতন গৃহে বসবাস ও পুরাতন ভাড়াটীয়া গৃহত্যাগের ভিতর বিধাতার অপূর্ব্ব কৌশল দেখিয়া, তাই ভক্ত স্বহস্তে লিখিয়াছেন, "দীন ভগবদাশ্রিত লোকের জন্য রাজভাণ্ডারের দ্বার যেমন উন্মুক্ত, তেমনি মুষ্টি-ভিক্ষা-প্রদানে দরিদ্রজনেরও হস্ত সদা প্রসারিত। আহা! ইহাতে কেবল মার খেলাই দেখিলাম। × × মার এই ক্ষুদ্র লীলাক্ষেত্রে দেখিলাম যে, সংসার যতই দুঃখ দিবার চেষ্টা করিল, মার অদ্ভুত কৌশলে সে দুঃখ সুখকে অনুসরণ না করিয়া একাকী কখনও উপস্থিত হয় না। সংসার শত্রুতা করিল, মা জননী তাহার মধ্যেই নিজ খেলাই খেলিলেন। যাঁহাকে প্রজা হইয়া সপরিবারে বাস করিতে হইতেছিল,......বিনা কারণে সময়ে সময়ে সপরিবারে যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত, তাঁহাকে মা কৃপা করিয়া, সে জঞ্জাল হইতে উঠাইয়া, মা তাঁর খাসের প্রজা করিলেন। ধন্য মা! তোমার অদ্ভুত লীলা।"

এই নূতন কুটীরে বাস করিবার এক বৎসর নয় মাস পরেই স্থানীয় ও বিদেশীয় দাতা মহোদয়গণের কৃপায়, ভক্তপরিবারের জন্য একটী অট্টালিকা নির্ম্মাণের আয়োজন হইল। ১২৯৮ সালে ৬ই ফাল্গুন ভক্ত ফকিরদাসের নূতন গৃহের ভিত্তিস্থাপন হয়। ঐ অনুষ্ঠান উপলক্ষে যথাবিধি প্রার্থনাদি হইলে, তাঁহার পিতৃদেব মহাত্মা সূর্য্যকুমার রায় মহাশয় স্বহস্তে ভিত্তি স্থাপন করেন। এই শুভ অনুষ্ঠানের কয়েকদিন পরেই মাতা শশিমুখী দেবী প্রভৃতির একটি প্রাণসংহারকারী কঠিন পরীক্ষা উপস্থিত হয়। ঐ ফাল্গুনের ১৫ই, শুক্রবার রাত্রি প্রায় ২টার সময়, যখন সকলেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত, এমন সময়ে মাতার তৃতীয়া শিশু কন্যা (বিনোদিনী) সহসা জাগিয়া কাঁদিতে লাগিল। শিশু কন্যার ক্রন্দনে মাতার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি গৃহের উপরিভাগ ভয়ানক আলোকে পূর্ণ দেখিয়া, আসন্ন বিপদ আশঙ্কা করিয়া, ব্যাকুল হইয়া ভক্তকে জাগাইয়া উহা দেখাইলেন। তিনিও ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, অল্পক্ষণ পূর্ব্বে কোন দুষ্টলোক শয়নগৃহের কোন স্থানে আগুন লাগাইবার সুবিধা না পাইয়া, ঐ গৃহসংলগ্ন একটি তালপাতার চালে আগুন লাগাইয়াছে। এমন স্থানে আগুন লাগাইয়াছে যে, অতি অল্প সময় মধ্যে শয়নগৃহখানি পুড়িয়া যাইত এবং ভক্ত ফকিরদাস সপরিবারে অগ্নিদগ্ধ হইতেন। এই দৃশ্য দেখিয়া ভক্ত তাঁর কন্যাদ্বয়কে জাগাইয়া ও এ সেবককে ডাকিয়া ঐ অগ্নিনির্ব্বাণের ভার দিয়া, প্রতিবাসীদের গৃহগুলি রক্ষার জন্য ছুটিয়া গেলেন। এই ভীষণ ব্যাপারের সংবাদ পাইয়া প্রতিবেশীরা ছুটিয়া আসায়, সকলের চেষ্টায় সহজেই ঐ অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল; কিন্তু প্রতিবাসীদের গৃহগুলিতে প্রবলবেগে অগ্নি লাগায়, প্রায় সমস্ত পাড়াটি পুড়িয়া গেল। ভক্ত ফকিরদাস ছুটিয়া গিয়া সজোরে প্রতিবাসীদের দ্বারে আঘাত করায়, তাঁহারা বাহিরে আসিয়া ভয়ানক রকমে কান্নাকাটি করিতে লাগিলেন। তার মধ্যে একটি প্রধানা স্ত্রীলোক ভীষণ রকমে কান্নাকাটি ও শিরে করাঘাত করিয়া, ভক্ত ফকিরদাসের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বড়বাবু! আমার পাপেই আজ আমাদের এই সর্ব্বনাশ হইল। প্রথমে কোন দুষ্ট লোকে আপনার চালা ঘরে আগুন লাগাইয়া ছুটিয়া যাবার পর, উহা আমি দেখিয়াছিলাম; কিন্তু আন্তরিক হিংসার জন্য সে সময় আপনাদের ডাকি নাই বা জাগাই নাই, চুপ করিয়াছিলাম। ঐ লোকটা যে আমাদের ঘরেও আগুন লাগাইয়াছে, তাহা আমরা আদৌ টের পাই নাই। যদি আপনার ঘরের আগুন দেখিয়া বাহিরে আসিয়া আপনাদের ডাকিতাম, তা'হলে আমাদের আজ এ সর্ব্বনাশ হইত না। বড় বাবু! আপনি এ মহাপাতকীকে ক্ষমা করুন।" এই ঘটনার পর প্রতিবাসীরা ভক্তপরিবারের যথেষ্ট সহানুভূতি ও সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। এই ভীষণ অগ্নিপরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ভক্ত লিখিয়াছিলেন, "বিশ্বাসী পাঠক! এই অপূর্ব্ব প্রাণসংহারক ব্যাপার মধ্যে বিধাতার করুণা দর্শন করুন। মুহূর্ত্ত মধ্যে বিশ্বাসী দাসপরিবারের সকলেই ভস্মে পরিণত হইত, কিন্তু একটী অতি ক্ষুদ্র উপায় দ্বারা তিনি তাঁহার শরণাগত দাসদাসীকে তাঁহাদের প্রাণাধিক সন্তানগণ সহ রক্ষা করিলেন। আসন্ন বিপদ্‌দর্শনে মার অতুল করুণা ক্রন্দন করিতে করিতে শিশুর অন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং শিশুও তৎপ্রভাবে ক্ষণকালের জন্য ক্রন্দন করিয়া সকলের প্রাণরক্ষার উপায় হইল। ধন্য মা! ধন্য তোমার করুণা! যে উপায়ে তুমি তোমার সাধনকার্য্য কর, তাহা পৃথিবীর দৃষ্টিতে সামান্য হইলেও অসামান্য, ক্ষুদ্র হইলেও তাহা নিঃসংশয়রূপে সুমহৎ।"

১২৯৮ সালে ১৪ই কার্ত্তিক মাতা শশিমুখী দেবীর চতুর্থ কন্যার জন্ম হয়, শিশু কন্যাটি চারদিন মাত্র জীবিত ছিল। এই শোকে মাতাকে ভীষণ শোকাহত হইতে হইয়াছিল। মার কৃপায় পুনরায় ১২৯৯ সালে ১৭শে অগ্রহায়ণ মাতা শশিমুখী দেবীর ৪র্থ পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। এই শিশু কয়েকমাস পরে উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় কর্ত্তৃক 'সত্যানন্দ' নাম প্রাপ্ত হয়। ঐ সালে ৬ই ফাল্গুন মহাসমারোহে অমরাগড়ী নববিধান ব্রাহ্মসমাজের নবনির্ম্মিত ব্রহ্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠা উৎসবে, মাতা শশিমুখী দেবী সমাগত সাধকমণ্ডলীর সেবাকার্য্য খুব নিষ্ঠাপূর্ব্বক করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে ধর্ম্মতত্ত্বে লিখিত হইয়াছে, "ব্রহ্মমন্দির-প্রতিষ্ঠা উৎসবে ফকিরদাসের কুটীরে সপ্তাহকাল ব্যাপিয়া, প্রতিদিন দুই বেলা শতাধিক লোকের নানা উপকরণযুক্ত লুচি মিষ্টান্নাদি সুখাদ্য দ্রব্য দ্বারা সেবাকার্য্য চলিয়াছিল। এই ব্রহ্ম-

মন্দির-নির্ম্মাণ-কার্য্যে মাতা শশিমুখী দেবীর প্রায় ১০০৲ টাকার অধিক স্বর্ণালঙ্কার বন্ধক দিয়া ভক্ত ফকিরদাস স্বয়ং ব্যয় করিয়াছিলেন, তাহা কিছুতেই পরিশোধ হইল না। আমাদের মাতা অম্লানবদনে পতিদেবতার নির্দ্দেশে তাহা পুনঃ প্রাপ্তির আশা পরিত্যাগ করেন। (ক্রমশঃ)

নূতন সঙ্গীত

(১)

(মল্লার—একতালা; সুর—"হরি বলে সবাই নাচে")

কোন্ বিজনে, সঙ্গোপনে, করছ তুমি অবস্থান?
নগর ছেড়ে, তাই তোমারে, দেখতে এলাম, ভগবান!
হেথায় গিরি-উপত্যকায়, দেখব বলে মন তোমায় চায়,
মুক্ত হাওয়ায়, হৃদয় জাগায়, জুড়াইয়া মন প্রাণ!
তোমার বিমল মুখ-ভাতি, ঢালে প্রাণে মধুর জ্যোতি,
নাইক হেথা ভাবনা ভীতি, নাইক হেথা ব্যবধান!
নাইক হেথা কোলাহল, নাইক বাসনা চঞ্চল,
সহজ হেথা তোমার দেখা, সহজ হেথা তোমার ধ্যান!
এই শুভ আজ অবসরে, দেখি তোমায় নয়ন ভ'রে;
সবারে আজ ব্যাকুল করে, প্রেমামৃত করাও পান!

চেরাপুঞ্জী।

নববিধান ব্রহ্মমন্দির, ১৩-৬-৩৭।

(২)

(আলেয়া—একতালা; সুর—"দেহজ্ঞান, দিব্য জ্ঞান")

জগৎ জুড়ে, নিকটে দূরে, ব্যাপিয়া আছ সকল স্থল;
দিতে পরিচয়, শুভ প্রেমময়, করিয়া পূর্ণ অবনীতল!
বলে আকাশ-জলধি ভূমি, গিরি নির্ঝর "এই যে তুমি",
অন্তশ্চক্ষে দেখি যে আমি, তোমাময় সব মহীমণ্ডল।
পবন বহে সুধার ধারা, আলোক দেয় রবি চন্দ্র তারা,
তব পরিচয় দেয় যে তারা, তব প্রেমে হয়ে আত্মহারা;
কুসুম কহে সুরভিচ্ছলে, "এই পবিত্র হৃদয়দলে, তুমি",
হাসি দিয়ে ঐ শিশু যে বলে, "তব প্রকাশ কি সুবিমল"!
(কি সুস্পষ্ট, কি নির্ম্মল!)
ফিরিছ তুমি সবার ঘরে, তব পরিচয় দিবার তরে,
কত ভালবাসা, কতই আশা, সতত তুমি ধরি অন্তরে;
কতই খেলা খেলিছ ব'সে, এ মম ক্ষুদ্র হৃদয়ে প'শে,
চাহিয়া আছ প্রতি নিমেষে, করি সংসার লীলার স্থল!
(কে বুঝিবে তব লীলা-কৌশল? প্রভু!)

শিলং, ২৯-৬-৩৭। শ্রীদামোদর পাল

সংবাদ।

জন্মদিন—গত ১৬ই জুন, পাটনায় শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসাদ মজুমদারের গৃহে, তাঁহার দ্বিতীয়া দৌহিত্রী শ্রীমতি পান্না দত্তের জন্মদিনে, গৌরীবাবু উপাসনা করেন এবং মাতামহী শ্রীমতী সুমতি দেবী প্রার্থনা করেন।

গত ১৯শে জুন পাটনায়, শ্রীমতী বনলতা দের গৃহে, তাঁহাদের ভ্রাতা, কুচবিহার কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মনোরথধন দের জন্মদিনে প্রাতে সেবিকা হেমলতা উপাসনা, সন্ধ্যায় ডাঃ পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রার্থনাদি করেন। এই উপলক্ষে পাটনায় ঋষি কেদারনাথ ধর্ম্মগ্রন্থাগারে ১৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

নামকরণ—বিগত ১৩ই মে, বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্নে, হাওড়া বাঁটরানিবাসী শ্রীমান্ শচিকুমার দাসের দ্বিতীয় শিশুপুত্রের শুভ নামকরণ নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হয়। ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা করেন। শিশুকে 'সুমন্ত্রকুমার' নাম প্রদত্ত হইয়াছে। মা বিধানজননী শিশুকে ও তাহার জনকজননীকে আশীর্ব্বাদ করুন। এই উপলক্ষে অমরাগড়ীর মিশন ফণ্ডে ১৲ ও কলিকাতা নববিধানসমাজের উপাসকমণ্ডলীর প্রচার বিভাগে ১৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

শুভবিবাহ—গত ৪ঠা আষাঢ় (১৮ই জুন) শুক্রবার, টাঙ্গাইলনিবাসী বিধানবিশ্বাসী ভক্ত স্বর্গীয় শশিভূষণ তালুকদারের কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ীর সহিত, ভাগলপুরনিবাসী বিধানবিশ্বাসী ভক্ত স্বর্গীয় হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পৌত্র, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ সুশান্ত কুমারের শুভবিবাহ নবসংহিতামতে, কলিকাতায় ৪৫নং বেনিয়াটোলা লেনে, মিত্র ইন্‌ষ্টিটিউশন ভবনে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ শুভানুষ্ঠানে আচার্য্য ও পুরোহিতের কাজ করিয়াছেন। ভগবান নবদম্পতিকে শুভাশীষ দান করুন।

পারলৌকিক—আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, গত ২৮শে জুন, ৩নং পদ্মনাথ লেনে, শ্রীযুক্ত সুহাসচন্দ্র বসুর দশমাসবয়স্কা শিশুকন্যা রক্তামাশয়ে মেনেনজাইটিস হইয়া পিতামাতার ক্রোড় শূন্য করিয়া পরমজননীর ক্রোড়ে চলিয়া গিয়াছে। পরমজননী শিশুরত্নটীকে আপনার স্নেহক্রোড়ে আদরে রক্ষা করুন এবং শোকার্ত্ত পিতামাতার প্রাণে শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

আদ্যশ্রাদ্ধ—গত ২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ডাঃ উমাপ্রসন্ন ঘোষ তাঁহার মাতৃস্বসা স্বর্গীয়া সারদাসুন্দরী ঘোষের আদ্যশ্রাদ্ধ তাঁহার উয়ারীস্থ বাসভবনে সম্পন্ন করিয়াছেন। পণ্ডিত সারদা প্রসন্ন সেন উপাসনা করেন। এতদুপলক্ষে কলিকাতা প্রচার আশ্রমে ২৲, ঢাকা নববিধান সেবকমণ্ডলী ৩৲ এবং ঢাকা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ২৲ টাকা, দান করা হইয়াছে। পরম জননী

পরলোকস্থ আত্মাকে নিত্য স্নেহ ক্রোড়ে রক্ষা করুন এবং শোকার্ত্ত আত্মজনগণপ্রাণে শান্তি ও সান্ত্বনা দান করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ৪ঠা আষাঢ়, ১৮ই জুন, শান্তসাধক প্রেরিত ভাই কেদারনাথ দের জ্যেষ্ঠপুত্র স্বর্গীয় মনোমতধন দের সাম্বৎসরিক দিনে, কলিকাতায় তদীয় অনুজ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মনোনীতধন দের ২১৭ নং রাসবিহারী এভেনিউ ভবনে, ডাঃ সত্যানন্দ রায় উপাসনা করেন। অদ্য পাটনায় এতদুপলক্ষে ভগ্নী বনলতা দের গৃহে ডাঃ পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনা করেন এবং ভগ্নী সেবিকা হেমলতা প্রার্থনা করেন এবং কলিকাতা নববিধান প্রচার ভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করেন।

চেরাপুঞ্জিসংবাদ—শিলং হইতে শ্রীযুক্ত দামোদর পাল লিখিয়াছেন, গত ১৩ই জুন, রবিবার প্রাতে প্রায় ১১টার সময়, তাঁহারা ১৬।১৭ জন ভাই ভগ্নী চেরাপুঞ্জি গিয়া সেখানকার নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনাদি করিয়াছেন। ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ উপাসনা করেন। স্বর্গের ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া প্রকৃতির সঙ্গে মিশে সহজ ব্রহ্মদর্শনে ও তাঁহার প্রচুর আশীর্ব্বাদলাভে সকলে ধন্য হইয়াছেন। এই উপলক্ষে দামোদর বাবুর নবরচিত ও গীত সঙ্গীতটী স্থানান্তরে দেওয়া গেল।

শিলংসংবাদ—শিলং হইতে শ্রীযুক্ত দামোদর পাল লিখিয়াছেন, গত ২৯শে জুন সন্ধ্যায়, তাঁহাদের ভবনে (স্বাস্থ্য-বিভাগের ডিরেক্টর ডাঃ সচ্চিদানন্দ হোসেন পালের ভবনে) স্থানীয় ব্রাহ্ম ভাই ভগিনী প্রায় ৪০ জনকে লইয়া, ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ পারিবারিক উপাসনা বিশেষভাবে করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে দামোদর বাবুর নবরচিত গানটী স্থানান্তরে দ্রষ্টব্য। ৩০শে জুন প্রাতে, ঐ ভবনে সাধু প্রমথলালের পুণ্যস্মৃতি উপলক্ষে ঢাকার ইন্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পুণ্যেন্দ্রনাথ মজুমদার উপাসনা করেন।

প্রেরিত পত্র

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ধর্ম্মতত্ত্বসম্পাদক মহাশয় শ্রদ্ধাস্পদেষু—

সবিনয় নিবেদন,

মুঙ্গের ও জামালপুর ব্রাহ্মসমাজের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রশান্তকুমার সেন মহাশয়ের যে হিসাব, গত ১৬ই জ্যৈষ্ঠের ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত হইয়াছে, আমি উহা গত ২১শে জুন পাঠ করিলাম। ঐ হিসাব সম্বন্ধে আমার কয়েকটি নিবেদন ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকায় প্রকাশ করিলে অত্যন্ত অনুগৃহীত হইব।

প্রথম নিবেদন। মুঙ্গের ও জামালপুর ব্রাহ্মসমাজের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক ভ্রাতা প্রেমসুন্দর বসু তাঁহার হস্তস্থিত মোট ৩৭২॥৵০ আনা সম্পাদক প্রশান্তকুমার সেন মহাশয়কে নগদ দিয়াছিলেন। তাহা হইতে মুঙ্গের ব্রহ্মমন্দির মেরামত ও ভূমিকম্পের পর ঐ মন্দিরের মেরামত ও দুইটী নূতন বারাণ্ডা, সাইড রুম ইত্যাদির জন্য ও মন্দির কম্পাউণ্ডের বার্ষিক খাজানা ও ঐ মন্দিরের পূর্ব্ব কম্পাউণ্ডের পূর্ব্বাংশের জমি গভর্ণমেণ্ট হইতে একোয়ারের বিরুদ্ধে রীতিমত মোকদ্দমা জন্য আমাকে কয়েক বৎসর কয়েক দফায় মোট ২৩১৸৶ টাকা সম্পাদক মহাশয় দিয়াছেন। সম্পাদকের প্রদত্ত এই টাকা ব্যতীত প্রতিবৎসর নানা স্থানের বন্ধুগণ ও সহৃদয়া ভগিনীগণ ভক্তিতীর্থরক্ষার্থে আমার হস্তে অনেক টাকা দিয়াছেন। তাহা ছাড়া শ্রদ্ধাভাজনীয়া স্বর্গীয়া মহারাণী সুনীতি দেবী, শ্রদ্ধেয়া মহারাণী সুচারু দেবী, স্বর্গীয় ভ্রাতা নির্ম্মলচন্দ্র সেন, ডাঃ সত্যানন্দ রায় প্রভৃতি নিয়মিত মাসিক সাহায্য কয়েক বৎসর করিয়া নবভক্তের ভক্তিতীর্থ মুঙ্গেরকে রক্ষা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া প্রতি বর্ষে বর্ষে বাঁকিপুর অপূর্ব্বকৃষ্ণ পালের নববিধান ট্রাষ্ট ফণ্ডের ট্রাষ্টীগণ নিয়মিত সাহায্য করিয়া ভক্তিতীর্থের উৎসবের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। আমি ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক মহাশয়ের নিকট হইতে সাবেক মজুত টাকা হইতে সময়ে সময়ে কিছু কিছু লইয়া ব্রহ্মমন্দির মেরামত ইত্যাদির হিসাব আংশিক ভাবে তাঁহাকে দিয়াছিলাম; কিন্তু তিনি ঐ হিসাবের কোন উল্লেখ না করিয়া, কেবল আমাকেই মণি অর্ডারে টাকা পাঠান ও মণি অর্ডারের কমিশন খরচ লিখিয়া তাঁর দায়িত্ব এড়াইয়াছেন। তাহা ব্যতীত কয়েক বৎসর মন্দির কম্পাউণ্ডের জন্য মুঙ্গের খাসমহলের প্রাপ্য বার্ষিক খাজানা ৬৲ টাকা করিয়া পাঠাইয়া, ঐ টাকার রসিদ তিনি পাইয়াও, খাজানার বিষয় তাঁর হিসাবে উল্লেখ না করায়, আমি একটুকু আশ্চর্য্য হইলাম।

দ্বিতীয়। মুঙ্গের ব্রহ্মমন্দির মেরামত জন্য ও ভূমিকম্পের পর ঐ মন্দির রীতিমত মেরামত ও দুইদিকে ২টি বারাণ্ডা সম্পূর্ণ নূতন ও তৎসহ দুইদিকের সাইড রুম নির্ম্মাণে যে সকল দাতাগণ ও ভগিনীগণ আমাকে মুক্তহস্তে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম ও দানের পরিমাণ কয়েকবার ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশ করিয়াছি ও খরচের হিসাবও মাঝে মাঝে ঐ পত্রিকায় ও ইংরাজী নববিধান পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি; আশা করি, ধর্ম্মতত্ত্বের ও নববিধান পত্রিকার পাঠক পাঠিকাগণের তাহা স্মরণে আছে।

তৃতীয়। ১৯৩৬ সালে ডিসেম্বর মাসে মুঙ্গের নববিধান ব্রহ্মমন্দিরের নূতন কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদকের কার্য্যভার লইয়া, আমার নিকট হইতে বিগত কয়েক বৎসরের আয় ব্যয়ের হিসাবের খাতাগুলি ও ঐ সমাজ সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় খাতা ও কাগজ পত্র লইয়া, তিনিই কয়েক বৎসরের আয় ব্যয়ের হিসাব প্রকাশের ভার লইয়াছেন; এ জন্য এই সেবক তাঁহার নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

চতুর্থ। জামালপুরের হিসাব অতি অল্প ও জটিলতাশূন্য; আমার নিকট পূর্ব্ব হিসাব যাহা আছে, তাহা শীঘ্রই প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

আমি আশা করি, আমার এই নিবেদন সম্বন্ধে মণ্ডলীর ভাই ভগিনীগণ স্থিরভাবে চিন্তা করিবেন ও ভক্তিতীর্থের প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখিবেন।

বিনীত

কলিকাতা, শান্তিকুটীর; শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়

২৩।৬।৩৭ মুঙ্গের ও জামালপুর ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক।

Edited on behalf of the Apostolic Durber New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৭২ ভাগ।
১৩শ সংখ্যা।

১লা শ্রাবণ, শনিবার, ১৩৪৪ সাল, ১৮৫৯ শক, ১০৮ ব্রাহ্মাব্দ
17th July, 1937

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩

প্রার্থনা

হে দুর্ব্বলের বল, হে অনাথনাথ, রোগ বুঝিয়াই ঔষধ দিয়াছ। অভাব বুঝিয়াই উপায় করিয়াছ। তুমি যে বর্ত্তমান সময়ে কি আশ্চর্য্যরূপে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছ, তাহা পৃথিবী এখন বুঝিল না, পরে বুঝিবে। হে দয়াল, বেদ বেদান্তের সময় কি কঠিন ব্রহ্মজ্ঞান ছিল! পৌত্তলিকতার সময় কি বিকৃত ব্রহ্মজ্ঞান ছিল! কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগকে তুষ্ট করিবে বলিয়া ফরমাশ্ দিয়া মর্ত্তে প্রেরণ করিলে। যত রকম দেবতা কল্পনা হয়েছে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম যে দেবতা, তাই তুমি প্রেরণ করিলে আমাদের মধ্যে। তুমি নিরাকার পবিত্র তেজোময়, অথচ জননীরূপে দেখা দিলে। আমরা যে ধন পেয়েছি, এমন কেহ পায় নাই। অভাব বুঝে তুমি উপায় করিলে। বার বার তোমাকে প্রণাম করি। নববিধানের সময় বিশেষ দয়া করিয়া, বিশেষ মূর্ত্তিখানি পাঠাইলে। শিক্ষিত অশিক্ষিতের প্রভেদ রহিল না, যুবা বৃদ্ধের ভিন্নতা রহিল না। লোকভয়, শাস্ত্রভয় রহিল না। একি জীব তরাইবার বিশেষ আয়োজন নয়? জগদীশ, এই ঘরে বসিয়া ভাল করিয়া সাধন করি আর না করি, পুণ্যাত্মা হই আর না হই, শাস্ত্র পড়ি আর না পড়ি, একবার "মা" বলিয়া ডাকিলেই তুমি আসিয়া দেখা দিয়াছ। কৃপাসিন্ধু, তোমার এই সুমিষ্ট নামটি আমাদের প্রতিদিনের সাধন ভজনের বস্তু করিয়া দাও। সহজে 'মা' বলে তোমার স্তন পান করিতে পারি, সহজে কষ্ট বিপদে তোমায় ডাকিয়া শান্তি পাইতে পারি, সহজে তোমার চরণ ধরিয়া ডাকিতে পারি। মা, তোমার বিশেষ দয়া দেখিলাম, তোমার এই মাতৃরূপে। এমন সহজে তুমি আর কোন্ সম্প্রদায়ের কাছে দেখা দিয়াছ? এক আধজন এদিক ওদিকে এইরূপে তোমায় দেখিয়াছে। কিন্তু কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যেত এই মত দেখি নাই? কি শুভক্ষণে আমরা আসিয়াছি! কি সৌভাগ্য আমাদের! রোগে শোকে পাপে তাপে মলিন হইয়াও, এমন ধন পাইয়াছি। হে কৃপাসিন্ধু, হে গতিনাথ, কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন, আমাদের প্রতি তোমার বিশেষ কৃপা দেখিয়া, তোমার চরণে পড়িয়া, তোমার কৃতজ্ঞতা-ঋণ শোধ করিতে চেষ্টা করি, মা, তুমি আজ গরিবদিগকে দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ! শান্তিঃ!

[দৈনিক প্রার্থনা, কমলকুটীর, ৬ষ্ঠ ভাগ]

—০—

মাতৃভাব

নূতন যুগে নববিধানে ভক্তিযোগের পরাকাষ্ঠা মাতৃভাবে। বিশেষ বিশেষ সময়ে, পৃথিবীস্থ নরনারীর বিশেষ বিশেষ অভাবমোচনের জন্য, ঈশ্বর স্বর্গ হইতে এক একটী নূতন ভাব প্রকাশ করেন। নবযুগে মাতৃভাব বিধাতার বিশেষ বিধান। ঈশ্বরের মাতৃত্ব, নরনারীর শিশুত্ব এই বিধানের নূতনত্ব। ঘরে ঘরে মার কোলে শিশুদের দেখি; শিশুর সহজ সরল ধর্ম্ম কি, তা কথঞ্চিৎ বুঝি। আমরা যখন শিশু ছিলাম, তখন শিশুত্ব যে কি মধুর, স্বর্গীয়, তা বুঝি নাই। শিশুত্ব অতিক্রম করিয়া যখন যৌবনে পদার্পণ করিলাম, তখনই কথঞ্চিৎ বুঝিলাম, শিশুত্ব যে কি অপার অপার্থিব স্বর্গীয় সামগ্রী। তখনই মনে হল, মার কোলের সরল শিশুর মত নির্ভয়, নিশ্চিন্ত থাকিলে এ জীবনটা বড়ই সুখের ও আনন্দের হইত।

মার কোলে শিশু বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি। পৃথিবীতে যত সৃষ্টি হইয়াছে, তন্মধ্যে এতদপেক্ষা উচ্চতম মহত্তম সৃষ্টি আর কিছুই মনে হয় না। ইহার ভিতরে কি গভীরতম আধ্যাত্মিকতত্ত্ব নিহিত আছে, মানবজীবনের কি উচ্চতম আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছে, মানবধর্ম্মের কি মহত্তম প্রকাশ হইয়াছে, ভাবিলে বিস্ময়াপ্লুতচিত্তে বিধাতার চরণে শত শত ধন্যবাদ দিতে প্রাণ স্বতই অগ্রসর হয়। মাতৃত্বে ও শিশুত্বে কি অচ্ছেদ্য যোগ! মা শিশু ছাড়া থাকতে পারেন না, শিশুও মাছাড়া হয়ে থাকতে পারে না। মার প্রাণের ভিতর শিশুর প্রাণ, শিশুর প্রাণের ভিতর মার প্রাণ; এমন ওতপ্রোত ভাব আর কোথায় দেখা যায়? শিশুর সম্পূর্ণ নির্ভর মায়ের উপরে, মারও সম্পূর্ণ আত্মদান শিশুর উপরে। ভক্তি-ধর্ম্মের এমন সারতত্ত্ব আর কোথায় প্রকাশিত হইয়াছে? বিশ্বাস, প্রেম, ভক্তির চরমোৎকর্ষ শিশুত্বের মধ্যে, আর আত্মভোলা উদার সরল হৃদয়ের প্রাণঢালা ভালবাসা মাতৃত্বের মধ্যে।

'মার কোলে শিশু' নবধর্ম্মের নূতন প্রতীক। মানবাত্মার নূতন ধর্ম্ম কি, নূতন সাধনা কি, নূতন সিদ্ধি কি, তাহা ইহার ভিতরে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত। আমরা পৃথিবীতে মার কোলে শিশু হইয়া আসিয়াছি, এই জন্য যে, পরমজননীর ক্রোড়ে শিশু হইয়া উত্থান করিব এবং অনন্তকাল অনন্ত স্নেহময়ী জননীর ক্রোড়ে শিশু হইয়া থাকিব। পৃথিবীতে জড় শরীরের শিশুত্ব নিয়া আসিয়াছি, আত্মার শিশুত্ব নিয়া পরমজননীর ক্রোড়ে আরোহণ করিব। পার্থিব শিশুত্ব দু'দিনের, ক্ষণিক, কিন্তু আত্মার শিশুত্ব নিত্য ও অনন্ত। সাকার জড় শরীরের যে শিশুত্ব, তা ক্রমে বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে, প্রৌঢ়ে ও বার্দ্ধক্যে পরিণত হইয়া মৃত্যুর অধীন হয়: কিন্তু নিরাকার আত্মার শিশুত্বের অবসান হয় না, আত্মা ক্রমে আরও শিশু, আরও শিশু হইয়া, মার কোলে অনন্ত শিশুত্বের ধর্ম্ম, অমরত্বের ধর্ম সাধন করে। শিশুত্বে জীবনের আরম্ভ, শিশুত্বে জীবনের পরিণতি। ভক্ত তাই বলিলেন, "মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে যেমন ইহজীবনের ক্ষুদ্র অংশ এবং মনুষ্যশরীর যেমন ক্ষুদ্র জরায়ু মধ্যে প্রস্তুত হইয়া সংসারে অবতীর্ণ হয়, আমাদের আত্মাও সেইরূপ শৈশবাবস্থায় এই ক্ষুদ্র সংসারে কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া, বৈরাগ্যসহকারে পরলোকের জন্য প্রস্তুত হয় এবং অনন্ত জীবনের যোগ সাধন করে।"

বৈরাগ্য কি? দীনতা, অকিঞ্চনতা, প্রবল অনুরাগ ও সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা; এই বৈরাগ্যে মৃত্যুভয় চলিয়া যায়, অনন্ত জীবনের আভাস প্রাণে উপস্থিত হয়। ভক্ত ব্রহ্মানন্দ এই বৈরাগ্য-সম্বন্ধে বলিলেন, "বৈরাগ্য মৃত্যুকে বিনাশকরতঃ, ইহলোক ও পরলোককে একত্রীভূত করিয়া অনন্তজীবনের স্রোত অসীমরূপে প্রসারিত করে। ইহার নিকট এ জীবন অনন্ত জীবনের এক ক্ষুদ্র কণা বলিয়া প্রতীয়মান হয়, ইহা অনন্ত সাগরের একটি তরঙ্গমাত্র।" শিশুর মত বৈরাগী আর কে? শিশুর মাই একমাত্র সম্বল। মার কোলই শিশুর একমাত্র আশ্রয়, মাতৃস্তন্যই শিশুর আহার পান। ক্ষুধা পেলে শিশু "মা মা" বলে কাঁদে; শিশু আর কিছুই জানেনা। সরল শিশুর একমাত্র সাধনা কান্না। ঘুম পেলে শিশু মার কোলেই ঘুমোয়। শিশু মা-সর্ব্বস্ব; মাও শিশুসর্ব্বস্ব। শিশুর কান্না শুনলে মা সকল কাজ ছেড়ে দৌড়ে আসেন এবং শিশুকে ক্রোড়ে ধারণ করেন।

পৃথিবীতে শিশুত্ব নিয়া যখন আসিয়াছিলাম, তখন কান্নাই একমাত্র সম্বল ছিল। পরিণামে আত্মা যখন শিশুত্ব লাভ করে, তখনও সেই কান্না বা প্রার্থনাই জীবনের সম্বল হয়। ভক্ত শিশু তাই প্রার্থনা ভিন্ন আর কিছুই জানেন না। আত্মার শিশুত্বই ভক্তিধর্ম্মের সারতত্ত্ব।

কান্না বা প্রার্থনাই ভক্তিধর্ম্মের পরম সাধনা। শিশুর কণ্ঠের আদি শব্দ "মা"; মা নাম শিশুর কণ্ঠহার। শিশু সদাসর্ব্বদা এই মা মা বলিয়াই ডাকে: যে মা নাম প্রথম কণ্ঠে পেয়েছিলাম, এখন দেখিতেছি, সেই মা নাম চির জীবনের সম্বল। "মা" নামে কি যে মিষ্টতা মধুরতা, শৈশবে তেমন বুঝি নাই, সহজ সরল ভাবে স্বভাবের নিয়মে 'মা' বলে ডেকেছি; এখন সে মা নামে যে কি মিষ্টতা, মা নাম যে কি মধুমাখা, মা নাম যে কি সরস ও মধুর, তা কথঞ্চিৎ বুঝতে পেরেছি। এখন বুঝতে পারছি, মা বলে ডাকবার অধিকার কি চমৎকার। সত্যই এমন মধুমাখা মা নাম কোথায় ছিল, কে আনিল? এমন জীব তরাবার উপায় তো কোন যুগে ছিল না। মা নাম করতে কোন সাধন ভজনের প্রয়োজন হয় না; নরনারী, পাপী সাধু, বালক বৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে সকলেই মা বলে ডাকবার অধিকারী। এমন সহজ সরল মা নাম এসেছে আমাদের পরিত্রাণের জন্য।

যিনি ব্রহ্ম, তিনিই নূতন যুগে অনন্তগুণধারিণী, ভুবন-মোহিনী, ভক্তচিত্তহারিণী মা হয়ে এসেছেন। শিশু করে আমাদিগকে পৃথিবীতে এনেছিলেন, অনন্তকাল শিশু করে তাঁর কোলে রাখবেন বলে। নববিধান অনন্ত শিশুত্বের ধর্ম্ম। শিশু হইয়া অনন্তকাল পরমজননীর ক্রোড়ে থাকিব। ভক্ত ব্রহ্মানন্দ নববিধান-শিশুত্ব লাভ করিয়া নববিধান-শিশুর জন্মের কথা ঘোষণা করিয়া গেলেন। শিশুর কাছে সবই সমান, সবই নূতন। আমরা এই শিশুর কাছে সামঞ্জস্যের ধর্ম্ম, মহামিলনের ধর্ম্ম, নিত্য নূতনত্বের ধর্ম্ম শিক্ষা করি। ভক্ত চিরঞ্জীবের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া এই প্রার্থনাই করি:—

"কবে সহজে মা বলে' জুড়াব প্রাণ। (দয়াময়ী গো) এমন কি আছে যেমন মিষ্ট মায়ের নাম।

আমি পারি কি তোমায় ছেড়ে, থাকিতে এ সংসারে, আছে তোমার সঙ্গে যে আমার প্রাণের টান।

শিশু ছেলের মত, ডাকিব নিয়ত, করবো কোলে বসে' স্তন্যসুধা পান; এবার পূজিব মায়ের চরণ, হেরিব মায়ের আনন, (বড় সাধ গো) এবার গাইব বদন ভরে' মায়ের নাম ॥"

—•—

ধর্ম্মতত্ত্ব

"মা" নাম

"বালকের খেলার ঘরই মোক্ষধাম। তাহার প্রথম পরিচয় 'মা' বলিয়া ডাকা। পূর্ণ যোগী, পূর্ণ ভক্তও মার চরণে নমস্কার করেন। মা অপেক্ষা মিষ্টতর শব্দ নাই। সর্ব্বাগ্রে শিশু মার মুখ দেখে, মার স্তনের দুগ্ধ পান করে। শিশু জানিল, মা আছেন। সম্পর্ক কেবল মার সঙ্গে। শিশুর পরম ধন একমাত্র মা। তার পর শিশু বড় হইল, অনেক দেশ বেড়াইল। শেষে বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া সেই বৃদ্ধ এই সার বুঝিল, সেই শিশুবেলা যাহাকে ডাকিয়াছি, তিনিই সত্য। এই বলিয়া মার নাম সাধন করিতে লাগিল। দয়াময় নাম অপেক্ষা মা নাম মিষ্টতর। যে স্তনের সুধা পান করিয়া সকলে বাঁচিয়া আছে, সেই সুধা পরম পিতার নামে নহে, মার নামে।"

(কেশব)

—

কবে মার ভক্ত হইব?

"ব্রাহ্মগণ, কবে তোমরা মার ভক্ত হইবে? ব্রহ্মজ্ঞানীর কঠোর সাধন হৃদয়কে নির্য্যাতন করে, মনকে চাবুক মারে। অতএব তোমরা কোমলহৃদয় হইয়া মা বলিয়া জগদীশ্বরীকে ডাক। তোমাদের দেব যিনি, দেবীও তিনি; তোমাদের পিতা যিনি, তোমাদের মাতাও তিনি। তোমরা হিন্দুসন্তান, তোমাদের কোমল হৃদয় মাকে দেখিবার জন্য কাঁদিতেছে। মার অন্তঃপুরে গমন কর। মার অনন্ত স্তন হইতে অনন্ত প্রেমসুধা বাহির কর। আমাদের প্রচারের মূল মন্ত্র মা। বঙ্গদেশের জননী, ভারতের জননী, বিশ্বের জননী আমাদের জননী। সেই জননীর প্রেমে আমরা উন্মত্ত হইব। বসিব জননীর ক্রোড়ে, গাইব জননীর গুণ, মাথা রাখিব জননীর চরণতলে। জননী ভিন্ন এই বৃদ্ধ বালকদিগের আর কেহ নাই। মার মত আর কেহ নাই, বৃথা কেন যাও ভাই অন্য ঠাঁই? সকলে বলে, পুরুষের অপেক্ষা নারীর রূপ অধিক। সেইরূপ ঈশ্বরের পিতার ভাব অপেক্ষা তাঁহার মাতার ভাব অধিক সুন্দর। অতএব মার প্রেমে বশীভূত হইয়া, দয়াময় ঈশ্বরকে দয়াময়ী ঈশ্বরী জানিয়া, যেন আমরা তাঁহার শ্রীচরণতলে চিরদিন বাস করি।" (কেশব)

—•—

ব্রাহ্ম পরিবার *

(আচার্য্যের উপদেশ ; ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৩ খ্রীঃ)

নিরাকার যাহাদের ঈশ্বর, তাহাদের পরিবার সাকার, না নিরাকার ? যখন আমরা ব্রাহ্ম বলিয়া জগতে পরিচয় দিতেছি, সকলেই ইহা জানে যে, আমাদের ঈশ্বর নিরাকার। তাঁহার রূপ নাই, আকার নাই, চক্ষু তাঁহাকে দেখে নাই, এবং কখনও দেখিতে পাইবে না। হৃদয়ঙ্গম করিতে পারুক বা না পারুক, পৌত্তলিক জগৎ জানে যে, ব্রাহ্মদিগের ঈশ্বর নিরাকার, এবং পৃথিবীর সমুদয় সাকার এবং কল্পিত দেবতা হইতে ভিন্ন। কোন মৃত্তিকা কিম্বা পাষাণ অথবা কোন ধাতুনির্ম্মিত বিগ্রহের নিকট ব্রাহ্মেরা মস্তক নত করিতে পারেন না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আমাদের ঈশ্বর যেমন নিরাকার, আমাদের পরিবারও কি সেইরূপ নিরাকার ? নিরাকার ঈশ্বরকে নিরাকার ভাবে পূজা করিতেছি, নিরাকার ভাবে তাঁহার সেবা করিতেছি, তিনিও আমাদের নিরাকার ভক্তি প্রেম গ্রহণ করিয়া গোপনে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার আজ্ঞানুসারে যখন জনসমাজে কার্য্য করিতে যাই, তখন আকারবিশিষ্ট নরনারীদিগকে কি ভাবে গ্রহণ করিব এবং তাঁহাদের সঙ্গে কিরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করিব ? যে অবধি পৃথিবীর নরনারীর সঙ্গে সম্বন্ধ প্রকৃতিস্থ না হইবে, সে পর্য্যন্ত কাহারও প্রকৃত কল্যাণ নাই। পুরুষ কি ? স্ত্রী কি ? ভাই কি ? ভগ্নী কি ? স্পষ্টরূপে এ সকল না বুঝিলে পরিবার সাধন অসম্ভব।

ঈশ্বরকে নিরাকার বলিয়া স্বীকার করিলে, তাঁহার সন্তানেরা সাকার কি নিরাকার, তাহাও জানিতে হইবে। নতুবা কিরূপে তাঁহার পুত্র কন্যাদিগের সঙ্গে ঠিক সম্বন্ধ স্থাপন করিবে ? ঈশ্বরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয় ত দিনের মধ্যে আধ ঘণ্টা ; কিন্তু অবশিষ্ট সমস্ত দিন পৃথিবীর নর নারীর সঙ্গে বাস করিতেছি। জগতের অধিকাংশ পাপ ঈশ্বরের সম্পর্কে তত নয়, যত নরনারী সম্বন্ধে। কাম ক্রোধাদি রিপু সকল প্রবল এবং দুর্জ্জয় হইয়া কাহাদিগকে পীড়ন করে ? আপাততঃ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তত নয়, মনুষ্য মনুষ্যের বিরুদ্ধে যত পাপাচরণ করে। মন যখন অপবিত্র হয়, রসনা যখন নানা প্রকার জঘন্য এবং দুর্ব্বাক্য বলে, হস্ত যখন পাপ কার্য্যে দূষিত হয়, এবং এইরূপে যখন হৃদয়, মন এবং সমস্ত শরীর পাপ চিন্তা, পাপ বাক্য এবং পাপ কার্য্যে কলুষিত হয়, দেখিবে, তাহার মূলে নরনারীর সঙ্গে দূষিত সম্পর্ক, ইহাই সমুদয় পাপের উত্তেজক। অতএব নরনারীর সঙ্গে যে পরস্পর সম্বন্ধ, ইহা অতি গুরুতর এবং গূঢ় বিষয়। ব্রাহ্মমাত্রই পবিত্রভাবে এই সম্বন্ধ সাধন করিবার জন্য দায়ী। যাঁহারা এ সম্পর্ক জানিয়া নরনারীকে বিশ্বাস করেন এবং তাঁহাদের সেবা করেন, তাঁহারাই ঈশ্বরকে হৃদয়ের মধ্যে ধারণ করেন। কেন না ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁহার সন্তানগণ এমনই গূঢ়রূপে সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছেন যে, তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া কেহই তাঁহাকে ধরিতে পারে না।

যদি হৃদয়নাথ ঈশ্বরকে জীবনের প্রভু বলিয়া পূজা করিতে চাও, তবে তাঁহার আজ্ঞানুসারে পৃথিবীর নর নারীদিগের সেবা করিতে হইবে ; কিন্তু তোমরা দেখিতেছ, সেই নর নারী সকল সাকার ; কাহারও মুখ সুন্দর, কাহারও মুখ কদাকার। আকার মনে হইলেই হৃদয়ে প্রেম, প্রণয় উথলিয়া উঠে। পরস্পরের আকার ভুলিলে মনুষ্য সকলই ভুলিয়া যায়। পৃথিবীতে কি পারিবারিক, কি সামাজিক, রক্ত মাংসের যত সম্পর্ক, সমুদয় সেই আকারগত যোগে নিবদ্ধ রহিয়াছে। মৃত্যুর পর আকার বিলুপ্ত হইলে কিম্বা সেই আকার ভুলিয়া গেলে যে কাহারও সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে, সংসারীদিগের জীবন দেখিলে তাহা বোধ হয় না। আকারবিহীন কাহারও সহিত সম্পর্ক থাকিতে পারে, বিষয়ীরা ইহা মনেও ভাবিতে পারে না ; যাই আকার বিনষ্ট হইল, সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্কও চলিয়া গেল, সংসারের এই রীতি। কিন্তু ব্রাহ্মকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি কিরূপে নর নারীর সঙ্গে যোগ স্থাপন করেন। যদি বলেন, এইরূপ সাকার ভাবে, তাহা হইলে তিনি অব্রাহ্ম। ভাই ভগ্নীদের সঙ্গে ব্রাহ্মের যোগ সম্পূর্ণ নিরাকার ; তাঁহাদের শরীরের মুখ সুশ্রী হউক, আর বিশ্রী হউক, সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই, তাঁহার চক্ষু আত্মার উপর। আত্মাতে আত্মাতে তাঁহার নিগূঢ় যোগ। আত্মার আকার নাই, সুতরাং তাহার যোগও কোন প্রকার আকারমূলক নহে ; যতদিন মনুষ্যের প্রেম কিম্বা অনুরাগ আকারের প্রতি ধাবিত হয়, ততদিন পাপের দাসত্ব, ততদিন ভয়ানক অধর্ম্মের অবস্থা। ধর্ম্মের প্রথম সোপান কি ? নর নারীর সাকার শরীরের প্রতি পবিত্র দৃষ্টি এবং পবিত্র ব্যবহার করা। কিন্তু উচ্চ অবস্থায় যথার্থ ভাই ভগ্নীদের সঙ্গে সম্মিলন। সেই ভাই ভগ্নী কে ? সাকার শরীর নহে ; কিন্তু ঈশ্বর-নির্ম্মিত নিরাকার আত্মা। সেই নিরাকার ভাই ভগ্নী আমাদের স্বর্গীয় প্রেম শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁহারাই ঈশ্বরের পুত্র কন্যা।

ধূলি-নির্ম্মিত দেহ ঈশ্বরের সন্তান নহে। দেহ যে অনুরাগ লয়, তাহা মায়া, তাহা পাপাসক্তি। পৃথিবীর ধূলি-নির্ম্মিত সামান্য চর্ম্মকে আমরা স্বর্গীয় প্রেম দিতে পারি না। পৃথিবীর বস্তু কি স্বর্গীয় প্রেম আকর্ষণ করিতে পারে ? তবে প্রেম ভক্তি কে আকর্ষণ করিতে পারে ? ঈশ্বরনির্ম্মিত সেই স্বর্গীয় বস্তু—নিরাকার, কিন্তু প্রেমপুণ্যশীল আত্মা। স্বর্গই স্বর্গকে আকর্ষণ করে। আত্মা আত্মাকে দেখিতে পায়, আত্মা আত্মাকে

* ব্রাহ্মের পরিবার কিরূপ, পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ কিরূপ, এ সকল বিষয়ে আজকাল ব্রাহ্মগণের চিন্তা বা দৃষ্টি নাই। তাই পরিবার মণ্ডলী ছিন্ন বিচ্ছিন্ন। আচার্য্যদেবের "ব্রাহ্ম পরিবার" উপদেশটী প্রকাশিত করিবার উদ্দেশ্য এই, এ আদর্শে সকলে আবার নূতন করিয়া প্রকৃত পরিবার ও মণ্ডলী-গঠনে প্রবৃত্ত হউন। (সং)

চিনিয়া লয়, আত্মা আত্মার প্রেমে সম্বদ্ধ হয়, এবং আত্মা আত্মার পুণ্যে সুন্দর হয়। এই নিরাকার আশ্চর্য্য আধ্যাত্মিক যোগ ব্রাহ্মদিগের। তবে যদি তোমরা এই কথা বল যে, তোমরা সাকার ভাই ভগ্নীদিগকে এবং সাকার পিতা মাতাকে যেমন ভালবাস, এখনও কোন নিরাকার আত্মাকে তেমন ভালবাসিতে শিখ নাই; তবে ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া তোমাদের গৌরব কি? সংসারী লোকদের হইতে তবে তোমাদের ভিন্নতা কি? যাহাদের সঙ্গে রক্ত মাংসের যোগ, তাহাদিগকে ভালবাসা নিকৃষ্ট: কিন্তু শরীরের সঙ্গে যাহাদের কোন সম্পর্ক নাই, তাহাদিগকে ভালবাসাতেই মনুষ্যত্ব, সেই ভালবাসাই চিরস্থায়ী, এবং তাহাই ব্রাহ্মের লক্ষ্য।

নিরাকার ভাই ভগ্নীদের ভালবাসা এবং প্রাণপণে তাঁহাদের আত্মা পরিপুষ্ট করাই আমাদের জীবনের কার্য্য। পরলোকে কাহারও শরীর সঙ্গে যাইবে না। অতএব, ভ্রাতৃগণ, ভগ্নীগণ, যদি ঈশ্বরের হইতে ইচ্ছা কর, যদি মৃত্যুর পর অনন্ত জীবনের সম্বল চাও, তবে আকারগত সমুদয় শারীরিক সম্পর্ক বিনাশ করিয়া ঈশ্বরের সন্তান খুঁজিয়া লও। সাকার দেহকে ভাই ভগ্নী বলিয়া আর প্রতারিত হইও না। "ভাই বন্ধু যত হয়, কেবল পথের পরিচয়, ও মন কেহ কারও নয়।" এই কথা কেবল এই সাকার শরীরের সম্পর্কেই বলা হইয়াছে: কিন্তু যিনি যথার্থ বন্ধু, তাঁহার সঙ্গে বিচ্ছেদ নাই; যেথানে যাও, কি দূর দেশে, কি পরকালে, তিনি পিতার চরণতলে বসিয়া আছেন। কোথায় সেই ভাই? কোথায় সেই বন্ধু? লুক্কায়িত, নিরাকার, অতীন্দ্রিয়; এই চক্ষু তাঁহাকে দেখিতে পায় না, এই কর্ণ তাঁহার কথা শুনিতে পায় না, এই হস্ত তাঁহাকে ধরিতে পারে না। হায় কি ভ্রম! ঈশ্বরের সন্তান কোথাও দেখিলাম না, দেহকেই এতকাল ভাই ভগ্নী বলিয়া আলিঙ্গন করিলাম। পৃথিবীর উপকরণ লইয়া কি ঈশ্বরের সন্তান নির্ম্মিত হয়? অনন্তকালবাসী অমরাত্মা যাঁহার পুত্র কন্যা, এই ধূলি-নির্ম্মিত চক্ষু কর্ণ কি তাঁহাদিগকে লাভ করিতে পারে? বন্ধুগণ, এই যে মন্দিরের মধ্যে তোমরা শত শত সাকার দেহ দেখিতেছ, তোমরা কি জান না যে, এ সকল ব্রহ্মসন্তান নয়। কিন্তু এ সমুদয় শরীর খনন করিয়া স্তরে স্তরে নামিয়া যাও, এই সাকার ভাই ভগ্নীদের জীবনের গভীরতম নিম্নতম ভূমিতে অবতীর্ণ হও, দেখিবে, সেথানে ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বরের কন্যা বিরাজ করিতেছেন—এই চক্ষু সেথানে যায় না, এই হস্ত সেই বস্তু ধরিতে পারে না। সেই নিরাকার ভাই ভগ্নীদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকৃতি, তাঁহার অরূপরূপমাধুরী দেখিলে মোহিত হইবে। সেই সৌন্দর্য্যের তুলনা নাই। তিনি আপনার রূপলাবণ্য দিয়া আপনার পুত্র কন্যাদের গঠন করিয়াছেন। সেই শোভা দেখিলে কি আর ধূল-নির্ম্মিত মুখশ্রী সুন্দর বলিয়া বোধ হয়? সংসারী অপেক্ষা যাঁহারা উন্নত এবং পবিত্র, তাঁহারা সাধুর মুখে ঈশ্বরের পুণ্যপ্রভা এবং সাধুতা দেখিয়া মুগ্ধ হন; কিন্তু তাহাও অশ্রেষ্ঠ এবং অল্পকাল স্থায়ী। ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা শরীর ভেদ করিয়া আত্মার মধ্যে প্রবেশ করেন, এবং সেথানে প্রেম ভক্তির বস্তু সকল দেখিয়া গোপনে ঈশ্বরের পদতলে প্রেম ও কৃতজ্ঞতার অশ্রু বিসর্জ্জন করেন।

যখন ব্রহ্মরাজ্যের ভাষা বলিব, যখন তাঁহার সিংহাসনতলে দাঁড়াইয়া ভাই ভগ্নীদিগের হিসাব দিব, তখন কোন ভাই কিম্বা কোন ভগ্নীর নাম গ্রহণ করিলে সেই নামের এই অর্থ হইবে যে, তাঁহার শরীরের অন্তর্গত সেই ভ্রাতৃভাব অথবা সেই ভগ্নীভাব পূর্ণ বিশেষ আধ্যাত্মিক পদার্থই ঈশ্বরের পুত্র এবং ঈশ্বরের কন্যা। যদি সেই পদার্থ না চিনিয়া থাক তবে ঠিক পাত্রে তোমাদের প্রেম পড়ে নাই। অতএব সাবধান হইয়া ঈশ্বরের পুত্র কন্যাদিগকে চিনিয়া লও। এই ব্রত সাধন করিতে না পারিলে পরিত্রাণ নাই। শরীরকে ভালবাসে কে? ঈশ্বরের শত্রু! আত্মাকে ভালবাসে কে? ব্রহ্মসন্তান। মুখ দেখিয়া ভালবাসা পশুত্ব। সুন্দর পুরুষ, কি সুন্দরী স্ত্রীকে কে না ভালবাসিতে পারে? কিন্তু ব্রাহ্ম তিনি, যিনি বাহিরের সমুদয় সৌন্দর্য্য ভুলিয়া গিয়া আত্মার প্রেমে মুগ্ধ হন। ব্রহ্মকে নিরাকার জানিয়া যেমন তাঁহাকে প্রেম করিবে, তেমনই তাঁহার সন্তানদিগকে নিরাকার জানিয়া প্রাণের সহিত তাঁহাদিগকে ভালবাসিবে। ভাই কিম্বা ভগ্নীর মাধুর্য্য সে দিন দেখিব, যে দিন সাধন করিয়া তাঁহাকে মনে হইলেই তাঁহার ভক্তি বিনয় ইত্যাদি কেবল আধ্যাত্মিক পদার্থ সকল মনে হইবে, শরীর মনে থাকিবে না; কেবল তাঁহার মধ্যে যে ব্রহ্মসন্তান এবং আমার মধ্যে যে ব্রহ্মসন্তান, এই দুই জনের পরস্পর সাক্ষাৎ যোগ এবং এই দুই জনের মধ্যে পরস্পর সদালাপ হইবে। ভগ্নীগণ, আমরা তোমাদিগকে চিনিলাম না, তোমরা আমাদিগকে চিনিলে না। নিকৃষ্টভাবে জীবন গেল। চর্ম্ম দেখিতে দেখিতে দিন শেষ হইল। পরলোকের সম্বল হইল না। পরলোকে যে বস্তু যাইবে তাহা পাইলাম না। এইজন্য বলিতেছি, মনুষ্যের শরীর এবং বাহ্যিক আড়ম্বর ভেদ করিয়া, ঈশ্বরের পুত্র কন্যার সঙ্গে নিরাকার ভাবে, সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ভাবে সম্মিলিত হও। শরীরের সৌন্দর্য্য ভুলিয়া গিয়া নর নারীর আধ্যাত্মিক প্রেমকে প্রেম কর। তাঁহাদের নিরাকার পবিত্র ভাব গ্রহণ কর; এবং পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্র, ভ্রাতা ভগ্নী, বন্ধু বান্ধব সকলের মধ্যে যে ঈশ্বর সন্তান আছেন, তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দে ব্রহ্মরাজ্যে চলিয়া যাও। যখন এইরূপে ঈশ্বরের সেই নিগূঢ় নিরাকার আধ্যাত্মিক পরিবারে প্রবিষ্ট হইবে, তখন সাধ্য কি কোন পুরুষ কিম্বা কোন স্ত্রীলোককে দেখিলে অপবিত্র ভাব উত্তেজিত হয়। আর বিলম্ব করিও না, শীঘ্র ভ্রাতা ভগ্নীর আবিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হও। বাহিরের সম্পর্ক ভুলিয়া যাও। পিতা যেমন নিরাকার, তাঁহার পুত্র কন্যারাও নিরাকার। ব্রহ্মোপাসনা যেমন তোমাদের আনন্দকর হইয়াছে, এই নিরাকার পরিবারের সেবাও ব্রহ্মকৃপায় তোমাদের আনন্দজনক হউক।

—০—

ধন্য কে ?

(খ্রীষ্টের "পর্ব্বতশিখরে উপদেশ" অনুসরণে)

১। ধন্য সে, যাহার আত্মাতে পরমাত্মার দর্শনলাভের জন্য আকুলতা জাগিয়াছে; কারণ তাহার পক্ষে ঈশ্বরের দর্শনলাভ সুনিশ্চিত। আকুল আত্মাতেই পরম পুরুষ সমুজ্জল মূর্ত্তিতে প্রকাশ পান।

২। অপূর্ণ মানবের পক্ষে পাপাচরণ করা কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নয়; কিন্তু ধন্য সে, যে পাপাচরণ করিয়া যথার্থ অনুতপ্ত হয়, কারণ তাহার অন্তরে শান্তিদাতা নিশ্চয়ই শান্তির অমৃতধারা বর্ষণ করিবেন।

৩। ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ। ধন্য সে, যে ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করে, কারণ ধর্ম্ম তাহাকে নিশ্চয়ই আশ্রয় প্রদান করিবে এবং সর্ব্ববিধ দুঃখ বিপদ হইতে রক্ষা করিবে।

৪। "জীবে দয়া" মন্ত্রের সাধন কর। ধন্য সে, যে সর্ব্বভূতে দয়া প্রকাশ করে, কারণ তাহারও প্রতি সকল প্রাণী দয়া প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারে না।

৫। ধন্য সে, যে বিনয়-বিনম্র। বিনয়ের দ্বারা অনেকে রাজ্য লাভ করিয়াছে, এবং অবিনয়ের ফলে অনেক রাজ্যের ধ্বংসসাধন হইয়াছে।

৬। ধন্য সে, যে পবিত্র ও বিশুদ্ধচিত্ত, কারণ তাহারই আত্মাতে শুদ্ধমপাপবিদ্ধং পরমেশ্বরের সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত।

৭। ধন্য সে, যে বিবাদিগণের মধ্যে শান্তি সংস্থাপন করে। শান্তিসংস্থাপকেরাই শান্তস্বরূপ ঈশ্বরের প্রকৃত সন্তান।

৮। ধন্য সে, অপ্রতিম পরমাত্মাকে সযত্নে অন্তরে ধারণ করিবার কারণে যাহাকে অযথা নিন্দাভাজন হইতে হয় এবং মিথ্যা গালি ও দুর্ব্বিষহ অত্যাচার সহ্য করিতে হয়। উহাতে দুঃখের কোন কারণ নাই, বরঞ্চ আনন্দেরই যথেষ্ট কারণ আছে। মঙ্গলবিধাতা ভগবানের মঙ্গলবিধানে তাহার ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গললাভ সুনিশ্চিত। স্মরণ রাখিও, ইতিপূর্ব্বে যে সকল ব্রহ্মবাদী মহাপুরুষের তিরোভাব হইয়াছে, তাঁহাদিগকেও জীবণ নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

—•—

কেশবচন্দ্র ও তাঁহার অধীতব্য জীবন

বিগত ১৬ই চৈত্রের ধর্ম্মতত্ত্বে আমাদিগের নববিধানবিশ্বাসী প্রাচীন বন্ধু ডাক্তার কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ও তাঁহার ধর্ম্ম" প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সমগ্র বিশ্বাসী জগতের অধীতব্য। কোন মহাপুরুষের জীবনী স্বকপোল-কল্পিত ভাষা অথবা বিবিক্ষা-শূন্য পোষিত মত ও তাদৃশ ভাবের দ্বারা অভিব্যক্ত হইতে পারে না। সমস্তই অধ্যয়ন (study) ও গবেষণা (research) সাপেক্ষ। নিউটন যে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ (Gravitation of the earth) বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উপর স্থির করিলেন, তাহা তাঁহার একদিনের সিদ্ধান্ত নহে। তাঁহাকে এই পতন-নিয়ামক বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতে হইয়াছে। সকল বিষয়ে অন্তর্দর্শন (Introspection) ও পূর্ব্বদর্শন (Retrospection) প্রভৃতি বৃত্তির পরিচালনার প্রয়োজন। বঙ্গের মনীষা-সম্পন্ন সুপণ্ডিত ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় ভক্ত কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের বিশ্বাসী মণ্ডলীর গঠিত Parliament of Religions সভায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার অধ্যয়ন-সাপেক্ষ নহে। কেশবচন্দ্রের ভিতর হইতে যে উন্মেষিত নবতত্ত্ব আসিয়াছিল, তাহাই বিশ্বাসী মণ্ডলীর প্রথম অধীতব্য বিষয়। পক্ষিমাতা তাহার প্রসূত অণ্ডের উপর কিছুদিন পক্ষ বিস্তার করিয়া যে তাপ বিধান করে, সেই তাপে কঠিন আবরণ বিস্ফারিত হইয়া পক্ষিশাবকের জন্ম হইয়া থাকে। কোন নূতন তত্ত্ব বাহির করিতে হইলেই সেইরূপ তাপবিধান (Incubation) এর প্রয়োজন। কেশবচন্দ্র তাঁহার প্রাপ্ত সত্যকে নববিধান বলিলেন কেন, ইহা বুঝিতে হইলে গবেষণার প্রয়োজন। অনেক স্তব স্তুতি ও প্রার্থনার ভিতর দিয়া যাহা আসে, তাহাই বিধাতার নববিধান। খ্রীষ্টের বিধানকে বিশ্বাসী জগৎ কেন New Testament বলিয়া বুঝিলেন, তাহাও অধ্যয়নসাপেক্ষ। কেশবচন্দ্রের জীবনের উপক্রমণিকা অধ্যয়ন না করিলে, তাহার ভিতর হইতে প্রসূত নবতত্ত্ব বুঝা কঠিন। আমাদের বিশ্বাসী কামাখ্যাবাবু তাঁহার প্রবন্ধে যাহা বিবৃত করিয়াছেন, তাঁহার সে বিবৃতির সমীচীনতা চিন্তাশীলের চিন্তা-সাপেক্ষ। তাঁহার জীবনের নূতনত্ব কোন গ্রন্থ ও কোন মানব গুরুর শিক্ষা ও দীক্ষা সাপেক্ষ নহে। ইহা তাঁহার ভিতরে বিধাতার নূতন বিধান। তিনি তাঁহার নবালোক প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে গ্রন্থ ও গুরুবিহীন অবস্থায়, বিধাতার অব্যবহিত সান্নিধ্য অনুভব করিয়া সেই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ব্রহ্মের উপাসনায় বসিলেন এবং তাঁহার গভীর চিন্তা (meditation) ও গভীর একাগ্রতার (concentration এর) ভিতর সেই অশব্দ ব্রহ্মের "প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর" এই শব্দ শ্রবণ করিলেন, এবং সেই শব্দের অনুসরণ করিয়া প্রতিদিনের জীবনে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই শব্দ-ব্রহ্মই তাঁহার শাস্ত্র হইল। এই "প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর" শব্দই তাঁহার আলোক (light) ও তাঁহার নেতৃত্ব (Leading) রূপে তাঁহার জীবনকে এক নূতন পথে অগ্রসর করিতে লাগিল। তিনি তাঁহার "জীবনবেদে" তাঁহার জীবনের উন্মেষ-শাস্ত্র যাহা ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, সে শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিলে কেহই তাঁহার জীবনতত্ত্ব বুঝিতে পারিবেন না। কেশবপদের অনুগামী ভক্ত প্রতাপচন্দ্র তাঁহার

রচিত "Life and Teachings of Keshub Chunder Sen" পুস্তকের পরিশিষ্টে সেই জীবনবেদের আভাস ইংরাজীতে লিখিয়া গিয়াছেন। আমি যখন পুরাতন ত্রিহুত প্রদেশে অবস্থান করিতেছিলাম, তখন সেই প্রদেশে প্রাচীন খৃষ্টভক্ত রেভারেণ্ড জ্যাক্‌সন সেই পুস্তক পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন, "Keshub was a wonderful man. The Epiphany of his life is so Raliedosnic." তিনি অজস্র Railway Institute এ কেশবচন্দ্রের জীবনতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার সঙ্গে আলোচনা করিতে করিতে ঐ কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহার সে কথা আমার হৃদয়ে জাগিতেছে। বাইবেল পুস্তকের "Genesis" অধ্যয়ন না করিলে কেহই ঐ পুস্তকের Exodus আরম্ভ করিতে পারে না। সুপণ্ডিত শীল মহাশয়ের সর্ব্বাগ্রে কেশবজীবনের Genesis পাঠ করা উচিত। ধর্ম্মসমন্বয়মত (Harmony of Religions) তাঁহার ভিতরের আলোকের পরবর্ত্তী পরিস্ফুট আলোক। সাধনের পথে চলিতে চলিতে তিনি ধর্ম্মের মহামিলন দেখিলেন। ভাসমান তরী গঙ্গার স্রোতে আসিতে আসিতে দেখিতে পায় যে, একই স্রোত অন্যদিক হইতে সমাগত স্রোতের সঙ্গে মিশিয়া, এক প্রশস্ত স্রোতে পরিণত হইয়া, অসীম সাগরবারিতে মিলিয়া গিয়াছে। এই স্রোত সেই সাগর-সঙ্গমে শতমুখী হইয়া সেই অতলস্পর্শ সাগরজলে মিলিয়া গিয়াছে। সাধকের জীবনস্রোতও সেইরূপ। ভক্ত কেশব তাঁহার সাধিত বিবেক, বৈরাগ্য, বিশ্বাস এবং প্রেমপুণ্য লইয়া এক অগাধ ব্রহ্মসত্তার ভিতরে পড়িয়া গিয়াছিলেন। সাধক ব্যতীত সাধনের স্রোত কেহই দেখিতে পায় না। এক হিমালয়ের ভিতর হইতে বহু স্রোত বিনির্গত হইয়া চলিতে চলিতে এক স্রোতে পরিণত হইয়াছে। দিদৃক্ষু ব্যতীত প্রকৃত দর্শন সম্ভব হয় না। কেশবজীবনের আরম্ভিকা অর্থাৎ মূলতত্ত্ব সর্ব্বাগ্রে অধীতব্য। প্রত্যাদেশ (Inspiration) ও তাঁহার ভিতরে আলোক প্রকাশ (Revelation) এই দুই বস্তু অধ্যয়ন না করিলে কেহই তাঁহার জীবনপথ বুঝিতে পারিবেন না। তাঁহার ভিতরে একই বস্তু নানা ভাবে বিকশিত হইয়াছে। এক সূর্য্যরশ্মির প্রভাব আকাশ হইতে বর্ষিত বারিকণার উপরে অদ্ভুত সামঞ্জস্যের সহিত সাতটা রংএ প্রতিফলিত হইয়া একই বস্তুতে পরিণত হইয়াছে। একই ফুল নানা রংএ বিকশিত হয়। নানা জাতীয় পুষ্প হইতে সংগৃহীত পুষ্পরস মধুচক্রে আসিয়া একই বস্তুতে পরিণত হয়। তাই বলিতেছি, ভক্ত ব্রহ্মানন্দ জীবনপথে চলিতে চলিতে এক মহা সমন্বয়স্রোতে সকল যুগের ও সকল ধর্ম্মবিধানের সাধু ভক্ত ও সত্যের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন। তাঁহার এই আধ্যাত্মিক ভ্রমণ অর্থাৎ spiritual peregrinatian এক মহান্ অধীতব্য শাস্ত্র।

উপসংহারে বলিতে আসিলাম, অবশ্য বর্ত্তমানে হিন্দু সাধক পরমহংস রামকৃষ্ণ তাঁহার সাধনার একটা মহান্ দিক আমাদের সমক্ষে রাখিয়া গিয়াছেন। অবশ্য পরমহংসদেব ধর্ম্মসমন্বয় সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তিনি যে এই মহা সমন্বয় ধর্ম্মজীবনে সাধন করিয়াছিলেন, তাহা আমরা অব্যাহতভাবে স্বীকার করিতে পারি না। পরমহংসদেব সাকারের উপাসক, আর কেশবচন্দ্র এক নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক। পৃথিবীতে যেমন উত্তর কেন্দ্রের ব্যবধান, সেইরূপ ধর্ম্মবিশ্বাসে ইঁহাদের ব্যবধান। পরমহংসদেব উপবীতধারী ব্রাহ্মণ পুরোহিতরূপে কালীমূর্ত্তির পূজা করিতেন। আর ব্রহ্মানন্দ কেশব জাতি সম্প্রদায় ভুলিয়া গিয়া কোন্ নিরাকারের পূজায় কোথায় চলিয়া গিয়াছিলেন। অবশ্য উভয় ভক্তই তাঁহাদের আধ্যাত্মিক পথে প্রেম পুণ্যে মিলিয়াছিলেন, কিন্তু ধর্ম্মমতে মিলিতে পারেন নাই। কোন মূর্ত্তি-উপাসকের সমন্বয়সাধন সম্পূর্ণ অসম্ভব।

শ্রীগৌরী প্রসাদ মজুমদার।

—•—

পরমহংস রামকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক সাকার ও নিরাকার উপাসনার তথাকথিত 'সামঞ্জস্য'

(১)

রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয়ের শততম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে গত মার্চ্চ মাসে কলিকাতা টাউন হলে ধর্ম্ম মহাসম্মেলন হয়েছিল; তার প্রথম দিনের অধিবেশনে, এবং কয়েক দিন পরে ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে যুবক-সম্মেলনে, সর্ব্বজন-বরণ্য আচার্য্য ডক্টর সার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় পরমহংস সম্বন্ধে দুইটি বক্তৃতা করেছিলেন। ঐ দুই বক্তৃতার কোনও কোনও অংশের আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। আমি আপাততঃ একটি বিষয়ে কিছু বলতে চাই। বক্তৃতা দুটি মডার্ণ্ রিভিউ পত্রিকার এপ্রিল ও মে সংখ্যায় আচার্য্য শীল মহাশয়ের অনুমোদিত আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

শীল মহাশয় প্রথম বক্তৃতায় বলেছেন যে, পরমহংস রামকৃষ্ণ সাকার ও নিরাকার উপাসনার মধ্যে সামঞ্জস্য করেছিলেন। এই সামঞ্জস্য কিরূপে সম্ভব হয়েছিল, তার ইঙ্গিতস্বরূপ তিনি কিছু দার্শনিক তত্ত্বেরও অবতারণা করেছেন। তাঁর বাক্যগুলির বঙ্গানুবাদ এই :—"তিনি (রামকৃষ্ণ পরমহংস) সত্তাকে নিরুপাধির দিক হ'তে দর্শন করে' সকল উপাধিকে অস্বীকার করেছিলেন; কিন্তু সোপাধির দিক হ'তে তিনি জগজ্জননী কালীকে ও ঈশ্বরের অন্য অন্য মূর্ত্তিকে পূজা করতেন। তিনি সকলের মধ্যে এককে ও একের মধ্যে সকলকে পূজা করতেন। এতে তিনি স্ববিরোধিতা দেখতেন না; বরং পূর্ণতর সত্য দেখতেন। এইরূপে তিনি সাকার ও নিরাকার উপাসনার মধ্যেও সামঞ্জস্য করেছিলেন। তাঁর কাছে জড়ীয় মূর্ত্তির কোনও মূল্য ছিল না; তাতে তিনি ঈশ্বরের প্রকাশ অনুভব করতেন। জড় ও চেতনের

বিরুদ্ধতা তাঁর কাছে ছিল না।"

এই বাক্যগুলিতে শীল মহাশয় পৌরাণিক দেবদেবীর পূজাকে দার্শনিক তত্ত্বের আবরণে মণ্ডিত ক'রে' উপস্থিত করেছেন। দার্শনিক তত্ত্ব (Philosophy) ও পৌরাণিক দেবদেবীর কাহিনী (Mythology) দুই ভিন্ন বস্তু। কিন্তু তিনি এদুইকে একত্র মিশ্রিত ক'রে' বহু লোককে ধাঁধায় ফেলেছেন, এবং ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, প্রচলিত মূর্ত্তিপূজায় উৎসাহ দান করিয়াছেন।

কোনও কোনও দার্শনিক সিদ্ধান্ত করেছেন যে, সর্ব্বসাধারণ যাকে 'জড়' বলে, তা বাস্তবিক চেতনেরই প্রকাশ; সংসারে জড় ব'লে' কিছু নেই, সকলই চেতন। দার্শনিক প্রতিভাসম্পন্ন কোনও কোনও সাধকও কার্যতঃ এই প্রকার উপলব্ধি করেছেন। এইরূপ দার্শনিক ও এইরূপ সাধকদের কাছে জড় ও চেতনের বিরুদ্ধতা ঘুচে' গিয়েছে। তাঁদের দৃষ্টিতে মৃত্তিকা-প্রস্তর, ইট-কাঠ, জল-স্থল, সকলই চিন্ময় বা ব্রহ্মময় রূপে প্রকাশ পেয়েছে। আমরা বেশ বুঝতে পারি, এরূপ কোনও দার্শনিক বা সাধক যদি ঘটনাক্রমে একটি মৃত্তিকানির্ম্মিত বা প্রস্তরনির্ম্মিত মূর্ত্তি দেখতে পান, তা হ'লে অন্য দশটা জড় পদার্থের ন্যায় তাকে চিন্ময় বা ব্রহ্মময়ই দেখবেন: এ পর্য্যন্ত তিনি দার্শনিক জ্ঞানের (Philosophy-র) রাজ্যে আছেন। কিন্তু তিনি যদি ঐ মূর্ত্তিতে পুরাণবর্ণিত কোনও দেবতার আকৃতির সাদৃশ্য দেখে' অপর দশটা পদার্থ হ'তে তাকে বিশেষ মনে করেন, এবং তাতে 'প্রাণ-প্রতিষ্ঠা' ক'রে' তার পূজায় প্রবৃত্ত হন, তা হ'লে কি তিনি দার্শনিক জ্ঞানের রাজ্য ছেড়ে পৌরাণিক বিশ্বাসের (Mythology-র) রাজ্যে গেলেন না? শীল মহাশয় যে দার্শনিক দৃষ্টির কথা বলেছেন, যাতে জড় ও চেতনের বিরুদ্ধতা দূর হ'য়ে যায়, যাতে সকলের মধ্যে এককে ও একের মধ্যে সকলকে দেখা যায়, পৌরাণিক বিশ্বাসের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি?

পরমহংস মহাশয়ের জীবন হ'তেই দু' একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাক। এরূপ বর্ণিত আছে (ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকা, ১৮০৫ শক, ১লা মাঘ) যে, একবার ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় অত্যন্ত অসুস্থ হ'য়ে পড়াতে, পরমহংস উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁর রোগ সারিয়ে দেবার জন্য কলিকাতার সিদ্ধেশ্বরী কালীর কাছে ডাব-চিনি মানত করেছিলেন। অনেক দিন পরে কেশবচন্দ্র পুনরায় অসুস্থ হলে পরমহংস তাঁকে দেখতে গিয়া স্বয়ং সেকথা তাঁর কাছে বলেছিলেন। এখন প্রশ্ন এই, শীল মহাশয়ের বর্ণিত দার্শনিক দৃষ্টি অনুসারে তিনি ত যে-কোনও জড় পদার্থের নিকট আপন প্রার্থনা জানাতে পারতেন; এবং ডাব চিনি দেবার প্রয়োজন মনে করলে, তাও যে কোনও জড় পদার্থের নিকট দিতে পারতেন। কারণ, সকল জড় বস্তুই ত তাঁর চক্ষে সমভাবে চিন্ময় হ'য়ে গিয়েছিল। কালীমূর্ত্তিকে বিশেষ মনে করবার হেতু কি? সে মূর্ত্তির অন্বেষণে আপন স্থান ছেড়ে দূরে যাবারই বা প্রয়োজন কি ছিল? এই কি তার কারণ নয় যে, (১) কালী সম্বন্ধে পুরাণাদিতে যে সব বর্ণনা আছে, সেগুলি তিনি বিশ্বাস করতেন এবং (২) কালী আহার্য্য-পানীয় পেলে সন্তুষ্ট হন ও রোগ সারিয়ে দেন, এরূপ ধারণাও তাঁর ছিল?

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত—একবার আলিপুরের পশুশালায় সিংহ আছে শুনে' পরমহংস মহাশয় সেখানে যেতে ইচ্ছুক হ'লে, আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁকে দক্ষিণেশ্বর হ'তে ঘোড়ার গাড়ীতে কলিকাতায় (সুকিয়া ষ্ট্রীটের মোড় পর্য্যন্ত) নিয়ে গিয়েছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় বর্ণনা করেছেন যে, 'মা দুর্গার বাহন' সিংহকে দেখবেন, এই আনন্দে পরমহংস বালকের ন্যায় অধীর হয়েছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় সেই সাধু পুরুষের যে অকৃত্রিম সরলতার বর্ণনা করেছেন, তা অতিশয় মনোমুগ্ধকর। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, পরমহংস যে কেবল দুর্গা কালীকে ঈশ্বর মনে করতেন তা নয়, সিংহকেও ঈশ্বরের বাহন মনে করতেন। একটি বিশেষ পশুকে সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের বাহন মনে করা—এ কি শীল মহাশয়ের বর্ণিত দার্শনিক দৃষ্টির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়? অতএব, পরমহংস মহাশয়ের সাকার উপাসনার মূলে কোনও দার্শনিক দৃষ্টি নয়, তার মূলে পৌরাণিক দেবদেবীতে বিশ্বাস। তিনি হিন্দুসমাজে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এবং বাল্যাবধি ঐ সকল বিশ্বাসের মধ্যেই বর্দ্ধিত হয়েছিলেন। দার্শনিক দৃষ্টিলাভের বহু পূর্ব্বেই ঐ সকল বিশ্বাস তাঁর অন্তরে সুদৃঢ় সংস্কাররূপে পরিণত হয়েছিল। অন্য দেশে বা অন্য সমাজে জন্মগ্রহণ করলে উক্ত দার্শনিক দৃষ্টি কি তাঁর মনে হিন্দুর দেবদেবীতে বিশ্বাস জন্মিয়ে দিত? কখনই নয়। ঐ দৃষ্টির সঙ্গে এ সকল বিশ্বাসের কোনও কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নেই; অতএব ঐ দৃষ্টি লাভ ক'রে' তিনি সাকার ও নিরাকার উপাসনার 'সামঞ্জস্য' করেছিলেন, এ কথা বলা কি সঙ্গত?

কেহ প্রশ্ন করতে পারেন,—যদি সাকার ও নিরাকার উপাসনার মধ্যে কোন দার্শনিক সামঞ্জস্য না-ই থাকবে, তবে তত্ত্বজ্ঞানলাভের পরেও পরমহংস মহাশয়ের অন্তরে পৌরাণিক দেবদেবীতে বিশ্বাস রইল কেন? এর উত্তর এই যে, তত্ত্বজ্ঞান-লাভ সত্ত্বেও তিনি বাল্য-শিক্ষার ও দেশ-প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠানের প্রভাব সম্পূর্ণ অতিক্রম করতে পারেন নি। অসাধারণ প্রতিভাশালী ও উন্নত জ্ঞানী ব্যক্তিদেরও অন্তরে পূর্ব্বার্জ্জিত কুসংস্কার কিছু কিছু থেকে যেতে পারে, সংসারে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। কথিত আছে, প্রাচীন গ্রীসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী সক্রেটিশ আত্মাতে অধিষ্ঠিত বিবেকরূপী পরমেশ্বরের (যাঁকে তিনি 'Monitor' বলতেন) সাক্ষাৎ পরিচয় পেয়েও পাহাড়ে গিয়ে দেশ-প্রচলিত দেবদেবীর উদ্দেশে মুরগী বলি দিতেন। এ দেশীয় প্রাচীন ঋষিদের কেহ কেহ উন্নত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করবার পরেও ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ করতেন। এরূপ হ'বার একমাত্র কারণ এই যে, নবলব্ধ জ্ঞানালোক তাঁদের চিন্তারাজ্যের সকল অংশে সমভাবে পড়ে নি; কোনও কোনও অংশ পূর্ব্ববৎ

অন্ধকারময় বা ঝাঁপসা র'য়ে গিয়েছিল। মহামান্য ব্যক্তিদের সম্বন্ধেও এ কথাটা স্বীকার করতে আমাদের কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নয়। এতে তাঁদের প্রতি আমাদের ভক্তি হ্রাস হবার কারণ নেই। আচার্য্য শীল মহাশয় পরমহংস সম্বন্ধে এ কথা স্বীকার করলে আর তাঁকে উক্ত মহাত্মার সাকার উপাসনা ব্যাখ্যা করবার জন্ত কোনও দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করতে হ'ত না।

পরমহংস মহাশয় যে নিরাকার ও সাকার উভয় প্রকার উপাসনা করতেন, একে 'সামঞ্জস্য' বলা সঙ্গত নয়; ইহা দুয়ের পাশাপাশি অবস্থান মাত্র। এ দেশে বহু শতাব্দী যাবৎ দুই প্রকার উপাসনার এরূপ পাশাপাশি অবস্থান দেখা গিয়াছে। বর্ত্তমান কালেও ছোট-বড় অনেক সাধকের জীবনে ইহা দেখা যায়। সহস্র সহস্র লোক ঈশ্বরকে এক অথচ বহু, এবং নিরাকার অথচ সাকার, মনে করেন; আর অনেকে তদনুযায়ী দুই প্রকার উপাসনা করেন। এই পরস্পর-বিরুদ্ধ বিশ্বাস ও আচরণ হ'তে মুক্তি পাবার চেষ্টাই আমাদের করা উচিত; এর সমর্থন করলে দেশ মধ্যযুগেই প'ড়ে থাকবে, অগ্রসর হ'তে পারবে না। কারণ, মূর্ত্তি-পূজার অনিষ্টফল অনেক।

শীল মহাশয় বলেছেন, পরমহংস 'সোপাধির' দিক হ'তে জগজ্জননী কালীকে ও ঈশ্বরের অন্য অন্য মূর্ত্তিকে পূজা করতেন। এই সোপাধির দিকটা যে কি, তাহা তিনি ব্যাখ্যা করেন নি। সোপাধির দিক আর পৌরাণিক দেবদেবীতে বিশ্বাস কি একই বস্তু? পুরাণাদির বর্ণনাতে অন্ধভাবে বিশ্বাস না করলে, কোন্ অর্থে দেবদেবীকে 'ঈশ্বরের মূর্ত্তি' বলা যায়? সমগ্র জগৎকে কেহ কেহ 'ঈশ্বরের শরীর' বা 'ঈশ্বরের মূর্ত্তি' বলেছেন। ভক্ত রামপ্রসাদ গেয়েছিলেন, "জগৎটা যে মায়ের মূর্ত্তি জেনেও কি তাই জান না?" জগৎকে ঈশ্বরের মূর্ত্তি বলা হয়, এই অর্থে যে ঈশ্বর জগতের প্রাণ। কিন্তু মানব-কল্পিত দেবদেবীকে ঈশ্বরের মূর্ত্তি বলা যায় কিরূপে? প্রত্যেক দেবতার আকৃতি ও প্রকৃতি পুরাণাদির বর্ণনা হ'তেই গৃহীত। সে-সকল গ্রন্থে প্রত্যেকের জন্ম, বিবাহ, পুত্রকন্যা, শত্রুমিত্র, যুদ্ধবিগ্রহ, সৎকার্য্য-অসৎকার্য্য প্রভৃতির বিবরণ সম্বলিত এক একটি জীবন-চরিত আছে। নিত্য সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বদা একরূপ, অনন্ত ঈশ্বরের কি ঐরূপ জীবনচরিত থাকা সম্ভব? সকল দেবতাই যদি তাঁর মূর্ত্তি হন, তবে তাঁর কি বিভিন্ন প্রকার কার্য্য ও বিভিন্ন প্রকার চরিত্র? এক দেবতা যখন অপর দেবতার স্তুতি করেছিলেন, তখন কি ঈশ্বর নিজেই নিজের স্তুতি করেছিলেন? এক দেবতা যখন অপর দেবতার প্রতি ঈর্ষা করেছিলেন বা ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, তখন কি ঈশ্বর আপনারই প্রতি আপনি ঈর্ষা করেছিলেন বা ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন? এক অখণ্ড ঈশ্বর কি খণ্ড খণ্ড হ'য়ে বিভিন্ন ইচ্ছাবিশিষ্ট ও বিভিন্ন চরিত্রবিশিষ্ট বহু ঈশ্বর হয়েছিলেন? এরূপ কখনও হ'তে পারে না। অতএব, দেবতারা 'ঈশ্বরের মূর্ত্তি' নন। তাঁরা তবে কি? মানবীয় ভাব [যথা—আহার, পান, কাম, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার, স্বার্থবুদ্ধি, অক্ষমতা, ভয়, পলায়ন প্রভৃতি] এবং আংশিকরূপে ঐশ্বরিক ভাব [যথা—সর্ব্বব্যাপিত্ব, সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বশক্তিমত্তা প্রভৃতি] মিশ্রিত করে' দেবতাদের অদ্ভুত চরিত্রকাহিনী রচিত হয়েছে। কেবল মানবীয় ভাব দ্বারা মানবই হয়, দেবতা হয় না; কেবল ঐশ্বরিক ভাব-দ্বারাও ঈশ্বরই হয়, দেবতা হয় না। পুরাণকারগণ উভয় ভাবের সংমিশ্রণে দেবতাদের কাহিনী সৃষ্টি করেছেন। যে-সকল লোক ঈশ্বরের চিরন্তন কার্য্যপ্রণালী বুঝতে ও ধারণা করে' রাখতে অক্ষম, তারা ঐরূপ মিশ্রিত বর্ণনা শুনে মুগ্ধ হয়। মানব-প্রকৃতিতে অলৌকিক কাহিনী শ্রবণ দ্বারা বিস্ময়-রস সম্ভোগ করবার একটা চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা আছে; তার ফলে উক্ত প্রকার বর্ণনা জনসাধারণের প্রিয় হয়। তদ্ভিন্ন, এতে তাদের ঈশ্বর-বিষয়ক কৌতূহলও কিছু পরিমাণে চরিতার্থ হয়। এই সকল কারণে পুরাণসমূহের এত আদর ও দেবপূজার এত প্রসার। পুরাণকারগণ কি নিজেরাই বলেন নাই যে, অল্পবুদ্ধি লোকদের 'হিতের' (মনোরঞ্জনের?) জন্য তাঁরা এই সব কাহিনী রচনা করেছেন? আর, এক এক পুরাণ যে এক এক দেবতাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করবার জন্য অপর দেবতাদের দ্বারা তাঁর স্তুতি করিয়েছেন এবং নানা ঘটনার অবতারণা করে' তাঁদের চরিত্রকে হীনরূপে চিত্রিত করেছেন, তাতেও কি স্পষ্ট বোঝা যায় না যে, এ সব কাহিনী অলীক? বর্ত্তমান যুগে উন্নততর ও বিশুদ্ধতর জ্ঞানলাভের পরেও কি আমরা বলব, পুরাণ-কল্পিত দেবতারা 'ঈশ্বরের মূর্ত্তি'?

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

(তত্ত্বকৌমুদী হইতে উদ্ধৃত)

—•—

সাধুর প্রয়াণোৎসব

৩০শে জুন, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে, নববিধান-প্রাণ বিধানাচার্য্য-ভক্ত সাধু প্রমথলাল সেন স্বর্গগমন করেন। ১লা জুলাই প্রাতে উপাসনার পর সমবেত বন্ধুমণ্ডলী তাঁহার পুণ্যদেহ ভক্তিভরে বহন করিয়া শ্মশানক্ষেত্রে লইয়া যান। সেখানে প্রার্থনার পর দেহ ভস্মাবশেষে পরিণত হয়। পৃথিবী হইতে সাধুর তিরোধান সমসাময়িক মানবসমাজের পক্ষে দুর্ভাগ্যের ঘটনা, কেননা তাহাতে মানবসমাজ তাঁহাদের সাক্ষাৎ পুণ্যপ্রভাব হইতে বঞ্চিত হয়। তাই বাৎসরিক দিন স্মরণ করিয়া তাঁহাদের জীবন আলোচনা করিলে, সেই প্রভাব আবার জীবনে জাগ্রত করিবার একটা নূতন সুযোগ লাভ হয়। গত ৩০শে জুন প্রাতে নব-দেবালয়ে বন্ধুমণ্ডলী একত্রিত হইয়া গভীর দেব আরাধনা, ধ্যান ও প্রার্থনার ভিতর দিয়া দেবতার সঙ্গ ও পূজনীয় দাদা লালু

স্পর্শ লাভ করিলেন। শ্রদ্ধেয় খড়্গসিংহ ঘোষ মহাশয় উদ্বোধন আরাধনার পরে, নিজ জীবনে নালুদার প্রভাব যে ভাবে লাভ করিয়াছেন, তাহা বিবৃত করিলেন। সেই বিবৃতির ভিতর ভগবানের ইঙ্গিতে চালিত জীবন কেমন করিয়া দেবপ্রকৃতি-সম্পন্ন হয়, সচিন্ময়তার দৈববল লাভ করে, গভীর ব্রহ্মানুরক্তিতে স্তরে স্তরে উত্থিত হইয়া রূপান্তরিত হয় ও অধ্যাত্মমূর্ত্তি ধারণ করে, তাহা উপলব্ধ হইল। ব্রহ্মপূজায় নালুদা দেহের দুর্ব্বলতা হইতে অতিক্রান্ত হইতেন। আরাধনা আরম্ভ করিয়া তাঁর সমস্ত অস্তিত্ব দেবসত্তায় মগ্ন হইয়া যাইত। নিজ জীবনে ব্রহ্মপ্রভাব ও সাধনের এই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া, তিনি তাঁহার প্রেমাস্পদ খড়্গসিংহের নিকট সাধনফল বিষয়ে দুইটী লক্ষণ বর্ণনা করেন—১ম, ব্রহ্মে পরানুরক্তি, ২য় সফল সমাজসেবা (effective social service)। সাধনফলে পৃথিবীতে সকল বস্তু অপেক্ষা ব্রহ্মই প্রিয় হন এবং জীবন তাঁহার অনুরাগে ও ভক্তিতে অপরূপ রূপ ধারণ করে; ব্রহ্ম প্রিয় হইলে তাঁহার সন্তান মানবগণের সেবাও অপরিহার্য্য হয়, সমস্ত দেহ মন আপনা হইতে এই সেবায় উন্মুখ হয় এবং এই সেবা সফল সেবা হয়। সফল সেবা বলিতে যাহা বুঝায়, একটী উদাহরণে তাহা পরিষ্কার হইবে, যথা—কোন একটী যাত্রিদলের নৌকায় একটী ছিদ্র হইয়া ভিতরে জল প্রবেশ করিতে লাগিল; যাত্রিগণের মধ্যে যিনি সেই জল উত্তোলন করিয়া ফেলিয়া দিয়া নৌকা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিলেন, তিনি সেবার প্রয়াস করিলেন; কিন্তু এ সেবা সফল সেবা নহে। যিনি ঐ বিপদের মূল, যে ছিদ্র, তাহা বন্ধ করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়া নৌকাপাত্রের ছিদ্রটী বন্ধ করিলেন, তাঁহার সেবাই সফল সেবা হইল। ধর্ম্ম ও চরিত্রকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে লোকসমাজের দুর্ব্বলতা যায় না, সেজন্য এই ধর্ম্ম ও চরিত্রলাভে মানবকে যিনি উদ্বুদ্ধ করিতে পারেন, তাঁহার সেবাই সফল সেবা হয়।

ঐদিন সন্ধ্যায় তাঁহার প্রয়াণভূমি শান্তিকুটীরে পুনরায় বন্ধুগণ সমবেত হন। প্রাতে ডাঃ প্রবোধচন্দ্র রায় মহাশয় শুভ্র শুদ্ধ সুগন্ধ পুষ্পমালায় প্রয়াণগৃহপ্রাচীরে নির্দ্দিষ্ট সমাধি সজ্জিত করিয়া যান। সন্ধ্যার পার্শ্বস্থ গৃহে পূজনীয় রাজা রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ এবং ব্রহ্মানন্দ ও তাঁহার ভক্তদলের প্রতিকৃতির নিম্নে বসিয়া শ্রীযুক্ত হরিসুখ গুপ্তের নেতৃত্বে ব্রহ্মনামকীর্ত্তনে সকলে যোগদান করেন। মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী সাধু প্রকৃতির গৌরব বর্ণনা করিয়া, তাহা লাভের জন্য বিধাতার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন। শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী মণিকা দেবী সিমলা হইতে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে নালুদার লিখিত গভীর ব্রহ্মানুরাগ, লোকানুরাগ ও আধ্যাত্মিকতা পূর্ণ একখানি পত্র পাঠ করেন।

সাধুর পুণ্যদেহ এই পঞ্চভূতময় পৃথিবীতে যেদিন ভস্মে পরিণত হয়, সেদিনই বা সামান্য দিন কি করিয়া ভাবিব? ঐ দিন ৫।১ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে সন্ধ্যায় আবার অনুরক্ত বন্ধুগণ সমাগত হইলেন। ঐ দিন মিলিত আলোচনা, শ্রদ্ধেয় খড়্গসিংহ ঘোষ মহাশয়ের ভক্তি-উচ্ছ্বসিত আরাধনা এবং ভ্রাতা হরিসুখ গুপ্তের নেতৃত্বে সকলের প্রাণ খোলা সঙ্গীতে গৃহ মুখরিত হইল। বিধাতা, বিধান, সাধু ভক্ত, জড় জীব, মানব সকলকে গৌরবান্বিত করি। যে প্রণাম-সঙ্গীত "নমোদেব নমোদেব! নমো নিরঞ্জন হরি" বিধানযুগের আদিকাল হইতে আরতির আলোক জ্বালাইতেছে, সমস্ত অস্তিত্ব দিয়া বিধানবাদী ভক্তিমান্ মণ্ডলীর সহিত যে গান নালুদা শত শত বার উচ্চকণ্ঠে অনুরাগের সহিত গাহিয়াছেন, পূজা অন্তে সমবেত ভাই ভগ্নীগণ আবার সমস্বরে সেই গান গাহিয়া কৃতার্থ হইলেন।

নালুদা খিচুড়ী ভালবাসিতেন। খিচুড়ীর অপর নাম খেচরান্ন। খেচর অর্থ আকাশগামী। তবে কি খিচুড়ী সেই অন্ন, যাহা সাধককে আকাশে লইয়া যায়, অথবা ঊর্দ্ধে উত্থিত করে? ভোগের জন্য অত্যধিক সাধ্য ও সময় ক্ষেপণ না করিয়া, একত্রে পরিপুষ্টিসাধক উপকরণগুলিকে সহজে আহারের উপযুক্ত করিয়া লইয়া যে অন্ন প্রস্তুত হয়, তাহা খেচরান্ন বা আধ্যাত্মিকতা-সাধক খাদ্যবস্তু না হইবে কেন? তাই কি নালুদা খিচুড়ী ভালবাসিতেন? তাই কি দুই যুগ ধরিয়া ভারতের অপর প্রান্তে সিন্ধু করাচিতে সেবাব্রতে জীবনাস্তব্রতী নালুদার সাধু ভ্রাতা পুণ্যশ্লোক একাহারী মৌন নন্দলাল স্বপাক সহজ খিচুড়ীর উপরেই জীবনধারণ করিতেন? কেশবপ্রাণ ভক্তিভাজন ভাই অমৃতলাল বলিতেন, হয়তো বিজ্ঞানের আলোকে ক্রমে এমন খাদ্যের আবিষ্কার হইবে, যাহা একটী শিশিতে কয়েকটী বিন্দুর আকারে রক্ষিত করা যাইবে, এবং মানুষ তাহাতে শক্তি ও সুস্থতা রক্ষা করিতে পারিবে, রান্না ও খাওয়ার জন্য আর সময় দিতে হইবে না। নিজ কন্যাগণকে সর্ব্বদাই রান্না খাওয়ার জন্য সময় কম করিতে বলিতেন, যাহাতে ব্রহ্মপূজা, ব্রহ্মসন্তান-সেবা এবং আত্মোন্নতির জন্যই তাঁহারা অধিক সময় দিতে পারেন। ১লা জুলাই উপাসনার শেষে তাই কয়েকজনে মিলিয়া আনন্দে সাত্ত্বিক খেচরান্ন ভোজন করিলেন এবং সাধুর দেহাবশেষের সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠান পরম ভোগের আধ্যাত্মিক উৎসবে পরিণত হইল।

"In our Hymns A New Bible"—আমাদের ধর্ম্ম-সঙ্গীতে নূতন ধর্ম্মশাস্ত্রের আবির্ভাব।

Behold the Man—দেখুন, ঐ মানব—ঐ মহামানবকে দেখুন! সত্যের আলোকে দেখুন!

১৯১১ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মেণীর বার্লিন নগরে ধর্ম্মমহাসভায় নালুদা প্রচার করিয়াছেন—"বঙ্গদেশে বাঙ্গলাভাষায় যে সকল ধর্ম্মসঙ্গীত রচিত হইয়াছে, তাহা নবযুগে জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত লীলার জীবন্ত শাস্ত্র।......ইহাতে ঈশ্বরের লীলাপূর্ণ নূতন বাইবেল সৃষ্ট হইয়াছে।"

দেখুন, মহামানবকে দেখুন!—মহামানবকে এ জগতে কলঙ্ক-

[illegible] করিয়া রাখিয়া যাইবার জন্য, কলঙ্কমুক্ত মহামানবকে লোকসমক্ষে ধরিবার জন্য—কি প্রাণান্ত চেষ্টা করিলেন, মুদ্রিত Behold the Man প্রকাশ করিতে!

তাই এই ১লা জুলাই এর উৎসবে একখানি নববিধানের ব্রহ্মসঙ্গীত ও একখানি "Behold the Man" উৎসর্গিত হইল।

২রা জুলাই এই স্মৃতির উদ্দেশে সাধু প্রমথলালশিক্ষাতীর্থে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ। নববিধানের যাত্রাপথব্রত নির্দ্দেশ করিয়া ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে রচিত যে সঙ্গীত বালিকাগণের কণ্ঠে প্রথম ধ্বনিত হইয়া এই পৃথিবীর জীবনে তাহাদের উচ্চ আশা স্থাপন করিয়াছিল, বিদ্যালয়ে সকল শিক্ষার্থী ও শিক্ষাব্রতিগণের সম্মিলিত সভায় "কর্ম্মজ্ঞানের ভক্তিযোগের এসেছে বিশ্বে নূতন শিক্ষা" সেই সঙ্গীত গীত হইলে, শ্রীযুক্ত হরিসুখ গুপ্ত পূর্ব্বের নববিধান-বিশ্বাসী সমিতিগুলির সময় কেমন করিয়া নালুদার সঙ্গে যাতায়াত করিয়া তাঁর অপরূপ চরিত্র ও গভীর ধর্ম্মভাবের সহিত পরিচিত হইয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন ও জীবনে সে সৌভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়া চিরকৃতজ্ঞ রহিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করেন এবং শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় লিখিত "সাধু প্রমথলাল' হইতে কিছু পাঠ করেন। তারপর, সাধু প্রমথলালের অপূর্ব্ব সাধুতা ও ভগবদ্ভক্তি মানুষের পক্ষে যে অমূল্য সম্পদ, তাহাতে মানুষকে সম্পদবান করিবার জনাই এই প্রতিষ্ঠানের সূচনা, এবং তাই লোকবল নয়, কেবলমাত্র সত্যের পৃষ্ঠবল, অর্থবল নয়, কেবলমাত্র সফল সমাজ-সেবার অদম্য কামনার বল, এই লইয়াই ইহার স্থাপনা ও পরিচালনা, ইহা শিক্ষার্থিগণকে বুঝাইয়া দেওয়া হইল। তাই নানা অসহনীয় অত্যাচারের মধ্যেও ইহা রক্ষার জন্য প্রাণগত চেষ্টা। প্রতিদিনকার আহার, পানীয়, বস্ত্র, রোগের ঔষধ, পিতামাতা, ভাইবোন, আত্মীয় বন্ধুর প্রেম ও আশ্রয় এবং এই বর্ষাকালে মস্তকের উপরে ছাদ—এ সকল নহিলে আমরা জীবন ধারণ করিতে পারি না; এ সকলে আমাদের অধিকার কোন গুণে? তথাপি যে পাইয়াছি, তাহা বিধাতার দয়া; কিন্তু মানুষের জন্য বিধাতার সব চেয়ে বড় দয়া সাধুজীবন—সাধুর নিজ জীবনে তাঁহার অর্জ্জিত সিদ্ধি। ধর্ম্মের সমান ভাগ্য নাই, চরিত্রের সমান সম্পদ নাই। বিদ্যালয়ের নিয়মাবলীর কাগজেও আমরা এই সত্য লিখিয়াছি। কিন্তু ধর্ম্ম ও চরিত্র অর্জ্জন করিতে হইলে, চক্ষের সমক্ষে সাধুজীবনের সিদ্ধির মত সহায়, উৎসাহদায়ক, পথপ্রদর্শক আর কি আছে? তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা বিধাতার বড় দয়া আর কি হইতে পারে?

শেষে সঙ্গীতশিক্ষক গাহিলেন—

"এই নিবেদন তব চরণে—অধম সন্তানে করহে এবার অভিষেক নবজীবনে; অমৃতচরিত, ভকত-শোণিত, সঞ্চার আমার হৃদয়ে নিয়ত; নাহি প্রয়োজন আর পুরাতন দেহ মনে। সাধুর প্রকৃতি, সুনীতি সুমতি মিলাইয়া দাও দেহ মনে........।"

৭ই জুলাই, ১৯৩৭। নির্ভরপ্রিয়া ঘোষ।

—:—

সংবাদ।

জন্মদিন—কলুটোলা কৃষ্ণভবনে, শ্রীযুক্ত গগণবিহারী সেনের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ দীপ্তিপ্রকাশের জন্মদিনে গত ৪ঠা জুলাই এবং মধ্যমপুত্র প্রদ্যোৎকুমারের জন্মদিনে গত ১৩ই জুলাই ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

গত ১২ই জুলাই, বালীগঞ্জে ৪৩নং কার্ণরোডে, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চাটার্জ্জির গৃহে, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ দেবব্রতের জন্মদিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে ও জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সুশান্তকুমারের শুভবিবাহ উপলক্ষে ২৲ টাকা [illegible] চারতা[illegible] দান করা হইয়াছে।

শুভবিবাহ—গত ১৭ই আষাঢ়, (১লা জুলাই) শ্রদ্ধেয় কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ দেবজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী অলকার সহিত, যশোহর বনগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র উকীলের চতুর্থ পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ বিমলচন্দ্রের শুভ পরিণয় ১১৬নং লোয়ার সারকুলার রোডস্থ ভবনে সম্পন্ন হইয়াছে।

গত ৮ই জুলাই, (২৪শে আষাঢ়), কলিকাতা-প্রবাসী শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দত্তের ৩য় পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ সুশীলকুমারের সহিত, লাহোরনিবাসী পরলোকগত ডাক্তার জোহারীলাল নির্ভারীর দ্বিতীয়া কন্যা কল্যাণীয়া কুমারী সুলেখার শুভপরিণয় হইয়াছে। ডাঃ কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য্য ও পুরোহিতের কাজ করিয়াছেন। তৎপরবর্ত্তী দিন ৯ই জুলাই, সন্ধ্যায় নববধূর শুভাগমন উপলক্ষে, ঢাকুরিয়ায় বানার্জ্জিপাড়া লেনে, "সুখকুটীরে" অধ্যাপক খড়্গসিংহ ঘোষ উপাসনা করেন।

ভগবান্ নবদম্পতিযুগলকে স্বর্গের শুভাশীষ দান করেন। উভয় বিবাহ ১৮৭২ সনের ৩ আইন অনুসারে রেজেষ্ট্রী করা হইয়াছে।

পরলোকগমন—আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, গত ১৪ই জুলাই, বুধবার, পাটনাতে, তত্রত্য ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত হরিহর দাসের (ডাঃ শশিভূষণ দাস গুপ্তের জামাতা) খুল্লতাত শ্রীযুক্ত তারাপদ দাস স্বাভাবিক নিয়মে রাত্রি আহার পানের পর, মধ্যরাত্রিতে সামান্য অসুখ অনুভব করিয়া তন্মুহূর্ত্তে পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। পরমজননী তাঁহার সন্তানের আত্মাকে প্রেমক্রোড়ে নিত্যশান্তিতে রক্ষা করুন এবং শোকার্ত্ত পরিবারে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

সেবা—গত ২৬শে জুন, শনিবার, সায়ংকালে স্বর্গীয় ডাঃ শরৎকুমার দাসের ২৮নং নরসিংহ দত্ত রোড ভবনে ভাই অখিলচন্দ্র রায় পারিবারিক বিশেষ উপাসনা করেন। পুরবাসিনী মহিলারা সঙ্গীত করেন। ২৭শে জুন, রবিবার প্রাতে, ১০৩ নরসিং দত্ত রোডে, হাওড়া ব্রাহ্মসমাজে তিনি সামাজিক উপাসনা করেন। ব্রাহ্মভ্রাতা অক্ষয়কুমার দত্ত প্রায়

...র কাল এইরূপ সামাজিক উপাসনার ব্যবস্থা করিয়া ...ছেন। ঐদিন উপাসনায়, দেহমন্দিরে জীবন্ত ব্রহ্মের ...দর্শনে, সত্যনিষ্ঠ হইয়া তাঁর পূজা করিলে আর আমা- ...র ভেদ বুদ্ধি থাকে না, ঐভাবে আত্মনিবেদন হয়।

...সিক স্মৃতি—গত ৩০শে আষাঢ়, ৬৫।১ হ্যারিশন ...শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পিতৃদেব স্বর্গীয় শ্রীনাথ দত্তের ...নের মাসিকস্মৃতি উপলক্ষে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা

...াম্বৎসরিক—গত ৩০শে জুন, ১৬ই আষাঢ়, প্রাতে ...ীতে রায় সাহেব ডাক্তার প্রবোধচন্দ্র রায়ের মাতৃদেবী ... গোলাপসুন্দরী দেবীর সাম্বৎ[illegible] দিন উপলক্ষে ...ন্দিরে ভাই অখিলচন্দ্র রায় দুইবেলা উপাসনা করেন এবং ...বনের বিশেষত্ব বিষয়ে আত্মনিবেদন করেন।

... জুলাই ১৩২নং রাসবিহারী এভেনিউ ভবনে, ডাক্তার ...দ রায়ের মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে, অধ্যাপক ...হ ঘোষ উপাসনা করেন।

... ২২শে আষাঢ়, ৬ই জুলাই, হাওড়ায় ৫০নং কালিপ্রসাদ ... লেনে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাসের গৃহে, তাঁহার সহধর্ম্মিণীর ...রিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই ... প্রচারভাণ্ডারে ৪৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

... ২৬শে আষাঢ়, ১০ই জুলাই, হাওড়ায় ১৯নং কুচিল সরকার ... শ্রীমান্ সন্তোষকুমার দাসের গৃহে, তাঁহার পিতৃদেব ... সূর্য্যকুমার দাসের এবং সূর্য্যবাবুর মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক ...াই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে ...ভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

...ত ২৭শে আষাঢ়, ১১ই জুলাই, ২৪।৩ বাকির মির্জাপুর ... শ্রীমান্ সন্তোষচন্দ্র দত্তের গৃহে, তাঁহাদের পিতৃদেব স্বর্গীয় ...চন্দ্র দত্তের সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা ...। এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করা ...ছে।

...ত ২৯শে আষাঢ়, [illegible] জুলাই, [illegible] ১৭নং বৈঠকখানা ... সঙ্গীতাচার্য্যের জামাতা স্বর্গীয় সুধাংশুনাথ চক্রবর্ত্তীর ...রিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই ...ক পত্নী শ্রীমতী পুণ্যদায়িনী চক্রবর্ত্তী প্রচারভাণ্ডারে ২৲টাকা ...রিয়াছেন।

...দা সন্ধ্যায়, ১৮নং বিডন ষ্ট্রীট, স্বর্গীয় ডাক্তার এস, কে, ... ভবনে, তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী, শ্রীমান্ সুধীন্দ্রনাথ সরকারের ...বী স্বর্গীয়া সরোজিনী সরকারের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই ...কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে ...টাকা দান করা হইয়াছে।

...দান—বাঁকিপুর অপূর্ব্বকৃষ্ণ পাল নববিধান-প্রচার- ...নর ট্রাষ্টীগণ কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে নববিধান প্রচার জন্য, গত মার্চ্চ মাস হইতে মাসিক ৫৲ টাকা [illegible] ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক-মণ্ডলীর হস্তে দান করিতেছেন [illegible] এ দান সার্থক হউক।

ভ্রম-সংশোধন—গত ১লা আষাঢ়ের ধর্ম্মতত্ত্বে, ১৩২ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমে, প্রথম লাইনে প্রকাশিত "অপ্রিতম" নামের পরিবর্ত্তে "অপ্রতিম" নাম হইবে।

প্রেরিত পত্র

পুরী, নববিধান আশ্রমের মধ্যে নব নির্ম্মিত প্রেমেন্দ্র স্মৃতিতীর্থ হলের জন্য বিশেষভাবে নিম্নলিখিত সহৃদয় মহোদয় ও মহোদয়াগণের নিকট সহানুভূতি ও সাহায্য পাইয়া তাঁহাদিগের নিকট গভীর কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ১। শ্রদ্ধা-ভাজনীয়া মহারাণী সুচারু দেবী স্বয়ং সমস্ত মহাপুরুষ মহাজন-দিগের অমৃতময় উপদেশাবলী স্বহস্তে সুন্দর অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছেন। ২য়। শ্রীমদাচার্য্যদেবের দ্বিতীয়া কন্যা স্বর্গীয়া সাবিত্রী দেবীর পুত্রগণ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দদেবের যোগমগ্ন একটী বড় প্রতিকৃতি (ছবি) ঐ প্রেমেন্দ্র হলের জন্য দান করিয়াছেন। ৩য়। শ্রীমতী লীলা নারায়ণ একটী সুন্দর বক্স হারমোনিয়াম। ৪র্থ। আচার্য্যদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত অশোককুমার সেন একটী বড় ঘড়ী (ক্লক)। ৫। শ্রীমতী বিভাবতী মুখোপাধ্যায় ২খানি সতরঞ্চ। ৬ষ্ঠ। শ্রীমতী সুরুচি দেবী কতকগুলি ধর্ম্ম-পুস্তক। ৭ম। ডাক্তার সত্যানন্দ রায় কতকগুলি ধর্ম্মপুস্তক। ৮। ডাঃ অনুকূলচন্দ্র মিত্র ১খানি শ্বেত পাথরের চৌকী (নিত্য উপাসনার ব্যবহার জন্য)। ৯। শ্রীমতী কিরণ বসু ২৮খানি মূল্যবান পুস্তক। ১০। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী কতকগুলি ধর্ম্মপুস্তক। ১১। কুমারী সুচিত্রা নারায়ণ নিত্য উপাসনার কতকগুলি সরঞ্জাম। ১২। শ্রীমতী চারুবালা বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩৲। ১৩। শ্রীমতী প্রফুল্লবালা হালদার (বর্ম্মা) ৫০৲। ১৪। শ্রীযুক্ত সুমন্ত্র মহলানবিশ ১০৲। কুমারী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৲। ১৬। কুমারী রমা বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৲। ইহাব্যতীত ময়ূরভঞ্জের মহারাজকুমার ধ্রুবেন্দ্রচন্দ্র ভঞ্জদেও ১০০৲ বেঞ্চের জন্য এবং ময়ূরভঞ্জের মহারাজকুমারী জয়ন্তী দেবী পেট্রোম্যাক্স ল্যাম্পের জন্য ৪০৲ টাকা দান করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

আমি আশা করি, পুরাতন পুরীতীর্থকে নববিধানের নূতন সাধনতীর্থে পরিণত করিবার জন্য, আমাদিগের এই প্রচেষ্টার প্রতি সমস্ত ধর্ম্মবিশ্বাসী মহোদয় মহোদয়াগণ সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখিয়া মুক্ত হইবেন।

কলিকাতা, পি, ১৭ নিউথিয়েটার রোড, পোঃ সার্কাস। ১৮।৭।১৯৩৭।

বিনীতা
সুধাংশুবিকাশিনী দেবী

Edited on behalf of the Apostolic Durber New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha, কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।